উদ্বোধন



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

৬২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা | বার্ষিক মূল্য ৫৲

মাঘ, ১৩৬৬ | প্রতি সংখ্যা ০·৫০

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬২তম বর্ষ

(১৩৬৬-মাঘ হইতে ১৩৬৭-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ-১৩৬৬ হইতে পৌষ-১৩৬৭),

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

উদ্বোধন

ভারতাত্মার বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্যের নিকট আমার বক্তব্য আমি সাহসের সহিত বলিয়াছি। হে আমার প্রিয় স্বদেশবাসিগণ, তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য আরও সাহসিকতাপূর্ণ। নবীন পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিকট প্রাচীন ভারতের বার্তা আমি সাধ্যমত প্রচার করিয়াছি, ইহা ভালভাবে হইয়াছে কি হয় নাই, ভবিষ্যৎই তাহা প্রকট করিবে; কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলশালী কণ্ঠ হইতে এখনই মৃদু অথচ স্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—দিন দিন তাহার শক্তি বর্ধিত হইতেছে—ভবিষ্যৎ ভারত বাণী প্রেরণ করিতেছে বর্তমান ভারতের নিকট!

আমরা ভারতের অধঃপতনের কথা অনেক শুনিয়া থাকি। একদিন ছিল, যখন আমিও এ সব বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার শক্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া, দৃষ্টির বিঘ্নকারী সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বোপরি পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রগুলি যথাস্থানে যথাভাবে দর্শন করিয়া বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি—আমার ভুল হইয়াছিল।

আর্যদের পুণ্যভূমি! তোমার কোনদিন অধঃপতন হয় নাই। রাজদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে, উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শাসনদণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে। কিন্তু ভারতে রাজা এবং রাজসভা অল্প কয়েকজনকেই বিচলিত করিয়াছে; উচ্চ হইতে নীচ অগণিত জনগণ অবারিতভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অনিবার্য গতিপথ; জাতীয় জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে—কখন মন্দবেগে অর্ধচেতনভাবে, কখন জাগ্রত চেতনায় প্রবলভাবে। আমি অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখি, চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াছে অখণ্ড মিছিলের মতো, তাহার উজ্জ্বলতা কোথাও একটু কম—আবার একটু পরেই উহা দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওই, ওই দেখা যায় আমার জননী জন্মভূমি চলিয়াছেন শান্তগম্ভীর পদসঞ্চারে তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গৌরবময় কর্তব্য সম্পাদনে—পশুমানবকে দেবমানবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, স্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে।

[Introduction to 'India's Message to the World' হইতে অনুবাদ]

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষের উদ্বোধন

কালস্রোতে আর একটি তরঙ্গ অতীতের বক্ষে বিলীন হইয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র ৬২তম বর্ষ আরম্ভ। শ্রীভগবানের শুভাশিস্-শক্তিই আমাদের সম্বল। নববর্ষের যাত্রাপথে সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা দিনে দিনে নূতন করিয়া লাভ করিব, ইহা নিশ্চিত জানিয়াই আমরা আগাইয়া চলি।

'উদ্বোধনে'র বাণী জাগরণের বাণী, আবার অগ্রগতির বাণী। নিদ্রিত আত্মবিস্মৃত মানুষ ভোগাচ্ছন্ন স্বপ্ন হইতে জাগরিত হওয়ার পর কি করিবে? সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত মৃতপ্রায় মানুষ অমৃতময় আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া তার পর কি করিবে?—আত্মলাভের পথে, আত্মবিকাশের পথে, সাধনার পথে আগাইয়া চলিবে!

'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি'। যে চলিতে থাকে সেই মধু আহরণ করে। আমাদেরও চলিতে হইবে—জ্ঞানের সন্ধানে, হারানো স্বরূপের সন্ধানে!

স্থিরতা জড়ের ধর্ম, স্থবিরত্ব মৃত্যুর লক্ষণ, স্পন্দন প্রাণের ধর্ম, প্রকাশ চৈতন্যের লক্ষণ, অবারিত জয়যাত্রা জীবনের লক্ষণ। বজ্রনির্ঘোষে স্বামীজী যদি কোন কথা শতাধিক বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন তো তাহা গায়ত্রীমন্ত্রের মতো সেই মহাবাণী, 'ওঠ, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ ততক্ষণ থামিও না।'

স্বার্থ-সীমিত জীবনের মোহনিদ্রা হইতে আমাদের জাগিয়া উঠিতে হইবে। 'আমি ও আমার'—এই দুটি কথায় ভরা সুখতন্দ্রা ভাঙিতে হইবে! তারপর? তারপর চলিতে হইবে লক্ষ্যের অভিমুখে, লক্ষ্য সেই সুদূরের আদর্শ—যাহা দূরে, আবার নিকটে—অন্তরের অন্তরে! 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'! সেই লক্ষ্যই তো আমাদের হারানো স্বরূপ! তাহার অনুভূতি হারাইয়াই তো আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু। তাহার অনুভূতি ফিরিয়া পাইলেই মানুষ দুঃখের পারে যায়, তাহার কষ্টের শেষ হয়, সে বোঝে—স্বরূপতঃ আমি 'বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকঃ'—আমি জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন—স্বরূপতঃ আমি জ্ঞানের আলোক, প্রেমের আনন্দ। এই জ্ঞানের আলোকই মানুষের সকল দুঃখ দুর্বলতা দূর করে, জ্ঞানই তাহাকে ভয় হইতে মুক্ত করে; প্রেমের আনন্দই মানুষকে ভোগ হইতে ত্যাগে, সীমা হইতে অসীমে, অল্প হইতে ভূমায় লইয়া যায়। নববর্ষের উদ্বোধনে আমরা সেই আত্ম-বিকাশের, আত্মবিস্তারের প্রার্থনা জানাইয়া ছন্দোময় কর্মময় জীবনের পথে অগ্রসর হই।

*　　*　　*

আমাদের আগাইয়া চলিতেই হইবে, কারণ আমরা যে শুনিয়াছি স্বামীজীর কথা—আমরা যে বিশ্বাস করি তাঁহার বাণীর প্রতিটি অক্ষর: 'আধ্যাত্মিকতার এক বন্যা আসিতেছে। স্পষ্ট দেখিতেছি, এই উদ্দাম, বন্ধনহীন, সর্বগ্রাসী প্লাবন সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সকলে অগ্রসর হও, সকলের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা এই প্লাবনের গতিবেগ বর্ধিত করুক এবং তোমাদের সমবেত উদ্যমে উহার পথ বাধামুক্ত হউক!'

আমাদের থামিলে চলিবে না—লক্ষ্যের অভিমুখে অবিরত আগাইয়া চলিতে হইবে। 'উদ্বোধন' যে স্বামীজীর জাগরণের বাণী—অগ্রগতির আহ্বান!

'আগামী পঞ্চাশ বৎসর—'

'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন'—স্বামীজীর এই নির্দেশ দেশবাসী—জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক—গ্রহণ করিয়াছিল ; সংখ্যায় খুব বেশি না হইলেও মধ্যবিত্ত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মর্মে মর্মে স্বামীজীর এ বাণী একদিন নাড়া দিয়াছিল।

স্বল্পমাত্রায় আচরিত হইলেও যুগোপযোগী এই ধর্ম আমাদিগকে মহা ভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছে। স্বামীজীর মুখে এই বাণী উচ্চারিত হইবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই দেশজননী পরাধীনতার পাশমুক্ত হইয়াছেন,—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শৃঙ্খলিতা বন্দিনী জননী আবার রাণীর আসনে—দেবীর আসনে বসিয়াছেন।

স্বামীজীর চক্ষে দেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষের মতো প্রতিভাত হইযাছিল, তাই জাতির চরমতম অবনতির দিনেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে দেশের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, এবং আসন্ন প্রভাতের মাঙ্গলিক গীতি গাহিয়া গিয়াছেন! তিনিই সেই রাত্রিশেষের ঘনীভূত অন্ধকারের বক্ষে উষাগমের স্পন্দন-স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন, তিনিই ভারতবাসীকে ডাক দিয়া শুনাইয়াছিলেন: ওঠ, জাগো, সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়,—ওঠ, জাগো, দিবসের কর্মভার গ্রহণ কর, জগৎ তোমার প্রতীক্ষারত!

সে বাণী কেহ শুনিয়াছে, কেহ শোনে নাই, তা বলিয়া যুগধর্মের রথচক্র স্থির হইয়া বসিয়া নাই! ঘর্ঘর ধ্বনিতে তাহা চলিয়াছে বিশ্ব-পরিক্রমায়। দেশে বিদেশে দেব-মানবতার জাগরণী বাণী হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে, ধীরে—কিন্তু ধ্রুব।

উদয়কালীন দিগন্ত-লগ্ন সূর্য নবীন আশা ও নব অনুরাগের বার্তা বহন করিয়া আনে, অন্ধকার-ভয় বিদূরিত করিয়া আনন্দ-কাকলিতে গগন পবন মুখরিত করে। কিন্তু আলোক-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল আকাশে অরুণিমা মিলাইয়া যায়, প্রভাত-সূর্য ক্রমশঃ দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়; তাহার কিরণরাজি বিচ্ছুরিত হইয়া, প্রতিফলিত হইযা চারিদিকের সকল কিছু প্রকাশিত করে, কিন্তু সূর্যকে আর কেহ দেখে না, দেখে বিচিত্র জগৎ—বিচ্ছিন্ন সংসার, হারাইয়া যায় জগৎ-প্রকাশক আলোকের উৎস।

*　　　*　　　*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মানুষ স্বামীজীকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, এখন আর তাহা দেখে কি? কাহারও কাহারও মতে স্বামীজীকে আমরা ভুলিয়াছি, কাহারও মতে সম্পূর্ণ ভুলি নাই, ক্রমশঃ ভুলিতেছি! আবার কেহ কেহ বলেন: স্বামীজীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এক সময় প্রয়োজন থাকিলেও এখন আর ঐ সব ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে লোককল্যাণ-প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নাই! দেশে 'দরিদ্র' থাকিলে তবে তো মুক্তির সাধকেরা 'দরিদ্রনারায়ণে'র সেবা করিয়া নিজ নিজ মুক্তির পথ প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাইবেন। আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের অভিধানে 'দরিদ্র' শব্দটিই অচল। তবে এখনও যে দেশে দরিদ্র আছে, তাহার কারণ পৃথিবী এখনও পুরাতন ভাব সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারে নাই। দান করিয়া কাল্পনিক পুণ্য অর্জন করিবার মতো লোভী ধনী এখনও আছে বলিয়াই দান গ্রহণ করিবার মতো লোভী দরিদ্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয়ই একসঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। ইহা অতি সুন্দর মুখরোচক মনোরম আশাবাদ,—আদর্শবাদ ইহাকে বলা

চলে না, কারণ ইহা তথাকথিত 'বাস্তববাদী' দর্শনেরই অনুসিদ্ধান্ত।

অভাবগ্রস্ত আর্ত পীড়িত দরিদ্রদিগকে যাঁহারা অর্থনীতির রঙীন চশমা দিয়াই দেখেন, তাঁহাদের সহিত এখানে আমরা কোন বাদে প্রবৃত্ত হইব না। শুধু বিবেকানন্দ-সমালোচনার একটি আধুনিক ধারা দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা একান্ত আবশ্যক বোধেই এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ধৃত হইল।

এতদ্‌ব্যতীত আর একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা মনে করেন—স্বামীজীর প্রাচীনপন্থী আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাস প্রগতিশীল বর্তমানে অচল। তাঁহারা স্বামীজীর ধর্মপ্রাণতামূলক দেশপ্রেমকে ভুল করিয়া মনে করেন 'সেকেলে জাতীয়তাবাদী হিন্দুয়ানি' (out-of-date patriotic Hinduism)। এই প্রকার যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই 'আমেরিকায় স্বামীজী'-বিষয়ক বিরাট গ্রন্থের রচয়িত্রী মার্কিন মহিলা তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য ঃ

ভারতের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত আমার যতটুকু পরিচয় আছে তাহাতে মনে হয়—অনেক আধুনিক হিন্দু (ভারতবাসী) মনে করেন, স্বামীজীর মতামত সেকেলে। তাঁহাদের মতে—পরিবর্তিত অবস্থায় স্বামীজীর ভাবাদর্শ অচল। কিন্তু আমি স্বামীজী সম্বন্ধে যতটুকু জানিয়াছি—তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাই, তাঁহার উপদেশগুলি আজও সজীব। আর যদি অনুমতি পাই, তবে বলিতে পারি—স্বামীজীর শিক্ষা অবহেলা করিলে ভারতবাসিগণ নিজেরাই বিপদে পড়িবে।*

এ কথার সত্যতা আজ আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। সম্পূর্ণভাবে না হইলেও দেশবাসী কথঞ্চিৎ ভাবে স্বামীজীকে ভুলিতে বসিয়াছিল। তাই আজ চারিদিকে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদের নামে স্বার্থবাদ সুবিধাবাদ ও তাহার ফলস্বরূপ মুষ্টিমেয়ের দুর্নীতি ও জনসাধারণের দুর্গতি। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেশে যে নৈতিক বল ছিল, আজ তাহা গল্পের বিষয়বস্তু।

'ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ, এই পথে তাহার জীবনধারা প্রবল বেগে চালিত কর, বাকী সব আপনা আপনি আসিবে'—স্বামীজীর এই উক্তি দীর্ঘ দিন ধরিয়া বহু ভারতীয় যুবককে ত্যাগ ও সেবার পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ত্যাগের কথা শুনিলে আজ তরুণেরা হাসে, ভোগের কথায় তাহারা উৎকর্ণ—লালায়িত। তাহারা মনে করে ঃ ভোগেই তাহাদের জন্মগত অধিকার। সকলে ভোগ করিতেছে, আমি কেন করিব না? একদা চিন্তার ধারা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত ঃ যেহেতু সকলে ভোগ করিতেছে, অতএব আমি করিব না। আমি মহত্তর কিছুর সন্ধানে চলিব, প্রেয় ছাড়িয়া শ্রেয়ের সাধনা করিব।

চক্রপথে মানব-মনের এ পরিবর্তন ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর অজানা ছিল না, তিনি জানিতেন, 'an age of continence is followed by an age of corruption.'—একটি সংযমের যুগের পরে দেখা দেয় একটি অসংযমের যুগ। আজ সেই যুগ আসিয়াছে। আমরা কি ইহারই স্রোতে ভাসিয়া যাইব, অতলে তলাইয়া যাইব, না কি ঘূর্ণাবর্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিব? যদি সেই চেষ্টাই করিতে হয়, কি ভাবে করিব? কোথায় আমাদের শক্তি? কে আমাদের সহায়?

সহায় আমাদের তিনিই, যিনি জানিতেন—তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়াই মানুষ আগাইয়া

* মূল ইংরেজী উদ্ধৃতিটি এই প্রবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য।

চলে। শক্তি আমাদের তিনিই দিবেন, যিনি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তি দর্শন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন মানব-মহিমা। স্বামীজীকে ভুলিলে চলিবে না। যাঁহার বাণী ও উদ্দীপনা একবার আমাদিগকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছে, তাঁহারই শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদিগকে আবার এই মহত্তর দুর্গতি হইতেও পরিত্রাণ করিবে। স্বামীজী কি বলেন নাই, 'যাহা দিয়া যাইতেছি, তাহা কার্যে পরিণত করিতে ১৫ শত বৎসর লাগিবে'?

তাঁহার একটি মাত্র ভাবমন্ত্র সাধন করিয়া দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশবাসী ভুলিয়াছে তাঁহার কঠোর কঠিন সবধানবাণী: 'এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' স্বাধীনতা সত্ত্বেও দেশের বর্তমান দুঃখ দুর্দশা দুর্নীতি দেখিয়া যাঁহারা ব্যথিত ও চিন্তিত তাঁহাদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে: এবার স্বামীজীর কোন্ মহামন্ত্র সাধনা করিলে তবে আমরা এই নবজাগ্রত দেশের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে পারিব? নূতন দেশের জন্য আজ প্রয়োজন নূতন মানুষ। অধঃপতিত জাতির জন্য সুগভীর সমবেদনা অনুভব করিয়াই স্বামীজী আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এক অপূর্ব প্রার্থনা-মন্ত্র: 'মা, আমায় মানুষ কর।'

কেন, আমরা কি মানুষ নই? দেশে কি সত্যই মানুষের এত অভাব স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন যে বারংবার বলিয়াছেন, 'মানুষ গড়ার ধর্মই আমার ধর্ম!'

কী সেই 'মানুষ-গড়া ধর্মে'র রহস্য-মন্ত্র? শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিতেই ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে; কথাটি এত সরল ও সহজ যে ইহার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ গভীরেই থাকিয়া যায়। স্বামীজীর জীবন দেখিয়াই, স্বামীজীর ব্যাখান হইতেই আমরা ইহার অর্থ কিছুটা ধরিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মানুষে'র সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'মানুষ, না মানহুঁশ'। কথাটি কাব্য-পূর্ণ, কথাটি সূত্রাকারে উচ্চারিত। যার মান বা সম্মান বোধ আছে সেই মানুষ; আবার যে নিজের মান, পরিমাণ বা স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন সেই মানুষ। জানি না ইহার আরও কত গভীরতর অর্থ হইতে পারে, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি সেইটুকু সাধনা করিয়া যদি জীবনে পরিণত করিতে পারি, তবেই—কি ব্যক্তি-জীবন কি সমাজ-জীবন, কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হইয়া যায়।

'মা, আমায় মানুষ কর'—আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য ইহাই আমাদের সাধনমন্ত্র হউক এই 'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন' করিতে হইবে। অমানুষের মতো 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-জীবন যাপন করিয়া লাভ কি? যদি জীবন ধারণ করিতেই হয় তো মানুষের মতো জীবন যাপন করিতে হইবে। স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্মিত পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সচল বিগ্রহ, স্বামীজীই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের—নর-নারায়ণবাদের শক্তিশালী প্রবক্তা, স্বামীজীর নব-মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা কোটি কণ্ঠে প্রার্থনা করি: মা, আমাদের দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, মা আমাদের মানুষ কর।

*　　*　　*

From what I have learned of current Indian thought, it appears that a number of modern Hindus consider Swami's views outmoded and no longer applicable to the changed conditions and ideologies. But from what I have learned of Swami Vivekananda himself, it appears obvious that his counsel is still of vital relevance and that if I may be permitted to say so, the Indian people will neglect his teachings only at their peril. —**Marie Louise Burke**

[*From Preface to 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries'*]

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষ আসে—মানুষ যায়, কালের ঘূর্ণাবর্তে ক্ষণিকের ঢেউ তুলে আবার মিলিয়ে যায়। কোন লেখা বা রেখা তার ঐ ছোট্ট ঢেউ-এর স্মৃতি-কণাকে আর বহন করে না। এ যেন সত্যই 'জীবন'—জীবনের আর এক নাম যে জল, সেই অর্থে। জলের ঘায়ে জলের বুকে তার কোন দাগই তাই আঁকা থাকে না। কিন্তু এই নিশ্চিহ্নতার মিছিলে এমন মানুষও দেখা দেয়, যার কথা মহাকাল তার ধ্বংসাত্মক অবলুপ্তির মধ্যেও সোনার আখরে লিখে রাখে।

মানুষ আসে, মানুষ যায়—এই প্রবাহের মধ্যেও এঁরা চিরস্থির হ'য়ে থাকেন। শুধু স্মৃতি হিসাবে নয়—মানুষের সুমুখে এঁরা এক অপূর্ব আদর্শের আলোকবর্তিকা জেলে বিভ্রান্ত মানুষকে সদাই পথ দেখান। এই রকম এক আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মানুষের মধ্যে কেউ দ্বিদল, কেউ শতদল, কিন্তু স্বামীজী হলেন সহস্রদল পদ্ম—*শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রকার উক্তির যাথার্থ্য বিচারে আমরা যতই অগ্রসর হই*, ততই আমাদের কাছে ঐ কথার তাৎপর্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আমরা তখনই বুঝতে পারি, এই একটি মানুষ ভারতবর্ষকে কতখানি উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন—এবং এখনো এই ভারতবর্ষকে জগতের সুমুখে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কতখানি তাঁর আদর্শানুগ হ'য়ে চলতে হবে।

শুধু আধ্যাত্মিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, ভারতের শিক্ষা, এমন কি সমাজ-চেতনার আদর্শানুসরণেও আমাদের স্বামীজীর উক্তিগুলি আজ স্মরণ করতে হবে।

আত্মতত্ত্বের কথায় তিনি বলেছেন: আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হ'বে। * * * তবে ভিতরে আত্মা সর্বদা জল্ জল্ করছে—সেদিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! এইটাই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকে জগতে ব্যাবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থ-ভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান। * * * লোক যে পাপ পাপ বলে, সেটী দুর্বলতার ফল—'আমি দেহ' এই অহং ভাবের রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুমি পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হ'য়ে যাবে। ঠাকুর তাই বলতেন—আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।

শিক্ষার কথায় তিনি আমাদের শুনিয়েছেন: যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। * * * Negative thought ('নেই নেই' ভাব) মানুষকে নির্জীব ক'রে দেয়।

দেখছিস না, যে সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে, 'ওটার কিছু হবে না, ওটা বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হ'য়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। * * * ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। * * * নিজেদের মধ্যেকার দেবভাবের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। * * * কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে।

সমাজ-চেতনা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য: 'তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। * * * এইটী বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। * * * আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া—এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়।' * * * 'পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে তার দ্বারা কোন কার্যই হ'তে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখনি ক'রে ফেল; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন—তার ভেতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হ'তে পারে? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি, যা হয় করবেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা।'

জাগর মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে তিনি শুনিয়েছেন: ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

স্বামীজীর এই সব উক্তি অপরিসীম প্রেমের শক্তিতে অমর হ'যে আছে। তাই বলি, চল পথিক, তোমার জীবনের দীপটিকে ঐ আদর্শালোকে জালিয়ে নিয়ে চল। তোমার মনের সমগ্র সত্তাকে ঐ দিব্যদৃষ্টির সুমুখে অবারিত ক'রে দাও। তারপর সেই ধ্যানসম্পদ নিয়ে তোমার জীবনকে ক'রে তোল পূর্ণ, সার্থক। তিনি তো তোমাদের জন্যই সেই চিরসুন্দরকে আহ্বান জানিয়েছেন তোমাদেরই হৃদয়-দিগন্তে। সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে তোমার হৃদয় মন্দিরে আবাহন ক'রে নিয়ে এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণীতে 'শিক্ষাবিভাগে' জুনিয়র শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯ পড়িবেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি পত্র

[স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-সংগৃহীত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ ॥ SRI RAMAKRISHNA MISSION ORPHANAGE
P O. MAHULA, DT. MURSHIDABAD.
Dated 1st. Feby. 1913. ১৯শে মাঘ, সন ১৩১৯

প্রিয় শ্রীমান্ বিরজানন্দ,

অনেক দিন হইল 'Life' I Vol (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনীর ১ম খণ্ড) আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, এবং যতক্ষণ পাঠ করি রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে যেন দেখিতে পাই। সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই কাশীপুরের বাগান প্রভৃতির কথা পড়িতে পড়িতে হুবহু সেই সকল চক্ষের সাম্নে আসিয়া পড়ে। ধন্য Mother (মিসেস সেভিয়ার) ও ধন্য শ্রীশ্রীস্বামীজীর Eastern and Western Disciples (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ) ! যাঁহাদের বহুকালের আন্তরিক যত্নে আজ আমরা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর 'Life' (জীবনী) সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম। তোমাদের সকলের ঐকান্তিক যত্নের ফলে এবং শ্রীমতী mother (মাদার)-এর অসীম ভক্তি জোরেই শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজেই তোমাদের লিখিত 'Life'-এ (জীবনী গ্রন্থে) তাঁহার spirit (ভাব) সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়াছেন !!! তোমাদের সমবেত চেষ্টা ও অচলাভক্তির ফলে যেন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সর্বদা তোমাদের এই বইখানির মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তবে একটা কথা এই যে ১ম খণ্ড পড়িয়া ২য় খণ্ডের জন্য আরও ৪ মাস বিলম্ব প্রায় অসহ্য বোধ হইবে। কবে আবার 2nd Volume (২য় খণ্ড) পাইব বলিয়া দিন গনিতে থাকিলাম।

Mother (মাদার)-কে আমার হইয়া বলিও যে 'অদ্বৈত আশ্রম' হইতে এই যে শ্রীশ্রীস্বামীজীর 'Life' (জীবনী) বাহির হইল, ইহার তুলনা নাই ! কেবলমাত্র এই একটি কাজের জন্যই অদ্বৈত আশ্রমের গৌরব অক্ষুণ্ণ ও চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিল !!! ২য় Vol. (খণ্ড) বাহির হইবামাত্রই যেন আমাকে মনে থাকে। আর তাহা কি নাগাইদ বাহির হইবে, তাহাও লিখিয়া জানাইবে।

গত ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শুভ জন্মতিথিপূজা হোম আরতি যথারীতি হইয়াছে, এবং ভোগ লাগাইয়া আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে খাওয়ানো হইয়াছে। আবার আগামী কল্য রবিবার 'দরিদ্রনারায়ণ' ভোজন এবং উৎসবানন্দ হইবে। বহরমপুর Ramakrishna Vivekananda Association (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি)-এর member (সদস্য—কলেজের ছাত্র)-গণের আসিবার কথা আছে। তোমাদের ওখানে উৎসব কিরূপ হইল—লিখিবে।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং শ্রীশ্রীমহারাজও মঠে আসিয়াছেন, বোধ হয় শুনিয়াছ।

কাশিমবাজারের Hon'ble Maharaja (মাননীয় মহারাজা)-কে 'Life' (জীবনী) একখানি পত্রপাঠ পাঠাইবে, এবং তোমাদের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিবে।

...মাদারকে আমাদের এখানকার সকলের নমস্কার ও ভালবাসা জানাইবে, এবং তোমরা সকলে জানিবে। আশ্রমের ছেলেরা এক রকম ভাল আছে। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ।...ইতি—তোমাদেরই শ্রীঅখণ্ডানন্দ।

সংসারে থেকে সাধনা *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

এই তোমাদের লখনউ-এরই মেয়ে কাশীতে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, তুমি ঠাকুরকে তোমার ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসো? অদ্বৈত গোস্বামী বংশের মেয়ে জেনে কি জানি কেন আমার ভেতর থেকে এই প্রশ্নটি করতে ইচ্ছা হ'ল। তাই ওঁকে এ রকম জিজ্ঞাসা করলাম। তার উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই'। একঘর লোক বসে আছে। বেশীর ভাগই মেয়ে। সেই আমার প্রথম প্রশ্ন। আর কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি। যখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই'—তখন বললাম, তোমার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো। তখন তিনি বললেন, 'মহারাজ, ছেলেমেয়ে দিয়েছেন যে ঠাকুর। যখন দিলেন তখন তাঁর ইচ্ছায় পেয়েছি, আবার তিনি যখন ডেকে নেবেন, তখন আমাদের কিছু বলবার জো নেই। ছেলেমেয়ে তিনি দিয়েছেন, আবার তিনিই ডেকে নেবেন যখন তাঁর ইচ্ছা হবে। ঠাকুর যে আমার চিরকালের আপনার—ইহকালের, পরকালের। তাঁকে ভালবাসবো না? তিনি আগে, তারপর তো এরা।'

তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের। কোথায় তিনি? আগে তিনি, তারপর তো আমি। এটা ভুলে গেছি। উপনিষদ্‌ও আমাদের এই কথা শেখাচ্ছেন। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।'

সংসারে বেশী আসক্তি টান কিসের প্রতি? এই সব সম্পদ পুত্র বিত্ত প্রভৃতির প্রতি। এই সবেই তো আমাদের আসক্তি। কিন্তু আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে অন্তরে, এসবের চেয়েও প্রিয়। কাজেই তাঁকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করবে। এইটি ঋষিদের বাণী। আগে ভগবান, তারপর সংসার। আগে এক, তারপর শূন্য বসাতে হয়। আগে তিনি। তিনিই সব দিয়েছেন। কাজেই এই যে ছেলেমেয়ের প্রতি—সংসারের প্রতি যে আসক্তি, ভালবাসা, আকর্ষণ, টান—সব তাঁরই জন্য। তাঁকে বাদ দিলে কিছু থাকে না। এইটি ভাবো যে—সব তিনি, সব তাঁর। কতটা ভালবাসা হ'লে এটা সম্ভব হয় বল দেখি? আর সেই ভালবাসাটা আসে না কেন? এই টানটা আসে না কেন? সংসার টেনে রেখেছে; জরু, জমি, রূপেয়া—সব টেনে রেখে দিয়েছে। এইগুলিকে কোটী জন্ম ধরে ভালবাসছি। আপনার ক'রে রেখেছি। সেটা থেকে মন ওঠাতে হবে। সেইজন্যই ঠাকুরের শিক্ষা—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়, আর সেই আঠা ছাড়ানো যায় না। যদি তেল মাখানো থাকে, তাহলে হাতে আর আঠা লাগে না। তেল মাখানোর দরুন অল্প চেষ্টাতেই আঠা উঠিয়ে ফেলে দিতে পারা যায়। কাঁঠাল ভাঙা মানে কি? সংসার করা। আসক্তি হ'ল আঠা। সেই আঠাটা মনে লেগে আছে। তেলটুকু মাখানো চাই। সেই তেলটি কি? অনুরাগ, ভক্তি। সংসারের প্রতি টান, ভালবাসা—

* ১৩-১১-৫৯ তারিখে লখনউ রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ (tape-record এ গৃহীত) হইতে সংকলিত।

এ তো আছেই, ভগবান দিয়েছেন আমাদের ভেতর, না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? আমরা কি দেয়াল, ইট, কাঠ না পাথর? স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নিয়েই তো এই সংসার। এইগুলি কি সংসার থেকে একেবারেই চলে যাবে? মোটেই না। সেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হবে; ছেলে, মেয়ে, স্বামী—সবার সেবা করতে হবে। এ সব তাঁরই দান। তবে শুধু সংসারের সেবা করতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারা যায় না। সেই জন্যই ওই তেল মাখানোর উপদেশ।

প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ ও টান সংসারের প্রতি রয়েছে, তার দ্বারাই সংসারের কর্তব্য পালন করা হয়। সেই স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা যাঁর জিনিস, তাঁকেও তো দিতে হবে। যে অনুরাগ, যে প্রীতি, সংসারে দিচ্ছি—তার সবটা না হ'ক কিছুটা তো ভগবানকে দিতে পারি! প্রীতি দিয়ে সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে যখন পূজায় বসি, তখন কোথায় থাকে সেই প্রীতি? কোথায় সে ভালবাসা, সে আকর্ষণ—টান? সংসার টেনে রেখেছে মনটা, যেতে দেয় না। কিন্তু যদি তেল মাখানো থাকে? কর্তব্য পালন করলে, মনে ভক্তি-তেল মাখানো আছে, আঠা লাগলো না। আবার সেই প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ নিয়ে বসো পূজায় জপে, বসো ধ্যানে প্রার্থনায়। সেইটি আমরা শিখিনি। Attachment and detachment—এই দুটি কথা আছে, মানে আসক্তি এবং অনাসক্তি। ও তেল মাখানো নেই, কাজেই আঠা লেগে গেছে। আর সেই প্রেম ভালবাসা নিয়ে সংসারের যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একটা বড় কর্তব্য আছে। যাঁর সংসার, যিনি এই সব দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও তো একটা কর্তব্য থাকা চাই। ঠাকুর বলতেন, 'খোল-মাখানো জাব'। গরুকে শুকনো জাব দাও, খাবে কি? কিন্তু যদি খোল মাখিয়ে দাও, দেখবে কি রকম তৃপ্তির সঙ্গে খাবে। সংসারে যেটুকু করি, সব প্রীতি-খোল মাখানো। সকলে কি প্রীতি আস্বাদন করছে! সেই প্রেম ভালবাসা—ছেলে বল, স্বামী বল, সকলকে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নিজেদের সংসারে দেখছ তো, সেই প্রীতিটুকু যদি পরস্পরের মধ্যে আস্বাদন না করো সংসারটা একেবারে শুকনো হ'য়ে যায়। এ তোমরা তো জানো। এই প্রীতিটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। তেমনি ভগবানের দিকেও আবার একটা আকর্ষণ আছে তো? সকলের ভিতর তিনি। তিনি না থাকলে কোথায় থাকবে এ সব? এটা ভুলে গেছি। শুধু শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছি। কাজেই এর বেশী আর আমরা দেখতে পাই না। এই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, আবার ওঠাতে হবে, ভগবানকে দিতে হবে। এই দেবার জন্য গীতার উপদেশ—অনাসক্ত হ'য়ে থাকো। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—পানকৌটির। পানকৌটি জলে রইল, ডানা ভিজে গেল, একবার ডানা ঝেড়ে নিলে, শুকনো হ'য়ে গেল।

আবার পাঁকাল মাছের দৃষ্টান্ত: পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকবে। দেখ পাঁকের মধ্যে রয়েছে, অথচ গায়ে পাঁক লাগে না। ওই অনাসক্তির তেল মাখানো আছে। সংসারে আমরা প্রত্যেক জিনিসই করছি প্রীতির সঙ্গে। এমনকি কুকুর-বেড়ালের প্রতিও আমাদের কত প্রীতি! কুকুরটা পর্যন্ত তোমার প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। পশু, সেখানে আদান-প্রদানের ভাষা নেই—তাকেও তুমি কিভাবে যত্ন ক'রছ,

খাওয়ানো, দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে। আর সে তোমার গোলাম হ'য়ে যাচ্ছে। বেড়ালটাও তাই।

আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন, তাঁরই জন্য তো সব। স্বামীর মধ্যে, ছেলের মধ্যে, সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তাঁরই জন্য তো সংসারের সব কিছু এত প্রিয়, তাঁতেই তো সব কিছুর স্থিতি। সবই হচ্ছে তাঁর। তাঁকে ভালবাসতে হবে। প্রীতিই হ'ল আসল জিনিস। প্রীতিই হ'ল পরম সাধন। সেই, প্রীতিটুকু নিয়ে যেমন সংসার করতে হবে, তেমনি আবার বড় কর্তব্য যেটা, সেটাও করতে হবে। তাঁকে নিয়ে সংসার কর। জানো তো কি সঙ্গে ক'রে এনেছ? কেউ সঙ্গে যাবে? মোটেই না। যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে। মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছ, আবার সেই ভাবেই যেতে হবে। কোন্ অজানা দেশ থেকে এসেছ, আবার কোন্ অজানা দেশে যেতে হবে। এই মাঝখানেরটা নিয়েই আমাদের যত কিছু গোলমাল। তা তো ঠিক নয়। তিনি সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। আমরা সব তাঁতেই রয়েছি। কাজেই তাঁতে আমাদের আদি-অন্ত-মধ্য, সংসার তো আর শেষ লক্ষ্য নয়। তবে সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? সেই আগেকার কথা, যেটা থেকে আরম্ভ করেছি—আগে তিনি, তাঁকে ভালবাসতে হবে। সংসারে যারা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে—যতটুকু দরকার। আবার প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা তাঁকে দিতে হবে। সংসার তাঁকে ভুলে নয়, তাঁকে আশ্রয় ক'রে। তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে আপনার জেনে সংসার করতে হবে। কেননা ইহকালে পরকালে তিনিই রয়েছেন। সব সময় তিনিই আমার আপনার। ছেলেমেয়েদের দেখেছ তো সংসারে—কখনও দিচ্ছেন, আবার কখনও নিচ্ছেন। এর জন্য নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল কথা। এইটি যেন কখনও ভুলো না।

সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর বলতেন, ছুতারনির মতো। ওইগুলো অভ্যাস করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয়া যায় না। চিঁড়ে কোটে ছুতারনি। চিঁড়ে তুলছে, দেখছে চিঁড়ে কাঁড়া হ'ল কিনা। খদ্দের এসেছে, তাকে চিঁড়ে বিক্রী করছে। আবার কে কবে কত দাম বাকি রেখেছে, তার হিসাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে! কিন্তু মনটা রেখেছে কোথায়? ঢেঁকির মুষলের দিকে। গীতায় বলছেন ভগবান্ঃ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'—আমাকে আশ্রয় ক'রে সব কর। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'। একবারও অর্জুনকে বলছেন না যে, যুদ্ধ ক'রো না বা কাজ ক'রো না। বলছেন, যুদ্ধ কর—আমাকে স্মরণ ক'রে, আমাকে আশ্রয় ক'রে। আমাতে আসক্ত হও, আমাকে আশ্রয় কর। তাঁতে মনটা রেখে সব কাজ কর। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই প্রীতি প্রেম—সব। আর সেইটিকে অবলম্বন ক'রে, আশ্রয় ক'রে সংসার করতে হবে। ছুতারনি যেমন মনটিকে ঢেঁকির মুষলে রেখে দিয়ে অন্য সব কাজ করে। সংসারের ভেতর থেকেও মনটিকে তাঁতে ফেলে রাখা—এইটি শিখতে হবে। তাঁকে ধরে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে সংসার করতে হবে, তাঁকে ভুলে নয়।

ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত। আড়ায় ডিম রয়েছে, কচ্ছপ জলে চরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মন আছে সেই ডিমের দিকে। এইটি হ'ল আসল জিনিস। এটি অভ্যাস করতে হবে। এ সব কি একদিন, কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে বা ধ্যান করলেই হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব সময় এ যোগটি তাঁর সঙ্গে রাখতে

হবে। এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তাঁকে ভালবাসতে পারলে হবে—না হ'লে অসম্ভব।

সেই গল্প জান তো? কৃষ্ণ এসেছেন বিদুরের বাড়ী। আর বিদুরের স্ত্রী কি করছেন? দরিদ্র বিদুর, বাড়ীতে কিছুই নেই। বিদুরের স্ত্রী খুঁজে পেলেন একটি শুকনো কলা। আনন্দে তিনি এত বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন যে, কি করছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। সেই কলাটা ছাড়িয়ে শুকনো খোসাটি কৃষ্ণের মুখে ধরেছেন—একেবারে হুঁশ নেই। কিন্তু খোসাটিতে এমন একটা জিনিস মাখিয়ে দিয়েছেন যে তার অমৃতের মতো আস্বাদ। কৃষ্ণ সেই প্রীতি আস্বাদন করতে লাগলেন। দেখতে পাচ্ছ, ভক্তি মানেই এই প্রীতিটুকু। ভগবান সেই প্রীতিটুকু চান। যার কাছে পান, তার একেবারে গোলাম হ'য়ে যান। ভগবান অবতীর্ণ হন মানুষ-শরীরে, এইটি শিখাবার জন্য। ঠাকুর এই প্রীতির কথা বারবার বলতেন। মীরাও এই প্রীতির কথা বলেছেন, 'প্রীত করনা চাহি রে মনবাঁ; প্রেম লগানা চাহি।' তোমাদের এইগুলি সব জেনে নিয়ে সাধন করতে হবে। ভগবানকে আপনার ক'রে নিতে হবে। আর তা প্রত্যেকটি দৈনন্দিন কাজের ভেতর দিয়ে কিভাবে হবে, তাও শেখাচ্ছেন। যা কিছু করবে ভগবানকে স্মরণ ক'রে কর, যা কিছু করবে সব তাঁকে অর্পণ কর। আর আমরা কি করি? আমরা 'আমিত্বে'র উপাসনা করি। নিজেকে যত খালি করতে পারবে ততই দেখবে তাঁর প্রকাশ তোমার মধ্যে। যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, তা ভগবানকে স্মরণ ক'রে করতে হবে। সব সময়ে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাঁকে স্মরণ কর, আর কর্তব্য পালন কর। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' এইটিই হ'ল আসল জিনিস। আর আমাদের এইখানেই ভুল। তাঁকে স্মরণ ক'রে, আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হয়। এটা অভ্যাস ছাড়া হয় না। তবে সংসারে ভোগের মধ্যে সেটা আসে না। তাই চাই সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ বড় প্রয়োজন; ঠাকুরের ভাষায় 'ঘড়ি মেলানো'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতেন, তাঁদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে, আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। সাধুর কাছে গেলে সেইটে বুঝতে পারা যায়—অর্থাৎ তখন বিবেক জাগে। বিবেক ব'লে দেয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে পিছিয়ে এসেছি। এই জন্য মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়, regulate ক'রে নিতে হয়। সাধুসঙ্গ হুঁশ এনে দেয়। সাধুসঙ্গে ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ লাভ হয়, এমনকি ভগবান পর্যন্ত দর্শন হয়। এখনই হয় না কেন? কারণ, মন বিষয়ে বাঁধা পড়েছে। আমার নিজের জিনিস অপরের কাছে বাঁধা পড়েছে। মন তো আমার হাতে নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গে সেই বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে।

আর একটা কথা যা রোজ শোনো, শোনার পর একটু চিন্তা করবে। তোমাদের শোনা হ'য়ে গেল, ব্যস্, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে এ-গল্প সে-গল্প জুড়ে দিলে। যা শুনলে তার কিছুই মনে থাকে না। শ্রবণ হয়, কিন্তু মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার! কত জায়গায় কত কিছু শুনে আসো, সব মনে রেখে দাও। যদি ভাল সংস্কার থাকে তাহলে ধর্ম-প্রসঙ্গ যা শুনলে সব ঠিক মনে রাখতে পারবে। ভাল সংস্কার অভ্যাসের দ্বারা হয়।

তোমরা তো এত শুনছ, তবু মনটা ভরে না কেন? শুভ সংস্কার হয় না কেন? তোমাদের শ্রবণ হয়, মনন হয় না। চিন্তা করা চাই।

ঠাকুর যেমন বলতেন, 'গরু একপেট খেল, তারপর এসে জাবর কাটতে লাগল।' এইগুলি শোনার পর তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে চেষ্টা করবে। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অশুভ সংস্কারগুলো চলে যাবে। এই সবের দ্বারা রাজসিক মন সাত্ত্বিক হবে। সাত্ত্বিক মন সাধনার সহায়। কিন্তু রাজসিক মন ঠিক উল্টো রাস্তায় নিয়ে যায়। যা শুনলে দৈনন্দিন জীবনে যদি অভ্যাস কর, এই ভাবে কর্তব্য কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। ভগবানের লীলাচিন্তন, নামজপ, সাধুসঙ্গ মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে। এইগুলি দৈনন্দিন অভ্যাস করতে হবে, না হ'লে মনটা ওঠা নামা করবে। সেইজন্য ভগবান্ গীতায় বলেছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' ঠাকুরও বলছেন—কচ্ছপের মতো, ছুতারনির মতো খানিকটা মন তাঁতে রেখে কর্তব্য কর্ম করবে। এইটি রোজ অভ্যাস করতে হবে। মনটিকে সংসার থেকে একেবারে তুলে নিতে পারবে না, তাই গীতার শিক্ষা—আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। সব কাজে কর্মে সর্বদা খানিকটা মন তাঁর স্মরণে, তাঁর চিন্তায় রাখবে। এইটি অভ্যাস কর দেখি। ধর্ম একটা আস্বাদন করার জিনিস। ভগবান রয়েছেন, তাঁকে আস্বাদন করতে হবে তো? তাঁর সংসার তিনি সব (ভাব, সম্বন্ধ) দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে তো একটা ভাবে আস্বাদন করতে হবে। এইসব শুনলে, কিন্তু আবার হয়তো সব গুলিয়ে যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব সেখানে সদ্গ্রন্থ পড়বে। এ হ'ল practical ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনে যা দরকার। যা শুনলে সেটা অভ্যাস করবে। তা না হ'লে হাজার শোন, এক কান দিয়ে শুনবে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ধারণা করতে হয়।

তোমরা সকলে এসেছ। সকলেই তো ভগবানের ভক্ত। তাঁর কথা শুনতে ভালবাসো, এটা কত জন্মের শুভ সংস্কার, সুকৃতি। কেবল শোনা একটা রোগবিশেষ। কত লোক আছে, তারা শুধু শুনতেই চায়। তোমরা যেন তাদের মতন হয়ো না। যা শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিন্তা করবে, মনন করবে।

ভগবানের পথে এগোতে হবে তো একটু একটু ক'রে, এইটি ভুলবে না। সংসারের কর্তব্য যেমন ক'রছ, তেমনি কর। যে যে অবস্থায় আছে, তাকে সেই অবস্থা থেকেই তাঁর দিকে এগোতে হবে। গোটা সংসারটি তো আমরা মনেই পুরে রেখেছি। সংসার আর কতটুকু? সবই তো মনে। মনেই তো আসক্তি, চিন্তা—অতীতে আমার এটা হ'ল না, সেটা হ'ল না; ভবিষ্যতে আমার এটা হওয়া চাই, আর বর্তমানে এটা চাই, সেটা চাই—কেবল এই সব চিন্তা। কাজেই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে চলেছি, লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে, ভগবানে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। কিসের জন্য? আনন্দ—শান্তি পাবার জন্য। আর তাঁকে ভুলে যদি আনন্দ শান্তি খুঁজতে যাও সংসারে, তাহলে আরও জ্বালা—আরও অশান্তি। আনন্দ ও শান্তির রাস্তা হলেন তিনি। আবার তিনিই হলেন আনন্দ, তিনিই হলেন শান্তি।

স্বামী সদানন্দ

[সেবাধর্ম ও স্বামীজী-প্রসঙ্গে]

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ভাগলপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্লেগ-সেবা-কার্য হইয়াছিল তাহার প্রশংসা ভাগলপুর-বাসীদের মুখেই শুনিয়াছি। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও বাগ্মী স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু, তার-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় অবিনাশ চক্রবর্তী স্বামী সদানন্দের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। এই প্লেগ-সেবাকার্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বাগবাজার পল্লীর এবং অন্যান্য স্থানের অসহায় গৃহস্থের রোগীদের সাহায্য ও পরিচর্যা তিনি নিজেও করিতেন এবং যুবকদেরও উক্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করিতেন।

একবার কোন একটি বালক বসন্তরোগে (Small Pox) ছটফট করিতেছে। তিনি তাহাকে তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষে লইয়া শুইলেন। স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শে বালক ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে এইসব সংক্রামক রোগীর পরিচর্যা করা বিপজ্জনক। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি বললে, বিপজ্জনক? পাছে তোমার রোগ হয়, এই ভয়ে সংক্রামক রোগীর সেবা হবে না? এদের ফেলে রাখলে এই সংক্রামক রোগ বাড়ীতে পল্লীতে ছড়িয়ে যাবে, আর তুমি বুঝি তার হাত এড়াবে—এসব মনে ক'রছ, না? আমরা সন্ন্যাসী ফকীর—অত প্রাণের মায়া, শরীরের মায়া করি না। স্বামীজী এই সেবাধর্মকেই এই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। শরীর তো যাবেই আজ না হয় কাল, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। কিসের ভয়? ভয় করলেই যত গোল —মহামারী উপস্থিত হ'লে ভীরুদের রোগ হয় আগে। কাপুরুষ ভীরুরা কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বামীজীর মুখে প্রায় শোনা যেত, "অভীঃ অভীঃ"। একবার আমার মনে দুর্বলতার জন্যে সঙ্কোচ এসেছিল।'

কেন ও কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'উত্তর পশ্চিমে সাধুজীবনে একজন গুরুভাইএর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ট্রেনটি খুব লেট্ হওয়ায় রাত দুপুরে পৌছেছি—ঠিক সন্ধ্যায় পৌছবার কথা ছিল। এই রাত্রে কাউকে ব্যস্ত না ক'রে আমি একটি ধর্মশালার বারান্দায় শুয়ে রইলাম, প্রত্যূষে দেখি আমার পাশে একজন কুষ্ঠরোগী। মনটায় কেমন দুর্বলতা এল। গুরু-কৃপায় তখনই স্বামীজীর কথা মনে উদয় হ'ল—এ যে স্বয়ং শিব কুষ্ঠরোগীরূপে আমার সেবা নেবার জন্য আমার পাশে শুয়ে রয়েছেন। অমনি জল গরম ক'রে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে তার ঘা ধুয়ে দিলাম। গুরুভাইএর কাছে গিয়ে ভাল ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা এবং কিছুদিন তার আহারের বন্দোবস্ত ক'রে চলে এলাম।

এই সব সেবা করলে মনটা যে কত বড় হ'য়ে যায়—একবার তার ধারণা হ'লে মন আর সেবার আনন্দ ছাড়তে পারে না। Routine (নিয়ম) মতো duty (কর্তব্য) ক'রে যাচ্ছি, তা নয়; আমি যে সাক্ষাৎ শিবের পূজা করছি—এই ভাব না থাকলে শেষে শুষ্ক লাগবে, দলাদলি কর্তৃত্ব অভিমান অহঙ্কার আসবে। স্বামীজী আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় ক'রে দিয়েছিলেন। সেবা

করলাম বেশ, তারপর তাঁর ধ্যান চিন্তা; ওদিকেই আর মন থাকবে না। অনাসক্তভাবে এই সেবা।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজীর সঙ্গে আপনার কিভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ?'

তিনি বলিলেন: উত্তর-পশ্চিমে অনেকদিন বাস ক'রে সাধুদের একটু আধটু ভক্তি করতাম—ভিক্ষা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্যও করতাম। তখন হাতরাস ষ্টেশনে কাজ করছি, এমন সময় স্বামীজী একদিন সেখানে নামলেন —তাঁর চেহারা দেখেই আকৃষ্ট হলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল—প্রার্থনা করলাম, 'মহারাজ, আমার বাসায় দুই একদিন দয়া ক'রে ভিক্ষা নিন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাসায় কে কে আছে ?' বললাম, 'আমি একা—আমি অবিবাহিত। মেয়েছেলে কেউ থাকে না। সুতরাং আপনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ তোমার সাধুসেবার ইচ্ছা হ'ল কেন ?' আমি বললাম, 'উত্তর-পশ্চিমে বাস করি, সাধুদের মাঝে মাঝে আমার বাসায় দুই একদিন রেখে থাকি।'

তিনি সন্তুষ্টচিত্তে থেকে গেলেন। আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'তুমি যা খাও, আমিও তাই খাব; আমি সাধু ফকীর, ভিক্ষে ক'রব—তার আবার ফরমাস ক'রব কি ? সে তো ভিক্ষে নয় ? তুমি ইচ্ছামতো যা দেবে তাই খাব—আমার কোন বাধানিষেধ নেই।'

স্বামীজী দু-তিন দিন আছেন—আমি একদিন বেলাবেলি বাড়ীতে ফিরে গেলাম স্বামীজীর সঙ্গলাভ করতে। তাঁকে বাসায় খুঁজে পেলাম না, দেখি মধুরকণ্ঠে কে যেন গান গাইছে। স্বামীজীর কণ্ঠ বলেই মনে হ'ল। গিয়ে দেখি—নির্জন গাছতলায় স্বামীজী গান গাইছেন এবং চক্ষু সজল—দুই একটি ধারা গাল বেয়ে পড়ছে।

এই বলিয়া স্বামী সদানন্দ সেই গানটি আবৃত্তি করিয়া শোনাইলেন। বহুদিনের কথা, গানটি ভুলিয়া গিয়াছি; মর্মার্থ এই যে—তুমি আমাকে দায়িত্বের ভার দিয়ে গিয়েছ, আমি যে একা, তুমি এসে শক্তি দাও, যাতে এই দায় পালন করতে পারি।

স্বামী সদানন্দ বলিতে লাগিলেন: নির্জনে স্বামীজীর সেই ভাব দেখে আমার প্রাণ গলে গেল—এই তো দরদী প্রেমিক সাধু। সেইদিনই তাঁর শরণাগত হয়েছিলাম। ঠিক করলাম, নোকরি নেই করেঙ্গে—জবাব দিয়ে এই মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। স্বামীজী আমাকে প্রথম খুব বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ আছিস—সাধু-জীবন বড় কষ্টকর। আজ গাছতলায়, কাল কারুর কুটীরে; আজ ভিক্ষে জুটল না, কাল হয় তো পেট ভরে খাওয়া জুটলো—নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থা—এই সব কষ্ট কি সহ্য করতে পারবি ?' আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে অনায়াসে আনন্দে—পারবো খাওয়ার সময়ে ভিক্ষে ক'রে এনে আপনার সেবা করতে পারবো।' তাঁর অনুগামী হয়ে চললাম।

তাঁহাদের এই পরিব্রাজক-জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন: দেখ, তোমরা পড়েছ মহাপুরুষদের হৃদয় বজ্রের মতো কঠোর আবার ফুলের চেয়েও কোমল—স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণকালে পদে পদে তার পরিচয় পেয়েছি। আমি নতুন, মরুভূমির উপর দিয়ে কখনও চলিনি। একদিন মরুভূমির উপর স্বামীজীর সঙ্গে যাচ্ছি—একটু বেলায় প্রখর রৌদ্রের তেজে বালুময় পথ তেতে উঠেছে, জুতা পায়ে দিয়ে চলেছি, কিন্তু জুতোও গরম—পা রাখতে পারছি না—এদিকে আগুনের মতো হাওয়া—চলতে

পারছি না—অসহ্য কষ্ট ! স্বামীজী পিছন ফিরে আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'তোর ঝোলাতে জুতো রাখ্—আমার কাঁধে চড়্।' আমি হতভম্ব হ'য়ে কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি শোন্।' আমার পালোয়ানী শরীর। ঝোলাশুদ্ধ আমাকে কাঁধে নিয়ে সেই প্রখর রৌদ্রে মরুভূমির রাস্তা দিয়ে স্বামীজী চলছেন, পরে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় নামিয়ে দিলেন মরুভূমির রাস্তা পার ক'রে।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামী সদানন্দ সজল চোখে বলিলেন, 'বল—কোন্ গুরু, কোন্ বাবা এমন করে ? তিনি যে আমার কী ছিলেন কি ক'রে বোঝাবো ?' এই ঘটনা তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন। এমনকি রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিয়াছেন।

স্বামীজীর আদেশে তিনি একদল যুবক লইয়া হিমালয়ে বদরীনারায়ণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের কোন কোন মহাপ্রাণ যুবকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দুই একটি গান নিজমুখে আবৃত্তি করিয়া তিনি বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। বাস্তবিকই স্বামী সদানন্দের জীবন ছিল অপূর্ব আত্মত্যাগ ও সরলতায় ভরা এবং হৃদয়টি ছিল কানায় কানায় প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি জাপান ভ্রমণে গিয়া উদ্বোধনে যে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছিলেন—তাহাতে বোঝা যায় তাঁহার ভাবধারা দ্বারা দেশের যুবকদের তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করেন নাই। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পদ্মভূষণ বশীশ্বর সেন তাঁহার এই পবিত্র জীবন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। শেষজীবনে বশীশ্বর ও তাঁহার ভ্রাতা টাবু তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী সদানন্দের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা গুরুভক্তি ও সাধুভক্তির আদর্শস্বরূপ। কতদিন সেখানে স্বামী সদানন্দের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভগিনী নিবেদিতা বোসপাড়ার এই বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন—প্রায় দুই বেলা স্বামী সদানন্দকে দেখিতে আসিতেন। নিবেদিতার জীবনে ইঁহার সহায়তা কিছু কম ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতি স্বামী সদানন্দের গভীর অনুরাগ এবং ভক্তি ছিল। তিনি মুখে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রুগ্ণ মুমূর্ষু অবস্থায় শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। শুনিয়াছি সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, স্বামী সদানন্দের কী অপরিসীম ভক্তি ছিল এবং জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কত স্নেহ করিতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় ইহার সামান্য উল্লেখ আছে।

মহাপ্রাণ মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবন লোককল্যাণের জন্য আহুতি দিয়া চলিয়া যান। ইঁহাদের জীবন-কথা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়—ইঁহাদের দর্শন করিলে জীবন ধন্য হয়।

জিজ্ঞাসা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

এক পুণ্যপ্রভাতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের আকাশ বাতাস ধ্বনিত ক'রে উচ্চারিত হয়েছিল জগতের সেই মহাজিজ্ঞাসা—সেই শাশ্বত প্রশ্ন ভগবান বুদ্ধের অম্বুদকণ্ঠে :

'কস্মিন্নু খো নিব্বুত্তে হৃদয়ং নিব্বুত্তং নাম হোতি ?'—কি নিভে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিভে যায় ?

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষ এই প্রশ্নেরই উত্তর অন্বেষণ ক'রে ফিরেছে, এই জিজ্ঞাসাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে সংসারের তমসাচ্ছন্ন পথ ছেড়ে মোক্ষের অরুণোদ্ভাসিত পথে অগ্রসর হ'তে, ধন-জন-মানের মোহ কাটিয়ে জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের শুভ ব্রতে জীবনোৎসর্গ করতে, পার্থিব বাসনা-কামনা নিভিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অনির্বাণ দীপশিখা অন্তরমধ্যে প্রজ্বলিত করতে। এইভাবেই বারংবার উত্থিত হয়েছে মানব-হৃদয়ের সেই অদম্য আকুতি :

'কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।'

—(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫-১১-১)

'কস্মিন্নু ত্বং চাত্মা প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি।'

—(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩-৯-২৬)

'কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।'

— (ঐ ৩-৮-৭)

'কে আমাদের আত্মা ? ব্রহ্ম কি ?'

'কোন্ বস্তুতে তুমি ও তোমার আত্মা প্রতিষ্ঠিত ?' 'কোন্ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোত ?'

*　*　*

এই ঐশ্বর আকুতিপূর্ণ পুণ্যপিপাসা দূর করবার একমাত্র উপায় হ'ল জ্ঞান, যার সম্বন্ধে ভারতদর্শনসার গীতা বলেছেন :

'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই।

পুণ্যভূমি ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিরা এই জ্ঞানের মহিমাই কীর্তন করেছেন নানাভাবে, নানা সুরে ও ছন্দে—চিরকাল। জ্ঞানের প্রারম্ভ যে জিজ্ঞাসা, সেই সম্বন্ধে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য কি বলেছেন—এই প্রবন্ধে তারই সামান্য কিছু বলছি।

শঙ্করের মতে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎ সাধন হ'ল 'জ্ঞান'। এই জ্ঞানের আলোকেই শঙ্কর-দর্শন সর্বত্র সমুজ্জ্বল। এই বিষয়ে শঙ্কর কর্ম ও জ্ঞানের মূলীভূত প্রভেদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের পূর্বে সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এই ইচ্ছা হ'ল 'জিজ্ঞাসা'। যে জ্ঞান জীবনের একমাত্র পরমশ্রেয়ঃ, যে জ্ঞানালোকই একমাত্র অনাদি অবিদ্যা-তমিস্রা দূর করতে পারে, যে জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্ম বা মোক্ষ, সেই জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই তো সাধকজীবনের সর্বপ্রথম সোপান। সেজন্য সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই আছে :

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—অর্থাৎ 'অথ' বা 'এর পরে', 'অতঃ' বা 'এই কারণে' সাধকের মনে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা 'ব্রহ্মকে জানবার অভিলাষ' হয়। সেজন্য এস্থলে প্রথম প্রশ্ন উঠবে : কিসের পরে এরূপ পরম মঙ্গলসূচক 'জিজ্ঞাসা'র উদয় ?

বস্তুতঃ 'অথ' শব্দটির কয়েকটি বিভিন্ন অর্থ আছে :

অথ স্যাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কার্যারম্ভেঽথনন্তরে।
অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু কচিৎ॥

—অর্থাৎ 'অথ' শব্দের অর্থ মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্যারম্ভ, আনন্তর্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা, অন্বাদেশ বা কথিতানুকথন।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর 'অথ' শব্দের তিনটি প্রধান অর্থ—(১) অধিকার, (২) মঙ্গল এবং (৩) প্রশ্ন—উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, 'অথ' শব্দের একমাত্র অর্থ এস্থলে 'আনন্তর্য'।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সুবিখ্যাত (শঙ্কর-ভাষ্যের) 'ভামতী' টীকায় এই সম্বন্ধে যুক্তিবিচার-মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ 'অথ' শব্দের অর্থ এস্থলে 'অধিকার' হ'তে পারে না। 'অধিকারে'র অর্থ হ'ল যে নূতন বিষয়ের আলোচনা হবে, তারই অবতারণা। যেমন যোগশাস্ত্র আলোচনার প্রারম্ভে বলা হয়ঃ 'অথ যোগানুশাসনম্'—অর্থাৎ এখন যোগবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে। এস্থলে 'যোগ'ই হ'ল সেই সমগ্র আলোচনা বা গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' স্থলেও যদি 'অথ' শব্দের ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই বলতে হয় যে, সমগ্র ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনেরই বিষয়বস্তু হ'ল শুধু 'জিজ্ঞাসা' বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মাত্র,—'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' নয়। কিন্তু এ তো অতি হাস্যকর মত। কারণ সকলেই জানেন যে, ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র বিষয়বস্তু হলেন 'ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভের জন্যই ব্রহ্মসূত্র-পাঠ। এরূপে এস্থলে প্রথমে ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা বা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র উদয় হয়, তারপর 'ব্রহ্ম-মীমাংসা' পাঠ করা হয়, তারপর 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ হয়। সেজন্য সমগ্র ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' বা ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছারূপ একটি চিত্তবৃত্তি বা মানসিক ভাবের মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা (Psychological Treatise) নয়, বরং 'ব্রহ্ম'রূপ একটি তত্ত্বের তাত্ত্বিক বা দর্শনমূলক আলোচনা (Metaphysical Treatise)। যদি কেবল এরূপ একটি 'ইচ্ছা'ই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হ'ত, তাহলে কাকদন্ত-পরীক্ষার জন্য যেমন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রসর হন না, তেমনি ব্রহ্মসূত্র-পাঠের জন্য কেহ প্রভূত কষ্ট স্বীকার ক'রে অগ্রসর হ'তেন না, সুনিশ্চিত। 'ভামতী' টীকায় (১।১।১):

'তদবিবক্ষায়াস্তু তদসূচনেন কাকদন্ত-পরীক্ষায়ামিব ব্রহ্ম-মীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্তেরন্।'—সেজন্য 'অথ' পদের অর্থ এস্থলে 'অধিকার' নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'অথ' পদের অর্থ এস্থলে 'মঙ্গল' নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক পদের দুটি দিক আছেঃ 'শব্দের' (শ্রবণমাত্র) দিক, আন্তর (অর্থের) দিক। পদটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তা হ'ল তার 'শব্দ' (sound) এবং পদের দ্বারা যে বিষয়বস্তুটি নির্দেশ করা হয়, তা হ'ল তার 'অর্থ' (meaning); কিন্তু পদের 'শব্দ' এবং 'অর্থ' এক নয়। যেমন পুত্রের মুখে 'মা' এই পদ উচ্চারিত হ'লে সেই ধ্বনি বা 'শব্দে'ই মাতার মনে অনাবিল আনন্দের উদয় হয়; কিন্তু 'মা' পদের 'অর্থ'—এই আনন্দ নয়, একটি বস্তুবিশেষ বা একজন নারী মাত্র। একই ভাবে 'অথ' পদের ধ্বনি বা শব্দই শঙ্খধ্বনির ন্যায় মঙ্গলদায়ক নিশ্চয়; কিন্তু সেজন্য 'অথ' পদের অর্থ 'মঙ্গল' নয়।

তৃতীয়তঃ 'অথ' পদের অর্থ পূর্বোল্লিখিত বিষয়ে 'প্রশ্ন' নয়। যেমন বলা হয়ঃ 'কিময়মাত্মা নিত্যঃ অথোঽনিত্যঃ?' অর্থাৎ এই আত্মা নিত্য, অথবা অনিত্য? কিন্তু এক্ষেত্রে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' বিষয়ে এরূপ 'প্রশ্ন' বা 'বিকল্পে'র কোন প্রসঙ্গই নেই।

সেজন্য এক্ষেত্রে 'অথ' পদের প্রকৃত অর্থ হ'ল 'আনন্তর্য'। অর্থাৎ এই অর্থানুসারে 'ব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসা'-রূপ কার্যটি একটি পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর করছে, এবং 'অথ' পদের দ্বারা সেই কারণটিই বোঝা যাচ্ছে।

কি সেই কারণ যা থেকে এরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়? পৃথিবীতে তো সহস্র সহস্র মানুষ আছে, তাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনই তো কেবল ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছুক হ'য়ে ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রের শরণাপন্ন হন। কি কারণে এই ধন্য কয়েকজনের এরূপ ইচ্ছা হয়? কি কারণে সংসারের ভোগসুখেচ্ছা বর্জন ক'রে, তাঁরা এইভাবে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, মুক্তির ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হন?

উত্তরে শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১।১।১) সুবিখ্যাত 'সাধন-চতুষ্টয়ে'র অবতারণা করেছেন :

'তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্ যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ-ভোগ-বিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ।'

—অর্থাৎ যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি করেছেন, যিনি ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বীতস্পৃহ হয়েছেন, যিনি শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, এবং যিনি মোক্ষলাভেচ্ছু—তাঁরই মনে এই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদয় হয় অনিবার্যভাবে।

এই সাধন-চতুষ্টয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'ভামতী'-কার যা বলেছেন তার ভাবার্থ :

'নিত্য' বস্তু হ'লেন 'প্রত্যগাত্মা'; 'অনিত্য' বস্তু হ'ল 'দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়'। অর্থাৎ প্রকৃত কল্পে দৃশ্যমান সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই তো 'নিত্য' বা সত্য বস্তু। অপর পক্ষে দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়প্রমুখ অন্যান্য সমস্ত পার্থিব বস্তুই 'অনিত্য' বা মিথ্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক এই ভাবে, ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের পূর্বেই—প্রারম্ভেই—আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রভেদ স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করেন, তাহলে তিনি তো তৎক্ষণাৎই আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব ও বিশ্বজগতের মিথ্যামায়াময়ত্ব উপলব্ধি ক'রে মুক্ত হ'য়ে যাবেন, আর ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের আবশ্যকতা কি?

অপর পক্ষে যদি বলা হয় যে, তাঁর এই উপলব্ধি স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত উপলব্ধি নয়, কিন্তু কিয়দংশে অদৃঢ় অপূর্ণ ও অনিশ্চিত উপলব্ধি, তাহলেও এই দোষ হবে যে, এরূপ অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় সাধন—ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বিরাগের উদয় হ'তে পারে না। এই উভয়সঙ্কট অতিক্রম করবার জন্য এস্থলে এই কথাই বলতে হয় যে, সাধক সাধারণভাবে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন, তাঁর মধ্যে যে আত্মা তা নিত্য এবং বাহিরের সকল বস্তু অনিত্য। অবশ্য এই স্তরে তাঁর এরূপ উপলব্ধি হয় না যে, সেই আত্মাই ব্রহ্ম এবং অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা—মায়ামাত্র। এরূপ পরম ও চরম উপলব্ধিই তো মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক ব'লে তার শুভোদয় হয় বহু পরে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ পরম সাধনের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও এই প্রারম্ভিক স্তরে এই যে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি, তাও পরিশেষের একমাত্র সত্য আত্মা ও মিথ্যা দেহাদির মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধির ন্যায় পরমা উপলব্ধি না হলেও স্বীয় ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও নিশ্চিত উপলব্ধি। সেজন্য এরূপ প্রারম্ভিক উপলব্ধিও দ্বিতীয় সাধন 'ভোগবিরাগে'র সৃষ্টি করতে পারে।

সংসারের সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য ব'লে জানলে স্বভাবতই তাদের প্রতি আর কোন আসক্তি বা আকর্ষণ থাকতে পারে না। সেজন্য

পূর্বোক্ত উপলব্ধিবিশিষ্ট সাধক ভোগেচ্ছাবিহীন, নিষ্কাম পুরুষ।

যিনি এরূপ ভোগকলুষবিহীন, তিনিই শম-দমাদি প্রকৃষ্ট গুণে সমুজ্জ্বল।

'সোঽয়মস্ত বৈরাগ্যহেতুকো মনোবিজয়ঃ শমঃ ইতি বশীকারসংজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। বিজিতঞ্চ মনস্তত্ত্ব-বিষয়-বিনিয়োগযোগ্যতাং নীয়তে। সেয়-মস্য যোগ্যতা দমঃ। যথা, দান্তোঽয়ং বৃষভযুবা হল-শকটাদি-বহন-যোগ্যঃ কৃত ইতি গম্যতে।' (ভামতী—১।১।১)

—অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা মনের বিজয়ের নাম 'শম' অথবা 'বশীকার'। এরূপ বিজিত মনের তত্ত্বাবধারণের যোগ্যতার নাম 'দম'। যেমন বন্য বৃষভও মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিজিত হ'লে হল-শকটাদি বহনে যোগ্য হয়, তেমনি বৈরাগ্য দ্বারা বিজিত মনও নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করবার যোগ্য হয়।

'তিতিক্ষা'—প্রাপ্ত বস্তু পরিত্যাগের ইচ্ছা; 'উপরতি'—প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি বিমুখতা; এবং 'শ্রদ্ধা'—সত্যে স্থির বিশ্বাস। 'মুমুক্ষুত্ব'—মোক্ষলাভের ইচ্ছা।

এই ভাবে এই 'সাধন-চতুষ্টয়'ই সাধক-জীবনের প্রারম্ভ। অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, সংসার-পঙ্ক-নিমজ্জিত, পার্থিব-ভোগলিপ্ত, ত্রিতাপদগ্ধ, বদ্ধ জীব যে শুভক্ষণে এরূপ ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন পরিত্যাগে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, সেই শুভক্ষণেই তো তার প্রথম পদক্ষেপ মোক্ষের অমল, অভয়, অরুণ পথে। এই সাধক-জীবনের চারটি প্রধান কথা :

অসার অনিত্য সংসারকে সেইরূপেই জানতে পারা; এরূপ সংসারের মায়া ত্যাগ করা; মনকে নিম্ন বিষয় থেকে উত্তোলন ক'রে উচ্চ তত্ত্বে সন্নিবিষ্ট করা; এবং সাংসারিক জীবনের ঊর্ধ্বে সেই অনুপম পারমার্থিক জীবনের জন্য ব্যাকুল হওয়া। শঙ্করের মতে এই চারটি প্রারম্ভিক শর্ত যাঁর ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে, তিনি স্বভাবতই সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে জানতে ও উপলব্ধি করতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থপাঠে বা উপদেশ-শ্রবণে জীবনোৎসর্গ করেন। এইভাবে যে 'জিজ্ঞাসা' জ্ঞানের প্রারম্ভ, সেই মহাজিজ্ঞাসার কারণস্বরূপ হ'ল 'অথ' পদের দ্বারা নির্দিষ্ট এই সাধন-চতুষ্টয়।

এইভাবে শঙ্কর তাঁর স্বভাবসুলভ সহজ সরল সুমিষ্ট ভাষায় যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করেছেন, তা হ'ল এই যে—জ্ঞানলাভের কথা তো দূরে থাকুক, কেবলমাত্র 'জিজ্ঞাসা' বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছারই যাতে উদয় হ'তে পারে, সেজন্যও বহু সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান যে মানবের জীবনে কি অমূল্য ধন, এ থেকেই তা সহজে অনুমেয়।

শিশির ও সাগর

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অসীম সাগর অথই অপার সাধ্য নাই যে তরি;
শাশ্বত কাল অশেষ অতল রহস্যে রহে ভরি'।
উপরের চল-উর্মিমালায়,
হেরি রূপরাশি—দাঁড়ায়ে বেলায়,
নাহি জানা যায় আছে কী তলায়;
সাগরে নামিতে বাত্যাতাড়িত দীপশিখা সম ডরি।
ডুবে গেল যাহা, চিরতরে তাহা সিন্ধু লইল হরি'।

মুক্তার মতো শিশির-কণিকা নামিছে উপর থেকে;
ভীতি-অশ্রুতে ভরিয়া কাঁপিছে অপার পাথার দেখে।
রূপময় ওই স্বাতন্ত্র্য তার,
সাগরে মিশিয়া হবে একাকার,
মৃত্যু-ভয়ে সে করে চীৎকার,
ডুবিয়া গেল সে, আমিত্ব তার এতটুকু নাহি টেকে।
তবু তো সাগরে সত্তা তাহার চিরতরে গেল থেকে।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

একদা দেবর্ষি নারদ মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির আশ্রমে আগমন করিলে বাল্মীকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি সদ্‌গুণসমূহে গুণিগণের অগ্রগণ্য? কোন্ ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদার ব্যবহার-সম্পন্ন এবং সর্বপ্রাণীর কল্যাণকামী?—বীর্যশালী, বদান্য ও প্রিয়দর্শনই বা কে? কোন্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতাগণেরও ভীতির পাত্র হইয়া থাকেন? কাহার চরিত্র মহদ্‌গুণ ও সম্পদ্-সমূহের আশ্রয়? কোন্ জন বীর্যে, শৌর্যে, তেজস্বিতায়, সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও বিক্রমে দেব-তুল্য? হে দেবর্ষে, আপনার নিকট এই সকল গুণবিভূষিত ব্যক্তির বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

নারদ বলিলেন, 'তুমি বহু অথচ দুর্লভ গুণের উল্লেখ করিয়াছ। মানব কেন, দেব-গণের মধ্যেও কোন একজনকে এই সকল গুণের অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র এই সকল গুণে ও অন্যান্য বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত।'

অতঃপর নারদ সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের উদার মহৎ চরিত্র বর্ণনা করিলেন। বাল্মীকি সেই অদ্ভুত রামচরিত শ্রবণে বিস্মিত হইলেন।

বাল্মীকি কর্তৃক যথাবিহিত সৎকৃত হইয়া নারদ প্রস্থান করিলে বাল্মীকি চিন্তামগ্ন হইয়া মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সশিষ্য তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। স্নান ও তর্পণান্তে অন্যমনা হইয়া তিনি তীরস্থিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রামচরিত-শ্রবণে তাঁহার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্ত সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল বনরাজির মধ্যে নির্ভীকভাবে বিচরণশীল এক সুন্দর ক্রৌঞ্চ-দম্পতির প্রতি। বাল্মীকি মুগ্ধ হইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁহার সম্মুখেই ক্রৌঞ্চ-দম্পতির একটি নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত দেহে ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। ক্রৌঞ্চী করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ক্রৌঞ্চের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে আর্ত বিলাপে পরিপূরিত হইয়া উঠিল সমগ্র বনভূমি। নিসর্গ-সৌন্দর্যের পটভূমিতে অকস্মাৎ নামিয়া আসিল শোকের ছায়া। ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে বাল্মীকির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আবেগপূর্ণকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন:

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'

—রে নিষাদ, তুমি ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে কাম-মোহিত একটিকে (অকারণে) বিনাশ করি-য়াছ। অতএব তুমি কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াই বাল্মীকি চমকিত হইলেন। বিহগের জন্য বেদনা অনুভব করিতে করিতে তিনি এ কী বলিলেন! অন্তরের বেদনা মর্ম মথিত করিয়া প্রকাশ হইল সুরের ঝঙ্কারে, ভাব মূর্ত হইল ভাষায়, সৃষ্টি হইল প্রথম কাব্যের।

আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াও বাল্মীকি অন্যমনা রহিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা আগমন করিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। বাল্মীকি যথো-চিত পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক ব্রহ্মাকে সমাদর

করিলে তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'মহর্ষে, ক্রৌঞ্চবধ উপলক্ষে তোমার কণ্ঠ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে—তাহা তুমি শোক করিতে করিতে বলিয়াছ, অতএব উহা শ্লোকরূপে বিখ্যাত হউক। আর তুমি রামের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা কর। নারদের নিকট তুমি ঐ চরিত্র অবগত হইয়াছ। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা বিষয়ক সমস্ত ঘটনাই তোমার জ্ঞানের গোচর হইবে। তুমি পুণ্যজনক মনোরম রামকথা রচনা কর।'

পুনঃপুনঃ ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাল্মীকি স্থির করিলেন যে ঐ প্রকার শ্লোকের দ্বারাই তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিবেন। রামায়ণ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীসকল, যথা—রত্নাকর দস্যুর ঋষি বাল্মীকিরূপে পরিণতি-লাভ ও রামের জন্মের ষাট হাজার বৎসর পূর্বে বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ-রচনা প্রভৃতি পুরাণের অন্তর্গত। বাল্মীকি-রামায়ণে ঐ সকল কাহিনীর অস্তিত্ব নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের তৃতীয় সর্গে আছে :

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং চিত্রং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

—অর্থাৎ রামচন্দ্র রাজপদে আরোহণ করিলে ভগবান ঋষি বাল্মীকি বিচিত্র পদবিন্যাসপূর্বক উদারার্থ মনোরম রামচরিত প্রণয়ন করিলেন। চতুর্থ সর্গের প্রথমেই আছে :

শ্রুত্বা পূর্বং কাব্যবীজং দেবর্ষের্নারদাদৃষিঃ।
লোকাদন্বিষ্য ভূয়শ্চ চরিতং চরিতব্রতঃ॥
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু কাব্যস্যান্বেষতে গতিম্॥

—অর্থাৎ ব্রতাদিনিয়মপরায়ণ ঋষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে অপূর্ব রামায়ণরূপ কাব্যের সার বস্তু শ্রবণ করিয়া, পুনরায় জনজগৎ হইতে রামচরিত্র অন্বেষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বাগ্র-কুশোপরি উপবেশন করিয়া রামায়ণ-কাব্যের গতি অর্থাৎ রচনার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ করে। রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বনবাস-কাহিনী ও খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। বাল্মীকি বাস করিতেন তমসানদীর তীরে আশ্রমে। নারদের নিকট তিনি প্রথম রামচন্দ্রের বিষয় অবগত হন। কাব্য-রচনায় তাঁহার ক্ষমতাও জন্মিয়াছিল। সুতরাং লোকমুখ হইতেও নানা ভাবে তিনি রামচন্দ্রের সমুদয় কাহিনী সংগ্রহ করেন। অতঃপর নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তিনি ঐ কাহিনী শ্লোকাকারে গ্রথিত করেন।

সাধারণতঃ প্রচলিত রামায়ণ পাঠেও এই-রূপ অনুমান হয় যে, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া জনকনন্দিনী সীতা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানেই যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। বাল্মীকি সাদরে ঐ পুত্রদ্বয়কে পালন করেন ও তাহাদের নাম রাখেন লব কুশ। লব ও কুশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাল্মীকি তাহাদিগকে বীণার সহিত সুরসংযোগে রামায়ণকথা আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেন। বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ-কাব্য লবকুশ অতি মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতেন। বহু সভামধ্যে ঐ কাব্য আবৃত্তি করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে রামচন্দ্র বালক দুইটির বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের আমন্ত্রণ করেন। অতঃ-পর লবকুশকে স্বীয় পুত্র বলিয়া রামের অবগতি, সীতাকে সভাস্থলে আনয়ন, পুনরায় পরীক্ষার

প্রশ্ন উত্থাপনে সীতার পাতাল-প্রবেশ ইত্যাদি ও পরবর্তী ঘটনা-সমুদয় বাল্মীকি কর্তৃক পরে লিপিবদ্ধ হয়।

কাহারও কাহারও মতে বাল্মীকি যে দুইটি বালককে রামায়ণ আবৃত্তি শিক্ষা দেন, তাহারা সীতার পুত্রদ্বয় লবকুশ নহে; পরন্তু দুইটি মুনি-বালক। এইরূপে যাঁহারা কাহিনী আবৃত্তি করিতেন, তাঁহাদের কুশীলব আখ্যা দেওয়া হইত। তাঁহাদের মতে সমুদয় উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি কর্তৃক রচিত নহে, পরবর্তীকালে সংযোজিত।

রামায়ণকে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু রামায়ণকে ইতিহাসও বলা চলে। ভারতবর্ষে সাল-তারিখ সহ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার রীতি পূর্বে ছিল না। কিন্তু কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি তদানীন্তন জাতীয় ও সমাজ-জীবনের চমৎকার পরিচয় প্রদান করে। রামায়ণ-মহাভারতে দেশের ভৌগোলিক তথ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থ-নীতিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি মানবজীবনের সমুদয় দিক বর্ণিত হইয়াছে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে—বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া। আবার মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তিগুলি এই কাব্যের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার আবেদন সর্বজনীন—সর্বকালীন।

অবশ্য বহু ঘটনা আজিকার দিনে আমাদের নিকট অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান যুক্তিবাদী যুগেও দেখা যাইতেছে, সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ মানবগণের জীবনী-রচনায় কখন কখন মিথ্যা, ভ্রম ও কল্পনা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। সুতরাং দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্যেও কিছু কল্পনা ও আতিশয্যের প্রক্ষেপ স্বাভাবিক। তবে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে কাহিনীর অন্তর্গত মূল বক্তব্যটি সহজেই ধরিতে পারা যায়।

রামায়ণ আদি কাব্য; বাল্মীকি আদি কবি। সুললিত শ্লোক, অলঙ্কারের ছটা, সুরের ঝঙ্কার, উপমার সৌন্দর্য, নিসর্গের বর্ণনা, ভাবের গাম্ভীর্য, মূল কাহিনীর অব্যাহত গতি প্রভৃতির সমাবেশে রামায়ণ-কাব্য অপূর্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় চিন্তাধারা রামায়ণ কর্তৃক প্রভাবিত। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনে রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। পরবর্তী কালের কবিগণ বহু পরিমাণে বাল্মীকি কবিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য হইতে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃতে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' বাংলায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করিয়াই রচিত ও বিখ্যাত।

রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণের রচনাকাল খ্রীষ্ট-জন্মের তিন অথবা চার শতাব্দী পূর্বে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের পরেই কাব্য-যুগের আরম্ভ। ভগবান বুদ্ধের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৬২৪ অব্দে। বৌদ্ধ যুগের পূর্বে কাব্য-যুগ, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের যুগ। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ববর্তী, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। তবে মহাভারতে রামায়ণের মূল কাহিনীর উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে তাঁহাকে ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধৌম্য মুনি রামসীতার কাহিনী বর্ণনা করেন। রামায়ণে কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনীর উল্লেখ কোথাও নাই। কয়েকটি উপাখ্যান উভয় কাব্যেই স্থান পাইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—ঐ উপাখ্যানগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত ও প্রকাশিত রামায়ণ-গ্রন্থে বহু পাঠ-

ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে মূল কাহিনী সর্বত্রই সমান।

যাহা হউক, রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক তারিখ নির্ণয় করিতে না পারিলেও রামায়ণ-কাব্য যে বহু প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং বাল্মীকিকে বরপ্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

—যতকাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ বিরাজ করিবে, ততকাল রামায়ণকথা জনগণমধ্যে প্রচারিত থাকিবে।

প্রজাপতি ব্রহ্মার বরপ্রদান সার্থক হইয়াছে। ভারতবর্ষে কত উত্থান-পতন—বিপর্যয় ঘটিল, বহিরাগত কত সভ্যতা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত হইতে রামায়ণ-কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই।

যতকাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ বিরাজ করিবে, ভারতবাসী রামায়ণকথা হৃদয়ে বহন করিবে।

* * *

পুরাকালে কোশল নামে এক অতি সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত প্রদেশ ছিল। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা ছিল ঐ প্রদেশের রাজধানী। রাজধানী অযোধ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাওয়া যায়। সমগ্র নগরী ছিল পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ও চতুর্দিক ছিল অস্ত্রধারী প্রহরী কর্তৃক সুরক্ষিত। নিয়মিত জলসিঞ্চিত বিস্তীর্ণ রাজপথগুলি সর্বদাই ছিল হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য যান-বাহনে পূর্ণ ও জনকোলাহলে মুখরিত। বহু সপ্ততল অট্টালিকা, হর্ম্য, মনোরম উদ্যান, পানীয়শালা, বিবিধ রত্নসম্ভার-পূর্ণ বিপণি ও উৎসবমত্ত নাগরিকগণ রাজধানীর শোভা বর্ধন করিত। ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজা দশরথ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। সুদক্ষ রাজ্যশাসক-রূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। নিম্নোক্ত বিবরণ এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে অযোধ্যানগরীর অধিবাসিগণের অধিকাংশই ছিল সুখী। মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রোধী, নৃশংস—অথবা এক কথায় দুষ্টজনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দারিদ্র্য কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইত। সাধারণতঃ সকলেই ছিলেন বিদ্বান্, সৎ ও ন্যায়পথে জীবিকা-নির্বাহকারী; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ছিলেন স্বধর্মে রত; পুরুষ পত্নীনিষ্ঠ ও নারী পতিব্রতা—সকলেই ছিল শাস্ত্রোক্ত ব্রতপরায়ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন।

মহারাজ দশরথের সচিব ছিলেন বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও পুরোহিত ছিলেন বামদেব। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে রাজকার্য-পরিচালনায় সাহায্য করিবার জন্য আটজন প্রধান অমাত্য ছিলেন—সুমন্ত্র তাঁহাদের অন্যতম। অমাত্যগণ বিনীত, নীতিবিদ্, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান্, সদা অবহিত ও সর্বদা রাজাদেশ-পালনে তৎপর। সকলেই ধৈর্যশালী, সত্যধর্মপরায়ণ, ধর্মব্যবহার ও বিচারজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমদর্শী।

রাজা দশরথের একমাত্র দুঃখ—তিনি অপুত্রক। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। অমাত্য সুমন্ত্রের পরামর্শে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞে পুরোহিত-পদে বরণ করা হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক নামক ঋষির পুত্র। তিনি অরণ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অরণ্যেই তপোবনে বিচরণ করিতেন। তপোবনের বাহিরে মানবসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। ব্রহ্মচর্য-পালন ও তপস্যার ফলে তাঁহার চিত্ত অতি পবিত্র হইয়াছিল। সেই সময়ে অঙ্গদেশের

(বর্তমান বিহার) রাজা ছিলেন লোমপাদ। ঐ রাজ্যে বহুবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে শস্যক্ষয় ও প্রজাগণের দুঃখ সমুপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ বিভাণ্ডক-সুত, ধর্মাত্মা, পরমপবিত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর অমাত্যগণের পরামর্শানুযায়ী বার-বনিতাগণ কৌশলপূর্বক ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তপোবন হইতে রাজধানীতে আনয়ন করেন। সংসারানভিজ্ঞ সেই পবিত্র ঋষি শিশুর ন্যায় সরলভাবে বনিতাগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি প্রদানপূর্বক পূজা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি লতাপাতাবেষ্টিত সুসজ্জিত নৌকাকে দূর হইতে আশ্রম-ভ্রমে তাহাদের অনুরোধে উহাতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন।

রামায়ণে মূল কাহিনীর সহিত ছোট বড় বহু উপাখ্যান আছে। পণ্ডিতগণের মতে উহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানও তাঁহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত। তবে এ কথা অনুমান করিতে পারা যায় যে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং অমাত্যগণ কর্তৃক তাঁহাকে পুরোহিত-পদে বরণ করিবার পরামর্শ দেওয়া বিচিত্র নয়।

সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মিত হইল। যজ্ঞ উপলক্ষে বহু রাজা এবং ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ বিরাট। কেবল নৃপতিগণ এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী। যজ্ঞের প্রারম্ভে মন্ত্রপূত অশ্বের কপালে টীকা দিয়া সৈন্যসামন্তের রক্ষণাধীনে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সংবৎসর পরে অশ্ব প্রত্যাবর্তন করিলে আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী কিরূপ আড়ম্বরের সহিত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার বিশদ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান তখন পর্যন্ত দেশে প্রবল ছিল।

বসন্তকালে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ণ এক বৎসর পরে পুনরায় বসন্তকাল সমুপস্থিত হইলে চতুর্দিক ভ্রমণান্তে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যাবর্তন করিল। যথাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। হোতৃগণ বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতাগণকে আবাহন করিয়া অগ্নিতে হবি নিক্ষেপ করিলেন। যথাবিধানে স্থাপিত যূপে প্রতিদিন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বিবিধ পশু হনন করা হইতে লাগিল। যজ্ঞীয় অশ্বেরও চর্ম ছেদন করিয়া তাহার মেদ অগ্নিতে আহুতিস্বরূপ প্রদান করা নিয়ম।

যজ্ঞশেষে রাজার নিকট হইতে সুবর্ণ-রজতাদি দক্ষিণা গ্রহণান্তে প্রীতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ রাজাকে চিন্তাপূর্বক তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে বলিলেন। দশরথ কহিলেন, 'আমি উদার ও বিখ্যাত পরাক্রমশালী চারিটি পুত্র কামনা করি।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এই যজ্ঞকালে প্রস্তুত পায়স[১] নৃপতি কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই তিন মহিষীকে প্রদান করেন। দশরথ-প্রদত্ত সেই উত্তম পায়স ভক্ষণ করিয়াই মহিষীগণ তেজঃসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন।

অবতারগণের সকলের জন্মবৃত্তান্তই অলৌকিক। ইঁহাদের পৃথিবীতে আগমন সাধারণ মানবের ন্যায় নহে। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ অবতারপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক হইলেও বিভিন্ন, সুতরাং বিস্ময়কর। আবার একদিক দিয়া দেখিতে গেলে অবতারগণ সকলেই মানবদেহ পরিগ্রহণার্থে মাতৃগর্ভ স্বীকার করিয়াছেন; ইহা সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। বস্তুতঃ অলৌকিক ও লৌকিকের সংমিশ্রণে এই সকল মহামানবগণের জন্ম, চরিত্র, কার্য প্রভৃতি বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে। সাধারণ বিচার-

১ মতান্তরে যজ্ঞাবশিষ্ট হবি

বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, তর্ক উহার সম্পূর্ণ মর্ম-গ্রহণে অপারগ।

স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 'অবতার-পুরুষসকলে দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধন-কালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ- ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ······প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটিরই আলোচনা চলিয়াছে—।'[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, 'তিনি দেব-মানব—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয় তিনি তাহাই।' তিনি লিখিয়াছেন, 'ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানব-ভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।'[৩]

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব, পৃঃ ২৮
৩ ঐ পৃঃ ২৯

মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতারগণ মানবের ন্যায় আচরণ করেন। আবার ঐ সকল আচরণের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাঁহাদের অতি-মানবীয় ভাব। বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীতে বিচরণকালে তাঁহাদের মধ্যে দেব-মানব ভাবের সংমিশ্রণ ও উভয় ভাবের মধ্য দিয়া যে লোকোত্তর চরিত্র ও কার্য প্রকাশ পায়, তাহার মর্ম প্রকাশিত হয় অল্পসংখ্যক শুদ্ধাত্মার নিকট। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দেহত্যাগের পর ধীরে ধীরে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু॥
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ।
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্॥
কৌশল্যাঽজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমিক্ষ্বাকুনন্দনম্॥

—অনন্তর চৈত্রমাসে নবমীতিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে—পাঁচটি গ্রহ যখন তুঙ্গস্থিত, কর্কট-লগ্নেও চন্দ্রসহ বৃহস্পতি বিদ্যমান, তখন জননী কৌশল্যা সর্বলোকপূজ্য জগতের পতি দিব্য-লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অর্ধাংশ ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাভাগ রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন।

ইহার পর যথাক্রমে কৈকেয়ীর এক পুত্র ও সুমিত্রার যমজ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিল। চারটি শিশু তুল্য সুশ্রী। পুত্রগণের নামকরণ হইল—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

দার্শনিকের জীবনধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দর্শন ও দার্শনিকের জীবন সম্বন্ধে প্রায়শঃ অনেক ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। এসব ধারণা কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু শিক্ষিত সমাজেও উহাদের প্রসার আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে দর্শন কতিপয় বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির কল্পনা-বিলাস মাত্র, দর্শনচর্চা একটি অনাবশ্যক ও অনর্থক ক্রীড়ার সমতুল্য, অথবা কয়েকজন অকর্মা লোকের সময় কাটানোর উপায় মাত্র। দার্শনিকের জীবন-ধারা সম্বন্ধেও লোকের মনে দুই রকম ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। অনেকে ভাবেন যে দার্শনিক এক জগৎ-ছাড়া লোক, তিনি পরমার্থ-চিন্তায়, জ্ঞানবিচারে দিনরাত কাটান, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই এবং সংসার ও মানব-সমাজের কোন কাজে বা চিন্তায় তিনি তাঁহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করেন না। আবার অপর দিকে অনেকে, এমনকি কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে দার্শনিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বা থাকা উচিত নয়। একজন সাধারণ সংসারী লোক যেমন বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনের সহিত জড়িত থাকেন এবং সত্যমিথ্যা ধর্মাধর্ম বিচার না করিয়া জীবনে আর্থিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন, সেইরূপ দার্শনিকও সংসারের সব বিষয়ে মন দিবেন, সাংসারিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য সব চেষ্টা করিবেন; তবে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-লাভেরও চেষ্টা করিবেন এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ পোষণ করিবেন বা জ্ঞানবিচারে পারদর্শী হইবেন।

এসব ধারণাই ভ্রান্ত এবং সেগুলি নিরসন করা আবশ্যক। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে দর্শন ও দার্শনিকের জীবনধারা সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা দেখা যায় তাহার জন্য দার্শনিকরাই কতকটা দায়ী। কারণ কোন কোন দার্শনিকের মতে দর্শনশাস্ত্র শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান বিচারেই নিবদ্ধ থাকিবে এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীব-জগৎ সম্বন্ধে কোন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে। তাঁহাদের মতে দর্শনে মানুষের বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনের সমস্যাগুলির বিচারের স্থান নাই এবং মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়াস যুক্তিযুক্ত নহে। দার্শনিক সাংসারিক ও জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবেন এবং পরমতত্ত্ব ও পরমার্থ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিবেন। অপর পক্ষে আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন, দর্শনশাস্ত্র সর্ব বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয় মাত্র, এবং দার্শনিক সব বিষয়েরই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সব সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন। আবার দার্শনিকদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন ও কর্মধারা সাধারণ সংসারী লোকের জীবনপ্রণালী হইতে বিশেষভাবে বা একেবারেই ভিন্ন নহে। অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে কোন কোন দার্শনিক অতি অদার্শনিক জীবন যাপন করেন।

দর্শন মানবের কল্পনাবিলাস বা ক্রীড়ার আনন্দোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। উহা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ও প্রকৃতিগত মনোবৃত্তি। মানুষ দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর মাত্র নহে, তাহার বাহ্য ও জড় দেহের মধ্যে মন ও চিন্ময় আত্মা অবস্থিত। এজন্য মানুষকে দেহবিশিষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন চেতন প্রাণী বলিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (thought and reason) স্বভাব এরূপ যে, সে সব

বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। এ জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরসাথী, কিন্তু যেন চির অতৃপ্ত। ইহা মিটাইবার জন্য মানুষ জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা হইতে মানুষের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি হয়। মানুষ যখন তাহার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মূলে এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে, তখন এক প্রকার দর্শনের উৎপত্তি হয়। তাহাকে কেহ প্রাকৃত দর্শন (Natural Philosophy), কেহ প্রত্যক্ষমূলক দর্শন (Empirical Philosophy), কেহ বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific Philosophy), কেহ দৃষ্টবাদী দর্শন (Positivist Philosophy), কেহ বাস্তব দর্শন (Realistic Philosophy), আবার কেহ শুদ্ধ দর্শন (Philosophy) আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ দর্শনই এই প্রকার দর্শনের অন্তর্গত। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাখাকে এ প্রকার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

দর্শনের উৎপত্তির আর একটি মূল হইতেছে মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি। মানুষের যেমন দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমন তাহার মন বা অন্তঃকরণ এবং চৈতন্যময় বা চেতন আত্মাও আছে। এজন্য সব মানুষেরই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি আছে। অনুকূল অবস্থায় এ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়, আবার প্রতিকূল পরিবেশে উহা বিনষ্ট বা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দ্বারা কাহারও কাহারও মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকর্ষ লাভ করে। এরূপ প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলে বা ভিত্তিতে তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ও জীবজগৎ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আর এক প্রকার দার্শনিক মতবাদ রচনা করেন। এরূপ দর্শনকে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spiritualistic Philosophy বা Idealistic Philosophy) বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এইভাবে রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে মধ্য-যুগের খ্রীষ্টীয় দর্শনকে এই জাতীয় দর্শন বলা যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ (Sense-experience) ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি (Supersensuous or Spiritual experience) বিদ্যমান আছে মনে হয়, এবং এতদুভয়ের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। দৃষ্টান্তরূপে ভারতীয় সাংখ্য ও যোগ প্রভৃতি সব আস্তিক দর্শনের, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনের নাম উল্লেখ করা যায়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের দর্শনের মধ্যে প্লেটো, আরিস্টটল, প্লোটিনাস, স্পিনোজা, হেগেল, ব্রাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের দর্শনকে, এমনকি হোয়াইটহেড ও এক্সিস্টেনশ্যালিস্টদের (Existentialists) দর্শনকেও এই প্রকার দর্শনের দৃষ্টান্তস্থল বলিতে পারা যায়।

মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতে দর্শনের উৎপত্তি হইলে উহাকে আমাদের কল্পনা-বিলাস এবং দর্শনচর্চাকে অনাবশ্যক ক্রীড়ামোদ মাত্র বলা চলে না। মানুষের বিচারবুদ্ধিই মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। একেবারে বিচারবুদ্ধিহীন লোককে মানুষ বলা যায় না এবং মানুষ বলাও হয় না। কাহারও মধ্যে প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিলে তাহাকে আমরা 'মানুষের মত মানুষ' বলি, আবার বিচারবুদ্ধির অল্পতাহেতু কাহাকেও 'মানুষের মত মানুষ নয়' বলি। তারপর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানুষের

স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ও কর্ম। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে মানুষের সহজ ও অপরিহার্য ব্যাপার, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতিও যে সেইরূপ একটি সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে একথা সত্য। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে কোন দূরস্থ, দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য বাহ্য বস্তুর অনুভূতি বুঝি না। এরূপ মনে করিলে আধ্যাত্মিক অনুভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং উহা অস্বীকার করা অসঙ্গত হইবে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে আমি মানুষের আত্মার অনুভূতিই বুঝি। সকল মানুষেরই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে দেহেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার অনুভূতি আছে। 'আমি নাই' বা 'আমার অস্তিত্ব নাই' একথা বড় কেহ বলেন না। যদি কখন কেহ এক সর্বগ্রাসী সন্দেহের আশ্রয় লইয়া বলেন—'আমার নিজ আত্মাকেও আমি সন্দেহ করি', তবে বলিব—'আপনি আত্মাকে স্বীকার করিয়াই সন্দেহ করিতেছেন বা সন্দেহ করিতে পারেন।' পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি ডেকার্টের দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। অতএব বলিতে হয় যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যাহা আত্মানুভূতিরই নামান্তর, তাহা সব মানুষেরই অল্পবিস্তর আছে এবং চিরকালই থাকিবে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন বাহ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই স্থাপিত হউক বা আন্তর আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক হউক, তাহাকে আলেয়ার অনুসন্ধানের মতো নিরর্থক ও নিন্দনীয় বস্তু বলা সমীচীন হইবে না। পরন্তু দর্শন যে মানুষমাত্রের অপরিহার্য বৃত্তি ও নিত্য সহচর তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন ব্যতীত কোন মানুষেরই জীবনযাপন করা সম্ভব নয়; ভাল হউক মন্দ হউক, জীবজগৎ ও নিজ আত্মা বা জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়াই মানুষকে জীবনে চলিতে হয়, এবং এই ধারণাই তাহার দর্শন। অবশ্য এ ধারণাকে একটি দার্শনিক মতবাদ বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিবেন অথবা সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সচেতন ভাবে হউক বা নাই হউক, যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থন করা হউক বা নাই হউক, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি একটা না একটা দার্শনিক মত পোষণ করেন এবং তদনুসারে নিজ জীবনে চলিয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন যে দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া কিছু নাই, দর্শনশাস্ত্র সর্বৈব মিথ্যা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র, তবে তাঁহাকে বলিব—'আপনার মতও একটি দার্শনিক মত এবং উহাকে দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন, জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ বা দৃষ্টবাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।'

এখন দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে দুইটি বিপরীত ও অত্যুগ্র মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে দার্শনিকের জীবন সাধারণ সাংসারিক মানুষের মতোই হইবে। তিনিও বিষয়ী লোকের মতো সংসারাসক্ত ও স্বার্থান্বেষী হইবেন এবং নির্বিচারে ভোগসুখ-লাভের চেষ্টা করিবেন। অপর মতে দার্শনিক বিষয়বিরাগী ও সংসার-ত্যাগী পুরুষ হইবেন। তিনি সংসারের কোন বিষয়েই মন দিবেন না, একান্তে পরমার্থ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই করিবেন না এবং অন্য লোকের, সমাজের বা সংসারের কোন হিত বা অহিত কর্মে লিপ্ত থাকিবেন না।

আমার মনে হয় এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতই চরমপন্থী বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, এ দুই মতই জগতে বা লোকসমাজে প্রচলিত আছে এবং

বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত, সমাদৃত ও জীবনে অনুসৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

সাধারণতঃ দার্শনিকের জীবনধারায় তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিফলিত ও অনুসৃত হইয়া থাকে; অতএব দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বোপলব্ধির বিভিন্ন স্তর অনুসারে দার্শনিক জীবনধারারও বিভিন্ন মান ও স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দার্শনিক চিন্তা ও জীবনধারার পার্থক্য হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলি কেবল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ (system) বলিয়াই পরিচিত নয়। অধিকাংশ দর্শনমতের মূলে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও ভারতে বেদান্ত-সম্প্রদায়, সাংখ্য-সম্প্রদায়, যোগ-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। আবার বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যথা—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসেও আমরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও সম্প্রদায় দেখিতে পাই। যদিচ ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের মতো সেগুলি তত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত নহে। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে পাশ্চাত্যে দর্শনের সহিত জীবনের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় নহে। আরও এক কারণ হইতেছে যে, বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ ও উহাদের সমালোচনা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের মতো কয়েকজন মহর্ষি দার্শনিকের সূত্রাকারে গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যামূলে উহার অগ্রগতি ঘটে নাই এবং সেগুলিকে অকাট্য ও অনবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালের একাধিক দার্শনিক জীবনে তাহা অনুসরণ করেন নাই। তথাপি আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের Platonist, Aristotelian, Kantian, Hegelian, Marxist প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন এবং জীবনধারাও তদনুসারে কতকটা ভিন্ন হইবে।

পূর্বে দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে যে দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মূলেও দুইটি বিভিন্ন দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা আছে। সাধারণভাবে একটিকে জড়বাদ এবং অপরটিকে অধ্যাত্মবাদ (materialism and spiritualism) বলা যায়। প্রথমটির মতে জড় বা অচেতন পদার্থ বা প্রকৃতি হইতে সমুদয় জাগতিক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অচেতন মৃৎপাষাণাদি, বৃক্ষলতাদি, জীবদেহ, মানুষের সচেতন মন এবং আত্মাও জড় প্রকৃতির কার্য বা ক্রমপরিণতির ফলমাত্র। দেহাতিরিক্ত এবং দেহাসম্বদ্ধ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, চেতন দেহই আত্মা, দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়। অতএব পরলোক, পাপপুণ্য, অদৃষ্ট, কর্মফল ও ঈশ্বর প্রভৃতি সত্য বা সৎ পদার্থ নহে। যেন-তেন-প্রকারেণ সুখভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য এবং পরম পুরুষার্থ। এরূপ দার্শনিক মতবাদ হইতে যে জীবনধারার প্রবর্তন হয় তাহাকে সুখবাদ (hedonism) বলা হয়। জড়বাদী দার্শনিকের জীবনধারা নির্বিচারে সুখান্বেষণের প্রবৃত্তি ও সুখভোগের প্রগতি।

কিন্তু জড়বাদ ও তদনুবর্তী সুখবাদ বিচারসহ ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয় না। জড়বাদ একাধিক ন্যায়াভাস-দোষদুষ্ট দার্শনিক মত এবং সুখবাদ স্ববিরুদ্ধ ও আত্মঘাতী জীবন পথ। অতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও বর্বর ব্যক্তি বা জাতির নিকট উহারা গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হইবে। সভ্যতার আদিম যুগে, আদিম মনুষ্যজাতির জন্য

অথবা আধুনিক কালের দানব প্রকৃতির লোকের জন্য এরূপ দর্শনমত ও জীবনপথের বিধিব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এইজন্যই আমাদের দেশের চার্বাক দর্শনের কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যদের অকল্যাণ সাধন করিবার জন্যই এই মত তাহাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়—সর্ব কালেই এক রকম প্রকৃতির লোক থাকিবে, যাহাদের জন্য চার্বাক মতই বিধেয় এবং তাহাতে তাহাদের প্রথমে অকল্যাণ হইলেও চরমে কল্যাণ হইবে। মানুষের ভোগসুখের লালসা তৃপ্ত হইলেই সে ত্যাগের মহিমা বুঝিতে শিখিবে, প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়া ক্লান্ত হইলেই মানুষ নিবৃত্তির পথে চলিতে শিখিবে।

পূর্বে উল্লিখিত দার্শনিক জীবনধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতের মূলেও একটি ভিন্ন প্রকার দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা নিহিত আছে।* ইহাকে আমরা অধ্যাত্মবাদ বলিয়াছি। সাধারণভাবে অধ্যাত্মবাদ মতে আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের মূল তত্ত্ব বা পরমার্থ এবং তাহা হইতেই জীব-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের মূল কারণ ও উপাদান এক অদ্বিতীয় চেতন সত্তা, উহা জড় পদার্থ বা অচেতন প্রকৃতি নহে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন রূপ বা প্রকারভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদকে অনেকে এই দ্বিতীয় প্রকার দার্শনিক জীবনধারার ভিত্তি গণনা করেন। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত মাধ্যমিক-দের শূন্যবাদকেও এরূপ জীবনধারার ভিত্তি বলা হয়। কারণ—অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ; আর শূন্যবাদ অনুসারে শূন্যই পরমার্থ; উহা সৎ নহে, অসৎ নহে; সদসদ্ উভয় নহে; আবার সৎও নয় অসৎও নয়—এমনও নহে। যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে মায়াময় ও মায়া-সৃষ্ট, বা অসত্য ও মিথ্যা বা শূন্য ও অপরমার্থ বলিতে হয়। অতএব তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের এ সংসারের কোন বস্তুতেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে, তিনি ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবেন, পরমার্থ চিন্তা ছাড়া জগৎ-সংসারের কোন বিষয়ই চিন্তা করিবেন না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বিজনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবেন। দার্শ-নিকের এরূপ জীবনধারাকে আমরা ত্যাগের, নিবৃত্তির, নৈষ্কর্ম্যের বা সন্ন্যাসের পথ (asceticism) বলিয়া থাকি।

দার্শনিকের এই প্রকার জীবনও আদর্শ বা প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। যদি পূর্বোক্ত সুখবাদী জীবনধারায় মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার বা অবমাননা করা হয়, তবে সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনধারায় মানুষের আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত, অবসাদিত ও সঙ্কুচিত করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ উভয়কেই নেতিবাচক পথ (negative path) বলিয়াছেন। দুই নেতিবাচক দার্শনিক চিন্তা-ধারার মধ্যে এরূপ নেতিবাচক ও নিষেধাত্মক পথ দুইটির সন্ধান পাওয়া যায়। জড়বাদে মানুষের আত্মার নিষেধ এবং কেবল দেহেন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি থাকায় জড়বাদী দার্শনিকের জীবনে শুধু দেহসুখের অন্বেষণ ও আত্মানন্দের বিসর্জন করা হয়। তিনি শ্রেয়ঃ পথ ছাড়িয়া প্রেয়ঃ পথের অনুসরণ করেন, যেন কাঞ্চন ছাড়িয়া কাঁচ পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। অপর দিকে কোন কোন বেদান্তীর মতে ব্রহ্মে জগৎ-প্রপঞ্চ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ এবং আত্মা ত্রিকাল-সিদ্ধ থাকায়, তাঁহারা প্রবৃত্তির পথ একেবারে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথে বিচরণ করেন, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মে এই জগৎ-প্রপঞ্চ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ—একথা মূল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের কথা বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনায় সগুণ ও সবিশেষবাচক বাক্যও

পাওয়া যায়, আবার নির্গুণ ও নির্বিশেষবাচক বাক্যও পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার বাক্যকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা এবং সম মর্যাদা দেওয়া উচিত। কোন কোন অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী তাহা করেন নাই। অদ্বৈতীরা নির্গুণ ও নির্বিশেষবাচক বাক্যের উপর জোর দিয়া অপর প্রকার বাক্যগুলির নিজের মতো ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ঠিক তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার মনে হয় ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষও বটেন, আবার সগুণ সবিশেষও বটেন। আর এক কথা, 'ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্‌', 'সর্ব খলু ইদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্য হইলে জগৎ-প্রপঞ্চকে একেবারে অসৎ, মিথ্যা বা মায়া-মরীচিকা বলা ঠিক হইবে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবাক্য যেরূপ সত্য, 'যেন জাতানি ভূতানি' ইত্যাদি বাক্যও সেরূপ সত্য। এক প্রকার বাক্য সত্য, অপর প্রকার বাক্যকে অসত্য, অথবা সব বাক্যই সগুণবাচক—কোন কোন বেদান্তীর এসব কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই, বোধ হয় তাঁহাদের নিজ নিজ অভিপ্রেত বা অভিলষিত দর্শনমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ কথা, শঙ্করাচার্য প্রমুখ প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা জগৎসংসারকে পরমার্থ সৎ না বলিলেও অসৎ বা অলীক কল্পনা-মাত্র বলেন নাই এবং নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্মা জীবন যাপনও করেন নাই, পরন্তু ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য বহু কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে সর্বকর্ম-ত্যাগ ও জীবজগতের প্রতি অত্যুগ্র ঔদাসীন্য দার্শনিকের আদর্শ জীবনের লক্ষণ নহে। অদ্বৈত-বেদান্তী জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দার্শনিকের আদর্শ জীবনধারার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। দার্শনিক সর্বাগ্রে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। নিত্যানিত্য সদসদ্বস্তু এবং ন্যায়ান্যায়-কর্ম বিচার করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত আচরণ করিবেন। সত্যনিষ্ঠা দার্শনিক জীবনের পরম প্রয়োজন ও অমূল্য সম্পদ। দর্শন পরমার্থ সৎ বা সত্যের অনুক্ষণ অনুসন্ধান। যাঁহার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে তাঁহার পক্ষে পরম সত্যের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত। দার্শনিক সংযত জীবন যাপন করিবেন। তিনি অহিংসা প্রভৃতি পঞ্চ মহাব্রত বা পঞ্চশীলের অনুশীলন করিবেন। দার্শনিক সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন। তিনি আত্মতুলনায় পরের সুখে সুখী হইবেন এবং পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবেন। অন্যের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বা অনিষ্ট চিন্তাও দার্শনিকের নিকট গর্হিত কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। দার্শনিক স্থিতধী, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মতৃপ্ত হইবেন। তাঁহার বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইবে, এবং তিনি চিত্তপ্রসাদ-লাভে সচেষ্ট হইবেন। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও দার্শনিক ঐগুলিতে নিমগ্ন বা নিমজ্জিত হইবেন না, তিনি সর্বদাই বিষয়াতিরিক্ত ও বিষয় কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক জীবনে যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ভোগসুখের জন্য লালায়িত হইবেন না, যথাযোগ্য আয়াসলব্ধ এবং জীবন-রক্ষার জন্য যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইন্দ্রিয়-সুখে এবং ভোগৈশ্বর্যে অনাসক্তি আদর্শ দার্শনিক জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। তিনি অনাসক্তভাবে সংসারের সকল কর্ম করিবেন এবং কর্মের ফলাফলের জন্য ব্যস্ত ব্যথিত বা উল্লসিত হইবেন না। জ্ঞানসাধনাই দার্শনিকের প্রধান কর্তব্য এবং তাহার সাধনরূপে তিনি অদম্ভিত্ব, অমানিত্ব, ক্ষান্তি, সরলতা, চিত্তশুদ্ধি, স্থৈর্য, অনহঙ্কার, সাম্যভাব, আস্তিক্য বুদ্ধি, বিবিক্তদেশানুরাগ, চিত্তবিক্ষেপকারী পরিবেশ-ত্যাগেচ্ছা, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তত্ত্ব-জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করিবেন। সর্ব জীবের সেবা দার্শনিকের জীবনের ব্রত হইবে। তিনি সাধ্যমত দেশের ও দশের তথা বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিবেন। আদর্শ দার্শনিকের জীবন-যজ্ঞের পবিত্র মন্ত্র হইবে:

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্‌॥'

পূর্ববঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগ। পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঢাকার শ্রীবীরেন্দ্র বসু (মহারাজের শিষ্য) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঢাকা যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দও 'মহারাজ'কে ঢাকা ও ময়মনসিংহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, 'কোন তীর্থস্থান উপলক্ষ ক'রে না গেলে আমার আসন টলবে না। যদি আমাকে ৺কামাখ্যাধামে নিয়ে যেতে পার, তাহলে আমি যেতে রাজী আছি।'

আমি এবং বীরেনবাবু উভয়েই খুব আনন্দের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। আমরা মহারাজকে ৺কামাখ্যা যাওয়ার দিন দেখিতে বলিলাম। স্তান মহারাজের ঘরে বসিয়া মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ রাজা মহারাজকে পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাওয়ার কথা ঠিক হইবার পর আমি ময়মনসিংহের ভক্তদের লিখিয়া দিলাম পূজ্যপাদ মহারাজদের বাসস্থানের জন্য একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিতে।

মহারাজদের ৺কামাখ্যা রওনার তারিখেই কিছু মেওয়া ফল লইয়া আমি রওনা হইয়া গেলাম। ময়মনসিংহে পৌঁছিয়াই জানিতে পারিলাম যে, কোন ভাল বাড়ী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। আমাদের সমস্ত বাড়ীটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এবং চুনকাম করিয়া মহারাজদের বাসস্থানের জন্য ঠিক করা হইল এবং মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্যের বাড়ী হইতে কয়েকটা ভাল তাঁবু আনাইয়া আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর ধারে খাটানো হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কামাখ্যাতে তিন রাত্রি বাস করিবেন, ইহা পূর্বেই ঠিক করা ছিল; অতএব তাঁহাদের রওনা হইবার তারিখ অনুসারে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য একজনকে ৺কামাখ্যাধামে এবং কিছু ফল মিষ্টি সহ কয়েকজন ভক্তকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ফুলছরী ঘাট ষ্টেশনে পাঠানো হইল।

শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া ১৩২২ সনের ৬ই মাঘ (১৯১৬ খৃঃ ২০শে জানুআরি) শুক্রবার বেলা ১০।১০॥টার সময়ে ময়মনসিংহে পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী হরিহরানন্দ, অবিনাশ মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ, ব্রহ্মচারী বিনোদ, পুঁটিয়ার বিভূতিবাবু, ঢাকার বীরেনবাবু। ময়মনসিংহে তাঁহাদের আগমন-বার্তা পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। স্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া আসা হইল।

আমাদের বাসাতে দুইটি প্রকোষ্ঠ-যুক্ত একটি দালান ছিল। উহার বড় প্রকোষ্ঠ শ্রীশ্রীমহারাজের থাকিবার জন্য এবং ছোট প্রকোষ্ঠটি বাবুরাম মহারাজের থাকিবার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল। নূতন লেপ তোষক পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাতেই মহারাজদের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। এই

সময় আমার ইচ্ছা হইল—বাবুরাম মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রাখিব, কিন্তু মহারাজের ঘরে রাখিব না। দেখিব—মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর কোন আবশ্যকতা বোধ করেন কিনা। ঘরে ঢুকিয়াই ফটো না দেখিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো রাখিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমিও তখনই একখানা ফটো রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মহারাজের আগমনে এক অনির্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস আমাদের মনে বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই অফুরন্ত আনন্দের জের এখন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে খেলিতেছে। মহারাজগণ বাসায় পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। আহার করিবার সময় প্রথম গ্রাস হাতে তুলিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রায় দুই মিনিট কাল আমাকে এত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন যে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এই অপার্থিব দয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অপার কৃপার নিদর্শন।

আহার করিয়া মহারাজগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে স্বামী শঙ্করানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজদের বিকালবেলা বেড়াবার জন্য কি গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছ?' কাজের গোলমালে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এই কথা জানাইয়া তখনই গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে বলিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের এই কথোপকথন শুনিয়া শঙ্করানন্দজীকে বলিলেন, 'এখন গাড়ী আনবার কোন দরকার নেই। চল, আজ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।'

মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী সকলেই হাঁটিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে চলিলেন। আমাদিগের বাসার পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়া, সাহেব কোয়ার্টারের প্রশস্ত এবং পরিষ্কার রাস্তা ধরিয়া আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে চলিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ এক সময়ে ঐ স্থানে প্রায় ৮।১০ মাইল প্রশস্ত ছিল। এখন ঐখানে নদটি অতি অল্প-পরিসর, কিন্তু বিস্তৃত চড়াভূমি এখনও বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় বলিয়া ওখানে কোন বসতি নাই। ৮।১০ মাইল-ব্যাপী ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষাদি আছে। নদের ঐস্থানে আসিয়া প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।'

শ্রীশ্রীমহারাজ যে কয়দিন ময়মনসিংহে ছিলেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে—তাল মান লয় সহ ভজন গান করিতেন। ঘরের মাঝখানে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ঘরের ভিতরে বসিয়া এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া বহু লোক এই ভজন-সঙ্গীত শুনিতেন এবং এই দুই মহাপুরুষের ধ্যানস্থ মূর্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে ধন্য হইতেন।

অপরাহ্ণে বাবুরাম মহারাজ 'মহারাজে'র কক্ষে আসিয়া কথাবার্তা বলিতেন এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন।

মহারাজগণ ময়মনসিংহে পৌছিবার পরদিন বিকেলবেলা স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। শহরের গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ নিজে তো কিছুই বলিলেন না, অপর কাহাকেও কিছু বলিতে আদেশ করিলেন না। তৎপরিবর্তে তাঁহার আদেশানুসারে কেবল শ্রীরামনাম-কীর্তনই হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরির মতিবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা তাঁহাদের লাইব্রেরির নবনির্মিত ঘরের উদ্বোধন করা হউক। এ কথা মহারাজকে নিবেদন করা মাত্রই তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় এই নূতন লাইব্রেরি-ঘর উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। লাইব্রেরির উত্তরাংশে ঠাকুরঘর করিবার জন্য একটু প্রকোষ্ঠ ছিল এবং তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো একটি বেদীর উপর সাজানো হইয়াছিল। উহা দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'আমিই ঠাকুরের আরতি ক'রব।' এই কথায় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মহারাজ স্বয়ং আরতি করিলেন, এবং পরে হলঘরে একটু বসিলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন।

সোমবার দিন প্রাতঃকালেই মহারাজ ঢাকা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিছানা-পত্র বাঁধিবার আদেশ দিলেন এবং বিছানাপত্র বাঁধাও হইয়া গেল। আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ, ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আজই চলে যাবার উদ্যোগ করছেন ব'লে তোমার মন খুব খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তোমার এই টান বুধবারের বেশী থাকবে না, আর আজ মহারাজের যাওয়া হবে না।' আমাকে এই ভাবে অভয় দিয়াই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহা-রাজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহা-রাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকা যাওয়া স্থগিত রাখিলেন এবং বুধবার প্রাতঃকালে যাওয়ার সময় স্থির হইল।

বিছানা খুলিবার আদেশ দিয়াই শ্রীশ্রীমহা-রাজ বলিলেন, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।' তখন বেলা ৮৷৷টা হইবে। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, তাই অল্প একটু ঘুরিয়া আসিবার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজকে লইয়া আমাদের বাসার পূর্বদিকের রাস্তা দিয়া ব্রহ্ম-পুত্রের তীরে গেলাম। তথায় পৌছিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথম দিনের মতো বলিয়া উঠিলেন, 'এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।' ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধন্য, যেখানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস-পুত্রের মন বারেবারেই অনন্তে মিশিয়া যাইতেছিল।

সোমবার প্রাতঃকালে আর ভজনগান হয় নাই। বিকালবেলা মহারাজ সকলকে লইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজের ভজনগান হইয়া-ছিল। বিকালবেলা পূর্বদিনের মতো ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী মাধবানন্দ তথায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ পুরোপুরি পাঁচদিন ময়মন-সিংহে ছিলেন। এই পাঁচদিনে ময়মনসিংহের শিক্ষিত লোকদের এবং ছেলেদের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বহু প্রসার লাভ করে এবং কালে এখান হইতে পাঁচজন ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন।

বুধবার (১১ই মাঘ) প্রাতঃকালে ১০টার সময় মহারাজ সদলবলে ঢাকা রওনা হইলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিলাম।

ঢাকা স্টেশনে গাড়ী পৌছিলে তথাকার ভক্তেরা অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে মহারাজদের অভ্যর্থনা করিলেন। স্টেশনে প্রায় ৩।৪ শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় মহারাজদের থাকিবার জন্য কাশীমপুরের জমিদার শ্রীসারদা রায়চৌধুরীর কায়েতটুলীস্থিত বসতবাটীটি নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। ঢাকায় মহারাজগণ যতদিন ছিলেন, আমিও ততদিন তাঁহাদের সঙ্গে ঐ বাড়ীতেই ছিলাম।

ঢাকায় পৌছিবার পরদিনই প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'গত রাত্রে দেখলাম ঠাকুর এইখানে নৃত্য করছেন। ঠাকুরই তাঁর নিজের প্রচারকার্য নিজেই করছেন। আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।' ঢাকাতে পৌছিবার পরদিনই মহারাজের শরীর অসুস্থ হয়। এইজন্য প্রথম তিন চার দিন তিনি বাহিরের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই। বাবুরাম মহারাজই একটি বড় হল-ঘরে সমবেত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। মহারাজের শরীর সুস্থ হওয়ার পরে তিনিও আসিয়া প্রাতঃকালীন বৈঠকে যোগ দিতেন। ঢাকার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকে এই সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন শিক্ষিত ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীমহারাজের ঢাকা যাইবার ৫।৬ দিন পরে ঢাকার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিস্ সাহেব মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য আসেন। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'তুমি গিয়ে নির্মলকে (স্বামী মাধবানন্দ) বল যে, আমি তাকে বিস্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি।' মহারাজের আদেশের কথা শুনিয়া নির্মল মহারাজ তখনই বিস্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি সহজ এবং সরল ভাষায় ঠাকুরের কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বিস্ সাহেব ইহাতে খুব আনন্দিত হইলেন। খানিকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমহারাজও তথায় আসি-লেন। তিনি কিছু সময় ওখানে বসিয়া চলিয়া আসিলেন। বিস্ সাহেব মহারাজকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার দর্শনেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহারাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় কার্জন হলে শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া প্রথমতঃ স্বামী মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দেন, পরে বাবুরাম মহারাজও ছাত্রদের নিকট ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে জীবন গঠন করিবার জন্য খুব উদ্দীপনা-পূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঢাকার বিখ্যাত সেতারবাদক ভগবান সেতারী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম সেতারী উভয়ে একদিন বিকালবেলা অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমহারাজকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাজনা শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐদিনই কুমিল্লার বিখ্যাত বংশীবাদক আফতা-বুদ্দিন মিঞা শ্রীশ্রীমহারাজকে তাঁহার বংশীবাদন শুনাইয়াছিলেন। এই বংশীবাদনও অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

ঢাকা আসিবার পর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে ৮।৮॥টা হইতে বেলা ১০॥১১টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮।৯টা পর্যন্ত সমবেত ভক্তদের সঙ্গে অনবরত কথা বলিয়া ১২।১৪ দিন পরে বাবুরাম মহারাজের শরীর খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রি

৮॥।৯টার সময় সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্যের ভঙ্গী করিলেন। তখন তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার সেই অপরূপ রূপ এখনও আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত আছে।

এই সময়েই শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকার বর্তমান মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ঢাকাতে ২০।২৫ দিন থাকিবার পরে শ্রীশ্রীমহারাজকে কাশীমপুরের জমিদার সারদাবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। আমি এবং ঢাকার আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে যাই। সকলে ঢাকা হইতে প্রাতঃকালে রেলে জয়দেব-পুর রওনা হইলাম। কাশীমপুর জয়দেবপুর হইতে ছয় মাইলের হাঁটা পথ। এই পথটুকু যাইবার জন্য সারদাবাবু জয়দেবপুর স্টেশনে ৬টা হাতী পাঠাইয়াছিলেন। একটা হাতীর উপরে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া-ছিলেন, অপর পাঁচটা হাতীর উপরে ৪জন করিয়া বসিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাশীমপুর পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আহারাদির পর বিকালবেলা আবার হাতীর উপর চড়িয়া সকলে মিলিয়া ঐ গ্রামেরই সংলগ্ন এক বিরাট গভীর জঙ্গল দেখিতে গেলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে কাশীমপুর গ্রাম-সংলগ্ন একটা ছোট নদীতে বড় বড় চিতল মাছ ধরা দেখিবার জন্য মহারাজদের লইয়া যাওয়া হয়। হাতীতে চড়িয়াই সকলে তথায় গিয়াছিলাম। তথায় একবার জাল টানিতেই ৬টা বড় চিতল মাছ উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ খুব খুশী হইলেন।

এই দিনই শ্রীশ্রীমহারাজ সারদাবাবুকে মন্ত্র-দীক্ষা দিলেন। সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র আত্মহত্যা করে। এই দুর্ঘটনায় সারদাবাবু অত্যন্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে কালযাপন করিতে-ছিলেন। আজ মহারাজের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার দুঃখের বোঝা অনেকটা লাঘব হইল। বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সারদাবাবুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'আজ একটি বিল্বমঙ্গলের অভিনয় হ'ল।' মহারাজ এখানে সারদাবাবুর কয়েকজন আত্মীয়কেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই কাশীমপুরেই বাবুরাম মহারাজ আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন, রাখাল (শ্রীশ্রীমহারাজ) ত্রিগুণাতীত।'

কাশীমপুরে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহারাজদের সকলের ফটো তোলা হইয়াছিল। মহারাজ কাশীমপুরে তিন দিন কি চার দিন ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতে আরও কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণ-গঞ্জের ভক্তেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যান। মহারাজগণ কণ্ট্রাক্টার নিবারণ-বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবার পরদিনই শ্রীশ্রীমহারাজ নাগমহা-শয়ের বাড়ী দেওভোগ গ্রামে যান। তথায় পৌঁছিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত পুকুরের ধারে বসিয়া একটু বিশ্রাম করেন। সেইখানে একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নাগমহাশয়ের ভক্তির কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, 'তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরের বেড়াতে একবার উই ধরে বেড়ার কতক অংশ খেয়ে ফেলে, কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই ঐ উইগুলি মেরে বেড়াটা পরিষ্কার করতে দিলেন না।' তিনি উই-এর ভিতরেও জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিতেন, এইজন্য তাহাদের আহারে বিঘ্ন ঘটা-ইতে দেন নাই।

মহারাজ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'এ ভক্তির পরাকাষ্ঠা, highest (উচ্চতম) ভক্তির লক্ষণ।'

শ্রীশ্রীমহারাজের আগমন উপলক্ষে গ্রামের এক সংকীর্তনের দল নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজগণ সকলে পুকুরপাড় হইতে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ সংকীর্তনের দলের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মহারাজকেও বলিলেন, 'মহারাজ, একটু নাচ।' বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি গানে টান দিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্য করিবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল—নীচে হইতে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা মহারাজের বুকের উপর উঠিয়া গেল।

আমার মনে হইল--মহারাজের শরীরটা যেন অনেক লম্বা হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বক্ষও যেন অনেক স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ যেন পড়িয়া যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহারাজকে ধরিবার উপক্রম করিতেছিলেন। আমি মহারাজের পাশে দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার উত্তোলিত দুই হাত হঠাৎ জোর করিয়া নীচের দিকে চাপিয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে ভাবটা যেন নীচের দিকে নামিয়া গেল। মহারাজও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ওখানে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়াইয়া বাবুরাম মহারাজের দিকে তাকাইয়া 'বাবুরাম দা, চল' এই বলিয়াই সংকীর্তনের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের সঙ্গে সকলেই চলিয়া আসিলাম। চকিতের মধ্যে যে মহাভাবের খেলা হইয়া গেল তাহা হয়তো অনেকেই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। এমন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস মহারাজ মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে দমন করিয়া ফেলিলেন! নাগমহাশয়ের বাড়ী হইতে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ সাধারণতঃ বয়স্ক বা বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কেবল যুবকদের সঙ্গেই আলাপ করিতেন।

বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, 'আমি স্বামীজীর চেলা। স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, তুই গ্রামে গিয়ে সকলকে ঠাকুরের কথা শোনাবি। যুবকদের মন সংসারে আসক্ত হয়নি, তাই তারা ঠাকুরের কথা ধারণা করতে পারে। এইজন্যই আমি যুবকদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলি।'

মহারাজগণের নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে চট্টগ্রাম হইতে একজন ভক্ত আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে তথায় লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। বাবুরাম মহারাজ যাইতে রাজী হইলেন, কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বাবুরাম মহারাজকে কিছুতেই চট্টগ্রাম যাইতে দিলেন না। নারায়ণগঞ্জে ৭।৮ দিন থাকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। আমরা বহু ভক্ত তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলে আমরা অনেকেই কাঁদিয়াছিলাম, দেখিলাম বাবুরাম মহারাজের চোখেও জল। যতদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল, আমরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলাম; দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজও আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন।

* * *

মহারাজগণ কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমিও কলিকাতা যাই। কার্য উপলক্ষে আমাকে তখন প্রতি মাসে বা প্রতি দুই মাসে একবার কলিকাতায় যাইতে হইত এবং কলিকাতা গেলেই ৫।৬ দিন আমি মঠে

থাকিতাম। সেই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট শ্রুত বিশেষ বিশেষ উক্তিগুলির কয়েকটি এখানে নিবেদন করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের সেই পুরোনো বুলি: 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' একদিন শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি তো গুরু।' একদিন বলিতেছিলেন, 'সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত মন, সমাধি—এ না হ'লে কি সাধু হয়?' আর একদিন বলিতেছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন—তোরা ঈশ্বরের দিকে যত এগিয়ে যাবি, আমার ভালবাসা তোদের উপর ততই বেশী পড়বে। তখন কি আর এ কথার অর্থ বুঝি!' আর একদিন বলিতেছিলেন, 'মানুষ মনের সবটা বাজে খরচ ক'রে ফেলছে, যদি পাঁচ মিনিটও ভগবানের নাম ক'রত।'

আর একদিন মঠবাড়ীর দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির নীচের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাঁহাদের আরও দুএকজন গুরুভাই সকলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ 'গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি' কথা কয়টি এরূপ ভাবের সহিত উচ্চারণ করিলেন যে উপস্থিত মহারাজগণ শ্রীশ্রীমহারাজ এ বিষয়ে আরও কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। মহারাজ কিন্তু আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিলেন 'তুমি বড় কৃপণ।' মহারাজও অমনি 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ' এই কথা জোরে উচ্চারণ করিয়া সকলকে হাসাইয়া দিলেন, কিন্তু 'গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি' সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজের মঠে অবস্থানকালে নিয়ম ছিল নূতন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ শেষ রাত্রি ৪টার সময় মহারাজের ঘরে তাঁহার নিকট বসিয়া ধ্যান করিবে। একদিন আমার ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ধ্যানের শেষে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'সর্বদা মনে মনে ভগবানের নাম করা কি প্রকার সাধন?' উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ সাধন।'

একদিন বলরামবাবুর বৈঠকখানার হলঘরে বিকালবেলা শ্রীশ্রীমহারাজ পায়চারি করিতেছেন, আমি তথায় গিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে বসিয়া মহারাজকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজ কেবল 'জিতেন' এই শব্দটি এমন মধুরভাবে উচ্চারণ করিয়া আমাকে ডাকিলেন যে, আমার হৃদয়ের মর্মস্থান পর্যন্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। এমন প্রেমপূর্ণ মধুর আহ্বান, এমন আপনার-করিয়া-লওয়া ডাক জীবনে আর কখনও শুনি নাই। শ্রীশ্রীমহারাজের হৃদয় যে কি অসীম প্রেমপূর্ণ ছিল তাহা ঐ একটি আহ্বানেই বুঝিতে পারিলাম। মহারাজ আমাকে ঐ প্রকার একবার ডাকিয়াই আবার নিজের ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ একটি ডাক আমার প্রাণে আজ পর্যন্ত বাজিতেছে। ঐ একটি ডাকেই চিরপ্রেম-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

জাগি

'অনিরুদ্ধ'

জাগি অচেতন রজনীর কুহেলিকা উৎসারি
দীপ্ত অরুণ আলো সাথে ;
জাগি 'ওঠ্ ওঠ্ চল্ চল্' কম্বু কাকলি শুনি
উৎসাহ-উদ্বেল প্রাতে।
জাগি কুণ্ঠা ও দ্বিধা লাজ অবসাদ পরিহরি
বুকে ল'য়ে অদম্য আশা
জাগি পরাজয় লঙ্ঘিয়া দুর্জয় বিশ্বাসে
মোহ ভয়-সংশয়-নাশা।
জাগি পৃথিবীর ধাবমান পরিবর্তন স্রোতে
ধ্রুব পদে সংযুক্ত আঁখি
জাগি মিথ্যার গুণ্ঠন নির্মম বিদারিয়া
স্বার্থ-কলুষ দূরে রাখি।

জাগি উদ্ধত অহমিকা অভিমান চূর্ণিয়া
প্রপন্ন ঈশ্বর-চরণে
জাগি নির্মল ভক্তির প্রশান্ত মহিমায়
দুর্দম বাসনার মরণে।
জাগি এ বিশ্বভুবনের অনাহত সঙ্গীতে
দিকে দিকে বহে সুরধারা
জাগি অনুপম তৃপ্তির উচ্ছল প্লাবনে
আপনাতে আপনা-হারা।
জাগি জন্মমরণহীন ক্ষোভহীন শোকহীন
স্বরূপের ভাস্বর জ্ঞানে
জাগি অখিল এ চরাচর আত্মবিলাস মানি
অদ্বয় সত্যের ভানে।

বেলুড়

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সত্যসন্ধ সন্ন্যাসীর সুভাষিত বাণী,
ভাস্করের হাতে-গড়া মঠে মূর্তিমান্
জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিবাদ একসাথে আনি'
দানিল সেবার ধর্ম—প্রেমে মহীয়ান্।
মঠ নয়, মানবের মিলন-মন্দির,
জ্ঞানেতে নির্মল নিত্য, বিভূতির ছটা,
বিবেকানন্দের নামে সবে নতশির,
ধ্যানে নাই আড়ম্বর, অর্চনায় ঘটা।
বেলুড় পবিত্র নাম, জ্ঞানের মন্দির,
সত্যের দ্যুতিতে নিত্য চির-প্রভাময়,
কল্যাণের মন্ত্রগান ওঠে অতি ধীর,
ব্রহ্মচর্য-ব্রতচারী জাগে জ্যোতির্ময়।
প্রণাম বেলুড় মঠ, শিখাইলে প্রেম,
স্বামীজীর নামে নতি রাখিয়া এলেম।

বিবেকানন্দ

শ্রীশান্তশীল দাশ

হে সন্ন্যাসী দীপ্তচক্ষু, 'এ সংসার মিথ্যা মায়াময়',
ব'লে তুমি সাথে লয়ে বৈরাগীর উত্তরীয়খানি,
অসংখ্য মানুষ-ভরা, ত্যাগ করি' এই লোকালয়,
যাওনিতো দূরে সরে, হে বিরাট, অসীম-সন্ধানী।
তোমার অসীমে তুমি পেয়েছিলে সীমার মাঝারে,
প্রতিটি 'নরে'র মাঝে দেখেছিলে তুমি 'নারায়ণ';
অকুণ্ঠ অর্ঘ্যের ডালা তুলে দিলে সেই দেবতারে,
এ বিশ্ব নিখিল হ'ল সুবিশাল তব পূজাঙ্গন।
যেখানে মানুষ কাঁদে, লাঞ্ছিত, পীড়িত অসহায়—
তোমার দেবতা কাঁদে সেখানে সে-মানুষের মাঝে,
কী গভীর প্রেমে তুমি তুলে নিলে সেই দেবতায়;
তোমার আরতি-মন্ত্র কী গভীর সুরে সেথা বাজে!
'নারায়ণ' হ'ল 'নর' তোমার জীবন-সাধনায়,
সেই 'নারায়ণে' চিত্ত বারংবার প্রণতি জানায়।

আমেরিকায় বেদান্তের বার্তাবহ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার *

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ বাঙ্কার (Ellsworth Bunker) ১৯৫৭ খৃঃ ১৪ই মার্চ নয়াদিল্লীতে আমেরিকান ছাত্রদের একটি সভায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কৃষ্টিগত সম্বন্ধ দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান—সংক্ষেপে তার উল্লেখ ক'রে বলেন :

'This cultural interest (between India and the United States) has been a two-way affair. The impact of Swami Vivekananda at the World Parliament of Religions in 1893 is well-known. The great Tagore left a lasting impression on Americans after his visit to the United States. Many other leaders' achievements and utterances have had great influence in my country.'

—অর্থাৎ এই কৃষ্টিগত আগ্রহ দুদিক থেকেই দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩ খৃঃ বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সংঘাত সর্বজন-বিদিত। যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণের পর মহান্ (রবীন্দ্রনাথ) ঠাকুরও আমেরিকাবাসীদের মনে স্থায়ী প্রভাব রেখে আসেন। অন্যান্য বহু (ভারতীয়) নেতার কীর্তিকলাপের ও বাণীর প্রভাব আমার দেশে যথেষ্ট।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে এবং পরে ভারতের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়েছেন, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্বামীজীই যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রথম এবং যথার্থ কৃষ্টিগত প্রতিনিধি। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসভা নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা, তার থেকেও বড় ঘটনা—সেই সভায় বিবেকানন্দের উপস্থিতি। এই উপলক্ষে স্বামীজী (তখন তিনি মাত্র ৩০ বৎসরের যুবক সন্ন্যাসী) অপূর্ব সুযোগ পেলেন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার এবং পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত হবার। আবার স্বামীজীর (cyclonic Hindu বা তুফানী হিন্দু lightning orator বা বৈদ্যুতিক বক্তা প্রভৃতি নামে তখন তিনি বিভূষিত) অসংখ্য বক্তৃতায় এবং আলোচনায় আমেরিকাবাসীরা সর্বপ্রথম শুনল যে পাশ্চাত্যকে দেবার জন্য ভারতের আছে এক মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ। গভীর বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলবার যোগ্যতা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে ভারতের বেশী। স্বামীজী অনুভব করেন, ভারত যদি পাশ্চাত্যকে শেখায় ধর্ম ও দর্শন, পাশ্চাত্যও প্রাচ্যদেশগুলিকে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখাতে পারে।

বিবেকানন্দ যে ভাবে আমেরিকা গেলেন তা খুবই চমকপ্রদ। মোটেই তা সহজে নিষ্পন্ন হয়নি। কিছুকাল আগে থেকেই এ দেশে অনেকে জেনেছিল, চিকাগোয় একটি ধর্মমহাসভা হচ্ছে। স্বামীজী না পেয়েছিলেন কোন আমন্ত্রণ, না ছিল তাঁর টাকা—এতদূর যেতে হবে, আবার সে দেশে গিয়ে থাকার খরচও তো চাই।

অবশেষে ১৮৯৩ খৃঃ প্রথমে তিনি পেলেন অন্তরের এক আহ্বান অথবা দৈব আদেশ (যা অভিরুচি বলতে পারা যায়)—অনিমন্ত্রিত বিবেকানন্দ সাহস ক'রে পা বাড়ালেন অজানার পথে। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষিণ ভারতের শিষ্যেরা এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সাহায্যও করেন।

৩১শে মে স্বামীজী জাহাজে বোম্বাই ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ভঙ্কুবরে (কানাডা) পদার্পণ করলেন—২৫শে জুলাই। চিকাগো পৌঁছে তিনি জানলেন, ধর্মমহাসভা আরম্ভ হ'তে কয়েক সপ্তাহ দেরি আছে; তাই তিনি বোষ্টন চলে

* Associate Editor, Amrita Bazar Patrika.

গেলেন। ম্যাসাচুসেট্‌স্ অঞ্চলে চার পাঁচ সপ্তাহে ১১টি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কয়েকজন প্রভাবশালী আমেরিকানের সংস্পর্শে এসেছেন, সর্বোপরি আমেরিকার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তাঁর হয়েছে। তাঁর বক্তৃতাগুলি এত শিক্ষাপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর হ'ত যে তিনি সর্বত্র বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। যেখানে তিনি যেতেন, সেখানেই সংবাদ-পত্র সাগ্রহে তাঁর সংবাদ প্রকাশ ক'রত।

এখনও আসল সমস্যার সমাধান হয়নি,—, যেজন্যে তিনি অর্ধেক পৃথিবী (১০,০০০ মাইল) অতিক্রম ক'রে এসেছেন, সেই ধর্মমহাসভার আমন্ত্রণ-লিপি এখনও তিনি পাননি। সাহায্য এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডক্টর জন হেনরি রাইট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক; তাঁরই সহযোগিতায় অবশেষে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধির একটি আসন-লাভে সমর্থ হলেন।

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর কলা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মসভার অধিবেশন শুরু হয়। গত মে মাসে আমি যখন মিশিগান এভিন্যু-এর ওপর এই বিরাট ভবনে (বর্তমানে এটি একটি ম্যুজিয়াম ও চিত্র-প্রদর্শনী) প্রবেশ করি, তখন আমার মন যেন মুহূর্তের মধ্যে ৬৬ বৎসর পিছিয়ে চলে গিয়েছিল, এবং এই ঐতিহাসিক ভবনে ১৭ দিনব্যাপী ধর্মমহাসভার অধিবেশনে স্বামীজী যে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন, তা অনুভব করছিলাম।

যখন তিনি 'আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' ব'লে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, তখন সেই সভায় উপস্থিত ৫,০০০ নরনারীর মনে এক নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্বামীজীর ঐ মহান্ ভাষণে যে বিশ্বজনীনতার সুর ছিল তারই আবেদনে সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে কয়েক মিনিট ধরে আনন্দধ্বনি করেছিল। জনসভায় কোন বক্তার মুখে তারা এমন ভ্রাতৃত্বের ভাবপূর্ণ ভালবাসা-ভরা আহ্বান কখনও শোনেনি। ধর্মসভায় স্বামীজীর এই প্রথম বক্তৃতা এবং পরবর্তী ভাষণগুলিও তারা পরম আগ্রহে ও ভক্তিভরে শুনেছিল; এবং এই বক্তৃতার মাধ্যমেই স্বামীজীর নাম আমেরিকায় এবং তার বাইরেও রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে গেল।

মোটামুটি ভাবে স্বামীজী দু'বার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন; প্রথমবার—১৮৯৩ খৃঃ জুলাই-এর শেষ থেকে ১৮৯৫ খৃঃ আগষ্ট পর্যন্ত, আবার ১৮৯৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ এপ্রিল পর্যন্ত—২৯ মাস। দ্বিতীয় বারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন প্রায় ১০।১১ মাস ১৮৯৯।১৯০০খৃঃ। তাহলে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থান-কাল সর্বসমেত সাড়ে তিন বছরের বেশী নয়। ১৯০০, ২০শে জুলাই তিনি আমেরিকা ছেড়ে ইওরোপে ঘুরে হঠাৎ বেলুড় মঠে ফিরে আসেন ১৯০০ খৃঃ ডিসেম্বরে। প্রায় দেড় বছর পরে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

'নতুন আবিষ্কার'

স্বামীজীর আমেরিকা থাকাকালীন সাধারণ বিবরণ তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত জীবনীতে পাওয়া যায়; কিন্তু চমকপ্রদ খুঁটিনাটি অনেক কিছু—অজানাই থেকে যেত, যদি না 'জনৈক আমেরিকান ভক্ত' ১৯৫০ খৃঃ বিরাট গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। মার্কিন সংবাদ-পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি খুঁজে খুঁজে তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল। স্বামীজীর বক্তৃতার ও আলোচনার চমকপ্রদ বিবরণী, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

ও বিরাট জ্ঞান সম্বন্ধে আমেরিকানদের মতামত —সব মুদ্রিত আকারে পাওয়া গেল। সেগুলি যেন মাটি খুঁড়ে বার করা হ'ল। এগুলির ফটো তুলে নেওয়া হ'ল, প্রতিলিপি ক'রে নেওয়া হ'ল।

রামকৃষ্ণ-সংঘের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা Prabuddha Bharata-এর ১৯৫৫ খৃঃ কয়েকটি সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries by an American Devotee' নামে। সাগ্রহে এগুলি পড়তে পড়তে ভাবতাম, কে এই 'আমেরিকান ভক্ত'—যিনি নিরলসভাবে এক শহর থেকে আর এক শহরে গেছেন, গ্রন্থাগারে পুরানো সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা থেকে এত সব নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। গত বছর প্রবন্ধ-গুলি 'অদ্বৈত আশ্রম' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ৬৫০ পৃষ্ঠার বইখানির মধ্যে স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের প্রথমবারের মাত্র ২১ মাসের কথা (আগষ্ট ১৮৯৩ থেকে এপ্রিল ১৮৯৫ পর্যন্ত) আছে। আশ্চর্য হবো না, যদি দেখি অদূর ভবিষ্যতে একাধিক খণ্ডে স্বামীজীর আমেরিকা-বাসের সকল তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে। নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি—এক একটি যেন সোনার দানা। স্বামীজীর কথা শুনে মার্কিনদের মনে কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হ'ত, মানুষ হিসেবেই বা তারা তাঁকে কি ভাবে দেখত, আবার চিন্তাশীল বক্তা ও ধর্মনেতারূপেই বা তাঁকে তারা কি চোখে দেখত, এ সব বিষয়ে নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি সত্যি নতুন আলোক সম্পাত করে।

একথা সর্বজনবিদিত যে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অন্ততঃ প্রথমাবস্থা স্বামীজীর খুব সুখে কাটেনি। আবার ধর্মমহাসভায় অদ্ভুত সাফল্য অর্জনের পর যখন নির্ভীক বক্তা এবং ধর্মনেতারূপে তিনি বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন, তখন তাঁর অনেক শত্রুও দেখা দিয়েছে—বিশেষতঃ খৃষ্টান পাদ্রীদের মধ্য থেকে, তাদের ধারণা এই কালবৈশাখীসদৃশ হিন্দু সন্ন্যাসী বুঝি বা তাদের খৃষ্টধর্মের সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করবে। দুঃখের বিষয়—শত্রুতা ও বিরূপতা অনেক সময় সংবাদপত্রে ও বক্তৃতা-মঞ্চে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হ'ত, এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বামীজীকে এতে যোগ দিতে হ'ত। তবে একটা কথা—স্বদেশবাসীদের মধ্যেও যেমন কেউ কেউ স্বামীজীর শত্রুতা করেছেন, আমেরিকানদের মধ্যে আবার তেমনি স্বামীজী অনেক অকপট প্রভাবশালী এবং সাহায্যকারী বন্ধু লাভ করেছেন। শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছে। বন্ধুরা জানত, তিনি কি জিনিসে তৈরী। যে উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, তা যাতে সফল হয় তার জন্য তারা সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করেছে। 'আমেরিকান ভক্ত'টি তাঁর 'নতুন আবিষ্কারে' কিছুই গোপন করেননি। স্বামীজীর জীবনের সব দিক তিনি অনাবৃতভাবে দেখিয়েছেন উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা ক'রে। বইখানি যদিও জীবনী নয়, তবু স্বামীজীর জীবনের একখানি অমূল্য আকর গ্রন্থ।

গত বছর (১৯৫৯) মে মাসে আমি যখন স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে, তখন আমার বন্ধু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমিতির একজন সদস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই 'নতুন আবিষ্কারে'র 'জনৈক আমেরিকান ভক্ত'। —অবাক্ হ'য়ে দেখলাম 'জনৈক ভক্ত' জনৈকা মহিলা—দুর্বল, ছোটখাট ধরনের, বয়স প্রায় ৫০ কি ৬০। এঁরই নাম মারী লুই বার্ক! আশ্চর্য হ'য়ে ভাবতে লাগলাম—ক'বছর ধরে একটানা ভাবে এঁকে কি দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে! মহিলা এত শান্ত এবং নম্র যে তাঁকে তাঁর বই-এর কথা বলাতে তিনি বললেন, 'ও কিছু না'। এ রকম একটি বই লিখে যিনি আমাদের ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া পরম সৌভাগ্য।

বেদান্তের বার্তা

স্বামীজী মনে করতেন, ভারত আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ জিনিস যা দিতে পারে তা হচ্ছে 'বেদান্ত'; তারই মধ্যে আছে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও বিশ্বজনীনতার বাণী এবং এরই মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে দুই মহাজাতির মধ্যে।

বেদান্তের শিক্ষা: মানুষ দিব্যভাবাপন্ন। এই বিশ্বের পেছনে যদি কোন একটি বাস্তব সত্তা থাকে—তা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, এবং তিনি সর্বব্যাপী। সেই ব্রহ্ম যদি সর্বব্যাপী হন, তবে নিশ্চয় তিনি আছেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, তিনি আছেন যে কোন সৃষ্ট জীব ও পদার্থের ভেতরে। তিনিই যদি সব কিছুর মধ্যে আছেন, তবে বেদান্তের শিক্ষা শুধু ভ্রাতৃত্ব নয়—সকলের তাদাত্ম্য ঐক্য (identity)।

বেদান্ত আরও শিক্ষা দেয়, ইহজগতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য—তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সদা-বিদ্যমান ব্রহ্মভাবকে বিকশিত করা। বেদান্তের মতে সত্য বিশ্বজনীন। বেদান্ত সব ধর্মকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে, কারণ সব ধর্মের মূলেই যে দিব্য প্রেরণা আছে—তা বেদান্তই ধরতে পেরেছে। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনোভাবের উপযুক্ত। প্রত্যেক ধর্মই আবার প্রতিটি মানুষের মতো খানিকটা অজ্ঞানতায় জড়িত। তবে বেদান্ত তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বেদান্ত জোর দেয় অন্তর্নিহিত সত্যের ওপর। বেদান্ত ধর্মান্তরিতকরণ সমর্থন করে না; তবে হিন্দুকে সাহায্য করে ভাল হিন্দু হ'তে, খৃষ্টানকে ভাল খৃষ্টান হ'তে, মুসলমানকে ভাল মুসলমান হ'তে। তিন বছরের অধিককাল ধরে শত শত বক্তৃতায় স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মূল বিষয়বস্তু ছিল বেদান্ত।

বেদান্তের এই বার্তার বিশ্বজনীনতা বহু আমেরিকানের হৃদয় স্পর্শ করে। যারা তাঁর খুব কাছে আসত এবং আত্মোপলব্ধির জন্য সাহায্য চাইত, তাদের জন্য তিনি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করতেন। কয়েকজন সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এ সব কঠিন ও বিরাট কাজে স্বামীজীর লৌহদৃঢ় শরীরও ভেঙে পড়ল। তিনি দেশে ফেরার প্রয়োজন অনুভব করলেন, তবে তার আগে কতকগুলি বেদান্ত-কেন্দ্রকে স্থায়ী রূপ দেবার কথা ভাবলেন।

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন ক'রে এলেন। বিদেশে এইটিই প্রথম কেন্দ্র। ১৯০০ খৃঃ প্রথমে দ্বিতীয় বার যখন তিনি আমেরিকা আসেন, তখন লস্ এঞ্জেলস্-এ (দক্ষিণ কালিফর্নিয়ার) এবং স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোয় (উত্তর কালিফর্নিয়ার) বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সব কেন্দ্রে যে পরিবেশের মধ্যে সময় কাটিয়েছি, তার স্মৃতি এখনও আমার মনকে ঊর্ধ্বলোকে টেনে নেয়।

১৯০০ খৃঃ মাঝামাঝি যখন স্বামীজী শেষবারের মতো আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্য সেখানকার কাজের ভার নিয়েছেন। আজ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ১১টি বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। কয়েকটি কেন্দ্রে রবিবারের সমাবেশে যোগ দেবার সুযোগ পেয়ে বুঝেছি, আমেরিকার নরনারী—বিশেষ ক'রে তাঁদের মধ্যে যাঁরা মনীষাসম্পন্ন, বেদান্ত-আন্দোলনে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ। এ আন্দোলন কখনও গণ-আন্দোলন হ'তে পারে না। তাই বলা যায়—যুক্তরাষ্ট্রে এ আন্দোলন আনুভূমিকভাবে (horizontally) নয়, ঊর্ধ্বাধ ভাবে (vertically) ছড়িয়ে পড়ছে, অর্থাৎ আমেরিকার জনগণকে না হলেও

সেখানকার চিন্তাশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষকে প্রভাবিত করছে।

আমি বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছি—কয়েকটি বেদান্ত-কেন্দ্রের মার্কিন অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ভক্তি আগ্রহ এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা দেখে। এই শ্রদ্ধার অংশমাত্র যদি আমাদের থাকত! আমেরিকা যাবার আগে আমার ধারণা ছিল—দীর্ঘকাল আমেরিকা-বাসের ফলে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হ'য়ে গেছেন এবং যখন তাঁদের সাহেবী পোষাক-পরা দেখলাম, তখন ভাবলাম আমার ধারণাই ঠিক, কিন্তু তারপর যখন তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলাম এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলাম তখন বুঝলাম, অনেকের মতোই আমার ধারণা কতদূর ভুল।

স্বামীজী আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত—এই ৬৬ বৎসরের বেদান্ত-আন্দোলনের একটি প্রামাণ্য সুসম্বদ্ধ বিরাট ইতিহাস লেখার সময় হয়েছে। তাতেই পাওয়া যাবে বেদান্তের বার্তা কিভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ সমাদৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, আমেরিকায় ১১টি বেদান্ত-কেন্দ্র আর্থিক দিক দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, আমেরিকার নরনারীগণ—যাঁরা যে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই এর ব্যয়ভার বহন করেন।

কৃষ্টিগত সহযোগিতা

গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতার যে ভিত্তি স্বামীজী স্থাপন ক'রে গেছেন, আজ তা নানাদিকে নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে। কতকগুলি ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য ঠেকে, এবং আমি বিশ্বাস করি অনেকেরই কাছে ঐরূপ মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন :

> দূর দূর দেশেও এখানকার অনেক ভক্ত আছে, তাদের গায়ের রঙ অন্য রকম, তাদের ভাষা আলাদা।*

এই কথাগুলি কি বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের কাছে ইঙ্গিত নয় যে তাঁকে যেতে হবে বিদেশে—সেই সব ভক্ত খুঁজে বার করতে?

কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য অনুধাবনীয় :

বিবেকানন্দ যে সব বিদেশে গিয়ে থেকেছেন তার মধ্যে আমেরিকাই প্রথম, বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। 'রামকৃষ্ণ প্রচারে'র প্রথম বিদেশী কেন্দ্র ৬০ বৎসর আগে নিউইয়র্কেই স্থাপিত হয়েছে, স্বামীজীর একজন আমেরিকান শিষ্যার (মিসেস ওলি বুল) অর্থানুকুল্যেই বেলুড়ের প্রথম মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়। আবার বোষ্টনের দুজন ভক্ত মহিলা বেলুড়ের বিরাট মন্দিরের ব্যয়ভারের অধিকাংশ বহন করেন। স্যানফ্রান্সিস্কোর নূতন হিন্দু মন্দিরও (গত অক্টোবরে যার উদ্বোধন হয়েছে) আমেরিকার টাকাতেই নির্মিত। সবশেষে একজন আমেরিকান মহিলাই স্বামীজীর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন।

পূর্বেই বলেছি বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রথম কৃষ্টি-প্রতিনিধি। তাঁর পর বহু বিখ্যাত ভারতবাসী আমেরিকা গিয়েছেন, এবং বহু খ্যাতনামা আমেরিকান ভারতে এসেছেন। যদিও গান্ধীজী কখনও আমেরিকা যাননি, তথাপি আমেরিকা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে এবং 'ভারতের লিংকন' ব'লে মনে করে।

* এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছেন : তিনি (ঠাকুর) বলতেন,……… ‥ ‥ হার অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০)

এ-সব সত্ত্বেও যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভারত সম্বন্ধে এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রভূত অজ্ঞতার আবরণ থাকে, তাহলে উভয় দেশের মানুষের কর্তব্য—পরস্পরের কৃষ্টি ও চিন্তাধারা বোঝবার আরও ব্যাপক চেষ্টা করা। এরূপ করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এমন অনেক কিছু আছে যা উভয় দেশেই এক প্রকার। আমেরিকা পাশ্চাত্যে বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ, আর ভারত শুধু প্রাচ্যে কেন—পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমেরিকায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের সমাবেশ, ভারতের মহাজাতিও গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের ও ভাবের সমন্বয়ে। সমাজে, ব্যক্তি-জীবনে ও চিন্তাধারায় আমেরিকা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী; ভারতও তাই। আর আমেরিকানরা ভারতবাসীর মতো প্রাণখোলা এবং আদর্শবাদী, হৃদয়হীন আচারনিষ্ঠার ওপর উভয়েব কারুরই শ্রদ্ধা নেই।

এই যদি উভয় দেশের মানুষের মানসিক গঠন হয়, তবে এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে অধিকতর কৃষ্টিগত সহযোগিতার ফলে শুধু যে এই দুই দেশেরই মঙ্গল হবে তা নয়, প্রকারান্তরে এ প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের কারণ হবে।

স্মরণিকা

শ্রীদেবাশিস্ বাগচী

দীর্ঘ বছরের ব্যবধান
তোমার আমার মাঝে।
দেশের হিতের কাজে
জীবনের ব্রতশেষে করিলে প্রয়াণ
অমৃত আনন্দ-দেশে।
অবশেষে
কেটে গেছে অনেক বছর,
আমরা এসেছি পৃথিবীতে,
তোমারে দেখিনি তবু, হে সন্ন্যাসিবর
আজিকার দিনে চাই তোমারেই পেতে।
৪ঠা জুলাই,
উনিশ শ' দুই—
ইন্দ্রপতনে স্তব্ধ সবার অন্তর,
অশ্রুভারে অবনত অতীব কাতর।
তোমার বিচ্ছেদে সব শূন্য দেখেছিল
ভারতের ভবিষ্যৎ ক্ষণেকের তরে,
'আনন্দ'বিহীন বিশ্ব অসম্ভব ছিল—
'বিবেকে'র প্রেরণায় জাগিছে মানুষ আজ
প্রতি ঘরে ঘরে।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত';
কে তুমি মহান্ প্রাণ শুনাইলে সে বাণী শাশ্বত,
জাগালে বিশ্বের লোকে—
প্রেমের বর্তিকালোকে?

জীবন্মৃত মানুষেরে মুক্ত করিবারে
কে বলিলে 'ওঠ, জাগ, জানো আপনারে'?
সকল জীবের মাঝে আত্মা বিরাজিত,
মানুষের সব কাজ আত্মশক্তি-কৃত!
নরেন্দ্র নরেন্দ্রনাথ সত্যতত্ত্বজ্ঞানী—
খুঁজিয়া দিলেন পথ মুক্তির সন্ধানী।

বিশ্বসভা মাঝে আজ ভারতের স্থান
সু-উচ্চে স্থাপিত হ'ল, বেড়ে গেল মান,
গুরুর আসন আজও জগতের কাছে,
স্বামীজীর হাতে গড়া—ভারতের আছে।
সবই আছে; নাই শুধু সে অদৃশ্য হাত—
অমানিশা দূর ক'রে নূতন প্রভাত
এনেছিল এই দেশে,
ভারত জাগিল অবশেষে।

কিন্তু, হারায়ে গিয়েছে তার পরম প্রেমিক—
কোমল বীরের প্রাণ তেজস্বী নির্ভীক।
স্বামীজী গেলেন চলি কোথা কোন্ লোকে,
ভারতেরে মগ্ন করি' ভাষাহারা শোকে?
ঐ নী আখরে ওই লেখা তাঁর নাম,
প্রতিটি হৃদয় তাঁর জ্যোতির্ময় ধাম!

কে ঘোচাবে জাতির ক্লীবতা ?

শ্রীমতী দিব্যপ্রভা ভরালী

আজো তব জন্মভূমি অজ্ঞানতা-পঙ্কে মগ্নপ্রায়
তোমারে ভুলিছে দেশবাসী ;
আজি এ দুর্যোগ দিনে ভারতের প্রাণের বেদনা
ঘুচাও আবার তুমি আসি।

ভুলিছে শাশ্বত সুর ভারতের হৃদয়-তন্ত্রীব
লক্ষ্যহারা মূক জনগণ,
অন্ধ-নীত অন্ধ সব—অন্ধকারে কে দেখাবে পথ,
কে বা দুঃখ করিবে মোচন ?

ধর্মের পরম সত্য—আদর্শ মহান্—প্রচারিবে
পুনঃ আজি এ ভারত-ধামে,
সুষুপ্ত মানব-প্রাণ জাগাইবে অমৃত আলোকে
সত্য-শিব-সুন্দরের নামে !

দূব করি দুর্বলতা অক্ষমতা ভীরুতা দীনতা
কে শোনাবে শক্তির বারতা ?
বেদান্তের বজ্রবাণী 'অভীঃ অভীঃ' উদ্‌ঘোষি আবার
কে ঘোচাবে জাতির ক্লীবতা ?

তোমার বিহনে আজি সারথিবিহীন যেন রথ,
নেতৃহীন তব দেশবাসী।
কাঁদে আজো জন্মভূমি, শোকশীর্ণা দেশ-মাতৃকার
মুছাও চোখের জল আসি !

আত্মভোলা স্বদেশবাসীরে তব জাগাও আবার
শক্তিমন্ত্র করগো প্রচার
জনসমাজের মাঝে, টুটায়ে সকল গ্লানি ভয়
নব তেজ করগো সঞ্চার

সমালোচনা

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ; প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আরিয়াদহ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৪ ; মূল্য দেড় টাকা।

স্বামী নির্বেদানন্দ-রচিত 'The Holy Mother (Sarada Devi)' শ্রীশ্রীমায়ের শত-বর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'The Great Women of India' নামক ইংরেজী গ্রন্থের শেষ অধ্যায়, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহা পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাংলা অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাঙালী পাঠকসমাজ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-গুলি বিভিন্ন দিক হইতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সহ নিপুণভাবে আলোচিত দেখিতে পাইবেন।

অনুবাদ সর্বত্র সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না।

মা সারদামণি—শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪২ ; মূল্য ৮৭ নয়া পয়সা।

নব-সাক্ষরদের জন্য সহজ সরল ভাষায় লেখা শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন-কথা। বইটিতে ১৭ খানি ছবি আছে। শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে যে মডেল প্রদর্শিত হইয়াছিল, এগুলি তাহারই আলোকচিত্র। নব-সাক্ষর বয়স্কদের পাঠের সুবিধার জন্য বইটি বড় টাইপে ছাপা হইয়াছে। সাধু ও চলিত ভাষা মাঝে মাঝে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ইহা ভবিষ্যতে সংশোধনীয়।

* * *

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা :—অনুবাদক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ; দীপায়ন প্রকাশন ভবন প্রকাশিত ; পৃষ্ঠা ৯৩ ; মূল্য—দুই টাকা।

ভাব-কল্পনার আকাশে মানস-বলাকাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিছক 'স্বপ্নের হাতে আত্ম-সমর্পণের আকুতি' কোনদিনই কোন সত্যকার কবির উপজীব্য হইতে পারে না। মরমবীণার মূর্চ্ছনাকে শব্দ ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করিয়া পাঠকের মানসপটে ক্ষণিক আন্দোলন তুলিয়া পাঠককে কিঞ্চিৎ রসবোধের ইঙ্গিত দেওয়া—হয়ত কোন কোন কবির কাব্যসন্ধানের নিরিখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও বোধ হয়, কাব্য-বিচারের চরম মূল্যায়ন নয়। কিন্তু যে কবি নিজের আন্তর জগতের সূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনার তরঙ্গকে শব্দঝঙ্কারে হিল্লোলিত করিয়া 'বিশ্বের ব্যথা বহন' করেন সেই কবিই কবি। তাঁহারা তাঁহাদের চেতনার নিগূঢ় সৌন্দর্যকে সর্বমানবের ধ্যান-সম্পদে রূপায়িত করিয়া মানবমনে আনন্দলোকের বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে পারেন,—আমাদের আলোচ্য ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্ এইরূপ এক সার্থক কবি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত অংশ জুড়িয়াই (১৮১৯-৯২) ইনি আমেরিকায় জীবিত ছিলেন। তাঁহার লেখা Leaves of Grass, Drum Taps, Specimen Days and Collect এবং Democratic Vistas তাঁহার জীবিত কালে অনেক পাঠকের নিকট অবোধ্য শব্দ-সম্পদের সমষ্টিমাত্র মনে হইলেও তৎকালেই দার্শ-নিক Emerson-এর প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। আধুনিক কাব্যরসিকরা তাঁহার কাব্যে রসসম্পদের অনেক মহামূল্য বস্তু আবিষ্কার করিতে পারিয়া-ছেন। সেই কারণেই হুইট্‌ম্যান্ যে একজন সর্বমানবের চিরন্তনের কবি—এই প্রতিশ্রুতি আজ সর্বজনবিদিত।

এই মহান কবির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বকীয়তায় বাংলা অনুবাদ করিয়া নিঃসংশয়ে বাংলা কাব্যভাণ্ডারে এক স্মরণযোগ্য সংযোজন করিয়াছেন। অনুবাদকের কবি-মনের সুরস্পন্দনে হুইটম্যানের কাব্যসুষমার মূল সুরটিও চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। ফলে এই অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া আমরা হুইটম্যানের কবিমানসের যথার্থ রূপটিকে আমাদের নিকট অবারিত দেখিতে পাই। উদাহরণ-স্বরূপ দুই-চারিটি উদ্ধৃতির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছি :

"এই যে ভাবনা এ শুধু আমার একার নয়,
নয় আমার নিজস্ব
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা ভেবেছে
এ হ'ল তাই।" (পৃঃ১)

"আজ যা কাদার ডেলা, তাই হবে
প্রেমিক আর প্রদীপ আমি জানি।" (পৃঃ২)

"অনন্ত পর্যটনের আমি পথিক—
বর্ষাতি, আর মজবুত জুতো আর কাঁধে একটি লাঠি
—এই আমার নিশানা।" (পৃঃ ৬)

"যা হওয়া উচিত ছিল
সমস্ত অতীত ঠিক তাই—এই আমার ঘোষণা।"
(পৃঃ ২২)

"শক্তি আর সাহস চিরজয়ী,
যা জীবনকে জয়ী করে তাই করে মরণকে।"
(পৃঃ ২৯)

"পাল তোলো,
সমুদ্র যেখানে গভীর
চলো সেই অতলতায়
বেহিসাবী বেপরোয়া হে হৃদয়,
তোমার সঙ্গে আমিও মাতি
আবিষ্কারের নেশায়।" (পৃঃ ৬৪)

"এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
* * *
অকম্পিত পদে তুমি এসো
যখন সময় হবে আমার।" (পৃঃ ৯৩)

এই সুন্দর অনুবাদগুলিকে আস্বাদন করিয়া আমাদের বাঙালী কাব্যপিপাসীদের হুইট্‌ম্যান্-তৃষ্ণা বর্ধিত হইলে তাঁহারা নিশ্চয় মূলের সন্ধানে ছুটিবেন। পুস্তকটিতে দুই চারিটি মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়িল। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে তাহার সংস্কার সাধিত হইবে। পুস্তকটির কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর; বোর্ডবাঁধাই প্রচ্ছদপটে হুইটম্যানের একটি ভাবমূলক রেখাচিত্র পুস্তকটির গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

—মহানন্দ

নবনীত (হিন্দী ডাইজেষ্ট)—শ্রীরতনলাল জোশী কর্তৃক নবনীত প্রকাশন লিমিটেড, ৩৪২ তারদেব, বোম্বাই-৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲।

হিন্দী প্রকাশনের ক্ষেত্র অভাবনীয় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহা হিন্দী-প্রেমিক ব্যক্তিগণের নিকট কেবলমাত্র আনন্দদায়ক নয়, সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য-প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

আলোচ্য 'নবনীত' ইংরেজী Reader's Digest-এর অনুকরণে পরিকল্পিত। মুখ্যতঃ সমসাময়িক হিন্দী লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজী, বাংলা, তামিল, উর্দু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা হইতেও প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। অবশ্য অহিন্দী প্রত্যেক রচনাই হিন্দীতে অনূদিত। রবীন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মুল্করাজ আনন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কে. এম. পানিক্কর, খাজা আহমদ আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখায় ইহা সমৃদ্ধ। অনুবাদগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। অসংখ্য রেখাচিত্রশোভিত সুমুদ্রিত 'নবনীতে'র দীপাবলী বিশেষাঙ্ককে অভিনন্দিত করি।

—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বার্ষিক সভা

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫০তম বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী পঠিত হয়।

১৯৫৮ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

আলোচ্য বৎসরে পূর্ব পাকিস্তান ব্যতীত মিশনের প্রায় সকল কেন্দ্রেই উন্নতি লক্ষিত হয়।

নূতন ভবন বা বিভাগ উদ্বোধন

কনখল সেবাশ্রমে এক্স-রে ও ফিজিওথেরাপি বিভাগ খোলা হইয়াছে (জানুআরি), আসানসোল আশ্রমে এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে বহুমুখী বিদ্যালয়-ভবনের উদ্বোধন (জানু), রহড়া আশ্রমে নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (জানু), জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (জুন), শিলং আশ্রমে বিদ্যার্থি-ভবন (ফেব্রু), কামারপুকুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়-ভবন (এপ্রিল), চণ্ডীগড় আশ্রম নূতন নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত (মে), রাঁচি আশ্রমে নূতন গ্রন্থাগার-ভবন (জুন), বেলঘরিয়ায় ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলের প্রধান ভবন (জুন), সারদাপীঠ বেলুড়—ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলে বৃহৎ ছাত্রাবাস (জুলাই), শিক্ষকশিক্ষণ কলেজ (জুলাই), গ্রন্থাগার (অক্টোবর), এলাহাবাদ আশ্রমে নূতন গ্রন্থাগার-ভবন (অক্টোবর), নরেন্দ্রপুরে কলেজের ছেলেদের জন্য দ্বিতল ছাত্রাবাস (ডিসেম্বর), মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয় এসেম্ব্লি হল (ডিসেম্বর), ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একটি নূতন বিদ্যালয়-ভবন (অক্টোবর)।

নূতন কেন্দ্র

ডিসেম্বরে দক্ষিণ ভারতের একটি উন্নতিশীল কেন্দ্র—'শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্' মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সদস্যসংখ্যা

১৯৫৮ খৃঃ মিশন ৭ জন সন্ন্যাসী সদস্য হারাইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম: স্বামী নির্বেদানন্দ। বর্ষশেষে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬২৬—তন্মধ্যে সাধু ৩০৬, ভক্ত ৩২০।

কেন্দ্রসংখ্যা

বেলুড়ের মূলকেন্দ্র ধরিয়া ডিসেম্বর মাসে মিশনের মোট কেন্দ্রসংখ্যা ছিল ৭৩; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; বাকী ৫৯টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৯, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২; দিল্লী, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া।*

কার্যবিভাগ

মিশনের কাজকর্ম মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ: (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৫৮ খৃঃ ভারতে কোন রিলিফের প্রয়োজন হয় নাই। সিংহলে ব্যাটিক্যালোয়া জেলায় দুইমাস বন্যার্তদের ও কলম্বো শহরে ১০দিন দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করা হয়। এজন্য মোট ব্যয় হয় ১২,০০০ টাকা।

(২) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—কাশী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুনের সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা-হাসপাতাল এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

* [মঠ কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

১৯৫৮ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৯টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে ২২,৫৫০ জন রোগী ছিল, এবং ৫১টি বহির্বিভাগীয় হাসপাতালে ২৩,৩৬,৯৪৪ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়।

(৩) **শিক্ষা :** মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ ও	১,৭৮০	
„ (আবাসিক)	বেলুড়		
বি. টি কলেজ,	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৪১	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	কোয়েম্বাতুর ও সরিষা (ছাত্রী)	১২৬	
জুনিয়র „ „	রহড়া ও সারগাছি	১০০	
শারীর শিক্ষা „	কোয়েম্বাতুর	৮৫	
গ্রামীণ „ „	„	১০৩	
সমাজশিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	১৫২	
কৃষিশিক্ষণ কেন্দ্র	„	১৬	
ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল	„ বেলুড় ও বেলঘরিয়া	১,১৪৫	
জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়		৪৯২	১২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রমসহ)	৫৬	৩,৪৬০	৪৪৪
চতুষ্পাঠী	২	৩১	
সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র	৫	২০৯	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১০	২,৭২৬	৮১৭
মাধ্যমিক „	২৭	৯,৫৩৮	৪,৩৫৯
সিনিয়র বেসিক „	৭	৫৮৪	৫৪২
জুনিয়র „ „	১৫	১,৮৭২	৫৭২
নিম্নশ্রেণীর „ „	৯৭	১৫,০৮১	৮,৪৬০

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৩৪,৬৭২ ছাত্র ও ১৫,২৮১ ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, মাদ্রাজ, বেলুড়, রহড়া, সরিষা, মেদিনীপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাসগুলি মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কার্যের নিদর্শন। এতদ্‌ব্যতীত কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে এবং রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা ছিল।

(৪) **সাহায্য :** বেলুড় মঠ হইতে প্রদত্ত সাহায্য :

সাহায্য :	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৯৩	২০১	৪
সাময়িক :	২৭২	৭৫	

এজন্য মোট ব্যয়িত হয় প্রায় ২২,১৬৩ টাকা। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয় তাহার পরিমাণ ৫,২১০ টাকা।

(৫) **কৃষ্টি ও ধর্ম :** পূর্বের মতো মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনাসভা, ক্লাস, প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বার্ষিক সভার অন্যান্য কার্য শেষ হইলে সভাপতি মহারাজ বলেন :

ঠাকুর এসেছিলেন বিশেষভাবে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্যে। কি দেখে দেশের লোক শিখবে? কে দেশকে গড়বে? আজ আমাদের 'মা' চাই। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, চাকরী করছে; কিন্তু দেশের শিক্ষা কোন্ দিকে যাচ্ছে? হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, মস্তিষ্কের চর্চা যথেষ্ট হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে মেয়েরা নিজেদের তৈরী করুক, দেশের ছেলেমেয়েদের তৈরী করুক। মেয়েরাই পারবে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি প্রতিরোধ করতে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ৬ই পৌষ, (২২. ১২. ৫৯) মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১০৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। উষাকালে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী : কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাটী (১নং উদ্বোধন লেন) ভক্তদের নিকট শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী নামে পরিচিত সেই বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভজন, আরাত্রিক প্রভৃতির মাধ্যমে মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়।

শত শত ভক্ত জগজ্জননীর শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রায় ৯০০ নরনারী বসিয়া এবং ৫০০ জন হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় এবং পরেও বহু ভক্তের সমাগম হয়।

ফরিদপুর : গত ২২শে ডিসেম্বর আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মবার্ষিকী উদ্যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি ভজন, দ্বিপ্রহরে বিশেষ পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ, বৈকালে মহিলাসভা, সন্ধ্যায় ভজন ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দ ভজন ও স্তোত্র পাঠ করে। আনুমানিক ২০০০ মহিলা প্রসাদ ধারণ করেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী : যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তগণকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্য-স্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্যাপিত হয়। ঐ দিন প্রাতে ভজন-সঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম ও কালী-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী বোধাত্মানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার পর ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সুন্দরানন্দ, ডক্টর কালিদাস নাগ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (হিন্দীতে) এবং সভাপতি স্বামী তেজসানন্দ। রাত্রে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে লীলা-কীর্তন করেন।

২রা জানুআরি সন্ধ্যায় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া স্বামী ওঁকারানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যা করেন, যথাস্থানে কথামৃতে উল্লিখিত সঙ্গীতগুলি গীত হয়। রাত্রে কালীকীর্তন হইয়াছিল। ৩রা জানুআরি পূর্বাহ্নে স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক গীতা ব্যাখ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যলীলা (সাধনা) অবলম্বনে পাঁচালি-সম্বলিত লীলা কীর্তন হয়। অপরাহ্নে ও রাত্রে হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই (নীলাচল-লীলা) কীর্তনাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগমে দিবসত্রয় কল্পতরু-লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটী আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

কাঁকুড়গাছি : যোগোদ্যানেও পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন এবং প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন ঃ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১৯শে পৌষ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিখানি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত ভবনকক্ষে সজ্জিত করা হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনী ও রচনা হইতে পাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও ভজনের পর প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

মেদিনীপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ২রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে যুগোপযোগী আদর্শ সুষ্ঠুভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ, মহিলা কলেজ, মেদিনীপুর কলেজে ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে চারিটি ভাষণ দেন। স্বামীজীর আদর্শে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে তিনি আহ্বান জানান এবং এই প্রাচীন দেশের শক্তির উৎস যে ধর্ম, তাহাকে বরণ করিয়া আদর্শ নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিবার পথের সন্ধান দেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে 'আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও মানবধর্মে'র তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজার বিরাট আড়ম্বরে এবং তীব্র কোলাহলে শান্তসমাহিত মনে অন্তরতমের সাধনা যেন বিঘ্নিত হয়, ধর্ম যেন আচারসর্বস্ব হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ অনুধ্যান দ্বারা এ যুগে সত্যধর্মের সন্ধান করিতে হইবে।

সেবাকার্য

মনসাদ্বীপ ঃ বাংলা দেশের অন্যান্য বহু স্থানের মতো সাগরদ্বীপও এবার অতিবৃষ্টির জন্য অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। এখানে বন্যা না হইলেও চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবং জানুআরির প্রথম সপ্তাহে বেলুড় হইতে প্রেরিত ৫০০ বস্ত্রাদি (ধুতি শাড়ী ও কম্বল) স্থানীয় মিশন কেন্দ্র কর্তৃক তিনটি ইউনিয়নে (ধবলাট, বেগুয়াখালি, মনসাদ্বীপ ২য়) প্রায় ৫০০ পরিবারের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহা ছাড়া UNICEF প্রেরিত ১২৫ প্যাকেট গুঁড়া দুধ চারটি ইউনিয়নে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

সমাজশিক্ষা দিবস

সরিষা ঃ গত ১লা ডিসেম্বর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্যসূচীর মাধ্যমে সরিষায় সমাজশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয় ঃ পতাকা তোলা, গ্রাম পরিষ্কার করা, সাক্ষর বয়স্কদের সই যোগাড় করা, জনশিক্ষা-প্রদর্শনী, মহিলাদের জন্য মিলনী সভা। উৎসবের পূর্বদিন সমবেতকণ্ঠে গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামে যাওয়া হয়, এবং শেষ দিন (২রা) অপরাহ্নেও জনশিক্ষা-প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

নরেন্দ্রপুর ঃ—গত ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রে সমাজশিক্ষা দিবস পরিপালিত হয়। মূল কেন্দ্রের পরিচালনায় বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মিগণ সমবেত হইয়া গান, আবৃত্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি দেখান। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় সমাজশিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন কয়েকজন সমাজকর্মী।

জাপানী কনসালের মিঃ কে সুচিরো জাপানের সমাজব্যবস্থার কথা বলেন। পরিশেষে

একাঙ্ক নাটিকা 'বারোয়ারী পূজা' সকলের মনোরঞ্জন করে। ১৯শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাজশিক্ষা কর্মসূচীতে 'গ্রামবাসীদের সহযোগিতার সমস্যা' বিষয়ক আলোচনা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্‌কো : প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব ভাষণগৃহে বেদান্ত ও ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়; স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

সেপ্টেম্বর : কর্ম, পুনর্জন্ম ও অনন্ত জীবন; ঈশ্বর আছেন, তার প্রমাণ; আন্তর যোগ; আমরা বাঁচি না, মরিও না। অদ্বৈতবাদ দর্শন ও ধর্ম।

অক্টোবর : কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং; (নূতন মন্দির উদ্বোধন); ভারাক্রান্ত যারা, সকলে এস; যে সাধুদের দেখেছি; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, প্রত্যক্ষ কর; শব্দ প্রতীক ও যোগাভ্যাস।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দক্ষিণেশ্বর : গত ৬ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীসারদামঠে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্তপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং বালিকাগণ কর্তৃক গীত মাতৃসঙ্গীত একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ৮টা হইতে ভক্ত-সমাগম আরম্ভ হয়। মঠপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত মাতৃসঙ্গীত দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করে, ইহার পর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সুন্দর ও সরল ভাবে আলোচনা করেন। প্রায় ২০০০ ভক্ত মহিলা এবং শিশুকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কালী-কীর্তন হইয়াছিল।

মাকড়দহ (হাওড়া) **:** গত ২৭শে ডিসেম্বর স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব নগর-কীর্তন, পূজা, প্রসাদবিতরণ, ভজন, কথামৃত-পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী সংশুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন স্বামী জীবানন্দ। প্রায় ২০০০ ভক্তের সমাগম হয়।

আঁটপুর (হুগলী) **:** ১৮৮৬ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর (পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক বাসভূমি) ঘোষবাটীর প্রাঙ্গণে প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে 'নরেন্দ্রনাথ' আটজন গুরুভ্রাতাসহ ঈশ্বরার্থে সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। সেইখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত আছে। প্রতিবৎসরের মতো এবৎসরও ২৪শে ডিসেম্বর ঐ পুণ্য-ঘটনার স্মৃতিতে ভক্তগণ সমবেত হন। বৈকালে জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ এই দিনের তাৎপর্য বিষয়ে বলেন। সন্ধ্যায় আগ্রহশীল ভক্তদের উপস্থিতিতে ধুনির সম্মুখে ঐ ঘটনার বিষয় পাঠ করা হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) নিকটেই পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে পূজা পাঠ আলোচনার মাধ্যমে জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কটক : কটকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৫৫তম কল্পতরু উৎসব বাঙ্গালীসাহি পল্লীস্থ রামকৃষ্ণ কুটীরে গত ১লা জানুআরি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বদিনে অভিষেক-কীর্তন হয়; উৎসবের দিন পূজা, পাঠ, কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। প্রায় ৩০০ লোকের এক সভায় স্বামী মহানন্দ ভাষণ দেন। পরের দিনও স্থানীয় আই, জি, পি-র বাসস্থানে বিশিষ্ট জনসমাবেশে আগ্রহশীল শ্রোতাদের প্রশ্নাদির যথাযথ উত্তর দান করিয়া বক্তা আনন্দ দান করেন।

বারাসত : শিবানন্দ-ধামে গত ১০ই পৌষ এবং ১৫ই পৌষ হইতে ১৮ই পৌষ পর্যন্ত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শুভ ১০৪তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, শিবমহিম্নঃস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, ভজন, শিবানন্দ-বাণী আলোচনা, ভাগবতপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কথকতা, ছাত্রদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, পাঁচালি-সম্বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় শিবানন্দ-জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী পুণ্যানন্দ এবং মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে স্থানীয় একটি দল 'জয়দেব' যাত্রাভিনয় করে।

আমেদাবাদ : গত ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অখণ্ডানন্দ হলে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে ভারতের উপ-অর্থসচিব শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসবে শ্রীমতী জয়াবেন ওঝা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মুখ্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপদেশাবলী সকলকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'সনাতন ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা' বিষয় অবলম্বনে হিন্দীতে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলেন: জঙ্গলে তপস্যা না করিয়া সংসারে সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাপন করিলে ভগবানের নিকট পৌছানো যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। মনে প্রাণে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যের জীবনকে সুখী করিবার জন্য সতত প্রযত্ন করা উচিত। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ইহাই সহজ সরল পথ বলিয়া তাঁহারা নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আলোক ও বর্ণ : ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি. ভি রামন্ আন্নামালাই নগরে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাডেমীর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। চক্ষু কেন ও কিভাবে বিভিন্ন রঙ দেখে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি যে নূতন তথ্য পাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই:

চক্ষুগোলকের পশ্চাতে রেটিনাতেই বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গ ধরিবার জন্য অন্ততঃ চার প্রকার উপাদান রহিয়াছে—(১) লুটিন—অপর নাম জ্যান্থোফিল (২) হেমোগ্লোবিন, (৩) অক্সি-হেমোগ্লোবিন, (৪) মিথাইমো-গ্লোবিন।

প্রথমটি ও তাহার কার্য পূর্ব হইতেই জানা ছিল। অন্য তিনটি রক্তের মধ্যেই আছে, এবং রেটিনায় প্রচুর রক্ত চলাচল হয়। রক্তের এই বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোকরশ্মি আত্মসাৎ (absorb) করিয়া বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করিয়া নার্ভ-সহায়ে মস্তিষ্কে লইয়া যায়। সেখানেই

বিভিন্ন বর্ণের অনুভব হয়। বিকীরণের 'কোয়ান্টাম থিওরি' প্রয়োগ করিয়া ডক্টর রামন্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কৃষ্টি-সংবাদ

সংস্কৃত নাটকঃ গত ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্যগণ কর্তৃক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সদ্যোরচিত সংস্কৃত নাটক 'মুক্তি-সারদম্' ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর প্রযোজনায় অভিনীত হইয়াছে। সর্বপ্রথম রজনীতেই 'মুক্তি-সারদম্' নাটকের অভিনয় বাঙ্গালোরে জনসাধারণকে বিশেষ মুগ্ধ করে। নাটকের রূপসজ্জায় সহায়তা করেন মাদ্রাজের প্রখ্যাত রূপসজ্জাকার হরিপদ চন্দ্র।

২৭শে ডিসেম্বর অখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালোরে 'শক্তি-সারদম্' এবং ৩০শে ডিসেম্বর পন্দিচেরীতে 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক নাটক অভিনীত হয়। উভয় নাট্যাভিনয়ই সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

মহাভারত-প্রদর্শনীঃ মাটির পুতুলে 'রামায়ণ-প্রদর্শনী'র পর অনেকেই 'মহাভারত-প্রদর্শনী'র জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাতীয় কৃষ্টি-সংঘের (National Cultural Association) উদ্যোগে শ্রীযুগল শ্রীমলের প্রচেষ্টায় এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর সহযোগে ইহা একটি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীরাজশেখর বসু-রচিত 'মহাভারতের সারানুবাদ' অবলম্বনে প্রথমে ১৩৭টি ঘটনা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরে ৩৫০০টি সুসজ্জিত মাটির পুতুলের সাহায্যে এই পুরাণ-কাহিনী জীবন্ত করা হইয়াছে। গৃহাদি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ যুগের ছাপ সুস্পষ্ট। মাসের পর মাস ধরিয়া ৪০ জন মৃৎশিল্পী এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, মৃতপ্রায় শিল্পটিও যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের নিকট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহাভারত-প্রদর্শনী দেখিয়া ইতিহাস ও পুরাণের সহিত জীবনের শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন। কয়েকটি স্থানে ঘটনার বিকৃতি চোখে পড়িল, উদ্যোক্তাদের মতে ঐরূপ ঘটনাও কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব-সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত :

তেজপুর (আসাম), খেপুত (মেদিনীপুর), পিপড়াডি বোলিয়ারি (হাজারিবাগ)।

ভ্রমসংশোধন

গত পৌষ সংখ্যায় ৬৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি'র লেখকের নাম 'ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন লাহিড়ী' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৭ই মাঘ, ২১শে জানুআরি, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

উদ্বোধন

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

৺পণ্ডিত আশুতোষ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

দীননাথঃ সদানন্দো ভ্রাজমানো স্বতেজসা।
কলিদোষ-সমাক্রান্ত-সমুদ্ধরণ-বাঞ্ছয়া ॥১

মহাশক্তিং সমাশ্রিত্য ত্বমাগতো নিজেচ্ছয়া।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং রামকৃষ্ণস্বরূপিণে ॥২

যো রামঃ স হি কৃষ্ণস্তু ত্বয্যভেদঃ প্রদৃশ্যতে।
লোকশিক্ষা-প্রদানার্থমাগতস্ত্বং মহীতলে ॥৩

করুণার্ণব ভো দেব! গৃহাণ প্রণতাঞ্জলিম্।
নাস্ত্যস্মাকং ধনং কিঞ্চিৎ তুভ্যং যদ্দীয়তে পুনঃ ॥৪

বিষ্ণবে রামকৃষ্ণায় রামকৃষ্ণায় বিষ্ণবে।
নমস্তুভ্যমভেদাত্মন্ পুনঃ পুনর্নমো নমঃ ॥৫

অহো তবায়ং মহিমা মহাত্মন্, সমগ্রলোকে সদয়া হি দৃষ্টিঃ।
রূপং তবেদং করুণার্দ্রচিত্তং রজস্তমোনাশকরং জনানাম্ ॥৬

ইচ্ছাস্মাকং তবচরণয়োঃ সন্নিপাতো মহাত্মন্,
সংসারাব্ধেস্তরণকরণং রামকৃষ্ণাখ্য দেব।
কিন্ত্বেতেষামতিগুরুতরং মানসং শত্রুপক্ষং
শীঘ্রং নো ভো শময় শময় প্রার্থনা নেষ্টমন্যৎ ॥৭

হে যোগিংস্ত্বং পরমপুরুষো দৃশ্যসে সুপ্রসন্নো
নিস্পন্দং তে নয়নযুগলং পশ্যতামাশু ভক্তিম্।
সংমূঢ়ানাং জনয়তি মুহুঃ কিং পুনঃ সাত্ত্বিকানাং
স ত্বং মুক্তো নয়নপথগো রামকৃষ্ণোঽদ্যমীষাম্ ॥৮

হে রামকৃষ্ণ! যুক্তাত্মন্! বামাঙ্গং প্রকৃতিস্তব।
সাপি যোগবিশুদ্ধাত্মা সারদানামধারিণী ॥৯

যুবয়োর্দৃষ্টিমাত্রেণ ভক্তিরব্যভিচারিণী
জায়তে প্রার্থনাস্মাকং সাধ্বী স্যান্মানসী গতিঃ ॥১০

মাতঃ! পূজ্যা জগতি সকলৈর্ভর্তৃপাদে বসন্তী
নিত্যধ্যানা পতিগতমনাঃ শান্তশুদ্ধস্বভাবা।
ধন্যাস্মিংস্ত্বং করণনিয়মাজ্ জ্ঞায়সে দেবতৈব
আদ্যা মাতা জনহিতকরী রামকৃষ্ণেণ সার্ধম্॥১১
রচিতমাশুতোষেণ শ্রীমতা ভক্তিসাধকম্।
সংখ্যৈকাদশমাত্রেণ শ্লোকস্তোত্রমিদং স্মৃতম্॥১২

বঙ্গানুবাদ

(হে রামকৃষ্ণ!) তুমি দীননাথ, সদানন্দময়, কলিযুগের বহুদোষ সমাক্রান্ত মানবগণের উদ্ধারেচ্ছায় স্বকীয় তেজে বিরাজমান।১

তুমি মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় আসিয়াছ, হে গুরুদেব! রামকৃষ্ণ-রূপধারী তোমাকে প্রণাম করি।২

যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ—এই রাম ও কৃষ্ণের অভেদ তোমাতেই দেখা যায়, তুমি লোকশিক্ষার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।৩

হে দয়ার সাগর দেব! এই প্রণতগণের অঞ্জলি গ্রহণ কর; আমাদের অন্য কোন ধন নাই যাহা তোমাকে দিতে পারি।৪

তুমি বিষ্ণুস্বরূপ রামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণু, অতএব হে অভিন্নস্বরূপ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি।৫

হে মহাত্মন্! আশ্চর্য তোমার মহিমা, সমগ্র জগতের প্রতি তুমি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। তোমার দয়ার্দ্র চিত্ত সকল লোকের রজোগুণ ও তমোগুণ নাশ করিতেছে।৬

হে মহাত্মন্! হে রামকৃষ্ণ! ইচ্ছা হয় তোমার চরণযুগলে পতিত হই; তোমার চরণে পতিত হওয়াই আমাদের সংসারসাগর পার হইবার হেতু। কিন্তু আমাদের চিত্তে কামক্রোধাদি গুরুতর শত্রুপক্ষ বাস করে, ইহাদিগকে শীঘ্র ধ্বংস কর, অন্য কিছু চাই না—এইমাত্র প্রার্থনা।৭

হে যোগারূঢ়! তোমাকে পরমপুরুষ ও আনন্দময় রূপে দেখি, আমরা মোহাচ্ছন্ন হইলেও তোমার নিশ্চল নেত্রদ্বয় দর্শনে আমাদের ভক্তিভাব জন্মাইতেছে! সাত্ত্বিকগণের আর কথা কি? মায়ামুক্ত তুমি, আমাদের নয়নগোচর হইতেছ।৮

হে যোগিন্ রামকৃষ্ণ! বামাঙ্গে তোমার প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিদেবীও সারদা-নামধারিণী হইয়া যোগ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তা হইয়াছেন।৯

তোমাদের উভয়ের দৃষ্টিমাত্রে ঐকান্তিকী ভক্তি হইতেছে। প্রার্থনা—আমাদের চিত্তের গতি সাধু হোক।১০

হে জননি! তুমি স্বামীর চরণসমীপে বাস করিয়া জগতে সকলের পূজনীয়া হইতেছ, তুমি সর্বদা ধ্যানযুক্তা, পতিগতপ্রাণা এবং নির্মল শান্তিযুক্তস্বভাবা, তুমি ইন্দ্রিয়সংযমহেতু এ জগতে ধন্যা হইয়া দেব রামকৃষ্ণের সহিত জনহিতকারিণী আদ্যাশক্তি দেবতারূপে পরিচিত হইতেছ।১১

শ্রীমান্ আশুতোষ কর্তৃক বিরচিত এই ভক্তি-উৎপাদক একাদশসংখ্যক শ্লোকাত্মক স্তোত্র সমাপ্ত হইল।১২

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বধর্ম, না বিশ্বজনীন ধর্ম ?

আজকাল মানুষের মনে নূতন করিয়া ধর্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসা জাগিতেছে। ধর্মবিষয়ক সভা সমিতির সংখ্যা বাড়িতেছে; সাময়িক সম্মেলনে, সাপ্তাহিক বৈঠকে বা দৈনিক প্রবচনে—কোথাও শ্রোতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। যতই আমরা এ যুগকে জড়বাদী ভোগবাদী বলিয়া গালি দিই না কেন, এ যুগের মানুষ প্রচলিত ধর্মগুলিকে যেরূপ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিতেছে, ধর্মের প্রকৃত রহস্য ও তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মন লইয়া জানিতে চাহিতেছে, এত ব্যাপকভাবে এরূপ কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজ-নৈতিক নেতারাও আজকাল স্বীকার করিতেছেন, ধর্মের ভিত্তিতেই স্থায়ী কল্যাণকর সমাজগঠন সম্ভব। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

মানুষের মতামতের 'পেণ্ডুলাম' যে আজ ধর্মের দিকে ঝুঁকিতেছে তাহার প্রধান কারণ—তাহার মনের অশান্তি, জীবনের অনিশ্চয়তা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে, আজ বিশ্বগতভাবে তাহাই ঘটিতেছে। যতদিন শরীরে শক্তি-সামর্থ্য থাকে ততদিন মানুষ পুরুষকারের উপর বিশ্বাসী থাকিয়া দৈব কোন শক্তিকে মানিতে চায় না, কিন্তু জীবন যতই অগ্রসর হয়, অনেক আপ্রাণ চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, শক্তি-সামর্থ্য পরাক্রমের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করিয়া যখন অস্তাচলের দিকে চলিতে থাকে, তখন মানুষ স্বীকার করে—পুরুষকার ভিন্ন আরও একটি শক্তি আছে, যাহার উপর তাহার কোনই হাত নাই, বরং সেই শক্তিই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। গত দুই মহাযুদ্ধের পর আণবিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ মানুষকে আজ এইরূপই এক দুর্বল অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। একই সঙ্গে দেখা দিয়াছে শিল্পযুগের অবশ্যম্ভাবী বিভীষিকা—শ্রেণীসংগ্রাম।

গ্রামীণ শান্ত সভ্যতা গিয়াছে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস টলিয়াছে। মানুষ আজ বিপন্ন, বিভ্রান্ত। ইওরোপের রেনেসাঁ-যুগ শিল্প ও বিজ্ঞানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়া যুক্তির রাজপথে তাহাকে ধর্ম-বিশ্বাস হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছিল, আজ তাহা এক আত্মঘাতী সভ্যতায় (যদি ইহাকে সভ্যতাই বলিতে হয়) পর্যবসিত!

আজ যেন মানুষের নিঃশ্বাস রুদ্ধ; যাহারা পরিত্রাতায় বিশ্বাসী, তাহারা একজন পরিত্রাতার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে। যাহারা অবতারে বিশ্বাসী তাহারা মনে করিতেছে, এইবার বোধ হয় পরবর্তী অবতারের আবির্ভাবকাল সমাগত! যদি এখন না হয়—তবে আর কবে সেই মঙ্গলময় শক্তি আবির্ভূত হইয়া মানবের দুঃখ কষ্ট দূর করিবেন?

*　　*　　*

ধর্ম-জগতের আলোড়ন তিনটি স্তরে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দেখা দেন সংস্কারকগণ, তাঁহারা পুরাতন ঐতিহ্যকেই বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী করিয়া চান এক বিরাট পরিবর্তন, চান এক নূতন নিয়ম; কিন্তু প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দেখা দেন আর একদল মানুষ, যাঁহারা পুরাতনকে ভাল-বাসেন; ম্রিয়মাণ পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁহাদের জীবন-ব্রত, তাঁহারা বহিরাগত নূতন সব কিছু বর্জন করিয়া পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই ভাসিতে বা ডুবিতে চান।

প্রকৃত বিবর্তন আসে তৃতীয় আর এক প্রকার বিপ্লবী মানবের মাধ্যমে, তাঁহারাই যুগের

চাকা ঘুরাইয়া দেন। অনুভূতির শক্ত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া অতীত-বর্তমান নূতন-পুরাতন সব কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান! তাঁহাদেরই জীবনালোকে যুগযুগান্তরের অন্ধতমিস্রা কাটিয়া যায়, তাঁহাদেরই চিন্তাধারায় ও ভাবের প্লাবনে জনমানসে যে পলি পড়ে, তাহারই উপর পরবর্তী যুগের সমৃদ্ধ ফসল ফলিয়া উঠে!

এইরূপ একটি যুগান্তকারী ঘটনা—ঘটিবে নয়, ঘটিয়া গিয়াছে! ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হইতেছে, কালের যবনিকা যতই উঠিতেছে—ততই দেখা যাইতেছে ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে বর্তমান মানব-মনের প্রশ্নের উত্তরগুলি যেন সাজানো রহিয়াছে! এ যুগের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান কে যেন পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছে! আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলিতেছি। তিনিই তাঁহার জীবনে সকল ধর্মের সত্যতা অনুভব করিয়া উদারতম ধর্মবোধের এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

নব যুগের প্রবর্তন করিতে হইলেই যে একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহা নয়; বর্তমানে তাহার কোন প্রয়োজনই নাই। বরং বহু বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে বিভ্রান্ত মানব আজ জানিতে চায়—ধর্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায়? এতগুলি ধর্ম কেন? সব ধর্মই কি সত্য? বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম কোন্‌টি?

তাত্ত্বিক আলোচনায় (theoretical disscussion) নয়—অনুভূতির স্পর্শেই মানুষ সংশয়শূন্য হয়, তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলিয়া যায়, তাহার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি কাটিয়া যায়, তাহার জীবনে দেখা দেয় স্থায়ী পরিবর্তন। প্রচারকদের বিবিধ যন্ত্রে অবশ্যই ঘোষিত হইতেছেঃ আমার শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই প্রকৃত ধর্ম, আমার ধর্মই ঈশ্বরাভিপ্রেত, আমার ধর্মই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ। আমার ধর্মই এ যুগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ধর্ম, আমার ধর্মই বিশ্বধর্ম! এই ধর্মেই বিশ্বশান্তি!

অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মিলিল—কিন্তু একটির তো মিলিল না, সেই একটির অভাবই মেঘের মতো সারা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সব কিছু কালো করিয়া দেয়। 'এতগুলি ধর্মমত কেন?'—এ প্রশ্নের উত্তর কই?

ধর্মমাত্রই যদি ঈশ্বরানুপ্রেরিত হয় এবং ঈশ্বর যদি এক হন, তবে ধর্মে ধর্মে এত বিভিন্নতা কেন, বিরোধ কেন?

দেখা যাইতেছে আজিকার যুক্তিবাদী মানব পুরাণ-কল্পিত বা কোন ব্যক্তি-নামাঙ্কিত ধর্মে নির্ভর করিতে পারিতেছে না, গালভরা-নামের 'বিশ্বধর্মে'ও (World religion) সে সন্তুষ্ট নয়। সে চায় বিরোধের সমন্বয়, সে চায় এক বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal religion)।

তথাকথিত বিশ্বধর্ম বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বজনীন ধর্ম বিশ্বপ্লাবী। বিশ্বধর্ম যতই বিরাট হউক, উহা বিরোধের বীজ বপন করে; বিশ্বজনীন ধর্ম বিরোধের অবসান—প্রকৃত শান্তির আশ্রয়! বিশ্বধর্ম বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, দাম্ভিক সম্রাটের মতো উহা অন্যান্য ধর্মকে দুর্বল ও হীন মনে করিয়া, এমন কি অধর্ম মনে করিয়া তাহাদের নির্মূল করিতে চায়। 'বিশ্বধর্ম' যুযুৎসু জিগীষু, প্রচারশীল প্রতিযোগিতাপরায়ণ, কখনও বা জিঘাংসাপরায়ণ। বিশ্বজনীন ধর্ম হিমালয়ের মতো স্বমহিমায় বিরাজমান, সকল ধর্ম শত শত তুষারশৃঙ্গের মতো তাহারই মহিমা প্রকাশিত করে, প্রতিফলিত করে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম প্রচারের উপর নির্ভর করে না, ইহা চিরদিন ছিল, আছে ও থাকিবে; তবে ইহা বোধের অপেক্ষা রাখে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম বুঝিতে পারিলেই ধর্মবিরোধ তিরোহিত হয়; ইহাই চিরন্তন মানব ধর্ম—সর্বধর্মের উৎস-মুখ, ইহাই সনাতন ধর্ম—সর্বধর্মের মিলনভূমি।

* * *

বর্তমান গণতান্ত্রিক মানব-মন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন বিশ্বধর্মগুলিতে সন্তুষ্ট নয়। উহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই, ঐগুলি কোন কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্রের বা শিলীভূত (fossilised) নিয়মতন্ত্রের নির্দেশে চালিত (regimented religion)। অপরপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিটি মানবের নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনা অনুযায়ী আন্তর বিকাশের ধর্ম।

বিশ্বজনীন ধর্ম শুধু সংগঠিত (organised) এবং দিব্যভাবে প্রকাশিত (revealed religions) কয়েকটি ধর্মকে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নয়; এ যুগের বিশ্বজনীন ধর্মের প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন, আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যে দিন দেখিব প্রত্যেকটি মানুষের ধর্ম পৃথক পৃথক! ইহারই নাম ধর্ম-স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতাই বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন। ধর্ম-ব্যাপারে ভারতে এই স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই এখানে মানুষ আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উঠিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। ধর্ম এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে নাই, এবং ধর্মচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র এখানে কখনও আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

এই বিশ্বজনীন ধর্ম বুঝিতে হইলে সর্ব প্রথম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে। ঈশ্বর যখন সকল ধর্মের স্রষ্টা, তখন বুঝিতে হইবে—দেশকালের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন ধর্মপথ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার কোনটিই ভুল নহে, তবে সকলগুলিরই মূল্য আপেক্ষিক। যখন যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, তখন সেখানে সেভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন সকলের পক্ষেই মঙ্গলময়, তখন সকল ধর্মেই তিনি তাঁহার শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রিয় একটি ধর্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধি সম্ভব এবং উহা সাধন- ও নিষ্ঠা-সাপেক্ষ।

আজিকার এই সঙ্কটের দিনে এই প্রকার উদার ভাব একান্ত প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এই প্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাবই মানুষকে মানুষের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করিতে পারে, বিশ্বজনীন ধর্মভাবই বিশ্বমানবের ঐক্য স্থাপন করিতে পারে, আজ মানুষ সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন। সর্বমানবের ঐক্যবোধ ব্যতীত অন্য কিছুই আজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

একটি মানুষকে অন্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়াছে—প্রথম তাহার শরীরবোধ এবং শরীর-কেন্দ্রিক ছোট বড় স্বার্থ! তারপর ভাষা, জাতি, ধর্ম—সব একে একে আসিয়া প্রাচীর তুলিয়া একদল মানুষকে আর একদল হইতে হইতে পৃথক করিয়াছে। কিন্তু চীনের প্রাচীরের যুগ কাটিয়া গিয়াছে; হিমালয়ের প্রাচীরও আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেক্ষেত্রে এ সকল কৃত্রিম ও অকৃত্রিম প্রাচীর অস্বীকার করিয়া আজ আমাদের দাঁড়াইতে হইবে বিশ্বের প্রাঙ্গণে শুধু মানবত্বের পরিচয় লইয়া। মানুষ শুধু দেহটুকুই নয়, দেহ-মন-আত্মা-সমন্বিত পরিপূর্ণ মানুষ। নিজের প্রকৃত পরিচয় যখন আমরা পাইব, তখন কি আর আমরা পশুর মতো দন্ত প্রকাশ করিয়াই পরস্পরকে অভিবাদন করিব? না নিম্ন স্তরের কামনা-সর্বস্ব মানুষের মতো পরস্পরকে ঈর্ষাদ্বেষ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিব? আত্মার উদারভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষই প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের অধিকারী হইয়া সর্বপ্রকার ভয়শূন্য শান্তিপূর্ণ সমাজ রচনা করিতে পারে—যেখানে সকল মানুষের শুধু দেহগত অভাবই দূরীভূত হইবে না, মনের অভাবেরও পূরণ হইবে, নৈতিক বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ প্রতিটি মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করিবে। বিশ্বজনীন ধর্মবোধ তাহারই প্রস্তুতি।

চলার পথে

'যাত্রী'

এ পৃথিবীতে মানুষের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিষ মানুষ নিজেই। তাই সে তার সমগ্র জীবন ধরেই আশ্চর্য বস্তুর প্রাণসত্তাকে ধরবার সাধনায় থাকে ব্যাপ্ত। কত তুলনা, কত দর্শন, কত অনুভব, কত স্বপ্ন, কত আদর্শ—আজীবন তাকে এই মহা আবিষ্কারের ধ্যানে তন্ময় রাখে। তাই সে ছোটে, কথা কয়, কথা শোনে, মিতালি পাতায়; অন্যের কাছে নিজের মূল্যায়ন করতে চায়; সাধন করে, সংসার পাতায়—এমনি কত কি! এক কথায় মানুষ তার এই জীবনটাকে দিয়েই তার জীব-শরীরের আনন্দ-কেন্দ্রের অন্বেষণ চালায়। তার কাছে জীবনটার তাই অনেক দাম; তবুও জীবন একদিন তাকে ফাঁকি দিয়েই সরে পড়ে!

পদ্মপাতায় জলের ফোঁটার মতোই এ জীবনের স্থিতি; ছুঁচের মাথায় সরষের অবস্থিতির মতোই তা আবার অস্থির। অথচ এই চির-যাযাবর জীবনটাকে সুস্থির ক'রে দাঁড় করাবার জন্যই মানুষের শতেক চেষ্টা ও সহস্র আকুতি সমস্ত জীবন ধরেই—ব্যর্থতার অট্টহাস্যে উতরোল হ'য়ে ফেটে পড়ছে। যা খোঁজার জন্য সে একদিন জীবন আরম্ভ করেছিল, সে খোঁজা শেষ না করেই সে চলে যায় জীবনান্তরে।

তা ব'লে জীবনটা কি শুধু ফাঁকি দিয়েই তৈরী?—এইটেই কি ভাবতে হবে? মনের সাগরের এই ব্যর্থ ঢেউ গোনা কি কোনদিনও শেষ হবে না? তা কে বলেছে? জীবনে সত্যকার রূপ বুঝতে হ'লে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে গেলে যেটি থাকে, সেটি বুঝতে হবে। সেইটি উপলব্ধি করতে পারলেই—সৃষ্টি পূর্বের সেই 'সৎ'কে—অর্থাৎ যা জন্মায়নি, যা মরে না, যা আছে—এবং যা আছে বলেই সকলে আছি—তাকে বুঝতে পারবো। এবং এই বুঝতে পারাটাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—পরাবিদ্যা। 'সৎ'কে জানাই পরাবিদ্যা। সেই সৎ-ই চিৎ, সত্যই চৈতন্যময়, জ্ঞানময়।

কথাটায় হেঁয়ালি এসে গেল। কিন্তু ভাষার সাহায্যে যাকে বোঝানো যায় না, যা অনুভবে অনুভব করতে হয়, যা কথা-হারানোর নীরবতায় নিশ্চল থাকে, যা বিচারের ব্যাখ্যায় বিচিত্র হয় মাত্র—তাকে অন্য কি ভাবে আর বোঝাতে পারবো? তবু বলি: সেই 'সৎ' জিনিষটি আছে, এইটেই সত্য—আর সব কিছু অসত্য। তা ব'লে তা এখানে আছে বা ওখানে আছে, তাও নয়; সে দূরে আছে বা কাছে আছে, তাও নয়। জীবনের এপারে বা ওপারে সে রয়েছে, তাও বলতে পারি না, তবে তা যে সকল ভয়-শূন্যতার মাঝে অশৃঙ্খলিত অবস্থায় মুক্ত হ'য়ে অবস্থান করছে—এইটেই আমাদের পুরোগামিগণ—যাঁরা সেই 'সৎ'কে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন—বলে গেছেন।

ঐ 'সৎ' বা অনন্ত সত্তাকে বুঝতে হ'লে আমাদের বাহ্য জাগ্রৎ জীবন-বোধকে যে মেরে ফেলে তাকেই আবার স্বপনের সুরে কাছে ডাকতে হবে, তা নয়। তবে আমাদের চোখের দৃষ্টিকোণটাকে দিতে হবে বদলে। উদাহরণ দিয়ে বলি: জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে জলের চাঁদকে ধরবার জন্য নীচে তাকালে কোনদিনই চাঁদে পৌছব না, তাই উর্ধ্বে তাকিয়ে চাঁদের যথার্থ অবস্থানকে করতে হবে আবিষ্কার। সেই ঠিক ঠিক দেখার দৃষ্টি পরিবর্তন করলেই আমাদের চোখ যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। অন্যথায় ঐ ছায়া-চাঁদের পেছনে ছুটে বেড়ালে তো চিরকালই তা অধরা থেকে যাবে।

কিন্তু এই সত্যকারের ধরাটাও কি সম্ভব ? এই সীমার মাঝে অসীমকে ধরা ? উত্তরে বলব : হ্যাঁ, সম্ভব, আর এইটুকু বোঝাবার জন্যইতো অবতারদের জীবন ও বাণী আমাদের সুমুখে তুলে ধরা রয়েছে। আমরা আমাদের জৈব-সমস্যার নানান জটিলতার পাঁচিল তুলে তাঁদের সেই উপলব্ধ বস্তুর আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। কেউ বা ঐ পাঁচিলের ওপর থেকে একটু আধটু উঁকি মেরে দেখছি ; কিন্তু ঐ পাঁচিল ভেঙে ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে, লক্ষের দু'একজন মাত্র, নিজেকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে টেনে এনে, সেই সত্যের অপূর্ব দর্শন-সাগরে নিজের জীব-জীবনের দৃষ্টি-গঙ্গার সাগর-সঙ্গম রচনা করেন। ফলে তাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে দৃষ্ট সৃষ্টির সেই আদিম ধ্বংসাত্মক পরিবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক সংবেদনার সাহায্যে সেই 'সৎ'-এর সানন্দ অনুভব করেন।

এই 'সৎ'-এর প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার জন্য আমাদের জগৎ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বাহিরের কোন কিছুর ওপর নির্ভর করতে হবে, তা নয়। আমাদের অন্তর থেকেই সেই শক্তি আসবে। শুধু আসবে নয়—তাই-ই আসে। উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনবেদ অনুসরণ করেই তা আমরা বুঝে নিতে পারি।

এই আন্তর শক্তিকে জাগাতে হ'লে নিজের মনকে নিজেরই বিবেক দিয়ে জয় করতে হবে। মনের নিম্নাভিমুখী সকল প্রবৃত্তিকে করতে হবে ঊর্ধ্বাভিমুখী এবং এর জন্য সবচেয়ে যা বেশী সাহায্য করবে তা হচ্ছে একটি জীবন্ত আদর্শানুসরণ। এই আদর্শানুসরণের জন্য চাই সেই আদর্শের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি। তাহলে, সেই দৃষ্টির সুমুখেই ফুটে উঠবে সেই দিব্য-দৃষ্টি, যার সাহায্যে আমরা ঈশ্বর-লীলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি। তখনই জানা হ'য়ে যাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিশ্বজগৎকে—আর শেষ পর্যন্ত নিজেকেও, যা জানা হ'য়ে গেলে আর অন্য কিছু জানা বাকী থাকে না।

ঐ সর্বপ্রাপ্তির ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের মধ্যেই ভাস্বর হ'য়ে রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। এর জন্য, এ পথের প্রধান বাধা 'ভয়'কে সর্বাগ্রেই দূর করতে হবে। ভয় দূর করা তখনই সম্ভব, যখন 'আমরা দুর্বল'—এই মহা পাপবোধ আমাদের মন থেকে চিরতরে হবে উন্মূলিত। তখনই আমরা স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারবো আমাদের মধ্যকার ঐশ্বরিক সত্তার সার্বভৌম স্বাধীনতার খোলা আকাশে। অথচ আশ্চর্য, এই 'স্বাধীনতা'কেই আমরা আমাদের প্রবৃত্তির শিকলে বেঁধে রেখে নিজেদের অগ্রগতি নিজেরাই স্তব্ধ ক'রে রেখেছি—নোঙর ফেলে দাঁড় টানার মতো। এই বন্দী জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের নিজেদের শক্তিই একমাত্র কার্যকরী। যেমন করেই হোক এই বন্দী জীবনের অবসান ঘটালেই আমরা বুঝতে পারবো—আমরা চিরস্বাধীন—স্বপ্নের কেমন এক অলীক কল্পনার মোহে নিজেকে এতদিন বন্দী ও শক্তিহীন ব'লে মনে করেছিলাম মাত্র। মনের সেই অবাধ স্বাধীনতার দিবালোকে সকল কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সকল কিছুই তার যথার্থ স্বরূপ নিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। ফলে, সেখানে কোন মরীচিকা থাকে না, থাকে না কোন কুহেলিকা, কোন স্বপ্ন বা মোহ ; বরং দ্রষ্টার আন্তর সৌন্দর্যের আলোকে তখন সে নিজেই যে কেবল নিজের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাই নয়, অন্য সকলেও তার প্রতি ঐ আত্মিক আলোর প্রেম সৌন্দর্যে, আকৃষ্ট হয়। এমন কি ঐ অনির্বাণ আগুনে পতঙ্গের মতো সকলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়,—ঝাঁপিয়ে পড়েও ; তবে তাতে তাদের পাখা পোড়ে না, প্রাণ যায় না, বরং এক মৃত্যুহীন জীবনের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করার শক্তি হয়।

পথিক, এখনো নীরব কেন ? অপরূপ রূপ-রাগে তোমার সুমুখেই তো সেই সত্যের রবি রয়েছে জেগে—শুধু সুমুখে নয়, তোমার ভেতরেও! আকাশ-বাতাস, আর তোমার ঐ শ্যামল বনানীর দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ, সেই রাঙা সত্যের অরুণ-রাগেই তো তাদের

প্রাণের সাধনদীপ্তি রাঙিয়ে গেছে। দেখ, একবার দেখ ; তাহলেই বুঝতে পারবে, কেমন ক'রে সেই পরশমণির স্পর্শ লেগে তোমার মরচে-পড়া মন-লোহা চেতনার স্বর্ণ-খণ্ডে রূপায়িত হবে। তখনই বুঝবে সেই কৃষ্ণের মহাকর্ষণ। তাই বলি, ওগো পথিক, মাঝ-পথেই থেমে গিয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কুচিত কোরোনা। মনে রেখো, সনাতন ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তুমি—নিখিলের অন্তর্লীন আনন্দ-ঝঙ্কার জেগে রয়েছে তোমারই কণ্ঠে। তুমি সে-সব ভুলে নিজেকে আর কত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে বলো? ওঠ, জাগ, মহাসাধনা খুলে দিক তোমার নিয়তির দ্বার—প্রবেশ করো সেই আলোর রাজত্বে—অমৃতময় হয়ে যাক্ তোমার জীবন। চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

তোমার আসার বারতা এল গো!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী কাব্যশ্রী

বসন্ত-বায় দোলা দিয়ে যায়,
শিহরণ জাগে মনে,
তোমার আসার বারতা এল গো,
কুসুমিত বনে বনে!
গায় আগমনী পিক কুহু-বোলে,
ব্যথিত হৃদয় ব্যথা আজ ভোলে,
দীর্ঘ দিনের বিরহ ঘুচিছে
সেই সুর আলাপনে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
শিহরণ জাগে মনে!
কচি কিশলয়ে কি যেন আভাস
সহসা উঠিছে ফুটে,
সবুজ বনের ছায়া-বীথি ছেয়ে
বকুল পড়িছে লুটে!
অশোকের রাঙা ঠোঁটে ঝরে হাসি,
রঙের নেশায় পলাশ উদাসী,
কৃষ্ণচূড়ার রূপের বাহার
নব রূপে ভ'রি উঠে!
বিশ্ব-হৃদয় রূপময় হ'য়ে
স্বরূপ তোমার ফুটে!
নদী আজ গায় কুল্ কুল্ স্বরে,
দিকে দিকে বাঁশী বাজে!
তোমার চরণ-ছন্দ যেন গো,
শুনি আমি তারি মাঝে!

সীমাহীন নভে তোমার নয়ন,
করুণার দিঠি করে বিকিরণ,
তোমার মুখের স্বর্গীয় শোভা
দিগ্ দিগন্তে রাজে।
তোমার আসার বারতা ল'য়ে গো
দিকে দিকে বাঁশী বাজে!

পরশন তব অঙ্গে লাগিছে
ভোরের অরুণ-করে,
চাঁদের অমিয়-জ্যোছনা ধারায়
স্মিত হাসি তব ঝরে!
জড়ের মাঝারে জেগে উঠে প্রাণ,
দিকে দিকে বহে পুলক-উজান,
শীর্ণা ধরার বুক ভ'রি আজ
অনুরাগ সঞ্চরে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
অন্তরে অন্তরে!

এল মধু তিথি মধুর লগ্নে
মধু-ঝরা মধুমাসে,
আকাশে বহিছে মধুর প্রবাহ
বাতাসের শ্বাসে শ্বাসে!
বিশ্ব-দৃশ্য আজি মধু-মাখা,
মধু দিয়ে যেন চরাচর ঢাকা,
জাগিয়া উঠেছ তুমি চির-রাকা
মধুভরা চিদাকাশে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
ভুবনের চারিপাশে

শ্রীরামকৃষ্ণ-'দর্শন'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মহাদেববাবু বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার দার্শনিক সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বহু বৎসর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাদি পড়িতেছেন, আলোচনা করিতেছেন, ভাল লাগে, আনন্দ পান, ধর্মজীবনে একটি বিশ্বাস, সাহস, উৎসাহ বোধ করেন। ইহার বেশী কখনও তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেদিন বন্ধু শিবদাসবাবু—দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মনে একটি খটকা লাগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ উপর-উপর পড়িলে কিছুই বোঝা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দার্শনিক মতবাদ জানা প্রয়োজন, তবেই তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

শিবদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো মহাদেববাবু, শ্রীরামকৃষ্ণ কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন?

—তা তো বলতেই হবে, অদ্বৈতবাদী শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে তিনি যখন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

শিবদাসবাবু বলিলেন, সে হ'তে পারে—এক সময়ে তিনি ঐ সাধনা করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি তো বরাবর কালীমন্দিরে যেতেন, প্রণাম করতেন, পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, কালীমূর্তিকে চামর করতেন। আবার কীর্তন শুনে তাঁর ভাব হ'ত, সমাধি হ'ত। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এ সকল আচরণের সামঞ্জস্য কোথায়?

মহাদেববাবু বলিলেন, কেন স্বয়ং শঙ্করাচার্যও তো দেবদর্শন দেবপূজা করেছেন, দেবদেবীর স্তবস্তুতি লিখে গেছেন। অথচ তাঁকে তো অদ্বৈতবাদের একরকম প্রতিষ্ঠাতাই বলা চলে। অদ্বৈতবাদ মানলেও বোধ করি দেবদেবীর ভক্তি আটকায় না।

শিবদাসবাবু—শঙ্করাচার্য দেবদেবীর স্তবস্তুতি লিখেছেন সত্য কথা, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর যে রকম (তাঁর পরমহংসত্ব লাভ করবার পরেও) একটা জমাটী ভক্তিভাব দেখা যায়, তাঁর ভিতর সে রকমটি ছিল কি? এ যেন শিষ্যসামন্তদের জন্যে বা মন্দাধিকারী গৃহস্থদের জন্যে দায়ে পড়ে ভক্তিবাদ খ্যাপন। শঙ্করের সমগ্র গ্রন্থাবলী পড়ে দেখুন—তাঁর মূল সুরটিই হ'ল, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আর জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই। বার বার তিনি পারমার্থিক সত্যের কথা বলছেন। সেই সত্যের তুলনায় এই জীব-জগৎ তো বটেই, দেবদেবীও মিথ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা কালীকে কখনো মিথ্যা বলতে পারতেন কি?

মহাদেববাবু—কেন? অদ্বৈত সাধনার আগে তিনি তো কল্পনায় জ্ঞানরূপ অসি দিয়ে মা কালীর মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, আর যেই ঐরূপ করা অমনি তাঁর মন হু হু ক'রে নামরূপের রাজ্য ছেড়ে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়েছিল।

শিবদাসবাবু—সে হ'ল সাধন-অবস্থার কথা। কিন্তু আমি বলছি পরবর্তী কালের পরমহংসদেবের কথা। যখন তিনি সাধনা শেষ ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, লোকশিক্ষক হয়েছেন, যখন তাঁর ফিলসফি দানা বেঁধেছে, তখনকার কথা। সেই অবস্থায় তিনি কি মা কালীকে, রাধাকৃষ্ণকে উড়িয়ে দিতে পারতেন?—মায়িক বলতে

পারতেন? নিত্য মন্দিরে যাওয়া চাই, প্রসাদ খাওয়া চাই, ভগবানের কত রকম নাম করা চাই। অদ্বৈতবাদী কি এ সব করবে? শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? রামকৃষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করতেন, তখন তিনি তো ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 'রোটি ঠোকতে কেঁও?'

মহাদেববাবু—তা, তোতাপুরীর মতো গোঁড়া অদ্বৈতবাদী দেবদেবীকে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, আমার ধারণা।

শিবদাসবাবু—হাঁ আপনার ধারণা হ'তে পারে। কিন্তু এটা হ'ল layman's (অনভিজ্ঞ ব্যক্তির) ধারণা। এর দাম বেশী নয়। আপনার ধারণা প্রমাণসহ নয়। শঙ্করের দেবভক্তি তাঁর ফিলসফিতে পাত্তা পায় না। ওটা শঙ্করের লেখায় ও চরিত্রে একটা ফালতু জিনিস, এমনকি অবান্তর জিনিসও বলা চলে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কালীভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি এ রকম ফালতু জিনিস নয়। কালীভক্তির background (পটভূমিকা) ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবাই যায় না। শঙ্করাচার্য যত স্তবস্তোত্র লিখেছেন তার সবগুলিকে বাদ দিলেও শঙ্করের জীবন ও বাণী অটুট থাকে।

মহাদেববাবু একটু দমিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হ'লে শিবদাসবাবু, আপনি কি বলতে চান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন না?

শিবদাসবাবু—হাঁ ঠিক। আমি বলবো তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না।

মহাদেববাবু—তবে কি বলতে চান তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন?

শিবদাসবাবু—না, তাও বলতে চাইনে।

—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী?

—না।

—দ্বৈতাদ্বৈত?—অচিন্ত্যভেদাভেদ?

—না।

মহাদেববাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে আপনি কি বলতে চান?

শিবদাসবাবু বিজ্ঞজনোচিত উদার হাসি হাসিয়া মহাদেববাবুর দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, বসুন, স্থির হ'য়ে বসুন। আমার গবেষণা, পর্যালোচনা, নিভৃত অনুধ্যানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যা বুঝেছি তা আপনাকে আজ বলবো। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তাঁর উপদেশের মর্ম বুঝতে পারবেন না।

শিবদাসবাবু বলিয়া চলিলেন। প্রতীচ্যের প্রাচীন গ্রীস হইতে বর্তমান ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু ইজ্‌ম্‌এর কথা তুলিলেন, প্রাচ্যে মহেন্দ্রজারো, প্রাচীন পারস্য, মিশরের দেবদেবী ধর্মতত্ত্ব হইতে শুরু করিয়া কর্তাভজা, বাউল, সাঁই পর্যন্ত কিছু বাদ দিলেন না। মহাদেববাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার অস্বস্তিভাব দেখিয়া শিবদাসবাবু বলিলেন, আর একটু ধৈর্য ধরুন মহাদেববাবু। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা খাড়া ক'রে নিই—তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের সিন্‌থেসিস্‌-এ আসবো। কিন্তু মহাদেববাবুর পক্ষে সেদিন আর অপেক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন, ঘুম পাইতেছিল, মনটাও ভীষণ খিঁচড়াইয়া গিয়াছিল।

পুনরায় কয়েকদিন পরে উভয়ের দেখা। শিবদাসবাবু বলিলেন, আসুন সেদিনকার আলোচনাটা আবার শুরু করা যাক। মহাদেববাবু বলিলেন, আমার মাথায় ঢোকে না আপনার ফিলসফি। শিবদাসবাবু বলিলেন, উপায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের ফিলসফি না বুঝলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পড়া বৃথা, তাঁর উপদেশ পালন সুকঠিন।

মহাদেববাবু আর কি করিবেন? সুবোধ বালকের মতো বসিয়া রহিলেন। শিবদাসবাবু বলিয়া চলিলেন। মহাদেববাবু যখন রাত এগারোটায় ছুটি পাইলেন, তখন তাঁহার মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

তাহার পর আরও তিন দিন এই অত্যাচার চলিল। কিন্তু কোনও সুফল হইল না। মহাদেববাবু শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-খ্যাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের কূলকিনারা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। নানা সংশয় উঠিয়া মনকে তোল-পাড় করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ-বোধ্য উপদেশগুলিও যেন দুর্নির্ণেয় রহস্যের কালো পোষাক পরিয়া ভূতের মতো তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল।

মহাদেববাবু সত্যই বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন।

* * *

কয়েকদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মহাদেববাবু ঠিক করিলেন অন্ততঃ দুই মাস আর শিবদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। যদি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন আবিষ্কার করিতেই হয়, তাহা নিজের চেষ্টাতেই করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে কথিত শিবদাস-বাণী শুনিয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

মহাদেববাবুর মনে হইল শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনই তাঁহার উপদেশের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান। তাঁহার শিক্ষা যদি কোনও স্থলে বুঝিতে না পারা যায়, শব্দজাল সৃষ্টি করিয়া উহা বুঝিতে যাওয়া নিরর্থক। উচিত, ঐ উপদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার জীবন-চর্যার অবলোকন। ঐ জীবনচর্যাই তাঁহার উপদেশকে স্পষ্ট করিয়া দিবে।

তিনি কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন? হাঁ। কেননা দিনের মধ্যে বহুবার তাঁহার মন নির্বিকল্প সমাধিতে নামরূপের অতীত অদ্বয় সত্যে ডুবিয়া যাইত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অনুভূতি তাঁহার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। 'বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥' গীতার এই শ্লোকে বর্ণিত সমদৃষ্টি স্বতই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। অদ্বৈতবাদ আর কাহাকে বলে?

তবে তিনি কালীঘরে যাইতেন কেন? 'মা মা' করিতেন কেন? সংকীর্তনে মাতিতেন কেন? অদ্বৈতবাদের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য কোথায়? দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ একই ব্যক্তিতে কি করিয়া সম্ভবপর?

মহাদেববাবুর মনে হইল, এই দার্শনিক সংশয়ের উত্তরও কোন নূতনতর দার্শনিক শব্দবিন্যাস হইতে মিলিবে না, মিলিবে শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবন হইতেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ যেমন তাঁহার আচরণ দ্বারা সমর্থিত, তাঁহার দ্বৈত উপাসনাও সেইরূপ তাঁহার বহুতর ব্যবহারে প্রমাণিত। কোন্ দার্শনিক তত্ত্বে দাঁড়াইয়া তিনি অদ্বৈত ও দ্বৈত—দুইকেই এইভাবে সমান মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নাই বা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম। তত্ত্বের বর্ণনা বড় কথা নয়, বড় কথা তত্ত্বের অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন (তাঁহার অনুভূতি ও আচরণ দ্বারা) যে, অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ আত্মানু-ভূতি এবং সমাধি হইতে নামিয়া আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে সর্ববস্তুতে এক সমরস ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াও ভক্ত ও ভক্তির আনন্দ ও সার্থকতাকে স্থান দেওয়া যায়—শুধু এক মতে নয়, অজস্র মতে অজস্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতানুভূতি সত্য, ভক্তিভাবও সত্য। তাঁহার অদ্বৈত দ্বৈতকে হীন করে নাই, তাঁহার দ্বৈত অদ্বৈতকে লঘু করে নাই।

ইহা কোন্ দর্শন?—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ দর্শন; তাঁহার জীবন একটি ছাঁচ। তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, অপরের পক্ষেও

তাহা সম্ভব হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ছাঁচে আমরাও আমাদের জীবন গঠন করিয়া যাইতে পারি—যে জীবনে অদ্বৈত ও দ্বৈতের সমন্বয় সম্ভবপর। নানা মত লইয়া বিরোধ যে নিরর্থক, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-দর্শনের মূলকথা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তাঁহার ভাস্বর জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই জীবনকেই অনুধ্যান করিতে হইবে, তবেই তাঁহার শিক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। না, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নূতন কোনও 'ইজ্‌ম্'-এর প্রয়োজন নাই। ঐ ইজ্‌ম্-কে খাড়া করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিতে হইবে, দ্বৈতবাদকে মুণ্ডন করিতে হইবে, আরও কত কিছুকে গালাগালি দিতে হইবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের বিরোধী। তিনি কিছু ভাঙিতে আসেন নাই, কাহাকেও তিরস্কার করিতে আসেন নাই। সকলকে পুরা সম্মান, শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া গিয়াছেন। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীকে তোমাদের দার্শনিক অভিধানের বাছা বাছা শব্দের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ দ্বারা একটি নূতন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে যাইও না দার্শনিক! বড় অন্যায় করিবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর। বলিও না—'ইজ্‌ম্' না হইলে, দর্শনের সুস্পষ্ট উপন্যাস না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাহীন, বিদগ্ধ সুধীসমাজে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁহাকে বরং অপাঙ্‌ক্তেয়ই থাকিতে দাও।

মহাপুরুষদের উপদেশ তাঁহাদের জীবিত-কালে যাহারা শুনে, শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়--তাঁহাদের শক্তি ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাহারা ঐ উপদেশগুলিকে মহাপুরুষদের জীবনের সহিত এক করিয়া দেখে বলিয়া তাহা-দের নিকট উপদেশগুলিতে বিশেষ কোন কুয়াসা থাকে না। উহা বুঝিতে কোন লিখিত ভাষ্যটীকার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সংশয় আসে তৎক্ষণাৎ তাহারা মহাপুরুষদের জীবনের আচরণসমূহের প্রতি দৃক্‌পাত করে। কোন না কোন আচরণ হইতে আলোক পাওয়া যায়, উপদেশের যে অংশ বুঝিতে পারা যাইতেছিল না, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বার বার অর্জুনকে কি বলিতেছেন?—অর্জুন, দেখ, আমার দিকে তাকাইয়া দেখ—আমি কি ভাবে কাজ করি, কি জ্ঞান হৃদয়ে ধরিয়া চলি ফিরি, কি ভালবাসা বুকে লইয়া জীবনধারণ করি, চিত্তের কি স্থিরতা, সমতা রাখিয়া এই দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে বাস করি। যদি তোমাকে কর্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগের কথা বলিয়া থাকি তো মনে করিও না বানাইয়া বানাইয়া, শব্দজাল বুনিয়া তোমাকে বলিয়াছি। ঐ যোগগুলির প্রমাণ আমি, ঐ যোগগুলির ব্যাখ্যা আমি, ভাষ্যও আমি।

বুদ্ধও শিষ্যগণকে উপদেশ করিবার সময় বার বার তৃতীয় পুরুষে নিজের কথা বলিয়াছেন—'তথাগত এইরূপ করিয়াছিলেন', 'তথাগত ইহা দেখিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। নিজের কথা নিজে বলা মহাপুরুষদের নিকট রুচিকর নয়, কিন্তু উপায়ান্তরই বা কি? না বলিলে, বিদ্যা-দিগ্‌গজ আমরা আমাদের বুদ্ধি তাঁহাদের উপদেশের সহিত মিশাইয়া একটি প্রকাণ্ড গালভরা মতবাদ খাড়া করিয়া বসিব, ঐ মত-বাদের চাপে তাঁহারা দমবন্ধ হইয়া মারা যাইবেন।

যীশুখ্রীষ্টকেও লজ্জার মাথা খাইয়া জেলে-মালা শিষ্যবর্গকে নিজের কথা পাড়িতে হইয়া-ছিল বার বার। জেলেমালাদের অনেক সময় সংশয় হইত—ইনি এত 'আমি আমি' করেন কেন? হায় রে, কি করিয়া তখন বুঝিবে

কেন করেন। পরে বুঝিয়াছিল। খ্রীষ্টের তিরোভাবের পর দিগন্ত-প্রসারিত অন্ধকারের মধ্যে, অজস্র বিপদ ও বিভীষিকার মধ্যে, নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে কোন্ শক্তি তাহাদিগকে সংহত রাখিয়াছিল, আশ্বস্ত রাখিয়াছিল, বিশ্বাসে কর্তব্যে অবিচলিত রাখিয়াছিল? খ্রীষ্টজীবন-প্রমাণিত খ্রীষ্টবাণী। জীবন তাহারা দেখিয়াছিল বলিয়া বাণীকে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল। খ্রীষ্ট তাহাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কথায় যদি অবিশ্বাস আসে তো তাহারা যেন তাঁহাকে মনে করে। তিনি নিজে তাঁহার উপদেশের ভাষ্য।

কিন্তু এই অদ্ভুত পৃথিবী বেশীদিন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্টকে আমল দেয় না। আখেরে বিদ্যাদিগ্‌গজরাই এই পৃথিবীকে চালায়, শাসায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ-বাণী 'গীতা'র কত ভাষ্য, কত টীকা, কত অনুটীকা কালে কালে জমিয়াছে—জমিতেছে। শাস্তার সরল প্রাণস্পর্শী উপদেশগুলিকে মূলধন করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কী বিপুল বহুপ্রসারিত শব্দ-বাণিজ্যই গড়িয়া উঠিয়াছিল! ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, তুমিই কি রক্ষা পাইয়াছিলে? গ্যালিলি উপসাগরের তটে তটে জেলেমালা চাষাভুষাদের মধ্যে, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধদের মধ্যে যাহা বলিয়া গেলে—পরে দেশদেশান্তরে গবেষক পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহার ব্যাখ্যান-অনুব্যাখ্যানের তাপে তোমার অন্তরাত্মা কি হাঁপাইয়া উঠে নাই?

শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্যও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাদের শিক্ষা ও জীবনপ্রেরণা 'দার্শনিক'দের কবলে পড়িয়া জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে, যাহা ছিল একটি সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক শক্তি, তাহা মেধাবী পণ্ডিতগণের বাক্যবিলাস ও তর্কামোদে পরিণত হইয়াছিল। বিদ্যাদিগ্‌গজরা জিতিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর ও চৈতন্যের ভাবকে হার মানিতে হইয়াছে।

মহাদেববাবুর মনে হইল শ্রীরামকৃষ্ণও অব্যাহতি পাইবেন না। 'শিবদাসবাবু'দিগকে নিরস্ত করা যাইবে না। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 'দর্শন' খাড়া না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। তাঁহারা যে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদগ্ধ সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করিতে নাছোড়বান্দা। দার্শনিক আলোক-সম্পাত ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ তো একান্তই গ্রাম্য পাঁচালি!

তা, শিবদাসবাবুরা তাঁহাদিগের 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী' লইয়া থাকুন। মহাদেববাবু ঠিক করিয়াছেন, তিনি উহা হইতে দূরে থাকিবেন। তাঁহাদিগের দার্শনিক ব্যাখ্যান ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা তিনি বুঝিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যতক্ষণ সামনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচরগণের জীবন ও আচরণসমূহকে যতক্ষণ প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যাইতেছে।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—তথা তন্ত্র, পুরাণ এবং আরও নানামতের সিদ্ধান্ত কি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণে সমন্বিত হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যার জন্য নূতন কোন গবেষণার প্রয়োজন নাই। সনাতন বৈদিক ধর্মের শিক্ষার মধ্যেই উহার দিগ্‌দর্শন আছে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' ইত্যাদি বাক্যই এক ও বহুর যোগসূত্র নির্ণয় করে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'বেদমূর্তি'। বেদ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য এক অদ্বয় ব্রহ্মসত্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি স্তরের উপযোগিতা আছে, প্রামাণ্য আছে। যিনি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি জানেন উপরে উঠিবার জন্য প্রত্যেকটি ধাপের প্রয়োজন। তিনি কোনও ধাপের নিন্দা করেন না, কাহাকেও গালাগালি দেন না।

কথার মালা সাজাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন গড়িতে পারা যাইবে না, গড়া উচিতও নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন। মহাদেববাবু ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মুশকিল কাটিয়া গিয়াছে।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পটভূমিকা]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত প্রসারে কেশবচন্দ্রের বিশিষ্ট জীবন-ভাবনা ও বিচিত্র কর্মোদ্যমের কথা বাঙালী আজ প্রায় ভুলতে বসেছে। ভোলবার প্রধান কারণ জীবনের প্রতি আচার্য কেশবের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আজকের বাঙালীর জীবনদৃষ্টির একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেশবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতিভাবনা ছিল জীবনসাধনারই অঙ্গ-বিশেষ। আত্মানুশীলন ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে জীবনকে একটা স্থির প্রতিষ্ঠাভূমির ওপর স্থাপন করতে পারলে সংস্কৃতিশতদল বিকশিত হ'য়ে উঠবে বিচিত্র বর্ণালি দিয়ে—এই ছিল কেশবচন্দ্রের সাধনা। সেজন্য সে আত্মভ্রষ্টতার যুগে কেশবচন্দ্র বাঙালীকে আহ্বান করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে। এ অগ্নিমন্ত্র আত্মার জাগরণের মন্ত্র। আত্মা জাগরিত হ'লে জীবনের উত্তাপ বাড়ে, আর এ উত্তপ্ত জীবনবোধের তাড়নায় জাগ্রত জাতি অনুসন্ধান করে নিত্য নতুন অভ্যুদয়ের পথ। কেশবচন্দ্রের এ অগ্নিমন্ত্রের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। এ অগ্নিমন্ত্র অগ্নিগর্ভ সহস্র শিখা বিস্তার ক'রে স্পর্শ করে-ছিল সে যুগের জাগরণোন্মুখ অসংখ্য মনকে; এবং সে বহুমনের কালিমা দগ্ধ ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল দেশব্যাপী এক নবীন জীবন। সে জীবন ব্যাপকতায় বিশাল, উপলব্ধিতে গভীর, কর্মৈষণায় অক্লান্ত, আর নবসৃষ্টি-প্রয়াসে অধীর।

সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের জন্যে প্রথমে চাই মনের পরিশীলন, আর মনের পরিশীলনের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন আত্মসমীক্ষা ও আত্মানু-শীলন। যেখানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মন ও আত্মার অনুশীলন নেই, সেখানে জাতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুম রচনা ছাড়া আর কী? প্রতিভার বরপুত্র কেশবচন্দ্র এ গভীর জীবনসত্য অনুভব করে-ছিলেন এখন থেকে আরও প্রায় একশো বছর আগে। স্বীয় অন্তরে অনুভূত গভীর প্রত্যয় জাগ্রত করেছিল তাঁর জীবনকে, আলোকিত করেছিল সমসাময়িক অসংখ্য মনকে, আর সক্রিয় করেছিল সে যুগের বাঙালীকে জীবন ও কর্মের বিচিত্র পথে বিচরণ করতে। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

কেশবচন্দ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮ খৃঃ) তার পাঁচ বছর আগে ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (১৮৩৩ খৃঃ)। এ মহান্ চিন্তানেতা ও কর্মবীরের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নব্য বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে যেন একটা উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল। মাত্র পনের বছরকাল (১৮১৫—১৮৩০) রামমোহন বাঙলা দেশের নব্যসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাঙালী জীবনের প্রায় সর্বতোমুখী সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর মৌলিক ভাবনা ও অক্লান্ত কর্মৈষণার সাহায্যে সমকালীন বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে যে উত্তপ্ত বেগ সঞ্চার করেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে যথেষ্ট। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর প্রাগ্রসর জাতিসমূহের সমপর্যায়ে উন্নীত

করবার উদগ্র কামনায় তিনি যে কর্মসূচীর নির্দেশ দেন তার ভেতর আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যে সুদূর ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যে আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাও বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল একটা নতুন সম্ভাবনার দিকে। সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত হ'তে থাকল তাঁর মৃত্যুর পরেও। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। তাঁর একান্তভাবে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিলেও তাদের বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন বা বিধর্মী ক'রে তোলেনি। এর কারণ, তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টায় বিপ্লবের বীজ যতই থাকুক না কেন, তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল ভারতের সনাতন জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা। রামমোহনের সমকালেই বাঙলা দেশে আর একটি প্রবল শক্তি দেখা দিল, যার প্রভাবে বাঙালীর মনোজীবন প্রবলভাবে আন্দোলিত হ'য়ে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ল। কোন কোন বাঙালী সংস্কৃতিসমালোচক এ যুগকে অভিহিত করেছেন 'ঝড়তুফানের যুগ' ব'লে। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এ বিপ্লববিক্ষুব্ধ যুগের স্রষ্টা হিন্দুকলেজের যুক্তিবাদী মনীষী শিক্ষক ডিরোজিও। কলেজ-গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে ডিরোজিও-প্রবর্তিত শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সমস্ত চিন্তাধারাকে একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে দেখা। এই নব্যতন্ত্রের শিক্ষার ফলে হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষার্থীর দল হ'য়ে উঠলেন প্রবল সংশয়বাদী। স্বদেশীয় সনাতন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে লাগলেন তাঁরা সীমাহীন ঘৃণার চোখে; আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যেই তাঁরা দেখতে পেলেন জীবনের সমস্ত অভীপ্সিত আদর্শ। ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামতনু লাহিড়ীর মতো স্বল্পসংখ্যক স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ছিলেন স্বদেশের সনাতন আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ। পূর্বোক্ত তরুণ ছাত্রদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বাঙালীর সংস্কৃতি-জগতে একটা তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। বিজাতীয় পোষাক, বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ, অপরিমিত মদ্যপান প্রভৃতি হ'ল তাঁদের বহির্জীবনের প্রধান আকর্ষণ, আর স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা ক'রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোচনাই হ'ল তাঁদের নব্যতন্ত্রী সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য। এমনকি ভারসাম্য-হীন শিক্ষার প্রবল উন্মাদনায় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক ধর্ম মনে ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধা করলেন না। স্বদেশীয় ভাবাপন্ন সে যুগের কোন কোন চিন্তানেতা দেখতে পেলেন সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবপ্রেরণায় একটা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

এ যুগসঙ্কটের দিনে রামমোহনের মানসশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এ বিজাতীয় ভাবান্দোলনের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত চরিত্রে বিশুদ্ধিসাধন, নব্যতন্ত্রী ইংরেজী শিক্ষিত-দের বহির্মুখী মনকে স্বদেশীয় ঐতিহ্যাভিমুখী ক'রে তোলাই হ'ল এ সময় দেবেন্দ্রনাথের একান্ত সাধনার বিষয়। এ উদ্দেশ্যে রামমোহনের ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলনে তিনি নতুন শক্তির সঞ্চার করলেন রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের সহায়তায়, আর সমকালীন অপরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ

প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্ সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের সহযোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা ক'রে।*

দেবেন্দ্রনাথ যে শুধু সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তা নয়, একটা সুগভীর ভাগবত চেতনা ছিল তাঁর মহান্ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব-উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রেরণায় তিনি যে শুধু স্বীয় কুলধর্মকে বিসর্জন দিলেন তা নয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে বেদান্ত-প্রতিপাদিত সেই সত্যধর্মকে প্রচার করবার ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সে যুগসঙ্কটের কালে। কিন্তু রামমোহন-পরিকল্পিত এ নবধর্ম-প্রচারে দেবেন্দ্রনাথ একটা প্রবল বাধা পেলেন সহকর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে। ভগবানের মঙ্গল-বিধানের প্রতি গভীর 'মিষ্টিক' চেতনার ফলে একটা সংশয়শূন্য বিশ্বাসই ছিল দেবেন্দ্রনাথের সকল ধর্মসাধনার মূল প্রেরণা, আর অবিচল বিশ্বাসে জগৎস্রষ্টার নিকট প্রার্থনা মানুষের আত্মিক সমুন্নতির প্রধান উপায়—এই ছিল ভগবৎ-নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির প্রধান কথা। প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষয়কুমার কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এ 'মিষ্টিক' বিশ্বাস ও ভক্তিতত্ত্বকে তাঁর যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। পাশ্চাত্য যুক্তি-নির্ভর চেতনার আলোকে একটি সত্যসন্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গী যে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, বাঙালী সংস্কৃতি যে একটা অভিনব অভ্যুদয়ের পথ খুঁজছে, দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারলেও সে সংশয়বাদের যুগে অন্তর দিয়ে তা অনুমোদন করতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের ওপর অক্ষয়কুমারের যুক্তি-দণ্ডের আঘাতের প্রবল প্রতিক্রিয়া হ'ল এই: নির্জনে স্রষ্টার মৌন মহিমা উপলব্ধি ক'রে নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে।

দেবেন্দ্রনাথের ভাবান্দোলিত জীবনের এ হ'ল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এ বছরটি নানা কারণে বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বছরেই ভারতের সিপাহীরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে—এই অভিযোগে; এ বছরেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা দেশ ও বাঙলা দেশের বাইরের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হ'ল; আর একটি আপাতক্ষুদ্র ঘটনা ঘ'টল বাঙলা দেশেই কলকাতার বুকে। এই স্মরণীয় বৎসরেই কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের একজন সত্যসন্ধ ভগবৎ-প্রেমিক যুবক আপন কুলধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। বাঙালীর আত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হ'ল কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগের বাঙালীর ধর্মসংস্কারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তেজস্বী কেশবচন্দ্রের যোগকে বলা চলে মণিকাঞ্চন-সংযোগ। এখন থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা গৌরবপূর্ণ উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হয়েছে এ উভয় ধর্মনেতার অতলান্ত ভগবদ্ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস ও লোকহিতব্রতের মহান্ আদর্শে।

আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-ইতিহাসে এই হ'ল কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা।

* ভাদ্র, ১৩৬৬ সনে উদ্বোধনে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ডিরোজিও-প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ডিরোজিওকে 'নব-যুগের প্রবর্তক'[১] বলেছেন। বিশেষণটি সার্থক। হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও[২] হিন্দু কলেজে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল অবধি পড়িয়েছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। সব পরিবর্তনের সূচনায় যেমন বাড়াবাড়ি থাকে, তেমনি ডিরোজিওর শিষ্যদেরও বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই ছাত্রেরা যখন উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন, তখন উন্মাদনার পর্ব কেটে গিয়ে সুস্থ ও মহত্তর জীবনা-দর্শে তাঁরা সার্থক হ'য়ে উঠেছেন। সুতরাং ফলের দিক থেকে বিচার করলে ডিরোজিও যে চিন্তার বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, তার অসাধারণ উৎকর্ষের কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ডিরোজিও ছিলেন জাত-শিক্ষক। 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'—এমন ধরনের শিক্ষা-ব্রতীদের মধ্যেও ডিরোজিওর মতো আদর্শ শিক্ষক দুর্লভ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্য দিয়ে ডিরোজিও বাঙালীর মানস ক্ষেত্রে যে সব চিন্তা-বীজ বপন ক'রে যান, সেগুলির মোটামুটি বিভাগ এই—(১) স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, (২) স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ, (৩) অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, (৪) পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ ও দেশীয় সংস্কৃতি—বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের সামাজিক ত্রুটির প্রতি অবজ্ঞা, (৫) জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। এই কয়টির মধ্যে চতুর্থ বিষয়টির জন্যই তদানীন্তন হিন্দুসমাজের সঙ্গে ডিরোজিওর বিরোধ ঘটে। অনেকটা এই কারণেই ডিরোজিও আজ অবধি এক শ্রেণীর হিন্দুর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে আছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে ডিরোজিওর শিষ্যেরা ধর্মের মৌলিক আদর্শগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁদের বিদ্রোহ ছিল দেশাচারের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ডিরোজিও কোন সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত ব'লে মনে করতেন না, তাই ধর্ম সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার-বিচারকে তাঁর শিষ্যেরা যতটা আক্রমণ করতেন, খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা করতেন না। সেদিক থেকে রামমোহনের চিন্তাধারা আরও স্বচ্ছ, উদার এবং সমদর্শী। পরবর্তী কালে ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ খৃষ্টান হননি। কৃষ্ণমোহন যে সামাজিক উৎপীড়নের জন্য খৃষ্টান হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন—একথা সুবিদিত। খৃষ্টান হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ অটুট ছিল। অপরপক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রাম-তনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে, যিনি রাজ-ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে কাথিয়াওয়ার রাজ্যে সুশাসনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

১,৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ৮৩, ৯৯-১০০। (নিউ এজ সংস্করণ)

২ জন্ম-১৮০৯—মৃত্যু-১৮৩১ 'জাতিতে পোর্তুগীজ বংশোদ্ভব ফিরিঙ্গী' (ঐ পৃঃ ৮৩)

এই সন্ন্যাসী তাঁর অনুরাগীদের কাছে 'গুরু ডিরোজিওর নাম' বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন এবং 'তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন।'[৩]

ছাত্রজীবনে ডিরোজিও ছিলেন ডেভিড ড্রামণ্ড সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্র। কলকাতায় সে সময় ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চালিত আরও স্কুল ছিল। কিন্তু অন্যান্য স্কুলের চেয়ে ড্রামণ্ডের স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আইরিশ ড্রামণ্ড ছিলেন ডেভিড হিউমের চিন্তাধারার পক্ষপাতী। তখনকার ভারতবাসী ইংরেজেরা অনেকেই ড্রামণ্ডের স্বাধীন চিন্তা বিশেষ পছন্দ ক'রত না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের উত্তরাধিকার ডিরোজিও এই গুরুর কাছেই লাভ করেন। ছাত্রজীবনে ডিরোজিওর ক্লাসিক সাহিত্য এবং গণিতের প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমাণ্টিক বন্ধনমুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, ডিরোজিও-মানস তার দ্বারাই লালিত। ইংরেজী সাহিত্যের সদ্য-প্রকাশিত বইগুলির সবচেয়ে আগ্রহশীল ক্রেতাদের মধ্যে ভারতবর্ষে ডিরোজিও ছিলেন অগ্রগণ্য।[৪]

ড্রামণ্ডের স্কুলে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় ছাত্রেরা একত্র পড়াশুনো ক'রত। এর ফলে ডিরোজিও এদেশের মানুষের সঙ্গে শৈশব থেকেই একাত্ম হ'য়ে মিশতে পেরেছিলেন। ফিরিঙ্গি হয়েও ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমিরূপে অন্তরে অনুভব করা—এই কারণেই তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছিল। স্কুলের পাঠ মোটামুটি শেষ ক'রে তিনি কিছুকাল তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে ভাগলপুরে ছিলেন। ভাগলপুরের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর সহজাত কবিস্বভাব সহজেই প্রেরণার উপাদান খুঁজে পেত। কিশোর ডিরোজিওর অনেক কবিতাই তখনকার 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছে। তিন চার বছরের মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন, এবং ইণ্ডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদকপদে নির্বাচিত হলেন—সেই সঙ্গে প্রতিভার গুণে হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হলেন। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলকাতার বিদগ্ধ-সমাজে তখন ছড়িয়ে পড়েছে, এখন শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ক্রমবর্ধমান হ'ল। পরবর্তী কালে Bradley-Birt (ব্রাডলি বার্ট) এই তরুণ কবির কাব্যগুচ্ছ একত্রে প্রকাশ করেন। ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা ক'রে তিনি ডিরোজিওর কাব্যসাধনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন :

> His poems show a remarkable command of language and beauty of expression ; and if inspite of their unbounded enthusiasm, their wealth of imagery, and their passionate resentment of wrong, they lack something in originality and undoubtedly owe much to Byron and Moore, his contemporaries, it must be remembered that death at the age of twenty-three cut short the undoubted promise his youthful work evinces......There can be no doubt from his poems that his was one of those natures not made for happiness. He lived life too intensely, his sympathies were too widespread, his sensitive mind too much alive to the eternal of things, for him ever to lead the ordinary life of his fellow men. (Poems of H.V. Derozio—a forgotten poet.)

—'ডিরোজিওর কবিতায় তাঁর ভাষার উপর দখল এবং প্রকাশের সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কবিতায় অপার উৎসাহ ও উদ্দীপনা, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সত্ত্বেও মৌলিকতার অভাব রয়েছে এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমকালীন বায়রণ ও মুরের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে মাত্র তেইশ বছর বয়সে অকালমৃত্যু তাঁর রচনাবলীর সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে। ...তাঁর কবিতা পড়ে একথা বেশ বুঝা যায় যে, সহজ সুখের জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। জীবনকে তিনি বড় বেশী নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন,

৪ Life of H.V. Derozio—Thomas Edward.

তাঁর সহানুভূতি ছিল অতিবিস্তৃত, তাঁর স্পর্শ-সচেতন মন সব বস্তুকেই দেখতে পেত অনন্তের পটভূমিকায়। তাই তাঁর পক্ষে সমকালীন অন্যান্য লোকদের মতো সাধারণ জীবন যাপন করা অসম্ভব ছিল।'

উদ্ধৃত মন্তব্যটি সংক্ষেপে ডিরোজিও-মানসের সার্থক উপলব্ধি। এই মন্তব্যটির সমর্থনে ডিরোজিওর দু'চারটি কাব্য-কণিকা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Good night! well then, good night to thee,
In peace thine eyelids close;
May dreams of future happiness
Illume thy soft repose!
I've that within that knows no rest,
Sleep comes to me in vain;
My dreams are dark—I never more
Shall pass 'good night' again.
(Good Night)

একটি চতুর্দশপদীতে ডিরোজিও মৃত্যুকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ ব'লে সম্বোধন করেছেন :

Death my best friend, if thou dost ope the door,
The gloomy entrance to a sunshine world,
It boots not when my being's scene is furled,
So thou canst aught like vanished bliss restore.

সেকালে তাঁর 'ফকির অব জাঙ্গিরা' কাহিনী-কাব্যটি সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিল। এ কাব্যের সূচনায় কবি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন :

My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion in chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave of thee,
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! One kind wish for thee!

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা-সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ-বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিপুল রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন-অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি!
(অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)[৫]

দেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে ডিরোজিওর Harp of India কবিতাটিও স্মরণীয়। তাঁর কাব্য সংগ্রহের অনেক কবিতাই গ্রীসকে লক্ষ্য করে। গ্রীক সভ্যতার মহিমা ও গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধ—এ দুইই ডিরোজিওর আবেগ ও চিন্তা-ধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় মেলে তারই পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর স্বদেশানুরাগ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই স্বদেশানুরাগ তিনি তাঁর ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। Young Bengal বা 'নব্য বঙ্গ' নামে পরিচিত তাঁর ছাত্র-বৃন্দ ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের জন্যই আজ অবধি আমাদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

৫ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

লোক-শিক্ষায় কথকতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লোক-শিক্ষা বলতে আপামর সাধারণের শিক্ষা-দীক্ষাই বোঝায়। সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে আমাদের শিক্ষালাভ হয়—দেখে, শুনে এবং পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষ নিজে দেখে আর কতটুকুই বা শিখতে পারে? অতীতে কত ঘটনাই ঘটে গেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে নিত্যই কত ঘটনা ঘটছে। সেগুলো দেখে শেখার তো কোন উপায়ই নেই।

পড়ে অনেক বিষয়ই শেখা বা জানা যায়, কিন্তু সকলের পক্ষে এই উপায়েও তো শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। পড়ে শিখতে হ'লে অক্ষরজ্ঞান আবশ্যক। একে তো আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। যারা কোনক্রমে নিজেদের নাম লিখতে পারে, তাদেরও সাক্ষরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা পড়ে কিছু শিখতে বা জানতে পারে না। সুতরাং যারা পড়ে শিখতে পারে, তাদের সংখ্যা এদেশে শতকরা আর কয়জন? খুব বেশী হ'লে শতকরা আট দশ জন মাত্র, এর অধিক নয়।

শুনে শেখার সুযোগ বা অবকাশ মোটামুটি সকলেই অল্পবিস্তর পেয়ে থাকে। সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে এই উপায়ে অনেক কিছুই শিখতে বা জানতে পারে। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে শুনে অনায়াসেই কত বিষয় আমাদের শেখা হ'য়ে যায়। সর্বসাধারণের পক্ষে শুনেই বেশী বিষয় শেখা সম্ভব। সুতরাং এই উপায়েই লোক-শিক্ষা ব্যাপকভাবে সাধিত হয়, সন্দেহ নেই। এই জন্যই লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার আবেদন যেমন অপ্রতিহত, তার অবদানও তেমনি অপরিসীম।

এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: "বাংলার গ্রামীণ জীবনে কথকতার প্রভাব কত, তাহা অল্প কথায় বুঝান কঠিন।…পূর্বে কথকতা লোক-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে কথকতার সাহায্যে অনেক পুরাণ-কাহিনীই জানিয়া লইতেন। শুনিয়া কীরূপ শেখা ও জানা যায়, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই। বৃদ্ধারা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন। বৈশাখ মাস—পুণ্য মাস। এ-সময়ে এই মহাকাব্যগুলি বেশী পড়া হইত। একজন বৃদ্ধাকে বাল্যকালে (তখন আমার এগার-বার বৎসর বয়স) রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইতাম। এই দুইখানি গ্রন্থের কোথায় কী কাহিনী বা উপাখ্যান আছে, তা বৃদ্ধার মুখস্থ। আমাকে 'অমুক অধ্যায়' বা 'অমুক উপখ্যান' পড়িবার নির্দেশ দিতেন। আমি তাহা পড়িয়া শুনাইতাম।…এখন ভাবিয়া অবাক হই, ঐ 'নিরক্ষর' বৃদ্ধা শুনিয়া শুনিয়া সমগ্র রামায়ণ মহাভারত কীরূপ জানিয়া লইয়াছিলেন।…একবার একমাস ধরিয়া কথকতা শুনিয়াছিলাম, তাহার রেশ যেন এখনও কানে লাগিয়া আছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতাম। তখন আমরা চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।"

প্রাচীন বাংলার লোক-শিক্ষার ইতিহাসে কথকতার ভূমিকা, সত্যই অতি বিরাট ও অতুলনীয়। একথা দেশের মনীষিগণও মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের

'লোক-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ আজ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

কথকতা কেবল মধুর স্বর-সংযোগে শাস্ত্র-পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যান নয়। এর পরিবেশনার ভঙ্গিমা বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরাণ-শাস্ত্রাদির এক একটি আখ্যায়িকা নিয়ে কথকঠাকুর অতি বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা করতেন। একই আসরে তাঁর কণ্ঠে কখন মধুর পাঠ, কখন শ্লোক আবৃত্তি, কখন সরস গল্প, কখন চমৎকার উপমা, কখন সুললিত সঙ্গীত এবং কখন তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা শোনা যেত।

কথকঠাকুরের অপূর্ব নাটকীয়তাও ছিল সর্ব-সাধারণের মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণের প্রধানতম সহায়। একই আসরে তিনি প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বিভিন্ন রস পরি-বেশনকালে তাঁর কণ্ঠস্বর, মুখমণ্ডল, অঙ্গভঙ্গিমা প্রভৃতি অতি অদ্ভুতরূপে পরিবর্তিত হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকেও সেই সমস্ত রসে এবং ভাবে বিগলিত ও অভিভূত ক'রে ফেলতেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে কথকঠাকুরের ভাবাপ্লুত পরিবেশন ভঙ্গিমার একটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়: "কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল।...তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে তাহার আজন্ম-জড়িত মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। বনের শিশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়'। কেহ আসিল না, কেহ সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন তিনি সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন। প্রতি কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়।' কেহ আসিল না।"

কথকতা জন-সাহিত্যের অন্তর্গত। যে সমাজ বা মণ্ডলী কথকতা শুনত, তারই মনের কথা-ভাব, অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, হৃদয়ের সুখ-দুঃখ ও অনুরাগ-বিরাগের একটা অতি নিবিড় সংবেদন তাতে অভিব্যক্ত দেখা যায়। কথকতার পুঁথি সেকেলে বাংলায় লেখ্য ভাষায় গদ্যে এক একটি পালা বিভাগ ক'রে রচিত হ'ত। ঐ পুঁথির ভাষা ছিল সংস্কৃতপ্রধান, গুরুগম্ভীর বিশেষণবহুল ও অলঙ্কারযুক্ত। তাতে কথাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে শাস্ত্রের শ্লোকমালার উদ্ধৃতি, পুরাণ-প্রবচন, সুললিত সঙ্গীত, মনোহর উপাখ্যান, সরস উপমা প্রভৃতিও সংকলিত থাকত। বিশিষ্ট কথক-গণের সাধনায় কথকতা একটি আদর্শ কলা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

বিশেষণবহুল দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসদ্বারা কথক-ঠাকুর কি ভাবে প্রসঙ্গের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা করতেন প্রাচীন পুঁথি থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দিই :

"নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদসম্ভূতা পূত-সলিলা শ্রীশ্রীভাগীরথীতটে শান্তরসাস্পদ শুচিস্নিগ্ধ পরমপবিত্র আশ্রমসন্নিধানে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহারাজাধিরাজ শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশ্রীভাগবতী কথামৃত শ্রবণমানসে পরমতত্ত্বজ্ঞ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরমহংস মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাপ্রভুপাদকে করযোড়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"

সদলঙ্কারসংযুক্ত শ্রুতিমধুর বাক্যে কথকঠাকুর পরিবেশ বর্ণনা করতেন, প্রাচীন পুঁথিগুলিতে তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও মেঘ-মন্দ্র দিবসের বর্ণনা, কোথাও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত্রির বর্ণনা, কোথাও বা আনন্দ উৎসব-মুখরিত

রাজবাটীর বর্ণনা, কোথাও শান্তরসাস্পদ তপোবনের বর্ণনা।

ঐ পালা-পুঁথিগুলির রচনা সরস ও সুন্দর হলেই যথেষ্ট হ'ত না। অনুষ্ঠানের সাফল্য বা উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর ক'রত কথকঠাকুরদের বাক্‌-নৈপুণ্য, পরিবেশন-কুশলতা, স্বরমাধুর্য ও বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমার উপর। ঐ পুঁথি তাঁদের প্রসঙ্গের মুখ্য বা প্রধান অবলম্বন হিসেবে থাকত। প্রসঙ্গত তাঁরা পুঁথির বাইরেরও বহু কথা-কাহিনী ও তথ্য-তত্ত্ব পরিবেশন করতেন। এমনকি সময়ে সময়ে তাঁরা বহু অবান্তর বিষয়েরও অবতারণা করতেন—সর্বদাই তাঁদের লক্ষ্য থাকত বিষয়বস্তুকে সরস ও সহজবোধ্য করার দিকে। তাঁদের স্বাভাবিক বাচন-ভঙ্গিমা ও বর্ণন-দক্ষতায় অতি নীরস শুষ্ক বিষয়ও সরল শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হ'ত।

সেকালে আমাদের কথক-পণ্ডিতগণের মতো ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণও অনেকে এদেশে নিজেদের ধর্ম-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাধনা-আদর্শ প্রভৃতি ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে কথকতাকে অন্যতম বাহনরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের শাসনকালে ইসলাম ধর্মের মহিমা ও প্রভাব দেশময় বিস্তারকল্পে 'নবী-কাহিনী' কথকতা প্রচলিত হয়। তাঁরা তখন মহান্‌ পীরপয়গম্বরের পুণ্যচরিত-মাহাত্ম্য আপামর সাধারণের মধ্যে কথকতার পদ্ধতিতে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

মৌলভী-মোল্লা কথকগণ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই তাঁরা পারশী, আরবী ও উর্দু মিশ্রিত ভাঙা ভাঙা বাংলায় কবিতা রচনা ক'রে বিচিত্র সুরলালিত্যে 'নবী-কাহিনী' কথকতা করতেন। ঐরূপ কবিতায় রচিত নবী-কাহিনী বা ইসলামী কথকতার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করি:

আমীর বলন্ত: আমি আরবনন্দন।
হামজা আমার নাম বিদিত ভুবন॥
আমীরের নাম শুনি লন্দুরে বোলয়।
আমাকে বান্ধিতে তুমি যাইলে মহাশয়॥
আমীরেও বলিলেনত: আমি সেই জান।
তা শুনি লন্দুরে গদা লয় তোর মান॥
আমীরে ছিকর ধরি কহিলেক আগে।
লন্দুরে গুরুক হানিলেক মহা বেগে॥

খৃষ্টান পাদ্রীগণ কথকতায় এদেশের জনসাধারণের গভীর অভিনিবেশ ও প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করেন। তাঁরা নিজেদের ধর্ম-সাধনা তথা মহাত্মা যীশুখৃষ্টের শিক্ষাদর্শ ও মতবাদ জনমণ্ডলীকে বক্তৃতাদ্বারা বোঝাতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, ঐরূপ শুষ্ক বক্তৃতায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তাঁরা তখন কেউ কেউ মনোযোগ সহকারে কথকতা শুনে তার ভাব-ভঙ্গিমাগুলি সযত্নে আয়ত্ত করেন। পরে তারই মাধ্যমে তাঁরা যীশুর 'সুসমাচার' প্রচারে ব্রতী হন। এই উপায়ে তাঁদের প্রচারকার্য সহজতর হ'য়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় (বাংলা সংস্করণ) প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে (২৬শে ফাল্গুন, ১২৭৭ সাল) প্রকাশিত একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী এখানে উদ্ধার করি:

"*কিছু দিন হইল জনকয়েক খৃষ্টিয়ান মফঃস্বলে তাম্বু ফেলিয়া তথায় ধর্মপ্রচার করিতে অবস্থিতি করেন। আমরা তাঁহাদের মুখে শুনি যে, কথকতা খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পাঠে অবগত হইলাম যে, লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড লঙ্‌ অন্যান্য জনকয়েক সাহেব সঙ্গে করিয়া উত্তরপাড়ায় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কথোপকথন শুনিতে যান

এবং তৎশ্রবণে মোহিত হইয়া নিজ ধর্মপ্রচারের একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।"

কথকের পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্র-পুরাণাদিতে গভীর জ্ঞানই কথকতার উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। দেখা যায়, সুপণ্ডিতগণ অনেকেই শাস্ত্রাদির নিগূঢ় মর্ম সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। অথচ, সাধারণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ তা সকলের বোধগম্য অতি মনোজ্ঞ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। পাণ্ডিত্য এবং ব্যাখ্যান-নৈপুণ্য পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত হলেও উভয়ের স্রোতোধারা সব সময় একই খাতে প্রবাহিত হয় না। সুতরাং সুপণ্ডিত মাত্রই যে উত্তম ব্যাখ্যাতা হবেন তার কোন অর্থ নেই।

ব্যাখ্যান-কুশলতার সমস্ত কৃতিত্বটা কথক ঠাকুরের গভীর পাণ্ডিত্যেরই ফল নয়। কোন কোন ভাগ্যবান্ কথক কথকতা-কালে পাণ্ডিত্যের অতীত এক ভাবরাজ্য থেকে ' অন্তরে প্রেরণা লাভ করেন। তার ফলে, ঐ সময়ে তাঁদের হৃদয়ে পরম পবিত্র এক স্বর্গীয় ভাব প্রকাশিত হয়। তখন স্বয়ং বাগ্‌দেবী যেন তাঁদের কণ্ঠে আবির্ভূতা হ'য়ে তাঁদের কথার রাশ ঠেলে দেন এবং তাঁরা তন্ময় চিত্তে কথকতা করেন।

ঐরূপ প্রেরণাপ্রসূত কথকতাই সার্থক। তার প্রভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অপরিসীম আবেদন ও সুগভীর ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। ফলে, সমাগত শ্রোতৃবর্গেরও মন ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাব-লোকে আরোহণ করে। তখন তাদের মন হ'তে সকল অবসাদ বিদূরিত হয়। তারাও তন্ময় হ'য়ে পরম আগ্রহভরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসে ঐরূপ কথকতার রস-মাধুর্য আস্বাদন করে। সময়বোধ এবং গৃহ-কর্মাদি বিষয়ের চিন্তা ঐ কালে তাঁদের মন হ'তে তিরোহিত হয়। কীভাবে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হ'য়ে যায়, সে সম্বন্ধে তাদের একেবারে হুঁশ থাকে না। কথকতা-শেষে তারা প্রচুর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। ঐরূপ ভাবময় কথকতার সুমধুর রেশ ও বিমল আনন্দ বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ভারতের সভ্যতা, ভারতের ভাব, পরকে আপন ক'রে নেয়, নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় না ক'রে নিজের যা কিছু ভালো, যা কিছু জনগণের অন্ধকার চিত্তে আলোকপাত করতে পারে, পথভ্রষ্টকে পথ দেখাতে পারে—তা বিলিয়ে দেয়, দেশ ও দশকে উন্নততর স্থানে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ এই হিন্দুর ধর্ম, তার আদর্শও এই। এই জাতি আবহমান কাল সাধনার ফলে অনেক কিছু পেয়েছে, তার সবটুকুই সে জগতের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে সার্থকতা লাভ করছে।

ভারতের বুকে অনেক আলোড়ন হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য গড়ে উঠেছে, অনেক ভেঙেও গেছে, ভারত কোনদিন তার আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হয়নি। বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনই ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রশক্তি। যুগে যুগে এই সভ্যতাকে বহু নূতন জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, তার ফলে সে তার মনন-সম্পদ বিতরণ ক'রে সকলকে সমৃদ্ধ করেছে, মহত্তর করেছে।

এই জীবন-দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য বহুর মধ্যে একত্ব-দর্শনের সাধনা। যুগে যুগে

এদেশে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা বহুরূপে বহুভাবে সাধনা ক'রে সেই একই ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখেছেন, বিভিন্ন মত নিয়ে, বিভিন্ন পথ দিয়ে তাঁরা একই অনুভবে পৌঁছেছেন।

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রেমই ভারতের সাধনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এই সত্যকেই পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। ভারতীয় দর্শনে—সাধনার প্রয়োজনে প্রেম মৈত্রী ও সাম্যের কথা আছে; শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই তিনটি ভাবকে আমরা রূপায়িত দেখতে পেয়েছি।

তাঁর অসংখ্য উপদেশ আমরা পেয়েছি; জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষকে তিনি সচেতন করতে চেয়েছেন, জানিয়েছেন মানুষের জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা।

মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখুক, কপটতা বা ছলনা ত্যাগ ক'রে, মন মুখ এক ক'রে সরল হোক, তবেই ভগবানকে পাবে, ঠাকুর এ কথা জোর করেই বলেছেন। অনেক জন্মের তপস্যার ফলে মানুষ সরল হয়, আর সেই সরলতাই বড় কাছে এনে দেয় ভগবানকে। অনন্ত ভগবান ভক্তের একাগ্র সাধনায় সান্ত-রূপে ধরা দেন—এ সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে লাভ করেছেন, তাই দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন: যে যে ভাবেই সাধনা কর, পৌঁছাবে সেই একই স্থানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: ভিন্ন ভিন্ন রূপে আরাধনা করলেও ভক্ত দেখতে পান একই ঈশ্বরকে—তাঁর আরাধ্যকে, সর্বত্রই যিনি বিদ্য-মান। ভগবান কল্পতরু, তাঁকে যে যেভাবে ডাকবে সেইভাবেই তিনি তাকে দেখা দেবেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে জানা, ঈশ্বরের বিষয় শোনা,—আর বিজ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁর দর্শন পাই, তাঁর সঙ্গে কথা বলি, তাঁকে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে পাই।

ঠাকুর ভাবকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, এতে যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই,—চাই শুধু বিশ্বাস। সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সংসারী মন যখন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, সেই সময় ঠাকুরের বাণী চিত্তে শক্তি সঞ্চার করে।

সংসারের কাজ ক'রে যাও, কিন্তু ভগবানের দিকে মন রাখো—এই ছিল তাঁর উপদেশ। হাজার কাজের মধ্যে তাঁর নাম কর, মনে রেখো তুমি দাসীমাত্র। পরের সংসারে কাজ ক'রছ, যেদিন জবাব হ'য়ে যাবে সেদিন ফিরে যেতে হবে আপনার ঘরে, আপনার জনের মাঝে। সে আপন জনকে বিস্মৃত হয়ো না।

ঠাকুর বার বার বলেছেন: পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকতে, কাদামাটি যেন গায়ে না লাগে। নিষ্কামভাবে কর্ম কর, কর্মফল তাঁর উপর ফেলে দাও। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকলেই কর্ম দুঃখের কারণ হয়, এইটি সর্বদা মনে রাখতে হবে।

ঠাকুরের মঙ্গলবাণী সাধককে পথ দেখায়, সংসারীকে সৎ প্রেরণা যোগায়, তাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী করে।

কুমারিলভট্টের জ্ঞানবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

কুমারিলের মতে আত্মার [মনের] ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানোৎপত্তির ফলে 'বিষয়' প্রকট হয়, কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে থাকে (১) জ্ঞাতা (২) জ্ঞেয় (৩) জ্ঞানের কারণ ও (৪) জ্ঞানের ফল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের জ্ঞাততা।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞানের ফল হইতে (জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাকট্য বা জ্ঞাততা হইতে) জ্ঞানের অনুমান হয়। জ্ঞান-ক্রিয়ায় জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধের উদ্ভব হয়। সেই সম্বন্ধ-সৃষ্টিতে জ্ঞাতার ক্রিয়া থাকে। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্তার (জ্ঞাতার) ক্রিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়, এবং এই সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানের অনুমান হয়। সংবিদ্ (consciousness) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ-সাধক তৃতীয় বস্তু। যাঁহারা বলেন—জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ উদ্ভূত হয়, তাহা মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়। 'আমি ঐ ঘট জানি'—ইহা আমরা বলিতে পারিতাম না, যদি জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আমরা জানিতে না পারিতাম। এখন বিবেচ্য—জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, এবং জ্ঞানের বিষয় সংবিদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সংবিদ্ ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় কিসের দ্বারা? একই জ্ঞানে বিষয়-জ্ঞান ও এই সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা এই জ্ঞানোৎপত্তির সময় এই সম্বন্ধের উদ্ভবই হয় নাই। জ্ঞানই এই সম্বন্ধ। তাহার উৎপত্তির পরে তাহার সহিত সংবিদের সম্বন্ধ হয়। যখন কোন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন তাহার বিষয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা প্রথমে বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া পরে বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহা বলা যায় না। জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে স্বপ্রকাশ, তাহাও বলা চলে না। তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য কুমারিল-শিষ্যগণ আত্মা এবং বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা মানস-প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেন। তাই মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

জ্ঞানে জ্ঞেয়ের এক বিশেষ রূপ (অতিশয়) জ্ঞান কর্তৃক সৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ত্রিতয়প্রতিভাসবাদিগণও (যাঁহারা জ্ঞানে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন) এই অতিশয়ের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক-দর্শনের অনুগামিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞানে বিষয়ের রূপান্তর হয় না। জ্ঞানসাম্য বিষয়ের গুণ নহে। ইহা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ। কুমারিল জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন, তাঁহার অনুবর্তিগণ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে, তাহা জ্ঞানের বিষয় এবং সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্য

এক জ্ঞানের প্রয়োজন। তাহাতে অনবস্থার উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মতে জ্ঞান অনুমানগম্য।

কুমারিল 'প্রমা'র (যথার্থ জ্ঞানের) স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকার করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি ইন্দ্রিয় অথবা অনুমান হইতে হইতে পারে, কিন্তু ইহা আপনিই বিষয় প্রকাশিত করে, এবং তাহার স্বতঃপ্রামাণ্যের বোধ উৎপাদন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিরোধী কিছু আবিষ্কৃত না হয় (যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ অপটুত্ব প্রভৃতি), ততক্ষণ জ্ঞানের সত্যতায় কোন সন্দেহ আমাদের থাকে না।

কুমারিলের মতে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান জ্ঞান-রূপে প্রামাণিক, জ্ঞাতার মনে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। পাণ্ডুরোগে যে কোন বস্তু পীতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ চক্ষুতে পীত-রস ; চক্ষু পীতবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বাহিরের বস্তু পীতরূপেই দৃষ্ট হয়। তখন যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে আবির্ভূত হয়, তাহা বস্তুতঃ পীতবর্ণ। সন্দিগ্ধ জ্ঞানে যখন দূরে দৃষ্ট দীর্ঘাকার পদার্থ, কোন মানুষ অথবা অন্য কোন দীর্ঘাকার বস্তু—এই সন্দেহ হয়, তখন শুধু দীর্ঘ আকারই জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তখন মনে দীর্ঘাকারবিশিষ্ট দুই বস্তুর স্মরণ হয়।

অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের কারণ। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ত্রিবিধ : (১) মিথ্যা জ্ঞান, (২) অজ্ঞান এবং (৩) সংশয়। সন্দিগ্ধ এবং মিথ্যা জ্ঞান ভাববাচক বস্তু ; ও তাহার উৎপত্তি হয় দোষযুক্ত কারণ হইতে, অজ্ঞানে জ্ঞানোৎপত্তির কারণের অভাব।

এই সকল আলোচনায় 'প্রামাণ্য' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রত্যেক জ্ঞানই (সত্য হউক, মিথ্যা হউক) জ্ঞানরূপে প্রামাণিক, কেননা যে রূপেই তাহা প্রকাশিত হউক, সেই রূপেই তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রান্তিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান—এই অর্থে প্রামাণিক। কার্যকালে যে জ্ঞান কার্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাই প্রামাণিক (pragmatic) এবং যাহা উত্তীর্ণ হয় না, তাহা অপ্রামাণিক।

ভ্রান্তি ও মিথ্যা জ্ঞান

সকল জ্ঞানেরই যদি স্বতঃপ্রামাণ্য থাকে, তাহা হইলে ভ্রান্তি কি ?

জৈন মতে—যে জ্ঞান আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অব্যবহিত ও অপরিহার্য উপায় তাহাই প্রামাণিক। যতক্ষণ কোন জ্ঞানের বিরোধী কিছু দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য। যে জ্ঞানে বস্তুদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হইতে ভিন্ন সম্বন্ধে বস্তুর প্রকাশ হয়, তাহা মিথ্যা। যখন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, তখন যে স্থানে সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানের সম্পর্কে সর্প দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই জ্ঞান মিথ্যা। যাহা তথ্য, তাহা তথ্য হইতে ভিন্নরূপে দেখাই মিথ্যা জ্ঞান। এই মতকে সৎখ্যাতি বলে।

উপরোক্ত মত ব্যতীত ভ্রান্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আছে : (১) আত্মখ্যাতি, (২) বিপরীত-খ্যাতি অথবা অন্যথাখ্যাতি এবং (৩) অখ্যাতিবাদ।

বিপরীত বা অন্যথাখ্যাতি—ন্যায় বৈশেষিক ও যোগদর্শনে স্বীকৃত ; আত্মখ্যাতি বৌদ্ধ-দিগের মত এবং অখ্যাতি মীমাংসা ও সাংখ্য-দিগের মত।

বৌদ্ধগণ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। এই বিজ্ঞান-প্রবাহ তাহার স্বীয় নিয়ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মানু-সারে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও মিথ্যা জ্ঞানের উদ্ভব হয়—তাহাতে বিজ্ঞান-বাহ্য কোন বস্তুর ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান-বাহ্য কিছু থাকিলেও, একটি বিষয় হইতে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও

মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তির কোন হেতু নাই। জ্ঞান-প্রবাহের মধ্যেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উদ্ভব এবং তাহাদের সংযোগ হয়। সত্য ও মিথ্যা উভয় জ্ঞানেই ইহা ঘটে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে বাহ্যকারণরহিত জ্ঞান হইতে যদি জ্ঞাতা ও ভ্রান্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে 'ইহা রজত' এই প্রত্যক্ষ হইত না। 'আমি রজত' ইহাই প্রত্যক্ষ হইত। 'বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই এবং আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বাহ্যবস্তু-উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়'—এ মতেরও কোন ভিত্তি নাই।

অন্যথাখ্যাতিবাদে শুক্তির বিশেষ ধর্ম ও রজতের ধর্মের ভেদ দৃষ্ট হয় না। আবার সেই সময়ে শুক্তির ঔজ্জ্বল্য ও অন্যান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ হইতে রজতের স্মৃতি আপনা হইতেই আবির্ভূত হয় এবং দৃষ্ট বস্তু রজত বলিয়া গৃহীত হয়। শুক্তি তখন শুক্তিরূপে জ্ঞাত হয় না, রজতের সহিত তাহার যে যে ধর্মের পার্থক্য তাহার জ্ঞান হয় না, কেবল রজতের সহিত তাহার সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয় বলিয়া রজতরূপে তাহার জ্ঞান হয়। রজতের স্মৃতি যে মনের মধ্যে আছে, এই তথ্যের তখন বোধ হয় না। কেবল রজত ও শুক্তির মধ্যে পার্থক্য-বোধের অভাব হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হইতে পারে না। কেননা যে জ্ঞান হয় তাহা ভাবাত্মক (positive), অভাবাত্মক (negative) নহে।

মীমাংসা-দর্শনের প্রভাকর-মতকে বলে অখ্যাতিবাদ। এই মতে প্রত্যেক জ্ঞানই সত্য, রজ্জুতে যখন সর্পজ্ঞান হয়, তখন দ্বিবিধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্মৃতি-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ রজ্জুর জ্ঞান ও স্মৃতি-সর্পের জ্ঞান। উভয় জ্ঞানই সত্য—কেবল তখন এইটুকু মনে হয় না যে, যে সর্পের জ্ঞান হইতেছে তাহা অতীতকালে দৃষ্ট। প্রত্যক্ষ রজ্জু ও স্মৃত সর্পের মধ্যে ভেদও লক্ষিত হয় না। ফলে সর্প দেখিয়া যাহা করিতাম, রজ্জু দেখিয়াও তাহাই করি; আমাদের আচরণ একরূপ হয়। এই আচরণই ভ্রান্তিদুষ্ট। স্মৃতি প্রমোষ (স্মৃতি-বিচ্যুতি) অথবা তাহার ফলে বিবেকাগ্রহ এখানে জ্ঞানের ত্রুটি। ইহা অভাবাত্মক, ইহাকে ভ্রান্তি বলা যায় না। ভ্রান্তি একটি ভাববাচক মানসিক অবস্থা।

কুমারিল-পন্থিগণ প্রভাকরের মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষ ও স্মৃত বিষয়ের ভেদজ্ঞানের অভাব হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হয় না। ভ্রান্তিতে যাহা দৃষ্ট হয়, অনেক সময় তাহা ভাবাত্মক। রজ্জু দেখিয়া যে সর্পের ভ্রান্তি হয়, সেই সর্পের জ্ঞান অভাবাত্মক নহে; তাহা জীবন্ত সর্পের ভাবাত্মক জ্ঞান। যখন রজ্জু দেখিয়া বলি 'ইহা সর্প' তখন বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্য 'ইহা' এবং বিধেয় 'সর্প'—উভয়ই সত্য; রজ্জু ও সর্প উভয়েরই জগতে অস্তিত্ব আছে। রজ্জু ও সর্পকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে বাক্যে সম্বদ্ধ করাই ভ্রান্তি—এই প্রকার ভ্রান্ত 'সংসর্গ'ই (বাক্যের মধ্যে সংযোগ) ভ্রান্তি। সম্বদ্ধ বিষয়গুলি সত্য, তাহাদের মধ্যে ভ্রান্তি নাই। এই প্রকার' ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত আচরণ সত্য জ্ঞান হইতে উদ্ভূত আচরণ হইতে ভিন্ন। এই মতের সহিত ন্যায়দর্শনের অন্যথাখ্যাতি- বা বিপরীতখ্যাতি-বাদের ভেদ নাই, অখ্যাতিবাদ স্বীকার না করিলেও কুমারিল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন।

পূর্বমীমাংসার তত্ত্ববিজ্ঞান

মীমাংসা-দর্শন বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহাদের সত্য অস্তিত্ব আছে। তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক নহে। বৌদ্ধ শূন্যবাদ

মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যাখ্যাত, বেদান্তের মায়াবাদও অস্বীকৃত। বহুবস্তুসমন্বিত বাহ্যজগৎ সত্য,—তাহার অস্তিত্ব মায়িক নহে, প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত মীমাংসা-দর্শনে আত্মা, দেবতা, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্তব্যতা উপদিষ্ট। জীবাত্মার সংখ্যা বহু, তাহারা নিত্য। জগতের উপাদান সকলও নিত্য, জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কর্মের নিয়ম কর্তৃক শাসিত।

জগতে আছে ত্রিবিধ বস্তু—(১) ভোগায়তন জীবদেহ, (২) দেহ-সংশ্লিষ্ট ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ, এবং (৩) ভোগ্য বিষয়। দেহের দ্বারা জীবগণ কৃতকর্মের ফলভোগ করে, ইন্দ্রিয়গণ-সাহায্যে এই ভোগ সাধিত হয়। ভোগ্য বিষয় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই জনক।

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, মীমাংসকদিগের কেহ কেহ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণু-উপাদান দ্বারা জগৎসৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না। কর্মের শক্তি দ্বারাই পরমাণু নিয়ন্ত্রিত। জীবদিগের কর্মানুযায়ী ভোগের জন্য যেরূপ জগতের প্রয়োজন, কর্মের শক্তিতেই সেরূপ জগৎ সৃষ্ট হয়।

মীমাংসা-দর্শন প্রত্যক্ষবাদী নহে। অপ্রত্যক্ষ বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা বৈদিক জ্ঞানকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ পার্থক্য নাই। জাতি, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভাকর ও কুমারিলের মত প্রায় এক প্রকার, কোন কোন বিষয়ে কুমারিল ন্যায়দর্শন অপেক্ষা সাংখ্য কর্তৃক অধিকতর প্রভাবিত। হিন্দু দর্শনসকলের মধ্যে সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনই কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (physics) একটা চিত্র তাত্ত্বিক দর্শনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে অল্প পরিবর্তিত আকারে ইহা গৃহীত হইয়াছে। কুমারিল ও প্রভাকর বৈশেষিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনে অনুশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকের মত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের মিল নাই। মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা। ঈশ্বর হইতে বেদের প্রামাণ্য উদ্ভূত নহে, এবং অন্য প্রমাণ দ্বারাও বেদের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মীমাংসা প্রথমেই সকল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে 'কিরূপে ধর্ম অর্জন করা যায়?' তাহা ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না; কেননা ধর্ম এমন কোন বিদ্যমান বস্তু (existing something) নহে, যাহার জ্ঞান অন্য প্রমাণ দ্বারাও লাভ করা যায়। পরন্তু কেবল বেদের আদেশ পালন দ্বারাই ধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম ও অধর্ম জ্ঞানের জন্য বেদের শব্দ-প্রমাণই আমাদের একমাত্র উপায়; অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছিল—কারণ তাহা ভিন্ন অনেক বৈদিক বাক্যের অর্থ বোধ করা দুঃসাধ্য। অন্য সকল দর্শনে সৃষ্টি- ও প্রলয়-বাদ অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করিলে বেদের নিত্যত্ব থাকে না, এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বই এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে অস্বীকৃত।

আত্মা

যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ও তাহার ফলভোগের জন্য দেহব্যতিরিক্ত আত্মার প্রয়োজন। আত্মা

না থাকিলে যজ্ঞই বা কে করিবে, স্বর্গেই বা যাইবে কে? সুতরাং মীমাংসা-দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে আত্মা ভিন্ন। আত্মা নিত্য, বিভু এবং বহু। প্রত্যেক দেহে একটি করিয়া আত্মা। শবরস্বামী জ্ঞাতার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা স্বসংবেদ্য (আপনা কর্তৃক জ্ঞেয়) কিন্তু অন্য কর্তৃক অদ্রষ্টব্য ও অদর্শয়িতব্য। শবর-মতে আত্মা ও সংবিদ্ (consciousness) অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানাতিরিক্তঃ স্থায়ী জ্ঞাতা বর্ততে'—জ্ঞানের অতিরিক্ত স্থায়ী জ্ঞাতা আছেন। সেই জ্ঞাতা আপনাকে জানেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

নিদ্রাকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকে। বুদ্ধি যদি আত্মার নিত্য সহচর হইত, তাহা হইলেও তাহারা যে অভিন্ন, তাহা বলা যাইত না। ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ে অনুভূত বিষয়-সকলের একত্ব-বিধান আত্মা কর্তৃক সাধিত হয়। সকল জ্ঞানেই আমরা জ্ঞাতাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করি। দেহের উপাদানসকল অচেতন; তাহাদের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহ তাহার অতিরিক্ত আত্মার উদ্দেশ্যসাধক, এবং আত্মা কর্তৃক চালিত। স্মৃতি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আত্মার পরিণাম হয়, কিন্তু সকল পরিণামের মধ্যে আত্মা বর্তমান থাকে। জ্ঞান আত্মার গুণ। আত্মা দ্রব্য। আত্মার পরিণাম হয়, এবং কর্মের ফল-ভোগের সময় সেই ফল-কারক কর্মের স্মৃতি আমাদের থাকে না। ইহা দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না। কর্মের ফলভোগের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তার প্রয়োজন। তাহা স্বীকার না করিলে কর্মবাদের কোন অর্থই হয় না। বৌদ্ধগণ কর্মফলের এবং পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় না। যে বিজ্ঞানপ্রবাহের কথা বৌদ্ধগণ বলেন, তাহা দ্বারা আত্মা, সংবিদ্, কামনা, স্মৃতি, সুখ ও দুঃখের ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিভিন্ন অংশে যে পরিণাম ঘটে, আত্মা তাহা অবগত হন। সুতরাং আত্মা অণুপরিমাণ নহেন। আত্মা বিভু এবং একটির পরে অন্য একটি দেহ ধারণে সক্ষম। আত্মার শক্তি দ্বারাই দেহ চালিত হয়। আত্মা বহু। তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হইত না। শরীরের ক্রিয়া দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অন্য আত্মার অস্তিত্বও অন্য দেহের ক্রিয়া হইতে অনুমিত হয়। এক সূর্য হইতেই জলে বহু প্রতিবিম্ব-সূর্যের উদ্ভব হয়—এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মা যে এক ও অদ্বিতীয় তাহা প্রমাণিত হয় না; কেননা জলে বিভিন্ন প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ তাহাদের আধার ভিন্ন ভিন্ন জলাশয় হইতে উদ্ভূত হয়। এই উপমা আত্মার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে বিভিন্ন দেহে আত্মা-প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ দেহ হইতে উদ্ভূত হয়, বলিতে হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ অচেতন দেহের গুণ হইতে পারে না। সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ, সুতরাং আত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বলা যায় না।

বিশ্বকৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই যুগে বিশ্বকৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে মানবসমাজকে চালিত করিতেছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হইবার পরে আসে একটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের একটি লক্ষ্য ছিল—মানুষের দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া কিসে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যায়। কলকব্জা আবিষ্কৃত হইল। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল; কিন্তু কলকব্জা যখন বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া ব্যাপকভাবে তৈরী হইতে লাগিল, তখন যাঁহারা ঐসব ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা লোভপরতন্ত্র ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সমাজে ক্ষমতা অর্জন করিয়া অপরের উপর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দাসত্বের ভার চাপাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বিরাট বিরাট শিল্পকেন্দ্রে সহস্র সহস্র নরনারী আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপূর্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা অপহৃত হইল। মানুষগুলি পেটের দায়ে কলকব্জার অঙ্গহিসাবে কলের মতো জীবন যাপন করিতে লাগিল। কলকব্জা যেমন অনুভূতিশূন্য কার্য করিতে থাকে, মানুষগুলি মানবসুলভ অনুভূতি হারাইয়া নিষ্ঠুর কলের সেবা করিতে লাগিল। কলকব্জার নেতারা মানবসুলভ সমবেদনা হারাইয়া মানুষের প্রতি কলের মতো ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে মানবের ব্যক্তিত্ব (Human personality) খর্ব হইতে লাগিল। নির্মম ব্যবহারে নেতাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র হইয়া গেল এবং সাধারণ নরনারীর ব্যক্তিত্ব দাসত্বের শৃঙ্খলে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। মানবীয় আত্মাগুলি (Standardised) ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিচরণ করিতে লাগিল। জগতের বড় সমস্যা তখনই, যখন ব্যাপকভাবে মানবাত্মা হীন ও দুর্বল হইয়া মানবের সমষ্টিভূত কল্যাণকে ধ্বংস করিতে থাকে। মানবসমাজের দুর্দিন সেইদিন, যেদিন মানুষ ব্যাপকভাবে নিজেদের সত্তা হারাইয়া আত্মহা-ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে।

ঐ যুগে একদিকে ভোগবাদ বিজ্ঞানের জড়বাদকে আলিঙ্গন করিয়া মানবীয় কৃষ্টিকে সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। যে যুক্তিবাদের খাতে বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ঐ যুগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আদর্শহীন ও প্রাণহীন। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষা ও দীক্ষা সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। আত্মার অস্তিত্ব বা তাহার অমরত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় তখনকার যুগে উচ্চশিক্ষিত নরনারী ধর্মবিজ্ঞান বা দার্শনিক সত্যগুলিকে কয়েকজন বিকৃতমস্তিষ্ক তথাকথিত মহাপুরুষ বা মতলবী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রসূত মনে করিতে লাগিলেন। যে সত্য প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ, প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, প্রাচীন আলেকজান্ড্রিয়ার প্লটিনাস ও পরফিরী, প্রাচীন চীনের লাউজে প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন —উহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সন্দেহস্থল ও

কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যের এই তরঙ্গ প্রাচ্যের সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করিল এবং প্রাচ্যের কৃষ্টিভূমি ভারতবর্ষ বিশেষভাবে সর্বপ্রকারে আক্রান্ত হইল। পাশ্চাত্য রাজশক্তি ভারতের অতীত গৌরবকে খর্ব করিয়া ধর্ম, দর্শন ও নীতির উপর প্রবল আঘাত করিতে লাগিল। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে ভারতীয় জীবন ও কৃষ্টি পূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এখন নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার চাপে তাহা নূতন করিয়া পরপদানত হইয়া পড়িল।

সেই যুগে কলিকাতা মহানগরী ভারতবর্ষের অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। সর্বপ্রকারে আত্মবিস্মৃত করাইয়া যে শিক্ষা ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে পঙ্গু করিবে, সেই শিক্ষা সুচিন্তিত প্রণালীতে যে বৎসর প্রবর্তন করা হইল—সেই বৎসরই প্রাচীন জগতের তথা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

ইঁহার আবির্ভাবের পূর্বে কতিপয় মহাত্মা ও সম্প্রদায় ভারতের কৃষ্টি এবং প্রাচ্যের মৌলিকত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়গুলি এই প্রাচীন যুগের ভগ্নস্তূপের উপর কতকগুলি অস্থায়ী ও আংশিক সংস্কার করিলেন। প্রাচ্যের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি ও পূর্বতন যুগাচার্যগণের অলৌকিক প্রতিভাকে দাঁড় করাইয়া ঐ যুগের সর্বগ্রাসী বন্যারূপী প্রতীচ্য সভ্যতাকে ব্যাহত করিতে পারিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময় কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিতেছিলেন—সেই সময় শিক্ষিতাভিমানী ভারতবাসী বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, দেবদেবী, ভারতীয় দর্শন, পূজাপদ্ধতি, উপাসনাপ্রণালী, যোগশিক্ষা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক রীতি-নীতি এবং অবতারসমূহের জীবনকাহিনী ও বাণী প্রভৃতি সর্ববিষয়ে আস্থাহীন হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও জড়বাদের তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যুগে কোন কেতাবী শিক্ষার ধার ধারেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প বা সভ্যতার কোন কিছু তাঁহার জীবনে কোন ছায়াপাতই করে নাই। তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তা করিয়া নিজের জীবনকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গঠিত করিতেছিলেন। সত্যকে জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিবার জন্য তিনি এক তীব্র সত্যনিষ্ঠা লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অলৌকিক জীবনে কি বাক্যে, কি চিন্তায়, কি কর্মে, কি ধর্মে ও কি ব্যবহারে কখনও অসত্যের সম্পর্ক রাখেন নাই। কি জাগ্রতে, কি স্বপ্নে, কি নিদ্রায় তিনি অপূর্ব সংযম সাধনা করিয়া নিরন্তর, নিরবচ্ছ আত্মানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল সাধনার মূলে ছিল—ঐকান্তিকতা, বিচারশীলতা ও ব্যাকুলতা। বর্তমান যুগে মানুষ কত সহজ উপায়ে নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে পারে এবং সত্য মূর্ত হইয়া কি ভাবে সত্যান্বেষীকে সহায়তা করেন—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সাধক-জীবনের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই। সত্যের পথে বর্তমান যুগে কি কি বস্তু বিশেষ পরিপন্থী—তাহা তিনি সাধনপথে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতে যে মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল, তিনি তাঁহার সাধক-জীবনের প্রারম্ভে তাহা সাধনা করিয়া কৃতকার্য হন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যেমন প্রথমে মাতৃনামে ক্রন্দন

করিতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই সাধকভাবে ব্রতী হইয়া পরম সত্যকে 'মা' বলিয়া কাতর আহ্বান করেন। বৈদিক যুগের ঋষিদৃষ্ট সত্য-গুলি তিনি সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রামায়ণবর্ণিত সীতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীরামসহায় হনুমানের ভাবে সাধনা করিয়া তিনি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নয়ন-গোচর করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীর ভাবে সাধনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ভারতবাসীকে তিনি দেখাইলেন যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পিত বা ভক্তভাবিত ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহারা সত্যই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধ্যানসহায়ে তিনি যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্যকে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত পথের ঐক্য-দর্শন করিয়া 'যত মত তত পথ'-রূপ যুগবাণী প্রচার করিলেন। জৈন সম্প্রদায় ও নানক এবং তুলসীদাস প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। সর্বধর্মের এবং সর্বমতের সমন্বয়ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি নিজের বাণী জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বেদমত ও পুরাণমতের ঐক্য তাঁহার মধ্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছিল। পুরাণ ও তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি উভয়ের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সাধনা করিয়া নিজের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশঙ্করের মিলনভূমি তিনি দেখাইয়াছিলেন। যোগ ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ তাঁহার ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের পরিপূর্ণ সাধনা করিয়া অপূর্ব ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁহার জীবনে সদা জাগরূক থাকিত। ঋষি-প্রদর্শিত হিন্দু দেবদেবীকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে, অপিচ তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া আলাপ করিতেন। তিনি সকল অবতারগণের সহিত যেমন একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন, তেমন সকল দেবগণের মধ্যেও নিজের স্বরূপ দেখিতেন ও দেখাইতেন। বেদান্তের দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি মত-বাদগুলি তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার বাণীর মধ্যে এই সকল মতের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

তিনি ব্যাবহারিক জীবনে—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পাপী, কি সাধু সকলের মধ্যে এক আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি সন্তান-ভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। দারপরিগ্রহ করিয়া সহধর্মিণীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, জগজ্জননীর আসনে বসাইয়া ইষ্টদেবীরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া-ছিলেন। তিনি সহধর্মিণীর সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যুর বা পর-কালের ব্যবধান ছিল না। তিনি এই সম্পর্কে এক অনন্ত সত্তার মধ্যে ইহজীবন ও পরজীব-নের সমন্বয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাণী সর্বদেশ, সর্বধর্ম ও সকল শাস্ত্রকে এবং সকল অবতারপুরুষকে গ্রহণ করিয়া এক অপূর্ব সার্বভৌমিকতা সৃষ্টি করিয়াছে।

তাঁহার উপদেশ ও জীবন—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে সকল ব্যক্তিকে সমভাবে স্পর্শ করিতে পারে। তাই তিনি বর্তমান জগতে এত মৌলিক, এত অভিনব ও এত জীবন্ত প্রতীয়-মান হইতেছেন।

ভারতীয় জীবনকে ও ভারতীয় সমাজকে উন্নত করিতে তাঁহার বাণী বর্তমান যুগে

অদ্বিতীয় অনুমিত হইতেছে। তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছে এবং জাতীয় আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ভারতের আত্মাকে পূর্ণভাবে নিজ জীবনের ও বাণীর মধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রত্যেক ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের ও দেশের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কারণ, ইহা মানুষের প্রতি মানুষের একটি মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত করিতেছে। এই দিব্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কার্য করিলেই জগতের মধ্যে যে অশান্তি ও হানাহানি চলিতেছে—তাহার উপশম হইতে পারে। কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—সব নীতির মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিতে অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম চালিত না হইলে জগতের কল্যাণ ও শান্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তাঁহার বাণীর প্রকৃষ্ট রূপায়ণ। তাঁহার জীবনই জগতের ও ভারতের ইতিহাসে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান।

পদধ্বনি কানে আসে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অনন্তকালের স্রোতে সংখ্যাতীত বুদ্বুদের সম
উঠিতেছে নিত্য চিন্তা শত শত ভাবের আবেগে,
সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী যে বুদ্বুদ, তাহা সর্বোত্তম,
আর সবি মিশে যায় মহাতরঙ্গের স্পর্শ লেগে।
সে বুদ্বুদ গঙ্গাতীরে ভবতারিণীর ঘাটে তুমি
হংসের আসনে বসি রেখে গেছ প্রভু! সর্ব ধর্ম
করি সমন্বয়,—আজ সে যে করিতেছে বিশ্বভূমি
আলোড়িত! আসুরিক যন্ত্র-সভ্যতার ঘৃণ্য কর্ম
হতেছে বিলীন এবে উল্লোলিত চৈতন্য-সিন্ধুতে,
নিঃশ্রেয়স লভিবার দিন এলো বুদ্বুদঁ-বিন্দুতে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে যেই জ্যোতি এনেছিলে সাথে,
তারি শিখা হ'তে হেরি জ্বলিতেছে শত দীপশিখা;
অকম্পিত রহে তারা দুর্দিনের হিমশিলা-পাতে
ঝঞ্ঝার আঘাতে। মহাভারতের গূঢ় আধ্যাত্মিকা
স্পর্শে তব হয়েছে উদ্ধার যাহা, তার তত্ত্ববাণী
জেগে ওঠে দিকে দিকে কৃপাসিক্ত বীজমন্ত্রে তব।
জড়-অধ্যুষিত ধরা বুকে লয়ে পাদপদ্মখানি
মৌন প্রতীক্ষায় শবরীর সম। ধরি' রূপ নব
তুমি যে আসিবে ফিরে নরদেহে হেথায় আবার,
পদধ্বনি কানে আসে পূর্ণ করো তব অঙ্গীকার।

শুদ্ধা ভক্তি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

ধর্ম অর্থে সাধারণতঃ বোঝায় একটি মিশ্রভাব। সে ভাবের সাথে জড়িয়ে আছে অজানার ভয়, বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে বিস্ময় এবং নিজের অসহায়তার উপলব্ধি। দুর্বল মানুষ চায় এক বিরাট শক্তির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে। তার বিশ্বাস যে এই বিশ্বশক্তি সহানুভূতি-সম্পন্ন—চোখের জলে সে সাড়া দেয়, বিপদের মুহূর্তে সে পাশে এসে দাঁড়ায় ও অন্ধকারে চলার পথে সে আলো দেখায়। এই সহানুভূতিতে বিশ্বাসের ফলে আসে কৃতজ্ঞতা, যার পরিচয় আমরা পাই আদিম মানুষের দেবতার স্তবগানে।

সাংখ্যদর্শনের মতে দুঃখবোধই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার মূল কারণ—'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা'। কিন্তু এ প্রশ্ন শুধু দুঃখজনিত নয়। সত্য কিংবা তত্ত্ব জানবার ইচ্ছাও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অজ্ঞতার বেদনা তার কাছে অসহনীয়।

বিভিন্ন ভাবের এই ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে একজন প্রেমময়কে ভালবাসতে। তার এ অন্তরের আকুতি চিরন্তন। উপনিষদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারও আগে বৈদিক ঋষি করেছেন ভগবান বরুণের স্তব রচনা! সে গান প্রেমের সুরে বাঁধা। ভালবাসার মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুষমাবোধ আছে তারই স্ফুরণ বৈদিক ছন্দে 'উষা'র বন্দনায়।

পুরাণের ভক্তি আর্য ঋষির প্রাণধর্মের ক্রম-প্রকাশ। বেদবিভাগের ও মহাভারত লেখার পরও মহর্ষি ব্যাসের অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ হয়নি। তাই সেই শূন্য গগনে বেজে উঠল দেবর্ষি নারদের প্রেমের বীণায় হরিগুণগান। শ্রীমদ্‌ভাগবত হ'ল রচিত। সে ভাগবতের ভগবানকে স্তব করলেন বালক ধ্রুব :

> ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বম্
> সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
> তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলম্
> বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তোবন্ধো॥

—প্রভু, একদিন তোমারই দেওয়া জ্ঞানে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে পিতামহ ব্রহ্মা দেখেছিলেন এই বিশ্বকে ছায়াছবির মতন—যেমন ক'রে মানুষ দেখে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে সদ্য ঘুমভাঙা-চোখে। ওগো আর্তের বন্ধু, সেই তোমার মুক্তিপ্রদ পা-দুখানি এই সফলতার মুহূর্তে ধ্রুব ভুলে যাবে—এত অকৃতজ্ঞ সে নয়। বিষ্ণুপুরাণে গাইলেন প্রহ্লাদ :

> নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
> তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তে সদা ত্বয়ি॥

—ওগো অচ্যুত, যত বার যত নীচ জন্মই আমার হ'ক না কেন, তোমার পায়ে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে।

সেই অচলা ভক্তির আকর্ষণে অচল তত্ত্ব চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আর জ্ঞানময় দেখা দিলেন প্রেমময় হ'য়ে। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই :

> ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার,
> কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন ছার ;
> ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার,
> যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ;
> কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে
> ভক্তভাবে অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥

* * *

ভগবান কৃষ্ণের ভক্তভাবে সে রস আস্বাদনে

প্রতিজ্ঞা এবার পূর্ণ হ'ল 'কথামৃতে'। শ্রীরামকৃষ্ণ ফুল হাতে ক'রে প্রার্থনা করলেন, 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

যে বস্তু স্বভাবতঃ শুদ্ধ, তার সাথে কোন ভাব-মিশ্রণ—আচার্য শঙ্করের ভাষায় কোন 'সংযোগ' কিংবা 'সমবায়'—অসম্ভব। মানুষের ভালবাসা অবিমিশ্র অনুভূতি নয়; তার চিন্তাও শুদ্ধ নয়। তাই মানবীয় চিন্তা কিংবা ভাবের মাধ্যমে এই শুদ্ধা ভক্তিকে প্রকাশ করা যায় না। 'কথামৃতে'র ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান যেমন কেবল 'বোধে বোধ হয়', শুদ্ধা ভক্তিও তেমনি কেবল অনুভবেই অনুভূত হয়। এ ভালবাসায় প্রেমিক, প্রেমাস্পদ ও প্রেম একই অখণ্ড ভাবে পরিণত হয়। তাইতো দ্বৈত ও অদ্বৈতের সঙ্গমতীর্থে দাঁড়িয়ে সমাধির আলোতে অস্ফুটস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'তুমিই আমি, আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি-আমি খাও। বেশ কিন্তু করছো। এ কি ন্যাবা লেগেছে! চারিদিকেই তোমাকে দেখছি'।

শুদ্ধা ভক্তি সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বশূন্য। এ ভক্তির মধ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের কোন প্রশ্ন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁর প্রার্থনার অর্থ করছেন, 'জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে'। শুদ্ধা ভক্তির মধ্যে দ্বিতীয় কোন বোধের স্থান নাই; তাই সে জ্ঞান-অজ্ঞানের, পাপ-পুণ্যের পার।

এই ভাগবত প্রীতির কোন হেতু নাই। এ প্রেম অহৈতুকী। ভালবাসার কোন কারণ থাকলে তার নিজস্ব নৈতিক গৌরব থাকে না; সে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। কোন কারণের বিনিময়ে সত্যকারের ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয় হয় না। প্রেম—রূপপিপাসা, গুণানুরাগ কিংবা ঐশ্বর্যপ্রীতি নয়। শুদ্ধ ভক্ত 'ঐশ্বর্যময়' ভগবানকে ভালবাসতে পারে না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, গোপীরা যমুনায় ডুব দিয়ে বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে দেখেছিলেন, কিন্তু সে রূপ তাঁদের ভাল লাগল না—'শুদ্ধ ভক্ত ঐশ্বর্য দেখতে চায় না'। ঐশ্বর্যানুরাগ মনের দারিদ্র্যের পরিচায়ক, আর সত্যকারের ভক্তি অন্তরের সম্পদ্। ঠাকুর বলতেন, 'হাজরা বোধ হয় পূর্ব জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই ভগবানের অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়'। ভাগবত অনুরাগ যত নিষ্কাম হবে সাধকের অনুভূতির মধ্যে ঐশ্বর্যের ভাগ তত কম পড়বে। কথামৃতে পাই: 'সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঈশ্বরী মূর্তি। তারপর দ্বিভুজা—তখন অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তারপর কচি গোপাল-মূর্তি দর্শন, তখন কোন ঐশ্বর্যই নাই। এরও পরে আছে কেবল জ্যোতি-দর্শন···যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়বে'।

শুদ্ধা ভক্তিকে 'কথামৃতে' বলা হয়েছে, 'নিষ্কাম অমলা ভক্তি'। পার্থিব সুখের প্রশ্ন তো দূরের কথা, এ অনুরাগের মধ্যে কোনরূপ গ্রহণের মনোবৃত্তিই নাই। প্রেমের স্বরূপ আত্মদান, প্রতিদান গ্রহণ নয়। ভালবাসা দিতেই জানে, নিতে জানে না। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা, 'তোমাকে দেখতে আসি, কারণ তোমাকে ভালবাসি—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি······আনন্দ একটু হয়, তা কি ক'রব?' এ ভালবাসা নিজের আনন্দে নিজেই ভরপুর। এ আনন্দ প্রেমেরই স্বরূপ। অপত্যস্নেহের

রসেই যেমন মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা, নিছক ভাগবত প্রীতির মাধুর্যই তেমনি এই নিষ্কাম ভক্তির রূপ। শুদ্ধ ভক্ত প্রেমাস্পদকে ভালবাসে, বিনিময়ে ভালবাসা চায় না। এ 'সাধারণী' প্রীতি নয়, যা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়)—'নিজের সুখ চায়, তোমার সুখ হ'ক আর না হ'ক'। 'সমঞ্জসা' প্রীতি চায় 'আমারও সুখ হ'ক, তোমারও সুখ হ'ক'—শুদ্ধা ভক্তি, এ প্রার্থনাও করে না। এ সেই সমর্থা প্রেম, যা 'কৃষ্ণ-সুখে সুখী'। ভগবানের নিজস্ব আনন্দের মধ্যে শুদ্ধ ভক্ত হয় আত্মহারা। সেই অখণ্ড শান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথক্ ভাবে আনন্দবোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাইতো মহাপ্রভু বলেছেন :

মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য ॥

* * *

প্রশ্নটি অন্য দিক থেকেও আলোচনা করা যেতে পারে। যে বস্তু মৌলিক কিংবা প্রাথমিক, দর্শনের বিচারে তার কোন কারণ থাকতে পারে না। মুক্তিপিপাসা থেকে এই ভক্তি জন্মায় না, যদিও এই ভক্তির ফলে মুক্তি হ'তে পারে। 'কথামৃতে' শুনি, 'ভক্তবৎসল মনে করলেই মুক্তি দিতে পারেন'।

একথা সত্য যে ভাগবত প্রীতি অদ্বৈততত্ত্ব-লাভের একটি প্রধান উপায়, কিন্তু 'কথামৃতের' শুদ্ধা ভক্তি নিজেই একটি উদ্দেশ্য, নিছক উপায় নয়। অন্ততঃ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দরদী সাধক তাকে তত্ত্বজ্ঞানের সহায়-রূপে গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হ'ল, 'আচ্ছা ভক্ত, তারও তো এককালে নির্বাণ চাই?' উত্তর এল—নির্বাণ যে চাইই এমন কিছু নয়। এই রকম আছে যে 'নিত্যকৃষ্ণ, তাঁর নিত্যভক্ত। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম'······'মুষলং কুলনাশনং—মুষল যত ঘসেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞানবিচার কর, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে আবার ঘুরে ফিরে—'হরি, হরি, হরিবোল'। এইটে জেনে রেখো, আলেখ-লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়'।

শুদ্ধা ভক্তি অহৈতুকী বলেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরও তার প্রকাশ হ'তে পারে। যার কারণ নেই, তার রহস্যও ভেদ করা যায় না। এ ভালবাসা একই সাথে নিজেই উদ্দেশ্য, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় (যদিও সে উপায় সম্বন্ধে ভক্ত সম্পূর্ণ সচেতন নয়) এবং ব্রহ্মলাভের ফল। 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্ন : 'নারদ, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার কি শাস্ত্রে নাই? ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরও তিনি একটু আমি রেখে দেন, তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়·····শুকদেবের জড়সমাধির পরও আবার রূপ-দর্শন হ'ল·····হৃদয়মধ্যে চিন্ময় রূপ দর্শন করতে লাগলেন'। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকেও এই সত্য ফুটে উঠেছে :

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

'নিত্য-রাধাকৃষ্ণ আর লীলা-রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ। শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখনও লীলায়। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।' নিত্য ও লীলার মধ্যে এক অখণ্ড রসাস্বাদই শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি কোন মাধুর্যকে অস্বীকার করে না; গ্রহণ করাই তার নীতি, বর্জন করা নয়। কিন্তু এ গ্রহণ করার কোন ভেদবুদ্ধি নাই—বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভূতি নাই। নিত্য ও লীলার রসের মধ্যে কোন ভিন্নবোধ নাই। সূর্যের

আলোর বোধ তার জ্যোতির অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র হয় না। নিত্য ও লীলার সমরস আস্বাদনই শুদ্ধা ভক্তির মর্মকথা।

এই ভক্তি স্বভাবতঃ স্থির ও শান্ত, কিন্তু অনুরাগের একটি ফেনিল রূপের পরিচয়ও 'কথামৃতে' আছে। সে আবেগ-ভরা প্রীতিকে 'রাগভক্তি' কিংবা 'প্রেমাভক্তি' বলা হয়। এই রাগানুগা প্রীতির সাথে শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য সব সময় সুস্পষ্ট নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কোন স্থানে তাকে 'অহৈতুকী' বা 'শুদ্ধা ভক্তির' অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। তবু তিনি ফুল হাতে ক'রে মহামায়ার কাছে যে শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন তা নিছক রাগানুগা ভক্তি নয়। এ কথা সত্য যে 'রাগভক্তি' শুদ্ধা ভক্তির মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, সে 'স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মতো, তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না'। শুদ্ধা ভক্তির মতোই সে ঐশ্বর্যবোধহীন; মুক্তি-পিপাসাও তার নাই। তবু কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির মতো সে সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত নয়; এবং অত নির্ব্যক্তিকও নয়। 'শুদ্ধা ভক্তি' প্রধানতঃ একটি উদ্দেশ্য; 'রাগ ভক্তি' কথামৃতের অধিকাংশ স্থলেই একটি উপায়। যথা:

'ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি .....এই ভক্তি এলে সাকার নিরাকার দুইই সাক্ষাৎকার হয়'। এই রাগভক্তির প্রধান উপাদান ইষ্টের ভিতর রসের সন্ধান। এ রস যেন 'ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা; স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা'। মাতৃত্বের রসই সন্তানকে আকৃষ্ট করে, আবার বাৎসল্য-রসেই হয় মাতৃত্বের স্ফুরণ। ভাগবত রস সাধকের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে এবং রসময়কে সে নিবিড়ভাবে পেতে চায়। এই একান্ত ক'রে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে রাগভক্তি। উপনিষদ্ যাকে বলেছে 'রসো বৈ সঃ', তাঁর আকর্ষণই প্রেমাভক্তির মূল কারণ। হরিভক্তি-বিলাসে আছে:

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

—ইষ্টের ভিতর যে নিজস্ব রস আছে, সেই রসের আবিষ্টতার রঙে রাঙানো ভক্তিকে রাগভক্তি বলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'ঈশ্বরের এই মাধুর্যরসে ডুবে যা।'

রাগভক্তি একমুখী 'আমি কেবল রামচিন্তা করি—বার তিথি নক্ষত্র জানি না।' এই দিব্য একাগ্রতা সাধকের মনে আনে বাহ্য বিষয়ে উদাসীনতা—পরিপূর্ণ নির্বিকারতা। তাইতো কথামৃতের ভগবান হলধারীকে পূর্ণিমার দিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আজ কি অমাবস্যা?' এই রসতন্ময়তার ফলেই একদিন মহাপ্রভু ভাগীরথীকে যমুনা ভেবে স্তব করেছিলেন: 'চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী, দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী'। —চিদানন্দের আলোয় গড়া নন্দনন্দনের প্রেমপাত্রী যমুনা, তুমি যে ব্রহ্মের বিগলিত করুণা।

প্রেমাভক্তি নিয়মনিষ্ঠা নয়, কিংবা অনুষ্ঠান-প্রিয়তাও নয়। পুণ্যলাভের কিংবা ধর্মসঞ্চয়ের কোন প্রবৃত্তি তার নাই।—'এই অবস্থায় অমুক দিন সংক্রান্তি—ভাল ক'রে নাম ক'রব, এ সব আর মনে থাকে না।'

'এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয়কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না দয়া থাকে .....দয়া অর্থ সর্বজীবে ভালবাসা।' প্রেমা ভক্তি নির্মম নয়, সে একনিষ্ঠ বলেই তার 'মায়া' নাই, সংসারাসক্তি নাই। পার্থিব প্রীতির সাথে দিব্যানুরাগের সামঞ্জস্য করা যায় না।

কথামৃতের ভগবানের ভাষায়—'প্রথমে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ভগবানে থাকে তবে ভক্তি হয়। শুদ্ধা ভক্তি হওয়া বড় কঠিন।' প্রেম স্বভাবতই একনিষ্ঠ। যে কারণে সতীর দুইজন প্রেমিক হয় না, ঠিক সেই কারণেই ভক্ত একই সাথে ভগবান ও সংসারকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা ভাগ হ'য়ে গেলে তার নৈতিক গৌরবও থাকে না। প্রেম ত্যাগমন্ত্রপূত। সন্তানের স্নেহে মা আত্ম-সুখে দেন জলাঞ্জলি; আর ভগবানের অনুরাগে ভক্ত সংসার-সুখে হন বীতস্পৃহ। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে: 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারবে, সে আমার শিষ্য হ'তে পারবে না।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।'

শুধাইনি তব পরিচয়

শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী

ভগবান, যুগে যুগে এ-ধূলায় তুমি নেমে এসে
দুঃখী তাপী পতিতেরে দাও তব অমৃতের স্বাদ,
দুর্বলেরে রক্ষা করো, ক্ষমা করো সর্ব অপরাধ,
মর্মজ্বালা মুছে দাও অশান্তের, তুমি ভালোবেসে
সংসার-গরলভার দূর করো—করুণায় হেসে
ওগো নীলকণ্ঠ, এই মরণের মাঝেতে অবাধ
বহাও অমৃত-বীজ, তমোঘন সর্ব অবসাদ;
রাত্রির তিমির সম কোথা যায় উষার উন্মেষে।
ভগবান রামকৃষ্ণ, এসেছিলে এ মর্ত্য-ধূলায়
আমাদের কান্না শুনে,—অহেতুক ওগো কৃপাময়!
আমরা খেলায় মেতে শুধাইনি তব পরিচয়;
আজ দেখি দিকে দিকে মানুষের মায়ার কুলায়
তোমার করুণা ভরা; বুঝি বা এখনো আছে ক্ষণ
এসেছি আকুল হ'য়ে বুকে বয়ে এ-কাঙাল মন।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমারে পাওয়ার পথ কত যে দুর্গম,
কর ক্ষুরধার—তাহা জানি প্রিয়তম।
তবু নাই সে উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা—
যাহারে আশ্রয় করি সমস্ত ভাবনা
তোমার চরণপদ্মে কেন্দ্রীভূত হয়।
জড়তায় পঙ্গু চিত্ত ঘুমাইয়া রয়
পঙ্কিল তন্দ্রার মাঝে। আর কতদিন
মৃত্তিকা আঁকড়ি রবো চলচ্ছক্তিহীন
বৃক্ষসম? দাও প্রভু, দাও সেই পাখা—
যাহে ভর করি যাবো ইন্দ্রধনু আঁকা
বর্ণাঢ্য স্বপ্নালু ওই দূর দিগ্বলয়ে,
তোমার আনন্দময় জ্যোতির নিলয়ে।
জড়তা ভাসায়ে দাও উৎসাহ-প্লাবনে;
আমার শক্তির উৎস তোমারই চরণে।

ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

শ্রীযুগলকিশোর দে

অখিল-রসামৃত-মূর্তি সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের স্বরূপ-নির্ণয়ের ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য যত শাস্ত্রাদির কথা আমরা জানি তন্মধ্যে শ্রীভাগবতকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আমরা এখানে তাহারই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করিব।

(১) বক্তা ও শ্রোতা লক্ষণে :
গীতার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই এক বিশেষ কর্তব্য-পরায়ণ অবস্থায় আসীন। উভয়েরই হস্তে কর্তব্য-ধর্মের যন্ত্রাদি; সারথিরূপে বক্তার হস্তে অশ্বের বল্গা, আর শ্রোতা—যিনি রথী—তাঁর হস্তে ধনুর্বাণ। আলোচনার সুর সর্বাত্ম-সমর্পণে উঠিয়াছে; আদেশ হইতেছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। গীতা শ্রোতাকে যেখানে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, শ্রীভাগবতে দেখি ঠিক সেই অবস্থাতেই শ্রোতা উপবিষ্ট। গঙ্গার উন্মুক্ত পবিত্র তীরে সমবেত ঋষিগণ, নিজ প্রজাগণ প্রভৃতির মধ্যেই সমস্ত কামনা-বাসনা-মান-অভিমানশূন্য হইয়া রাজাধিরাজ উপবিষ্ট। অপর দিকে বক্তা সর্বত্যাগী পরমহংসমুকুটমণি। গীতা যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, ভাগবত সেখান হইতে আরম্ভ হইল। কি অপূর্ব দৃশ্য!

কেবল তাহাই নহে, গীতায় বক্তা ভগবান স্বয়ং, ভাগবতের বক্তা ভগবৎপ্রিয় সর্বত্যাগী ভক্ত। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, আমি বলিলে জগৎ হয়তো বিশ্বাস করিবে না—তাই হে পার্থ, তুমি বল, তুমি ভক্ত, তোমার কথা জগৎ বিশ্বাস করবে—বল 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। এখানে শ্রীভগবান নিজ বাক্য হইতেও ভক্তমুখনিঃসৃত বাক্যকে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন, আর সমস্ত ভাগবতখানা দেখি সেই ভক্তমুখের বাক্য-সুধায় সুধান্বিত।

(২) ভাগবত-সভার অধিবেশনে :
নিখিল বিশ্বের মধ্যে একমাত্র শ্রীভাগবত ব্যতীত অপর কোন ধর্মগ্রন্থের এত অধিক অধিবেশনের কথা শুনা যায় না, ভারতের বেদ উপনিষদ্ ও অন্যান্য পুরাণাদিরও নয়। একাধারে ভক্ত ও ভগবানকে আদিপ্রবর্তকরূপে স্বীকার করিয়াই পুরাণ-চক্রবর্তী শ্রীভাগবত জগতের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল। শ্রীভাগবতে : (১।৩।৪৩)

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

দ্বিবিধ ধারায় (শ্রীভগবান ও ভক্ত) এই ভাগবতের ১৪টি অধিবেশন হইয়াছে—শ্রীভগবান হইতে ৬টি, ভক্ত-পরম্পরায় ৮টি। শ্রীভগবান হইতে :

শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা (১ম অধিবেশন), ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি নারদ (২য় অধিঃ), দেবর্ষি নারদ হইতে শ্রীব্যাসদেব (৩য় অধিঃ), শ্রীব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব (৪র্থ অধিঃ), শুকদেব হইতে পরীক্ষিত মহারাজ ও সভাস্থিত শ্রীসূত গোস্বামী (৫ম অধিঃ), সূত গোস্বামী হইতে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ ও জগদ্বাসিগণ (৬ষ্ঠ অধিঃ)। ভক্ত হইতে :

শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে সনৎকুমার (১ম অধিঃ), সনৎকুমার হইতে সাংখ্যায়ন (২য় অধিঃ), সাংখ্যায়ন হইতে দেবগুরু বৃহস্পতি (৩য় অধিঃ), বৃহস্পতি হইতে উদ্ধব (৪র্থ অধিঃ), উদ্ধব হইতে পরাশর (৫ম অধিঃ), পরাশর হইতে

পুলস্ত্য (৬ষ্ঠ অধিঃ), পুলস্ত্য হইতে মৈত্রেয় (৭ম অধিঃ), মৈত্রেয় হইতে বিদুর (৮ম অধিঃ)।

(৩) **ঔদার্যে :**

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥

ভাঃ ১১।২।১২

এই শ্লোকে বাধাবন্ধনহীন এক সর্বজনীন উদারতা। ভাগবতের প্রথমেও এই বাণীরই সার্থকতা-জনিত এক পরম আশার বাণী রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে···সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ' ॥

(৪) **স্বরূপের যথার্থতা নির্ধারণে :** অনেকে গীতাবক্তা ও ভাগবতের কৃষ্ণকে একই বলিয়া মানিতে চাহেন না। কিন্তু ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা কুন্তীস্তব, ভীষ্মস্তব ও শিশুপালের উক্তি হইতে বুঝিতে পারি।

এই সকল স্থানে দেখি কুন্তীদেবী যাঁহাকে রথের সারথ্যরূপ নীচ কার্যের কথা বলিলেন, তাহাকেই নন্দনন্দন এবং তমালনীল কলেবর বলিলেন; এগুলি যাঁহাকে নির্দেশ করে, তিনিই যে গীতাবক্তা! গীতার মঙ্গলাচরণে যাঁহাকে গোপালনন্দন বলা হইয়াছে, শিশুপাল তাঁহাকেই গোপাল কুলপাংশুল বলিয়াছেন। তিনিই তো সেই গীতার গোপালনন্দন ও দেবকীনন্দন, গীতাতেই আমরা একথার সত্যতা জানিতে পারি। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন যখন তাঁহার মানুষী মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভগবান তাঁহার সেই মানুষরূপই প্রকাশ করিয়াছিলেন—'স্বকং রূপং দর্শয়ামাস,' এই স্বকীয় রূপ বলিতে মানুষরূপই এবং তাহার স্বীকৃতি অর্জুনের বাক্যেই পাওয়া যায়—যখন অর্জুন বলিলেন, 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং' ইত্যাদি তখন সহজেই বলিতে পারা যায় যে, এই মানুষ রূপটি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণমূর্তি।

(৫) **লীলাকথা বর্ণনে :**

শাস্ত্রে সর্বত্র ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানেরই জয়। শ্রীভাগবত এই তিনেরই জয়গাথার অমিয় মধুর গীতি-মাল্য। লীলাকথার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, উপলক্ষণে শ্রীনাম রূপ গুণ ও পরিকরকেও বুঝিতে হইবে। কেননা, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র অমিয় মধুর ভাষায় বলি,

'কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥'

ইহার প্রতিটিরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই দেখা যায়, সনকাদি গুণাকৃষ্ট হইয়া, শুকাদি লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন।

শঙ্করাচার্য বলিলেন, 'মুক্তা অপি লীলাবিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি'। শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় শ্রীভাগবতেরও এই রূপ আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই সনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতকে 'কৃষ্ণ পরিবর্তিত' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই ভাগবতী লীলাকথার আকর্ষণ অতল গভীর। মাথুরবিরহিণী ব্রজরমণীগণ 'ভ্রমরগীতি'তে এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু হে উদ্ধব! তাঁহার কথা ছাড়িয়া তো থাকা যায় না।'

স্বয়ং লীলাকথা-কীর্তনকারীকে 'কে তুমি আচম্বিতে আসি আমারে পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত' (চৈঃ চঃ মধ্য), বলিয়া শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; অথচ সেই ব্যক্তিকে তিনি স্পর্শ করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার সংকল্প। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, যে আবেশে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছুটিয়াছিলেন, ঠিক সেই আবেশেই—বরং ততোধিক আবেশে তিনি কৃষ্ণ-কথাকীর্তনকারী (প্রতাপরুদ্র)কে ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত এই লীলা-কথারই কাহিনী; শ্রীভাগবত তাই প্রেমভক্তির

মন্দাকিনী, অশ্রুজলের নির্ঝরিণী; তাই শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন:

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তিরস পাত্র ॥ (চৈঃচঃ আদি)

তাই দেখা যায়, গোস্বামিপাদগণ—যেমন শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহকে 'হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম' বলিয়াছেন, তেমনি আবার দেখা যায় শ্রীভাগবতকেও 'মন্মহাধন', 'মদেকবন্ধো', 'সদ্‌গুরো' প্রভৃতি বলিয়াছেন। শ্রীশ্যামসুন্দরকে 'ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম' বলিয়াছেন, আবার শ্রীগ্রন্থকে 'ত্রয়ী' রূপে দর্শন করিয়াছেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান এই 'ত্রয়ী'-সংজ্ঞক ভাব লইয়াই শ্রীমৎ সনাতন শ্রীভাগবতকে 'শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত, ...কৃষ্ণ তুভ্যং নমো নমঃ' বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও আমরা শ্রীভাগবতকে শ্রীভগবানের মূর্তবিগ্রহরূপে বর্ণিত দেখি—

'পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ......
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্ ॥'

(৬) **শ্রীনামমাহাত্ম্যে:**

নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীভগবানের লীলার মতো ভগবন্নামের আলোচনা আর অন্য কোন গ্রন্থে এতাদৃশ দেখা যায় না।

এইজন্যই আমরা দেখি, ভাগবতের প্রথমে ও শেষে যেমন শ্রীভগবানের প্রণাম ও বন্দনা—ঠিক সেই প্রকার শ্রীভগবন্নামেরও প্রণাম ও বন্দনা। আবার যেমন 'সত্যং পরং ধীমহি' বলিয়া ভগবানকে বন্দনা—ঠিক নামকে সেই প্রকার 'সত্যং পরং ধীমহি' বলিয়া বন্দনা, এই প্রকার প্রণাম ও বন্দনা এবং শ্রীভগবন্নামের এরূপ সুষ্ঠু আলোচনা অন্যত্র আছে বলিয়া জানি না।

এই সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা একান্ত দরকার যে শ্রীভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহার সকল কিছুরই এক অপূর্ব ও অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ভাগবতে, এমনকি তাঁহার 'দাম'-বন্ধনের রজ্জুটিকে পর্যন্ত অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে। তাই দেখা যায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, অশন, বসন, প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগকেও বন্দনা ও প্রণাম করা হইয়াছে—এমনকি তাহাদের করুণা ভিক্ষাও করা হইয়াছে। শ্রীসনাতন সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকৃপাকে বন্দন করিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তব কারুণ্যমহিম্নে মে নমো নমঃ।'

যে গ্রন্থের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য, উহাকে 'বেদার্থ-পরিবৃংহিত', 'গায়ত্রীভাষ্য', 'ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাষ্যম্', 'ভারতার্থবিনিময়' প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

নদীয়ার নিমাই

শ্রীশম্ভুদাস মিত্র

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
—বিদগ্ধমাধব

যে সনাতন পুরুষের কথা বলিতেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার-জ্ঞানে পূজা করেন—অংশাবতার নয়, যুগাবতার নয়, মন্বন্তরাবতার নয়, পরন্তু লীলাময় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান।

ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় অবশ্য তাঁর পূর্ণাবতারত্ব স্বীকার করেন না। তথাপি ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বঙ্গমাতার তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। পূর্বাকাশে উদিত হলেও চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাকিরণ ভারতের সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়েছিল।

নদীয়ার নিমাই ছিলেন একজন পরম পণ্ডিত। ১৬ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ ক'রে তিনি নবদ্বীপে একটি টোলে অধ্যাপনা করতেন। আর তাঁর বয়স যখন ২১।২২ বৎসর, তখন তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে অবলীলাক্রমে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেদিন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ—যে সমাজে তাঁর পিতা এবং পিতামহের সমবয়সী প্রবীণ পণ্ডিতগণও ছিলেন—সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে নিমাই নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এত সম্মান অন্য কোন ভাগ্যবান্ অদ্যাবধি পান নাই।

তথাপি তাঁর জীবনী-রচয়িতাগণ বারংবার বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম যৌবনে 'বিদ্যা-বিলাস' করেছিলেন—অর্থাৎ যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং বিদ্যাচর্চা তিনি করেছিলেন, তৎসমুদয় তাঁর একটি বিলাস বা ক্রীড়া মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি চিরদিনই পরম ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রেম এবং ভক্তিমার্গে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রে তিনি এ জগতে প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করেন। অধিকন্তু তাঁর ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে শ্রুতিতে, গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিযোগ বর্ণিত হয়েছে, তা কালে কালে নষ্ট বা লুপ্ত হ'য়ে যায়। প্রথমে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের প্রভাবে এবং তৎপরে নাস্তিক বৌদ্ধমতের প্রচারে এবং পরিশেষে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তমত-প্রচারের ফলে হরিভক্তি লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই হরিভক্তি জগতে প্রচার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে স্তুতি করেছিলেন এই শ্লোকে :

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্ চিত্তভৃঙ্গঃ॥

—কালের প্রভাবে নিজভক্তিযোগ লোপ পেলে শ্রীচৈতন্য তা প্রচার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পাদপদ্মে ভৃঙ্গের ন্যায় চঞ্চল আমার চিত্ত গাঢ়রূপে লীন হ'ক।

তিনি নিজে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সাত শত বৎসর পূর্বে আচার্য শঙ্কর আসমুদ্রহিমাচল উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।' সেদিন ভারতের অগণিত নরনারী স্তব্ধবিস্ময়ে দেখেছিল এক বিরাট প্রতিভা, শুনেছিল তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদান্তধর্ম। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মের যেমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর ধর্ম প্রচারেরও তেমনি ছিল মৌলিকত্ব। তিনি তাঁর প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন জগতের কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল সকলকে ভালবেসে। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

'এই মত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥'

আর সেই ধর্মপ্রচারের ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ভারতের আকাশ, বাতাস মুখরিত হয়েছিল হরিনামে, কৃষ্ণনামে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে।

তাঁর একটি বিরাট কীর্তি লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার। তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বৃন্দাবন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি যখন শুনলেন যে যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে, তাঁর প্রিয় গোপিনীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন, সেই লীলাভূমি হিংস্র জন্তুদের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়েছে, তখন তাঁর চোখ

ফেটে করুণা ঝরে পড়েছিল,—আমাদের প্রতি করুণা, জগতের পাপী তাপীদের জন্য করুণা। সেই করুণায় বিগলিত হ'য়ে তিনি তাঁর দুই প্রিয় ভক্ত ও অনুরক্ত পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে পাঠিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার-কার্যে। তাঁরা বৃন্দাবনে গিয়ে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আলোচনা ক'রে এবং নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি লীলাস্থল নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার করেছিলেন। কেবলমাত্র এই কারণেই প্রত্যেক ভারতবাসী শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর ঐ দুইটি ভক্তের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে সংস্কৃত এবং বাংলা সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। যদিও আমরা 'শিক্ষাষ্টকম্' ছাড়া তাঁর নিজের কোন রচনা পাই না, তথাপি তাঁরই প্রেরণায় তাঁরই শিষ্য এবং সেবক, ভক্ত এবং অনুরক্তগণ এই দুইটি ভাষা এবং সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি দান করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যে সম্পদ্ আমরা পেয়েছি, বিষয়বস্তু হিসাবে, তা চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ আমরা পেয়েছি শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকখানি অপূর্ব টীকা। টীকা যে কত সুন্দর, কত মধুর হ'তে পারে তা এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ না করলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই সমস্ত টীকা রচনা করেছেন শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এবং আরও অনেকে। দ্বিতীয়তঃ আমরা পেয়েছি বৈষ্ণব দর্শন ও স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি অপূর্ব গ্রন্থ, যা অদ্যাপি পণ্ডিত এবং ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ দান করে। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' এবং 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'—শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'লঘুভাগবতামৃত'—শ্রীজীব গোস্বামীর 'সর্বসম্বাদিনী', 'ষট্সন্দর্ভ' এবং আরও বহু গ্রন্থ এই পর্যায়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু কাব্য, নাটক এবং গীতি রচিত হয়েছে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' এবং 'ললিতমাধব', শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'গোবিন্দ-লীলামৃত' এবং বাংলা ভাষায় রচিত বহু গোস্বামিগণের প্রণীত কাব্যসম্ভার যা বৈষ্ণব সাহিত্য নামে খ্যাত, আজও আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করে। সর্বশেষে আমরা পেয়েছি শ্রীচৈতন্যদেবের কয়েকখানি মধুর জীবনচরিত। শ্রীবৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', শ্রীদামোদর স্বরূপের 'কড়চা', শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমুরারি গুপ্তের 'চৈতন্য-চরিত', শ্রীলোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' এবং আরও বহু অমূল্য গ্রন্থ বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাঙালী আত্মভোলা জাতি। তাই এই পরমপুরুষকে আমরা ভুলে রয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত মধুর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজ মনে করেন এ ছোটলোক নেড়ানেড়ীদের ধর্ম, শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের উপযুক্ত নয়। কিন্তু যেদিন আমরা আমাদের উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষার দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে এদিকে মনোনিবেশ ক'রব, সেই দিন আমরা বুঝতে পারব—আমাদের এই দেশে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং কি মধুর তাঁর প্রবর্তিত প্রেম ধর্ম। বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেন, শ্রীহরির কৃপা ব্যতিরেকে তাঁর মহিমা বোঝা সম্ভব নহে। সে কৃপা কবে আমাদের উপর বর্ষিত হবে?

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[দ্বিতীয় প্রবন্ধ]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে সর্বত্র অবতার বলিয়া পূজিত। জার্মান পণ্ডিত Winternitz-এর মতে বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখনও শ্রীরামচন্দ্র অবতাররূপে পরিগণিত হন নাই। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়, কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, অবতারগণের পৃথিবীতে অবস্থানকালে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাদের অবতারত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। প্রকৃতপক্ষে দেহ-পরিত্যাগের পর তাঁহাদের দিব্য অলৌকিক চরিত্র ও কার্য ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইয়া প্রমাণ করে যে, তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধেও ইহা সত্য হওয়া স্বাভাবিক। কেবল অবতার কেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্বত্রই সাধক এবং সাধিকাগণ সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। জীবিতকালে তাঁহারা সাধক-সাধিকারূপে খ্যাতি লাভ করা দূরে থাকুক, কেহ কেহ নির্যাতন পর্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু দেহত্যাগের বহু বর্ষ পরে তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উচ্চ আসন লাভ করিয়া পূজিত হইয়াছেন। রাক্ষসদিগের অধিপতি রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া দেবগণের বিষ্ণুর সমীপে গমন ও অত্যাচারপীড়িত দেবগণ ও পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুর ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার আশ্বাস-প্রদান প্রভৃতি পরবর্তী রচনা বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়।

গীতামুখে শ্রীভগবান স্বয়ং অবতারগণের আবির্ভাবের প্রধানতঃ তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের ফলে যাঁহাদের চিত্তে বৈরাগ্য ও ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়, অবতারগণের আগমনে পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা ইহসংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। দুষ্টের বিনাশ রাম ও কৃষ্ণাবতারে অস্ত্রসংহারের দ্বারা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ ও চৈতন্যাবতারে করুণা ও প্রেমই ছিল অস্ত্রস্বরূপ। ইহা ব্যতীত স্বীয় অনুপম চরিত্র ও কার্যের দ্বারাই যুগোপযোগী যে ধর্ম তাঁহারা স্থাপন করিয়া যান, বহুকাল ধরিয়া মানবজাতি তাহা অবলম্বনে জীবনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। সকল অবতারের জীবনেই এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষ প্রকট।

বাল্মীকি-রামায়ণে আদিকাণ্ডে রামের জন্ম, তাড়কা মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসবধ ও সীতার সহিত বিবাহ—এই তিনটি প্রধান ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামের বাল্যলীলা সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নাই। রামায়ণ-রচনাকালে শ্রীরামচন্দ্র যে অবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ। ভক্তপ্রবর তুলসীদাস বহু পরে তাঁহার 'রামচরিত-মানসে' রামের অলৌকিক বাল্যলীলা নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার প্রেম- ও ভক্তিপূর্ণ ভক্ত-হৃদয়ের অনুভূতি।

রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাজপ্রাসাদে রাজৈশ্বর্যে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। যদিও চারি ভ্রাতার মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অতিশয় দৃঢ় ছিল, তথাপি যে কারণে হউক—লক্ষ্মণ রামের প্রতি ও শত্রুঘ্ন ভরতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। চারি ভ্রাতাই অপরূপ রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট, অমিত বিক্রমশালী,

বিনীত ও মহদ্‌গুণসমূহে বিভূষিত। সকলেই বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দশরথের প্রাণতুল্য ও প্রজাগণের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুত্রগণের বিবাহের কাল সমাগত দেখিয়া দশরথ যখন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, তখন সহসা একদিন মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র নৃপতির সাক্ষাৎ মানসে অযোধ্যায় আগমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, কান্যকুব্জের রাজা গাধির তনয়। বাহুবলে বহুবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তিনি মহর্ষিগণের অন্যতম বলিয়া পূজিত হন। বিশ্বমিত্র-উপাখ্যান প্রমাণ করে যে, ঐ সময় পযন্ত জাতি-বিভাগ বংশগত হইয়া উঠে নাই। ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কেহ ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যাত্মপরায়ণ হইলেই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতেন।

বিশ্বামিত্র তখন সিদ্ধাশ্রম তপোবনে যজ্ঞ-সিদ্ধিকর এক ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। ঐ ব্রতানুষ্ঠানকালে কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করার নিয়ম ছিল না। ব্রত অসমাপ্ত থাকিতেই রাক্ষসগণ যজ্ঞবেদীর উপর রুধির বর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা অত্যাচার আরম্ভ করিল। নিয়মবদ্ধ বিশ্বামিত্র ক্রোধ প্রয়োগ করিতে না পারায় কোন প্রকার প্রতীকারে সমর্থ হইলেন না। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দশরথ সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এখান হইতেই রাক্ষসদিগের সহিত রামের সংগ্রাম আরম্ভ। রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে নর ও রাক্ষস অথবা রাম ও রাবণের যুদ্ধের ইতিহাস। কেহ কেহ ইহাকে আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে রামচন্দ্র কর্তৃক দাক্ষিণাত্যে অনার্য জাতিসকল বিজিত হয় ও আর্যধর্ম স্থাপিত হয়। এই রাক্ষসদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, ইহারা অতিশয় অত্যাচারী, হিংস্র ও ক্রূর ছিল। সমুদয় আলঙ্কারিক বর্ণনা, যাহা আতিশয্য দোষে দুষ্ট তাহা ছাড়িয়া দিলেও প্রমাণ হয় যে, ঐ সময় ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-দেশ পর্যন্ত বহু আর্যেতর জাতি বাস করিত। লঙ্কার রাজৈশ্বর্য, রাজ্যপরিচালনা নীতি, রাক্ষস-দিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম প্রভৃতি উহাদিগকে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া নির্দেশ করে না। বস্তুতঃ আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মবাদের উপর এবং আর্যেতর সভ্যতা ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব-ভোগসম্পদ যাহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বা লক্ষ্য, তাহারাই নীতিজ্ঞান-বিরহিত, পরস্বাপহারী, লোভী ও অত্যাচারী হয়। চরিত্র ও কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন উচ্চ মহৎ আদর্শ না থাকায় 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' নীতিই তাহাদের পরিচালনা করে। অসু- অর্থাৎ প্রাণ-ধর্মী বলিয়া ইহারা অসুর। মনে হয় যক্ষ, রক্ষ, অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি ইহাদের শ্রেণীবিভাগ মাত্র। বর্তমান যুগেও এই অসুরের সংখ্যা কম নহে। সভ্যতার আদি যুগ হইতে এই অসুরদল কর্তৃক মানব-জাতি নিরন্তর পীড়িত, অত্যাচারিত। কদাচিৎ ইহাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মভীরু বিভীষণ ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আবির্ভাব হয়। রাক্ষস-গণ নরমাংসভোজী ছিল কিনা বলা কঠিন। অমরকোষে 'রাক্ষস' শব্দে নিশাচর নির্দেশ করা হইয়াছে। নিশাকালে ইহারা যত্র তত্র বিচরণ করিত। ঋষিগণের তপোবনে অকস্মাৎ দলবদ্ধ-

ভাবে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া নানাভাবে অত্যাচার করিত। ঐ সময়ে সমুদয় রাক্ষস-দিগের অধিপতি ছিল লঙ্কার রাজা রাবণ।

বিশ্বামিত্র রাক্ষসগণের অত্যাচার নিবারণার্থে রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। মনে হয়, কিশোর হইলেও তখনই রামচন্দ্রের ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। স্নেহের পুত্র নয়নানন্দ রামকে তিনি কিরূপে তপোবনে প্রেরণ করিবেন? কাতরভাবে তিনি বিশ্বামিত্রকে অনুনয় করিলেন,

'রামেণাহং বিহীনশ্চ মুহূর্তমপি নোৎসহে।
জীবিতং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি॥
উদারগুণসম্পন্নং মনোহৃদয়নন্দনম্।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং ন মে ত্বং নেতুমর্হসি॥
প্রণিপত্যাভিযাচে ত্বাং কৃপণঃ পুত্রলালসঃ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং ন মে রামং ভগবন্ নেতুমর্হসি॥'

রামবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও জীবন-ধারণে সমর্থ নহি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না।······

···বিশেষতঃ রাম এখনও ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করে নাই, বালক বলিলেই চলে, রাক্ষসনিধন তাহার দ্বারা কিরূপে সম্ভব? বিশ্বামিত্রের আদেশে দশরথ নিজেই তপোবনে গমনপূর্বক রাক্ষস বধ করিয়া তাঁহার যজ্ঞ নিষ্কণ্টক করিবেন। দশরথের কাতর প্রার্থনা ও যুক্তির উত্তরে বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন রামচন্দ্রকে। দশরথ প্রমাদ গনিলেন। রামচন্দ্রকে তপোবনে প্রেরণ অসম্ভব, আবার বিশ্বামিত্রকেও ক্রুদ্ধ করিতে পারেন না। অবশেষে বশিষ্ঠ পরামর্শ দিলেন, রাম বালক হইলেও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। ইহা ব্যতীত বিশ্বামিত্র পূর্বে রাজধর্ম পালন করিয়াছেন, সুতরাং নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার তিনি অবগত আছেন। রামচন্দ্রকে ঐ সকল বিদ্যা শিখাইয়া দিলে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। বিশ্বামিত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

অতঃপর রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ মুহূর্তমাত্র রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং তিনিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রামের অনুগমন করিলেন। রাজধানী পিছনে পড়িয়া রহিল। রাম ও লক্ষ্মণ বনপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা প্রথমে সিদ্ধাশ্রমে গমনপূর্বক রাক্ষস সংহার করিয়া পরে রাজধানী মিথিলায় উপনীত হন। অযোধ্যা হইতে মিথিলা পর্যন্ত সমুদয় পথের বর্ণনা যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার ভৌগোলিক বিবরণ।

রাম ও লক্ষ্মণ রাজকুমার। আবাল্য রাজ-প্রাসাদে রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিত। অথচ কত অনায়াসে বনপথশ্রম স্বীকার করিলেন! নির্ভীক, সুকুমার কিশোরদ্বয় উৎসাহের সহিত রাত্রিকালে নদীতীরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, আহার ছিল বনের সুমিষ্ট ফল-মূল। বিশ্রামকালে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের পরিচর্যায় রত হইতেন। রামের বালকোচিত কৌতূহলের সীমা নাই। রাজধানীর বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতিশয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং পথ অতিক্রমকালে যাহা কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত, তৎসম্বন্ধেই বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করিতেন। বিশ্বামিত্র অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, দেশের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসীম। রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রত্যেকটি জনপদ ও নদীর বিবরণ দিয়াছেন। পথিমধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যা

দান করেন। প্রথম রাত্রি সরযূর দক্ষিণতটে ও দ্বিতীয় রাত্রি গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অতিবাহিত হয়। প্রভাতে নৌকায় নদী পার হইয়া ক্রমে তাঁহারা এক বিশাল অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, পূর্বে ঐ স্থানে এক বিখ্যাত জনপদ ছিল, বর্তমানে উহা মহাবলশালিনী তাড়কা নামে রাক্ষসীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত। ঐ রাক্ষসীকে নিধন করা রামের কর্তব্য।

তাড়কা পূর্বে ছিল যক্ষী, কিন্তু ঋষি অগস্ত্যের তথায় বাসকালে তাড়কা তাঁহাকে পরাভূত করিতে উদ্যত হইলে অগস্ত্য তাঁহাকে নরমাংস-ভোজী রাক্ষসীতে পরিণত করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বহু উপাখ্যান পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় রূপকে আবৃত। অন্তর্নিহিত তথ্য সব সময় উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। কথিত আছে, দক্ষিণ ভারতে অগস্ত্য ঋষি সর্বপ্রথম আর্য সভ্যতা প্রচার করেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, ঐ অঞ্চলে প্রচারকালে অগস্ত্য তাড়কার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন, নারীবধ-ভয়ে রামচন্দ্র যেন করুণা প্রকাশ না করেন। গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাগণের হিতসাধনই রাজপুত্রগণের সদা কর্তব্য। প্রজারক্ষণ তাঁহাদের সনাতন ধর্ম।

তাড়কাকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র সেই জনপদ অত্যাচারমুক্ত করেন। পরদিন সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হইলে তাঁহারা মুনিঋষিগণ কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। রাক্ষস-ভয়ে সকলেই ভীত। যথাকালে যজ্ঞানল প্রজ্বালিত হইলে মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয় অন্যান্য অনুচরগণসহ যজ্ঞ-বিনাশাভিপ্রায়ে বেদীর অভিমুখে ধাবিত হইলে রাম তাঁহাদের সংহার করিলেন। আশ্রম নিরাপদ ও কল্যাণযুক্ত হইল।

ঐ সময়ে মিথিলাপতি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা জনকরাজার সভায় অবস্থিত যে বৃহৎ ধনু এ পর্যন্ত কোন নৃপতি উত্তোলন পর্যন্ত করিতে পারেন নাই —রামচন্দ্র তাহা দর্শন করেন। 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া রাম লক্ষ্মণ-সহ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক উত্তরদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই যাত্রাকালে বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জ নগরী, সগরবংশ ও নানা উপাখ্যানের সহিত গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁহার সাগর-সঙ্গম বর্ণনা করেন। উপাখ্যানের অন্তরালে গঙ্গানদীর উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর পর্যন্ত একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়।

শোণনদের তীরে কান্যকুব্জ নগরীর কথা বর্ণনা করিতে করিতে যখন অর্ধরাত্রি হইয়া গেল, বিশ্বামিত্র বলিলেন,

'নিস্পন্দাস্তরবঃ সর্বে সংলীনা মৃগপক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥
সূক্ষ্মেণাঞ্জনচূর্ণেন নভঃ কৃৎস্নমিবাঞ্জিতম্।
গ্রহনক্ষত্রতারাভিঃ কাঞ্চনীভিরিবাবৃতম্ ॥'

—রঘুনন্দন, দেখ, বৃক্ষসমূহ নিস্পন্দ, মৃগপক্ষিগণ নিদ্রিত এবং দিকসমূহ রজনীর অন্ধকারে আবৃত। সমস্ত নভঃপ্রদেশ যেন সূক্ষ্ম অঞ্জনচূর্ণের দ্বারা অনুলিপ্ত ও যেন কাঞ্চননির্মিত সমুজ্জ্বল গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজির দ্বারা আচ্ছাদিত।

সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে নদীতীরস্থিত নীরব বনভূমি ও তারকারাজিবেষ্টিত আকাশ কি মনোহর শোভাই না ধারণ করিয়াছিল!

প্রভাতে সম্মুখে বিস্তীর্ণ শোণনদ দেখিয়া রামচন্দ্র চিন্তিত হইলে বিশ্বামিত্র আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

'গাধ এব মহাবাহো তরিতব্যো যথাসুখম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥'

—হে মহাবাহো, এই নদ অগভীর। আমরা অনায়াসে যে কোন স্থান দিয়া পার হইতে পারি।

তবে আমি এই পথই স্থির করিয়াছি, যে পথে মহর্ষিগণ গমন করেন।

অবশেষে রাজধানী মিথিলানগরী দেখা গেল। নগরীর সমীপস্থ নির্জন বনে রমণীয় ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত মুনিগণ-পরিত্যক্ত ঐ আশ্রমটি কাহার?

'শ্রীমানবিরলচ্ছায়ো মুনিসংঘবিবর্জিতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যাসীদয়মাশ্রমঃ॥'

রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র অহল্যার উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। অহল্যাকে ব্যভিচারিণী জানিয়া গৌতম অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,

'ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি ত্বং নিবৎস্যসি॥
বায়ুভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্নিবৎস্যসি॥'

—অর্থাৎ তুমি বহু বর্ষ ধরিয়া সন্তাপ অনুভবকরত বায়ুভক্ষণ করিয়া সতত ভস্মশায়িনী ও সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বাস করিবে।

অহল্যার শাপ সম্বন্ধে পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত পলঘাট হইতে মুদ্রিত রামায়ণে আছে, 'বায়ুভক্ষা শিলা ভূত্বা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী' ইত্যাদি অর্থাৎ অহল্যা পাষাণরূপী হইয়াছিলেন। অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন—ইহাই অবশ্য সমধিক প্রচলিত।

অহল্যার প্রতি গৌতমের অভিশাপপ্রদান প্রসঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের গৌড়ীয় সংস্করণের সঙ্কলন করিয়া শ্রীঅমরেশ ঠাকুর ভূমিকায় যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, 'এই আখ্যানে ইহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অহল্যা গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং গৌতমও এই জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জন করেন নাই। তিনি অভিশাপচ্ছলে পত্নীকে প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার মন পাপ-পরিশূন্য হইলে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' অহল্যার উপাখ্যান তদানীন্তন সমাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গীরই সাক্ষ্য বহন করে।

গৌতম বলিয়াছিলেন,

'যদা ত্বিদং বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি তং দৃষ্ট্বা ধূতপাপা ভবিষ্যসি॥'

দশরথাত্মজ রাম যখন এই ঘোর বনে আসিবেন—তখন তাঁহার দর্শনে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

অতঃপর অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়া রামচন্দ্র অন্যান্য সকলের সহিত মিথিলায় উপনীত হইলেন। এখানে তিনি বিশ্বামিত্রের আদেশে জনক রাজার বৃহৎ ধনু ভঙ্গ করেন। রামের বীরত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া জনক পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বীর্যশুল্কা দুহিতা (অর্থাৎ যিনি বীর্যরূপ মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিব) সীতাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণের উদ্যোগ করিলেন। দশরথের নিকট দূত প্রেরিত হইল। দশরথ অপর পুত্রদ্বয় ও লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলে যথাসময়ে আড়ম্বরের সহিত রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত জনকের অপর কন্যা উর্মিলার এবং ভরত শত্রুঘ্নের সহিত জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির পরিণয়-কার্য সমাধা হইল।

পুত্র ও বধূগণকে লইয়া রাজধানী প্রত্যাবর্তন-কালে দশরথ আর একটি বিপদের সম্মুখীন হইলেন। পরশুরাম একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। পূর্বে একাধিকবার নিষ্ঠুরভাবে ক্ষত্রিয়গণকে নিধন করিয়াছেন। রাম জনক রাজার সভাস্থিত বৃহৎ ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন—এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বালক রামের বীরত্ব পরশুরামকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং তিনি পথিমধ্যে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস্ফালন পূর্বক তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত ধনুকে শর সংযোজনা করিতে বলিলেন। দশরথ প্রভৃতি সকলেই পরশুরামের ক্রোধ সন্দর্শনে ভীত ও কম্পিত হইলেন। রামচন্দ্র কিন্তু সহাস্যে অবলীলাক্রমে ভৃগু-প্রদত্ত ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে শর সংযোজনাপূর্বক তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন।

যথাকালে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ আনন্দে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সমালোচনা

ঋগ্বেদ : (প্রথম অষ্টক)—ডক্টর মতিলাল দাশ কর্তৃক ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের বাংলা ভাষায় পদ্যছন্দে অনুবাদ। প্রকাশক : ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ, Block K, Plot 467, কলিকাতা-৩৩ পৃঃ ২৩৩, মূল্য ৫৲।

গ্রন্থকার উক্তগ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের অনুবাদের পর 'অধ্যায় পরিচয়ে' গদ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ে কোন্ কোন্ মন্ত্রে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি বা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—তাহা এবং ঋষি, ছন্দ, সংখ্যা ইত্যাদি পদার্থগুলির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। বেদের ভাষ্যকার সায়ন, ব্যাখ্যাকার স্কন্দস্বামী, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মোক্ষমূলর, গ্রিফিথ্‌স্ প্রভৃতি বেদের অনুবাদকগণের অংশবিশেষে মতভেদেরও আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির অনুবাদ প্রায়ই মূলানুযায়ী হইয়াছে। পদ্যছন্দে অনুবাদ করায় বাঙালী পাঠকের পক্ষে শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইয়াছে।

সমস্ত বেদই যে সেই অমৃতস্বরূপ ভূমাকে বুঝাইয়া মানুষের বুদ্ধিকে পরিপূর্ণতায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহা তিনি (গ্রন্থকার) 'বেদরহস্য' নামক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন। যথা : 'বেদ অমৃত-বিদ্যা—অমৃতের পুত্রগণের জন্য তার প্রকাশ······ভূমার পরিপূর্ণতার বোধে উন্মীলন।' ইত্যাদি (১ পৃঃ ১১ পং)। আবার বলিয়াছেন : বিশ্বের সমস্ত শক্তিই সেই চৈতন্যের দিকে লইয়া যায় অর্থাৎ বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতিও পরম্পরাক্রমে সেই চৈতন্যের সন্ধান দিবার জন্য ব্যাপৃত।

কোন কোন স্থলে অনুবাদক কর্তৃক কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন : 'বেদ এই জীবনবাদ প্রচার করে।··· বৈরাগ্যের দীনতায় নয়, সমারোহে এবং উৎসবের আনন্দে।'

বেদ অমৃতবিদ্যা, অথচ বেদে বৈরাগ্যের কথা নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব? বৈরাগ্য ব্যতীত কি অমৃতত্ব লাভ হয়? বৈরাগ্য দীনতা নয়, ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিবার মহাশক্তি। আবার এক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে : 'বেদ মানুষকে বলেছে এই পৃথিবীকে ভালবাসতে। অজানা স্বর্গলোকের সুখের কামনায় জীবনকে উপবাসী ও ক্লান্ত করাকে যাঁরা ধর্ম মনে করেন, তাঁরা, শুনুন বেদের ·····উদাত্তবাণী।' (৩ পৃঃ ১৫ পং) ইহার বিরোধী কথা আবার দেখা যাইতেছে। যথা : 'যজ্ঞফল বহুধা প্রসারিত—অষ্টদিক্ পরিব্যাপ্ত ক'রে দ্যুলোককে যজ্ঞ ছেয়ে রেখেছে' (৮ পৃঃ ১৬ পং)। ইত্যাদি। এই সকল স্থলে গ্রন্থকার যদি উক্ত আপাত-বিরোধগুলির পরিষ্কার সমাধান করিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইত। অধিকারী-ভেদে, বেদ কোথাও ইহলোকের উপর জোর দিয়াছেন, আবার কোথাও বা পরলোকের উপর এবং শ্রেষ্ঠ অধিকারীর প্রতি সর্বত্যাগপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাবেই বিরোধের সমাধান হইতে পারে। —**মেধাচৈতন্য**

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নাটক (দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য)—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী প্রণীত। ১০২।৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৮৬; মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে :

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা আদিলীলা নাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাজীবনের আদিখণ্ড অবলম্বনে এই নাটক বিরচিত। ভাষা প্রাঞ্জল ও অভিনয়োপযোগী, তবে কোন কোন স্থানে সংলাপ দীর্ঘ কবিতায় প্রদত্ত হওয়ায় অভিনয় ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয়। ৮ অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে ৫২টি সুললিত গান আছে। ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা ইহার অভিনয় দর্শনে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রামাণিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হইবেন এবং ভক্তি ও তৃপ্তির আস্বাদ লাভ করিবেন।

গল্পে গীতা—শ্রীক্ষেত্রমোহন ভাদুড়ী প্রণীত। ৯, পশুপতি বোস লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২ ; মূল্য ১·৩৭ নয়া পয়সা।

ছাত্রছাত্রীগণের জন্য লেখা গল্পে গীতা। বর্তমানে বিভিন্নমুখী ভাবধারার প্রাবল্যে তরুণগণ বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় এইরূপ পুস্তকের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সমগ্র গীতাগ্রন্থের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমূলক উচ্চ তত্ত্বগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত না হইলেও গীতার মূল বিষয়-বস্তু সহজ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আদর্শ জীবন গঠনের উপাদান ইহাতে বহুল পরিমাণে সন্নিবেশিত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে জীবনের জয়যাত্রা, আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, জীবের দেহ ও আত্মা, গীতায় কর্মপদ্ধতি, কর্ম অকর্ম বিকর্ম, গীতায় যজ্ঞ, বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি আলোচিত। শুদ্ধিপত্রের বহির্ভূত বহু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে এইগুলি অবশ্য সংশোধনীয়।

কল্যাণ (হিন্দী): ৩৪তম বর্ষের ১ম সংখ্যা সংক্ষিপ্ত দেবীভাগবতাঙ্ক। সম্পাদক—হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০৪ ; মূল্য টাকা ৭·৫০।

হিন্দী ভাষায় সনাতন ধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ-' পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের পরিচালক-মণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই বিশেষাঙ্কের নাম 'সংক্ষিপ্ত দেবীভাগবতাঙ্ক।' ইহা প্রসিদ্ধ পুরাণ দেবী-ভাগবতের বারটি স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। পরমতত্ত্ব নিরূপণের সঙ্গে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, সদাচার প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অভিন্নস্বরূপা মহাশক্তি ভগবতীর বিবিধ কাহিনী, বিচিত্র লীলা, ভক্তরক্ষাকার্য, উপাসনা-পদ্ধতি, মন্ত্র, গায়ত্রী, দেবীভাগবত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর বিভিন্ন লীলা বর্ণন করিয়া এক রঙের (১৮) ও বহু রঙের (২২) এবং রেখাচিত্র (১৭৬) এই গ্রন্থের অলংকার। পূর্ব পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বিশেষাঙ্কটিও সুন্দর ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্ভারে পরিপূর্ণ। গ্রন্থাগার-সমূহের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। —**জীবানন্দ**

গীতা-জয়ন্তীঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ; প্রকাশক ঃ রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা ৩১, পৃষ্ঠা ২০৮, মূল্য দুই টাকা।

জনক-জননীর পুত্রশোক ভুলিবার উপায়রূপে বার্ষিক গীতা-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতা প্রচার এবং এই স্মারকগ্রন্থ সংকলন। দেবচরিত্র পুত্রকে স্মরণীয় করিবার এক সার্থক ও অভিনব পন্থা শোকার্ত পিতামাতা অবলম্বন করিয়াছেন। গীতার স্বর্গত ও জীবিত বহু বিখ্যাত ব্যাখ্যাতার লেখা হইতে নির্বাচন করিয়া এবং বার্ষিক গীতা-জয়ন্তীর বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা সংকলিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি সম্পাদিত। মোট ৩৫টি প্রবন্ধে গীতা সম্বন্ধীয় বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা পাঠকবর্গ জ্ঞান ভক্তি ও শান্তি লাভ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ ঃ গত ৭ই মাঘ (২১শে জানুআরি) বৃহস্পতিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম আবির্ভাব-উৎসব সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, কালীকীর্তন, হোম ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৬৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পার্শ্বস্থ গঙ্গাতীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী তেজসানন্দ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর জীবনী আলোচনাকালে বলেন যে, স্বামীজীর ধর্মমত জাতিগতভাবে বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ধর্মেতিহাস আলোচনা করিয়া ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বামীজীর আবির্ভাব আমাদের সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে।

পরিশেষে স্বামী তেজসানন্দ স্বামীজীর বাণীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার আহ্বান জানান।

পুরী ঃ গত ২১শে জানুআরি হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, নরনারায়ণ-সেবা, রামনাম, বক্তৃতা ও ছাত্রদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুচারুরূপে প্রচুর আনন্দসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআত্মবল্লভ মহান্তির সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় শ্রীসর্বেশ্বর দাস, শ্রীললিতমোহন বর্মন, শ্রীত্রিলোচন মিশ্র বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, সেবাধর্ম, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শ্রীকিশোরীমোহন ত্রিবেদী সংস্কৃত ভাষায় সভাপতি ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ দেন। ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিবৃন্দ স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দ দান করে।

তমলুক ঃ বিগত ২১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মতিথি-উৎসব তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজাপাঠ, প্রসাদবিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও সন্ধ্যা-আরতির পর আলোচনা-সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

পরে ২৪শে ও ২৫শে জানুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দ আশ্রমে ও তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ জানা স্বামীজীর সম্বন্ধে বলেন। সঙ্গীতবিশারদ শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর সুমধুর ভজন সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৩০শে জানুআরি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ ও 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তক হইতে পাঠ হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তির পৌরোহিত্যে ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন সুসাহিত্যিক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীবীরকিশোর ত্রিপাঠী এবং স্বামী অসঙ্গানন্দ। বিভিন্ন বক্তার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ, রামকৃষ্ণ মিশনের আর্তসেবা, স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিকতা, বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরে প্রায় ১৫০০ ভক্ত, বিদ্যার্থী ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্ম-সঙ্গীতের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত কর্মধারা :

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় : বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৭৫টি ছাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণীগুলিতে হিন্দী বাধ্যতামূলক, উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ঐচ্ছিক।

বেসিক ট্রেনিং স্কুল : ৭৬ জন শিক্ষালাভ করে। ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়। সিনিয়র বেসিক স্কুল : ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫১৮ (ছাত্রী ১৯৫)। বি. টি. কলেজ : ৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়। সমাজসেবা : S. E. O. T. C.তে ১৫ জন শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টা : এই বিভাগটি খোলা হয় ১৯৫৫ খৃঃ। সভাসমিতি, পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন, কারখানা, শ্রুতিচাক্ষুষী শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা করা হয়। ৭০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৭৫০ জন শিক্ষক এই কার্যে সহযোগিতা করেন।

গবেষণা : কোয়েম্বাতুর জেলার ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারণ জন্য এই বিভাগ ৪৫টি স্কুলে কার্য করিতেছে।

শারীর শিক্ষা কলেজ : আলোচ্য বর্ষের ৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

গ্রামীণ শিক্ষা : ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতেছে।

গ্রাম্য চিকিৎসা : এক্স্-রে সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। ৩০,৯০০ রোগী (নূতন ১৩,৭৭৪) চিকিৎসিত হয়। অস্ত্র-চিকিৎসা : ১৬৬

কনখল : সেবাশ্রম সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৭০৪ রোগী ভরতি হয়। বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৫,৩৩৯ (নূতন ২৭,৮২৩) ; অস্ত্র-চিকিৎসা ৩৪২টি ; লেবরেটরিতে ২,৯৩০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৪,৪৪১ ; পাঠাগারে ২৩ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। গড়ে দৈনিক ২৫০জনকে গুঁড়া দুধ এবং শীতকালে কিছু সোয়েটার ও গরম জামা গরীব ছেলেদের দেওয়া হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

উদ্বোধন (কলিকাতা) ঃ গত ১লা ফেব্রুআরি শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীর সংলগ্ন নব-নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ।

এতদুপলক্ষে ঐ দিন বিশেষ পূজা পাঠ হোম ভজনাদি হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রী শ্রীনাম কীর্তন হইয়াছিল। পরদিন বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সাধুগণ আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রসাদ ধারণ করেন।

বক্তৃতা-সফর

ওড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ঃ গত নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ওড়িষ্যা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা দেন। নিম্নে স্থান ও বক্তৃতার বিষয় লিপিবদ্ধ হইল :

স্থান	প্রতিষ্ঠান	বিষয়
কটক	প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান	কল্যাণরাষ্ট্রের শাসক
,,	রেডিও ক্লাব	উপনিষদের মাধুর্য
,,	অল ইণ্ডিয়া রেডিও	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্প
,,	সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন	ভাগবতের ভক্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ
মেদিনীপুর	বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ	ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশে (বাংলা)
,,	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম —বিদ্যালয়	উপনিষদ্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ (বাংলা)
,,	মহিলা মহাবিদ্যালয়	শিক্ষা
,,	মেদিনীপুর কলেজ	যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর বাণী
,,	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম —ছাত্রাবাস	আশ্রমিক ছাত্রদের উদ্দেশে (বাংলা)
বেলুড় মঠ	বিদ্যামন্দির	যুবকদের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান
,,	,,	ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা
,,	সমাজ-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষণ-কলেজ	শিক্ষকদের উদ্দেশে
কলিকাতা	রোটারি ক্লাব	বিবেকানন্দে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন
কলিকাতা	বলরাম মন্দির	উপনিষদের মাধুর্য (বাংলা)

আসামে ঃ গত সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসামের শিলং, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ডিগবয়, তিনসুকিয়া, মারগারিটা, মাকুম, লিডু, দুমদুমা, নাহারকাটিয়া, করিমগঞ্জ, শ্রীগৌরী, কালিগঞ্জ, ভাঙ্গা, গিরীশগঞ্জ, নিলামবাজার, কায়স্থগ্রাম, বারুইগ্রাম, ফাকুয়া-গ্রাম, নেতাজীনগর, সমৃদ্ধিপুর, কাঠিগড়া, হাইলাকান্দি, রামকৃষ্ণনগর, রাঙ্গাউটি, নালা-বাজার প্রভৃতি স্থানে আলোকচিত্র সহযোগে—'ভারতে শক্তিপূজা,' 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান', 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' ও 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' সম্বন্ধে মোট ৩৯টি বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

গত এক মাস যাবৎ স্বামী ঈশানানন্দ (বরদা মহারাজ) কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে বহু স্থানে ছোট বড় ভক্ত-সমাবেশে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন; কোন কোন সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা শুনিবার আগ্রহ সমাজে ক্রমবর্ধমান।

যে সকল স্থানে আলোচনা হইয়াছে নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লিখিত হইল : বলরাম মন্দির, বজবজ, সিঁথি (রামকৃষ্ণ আশ্রম) মাকড়দহ, খুরুট (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম), বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, চেতলা, আলিপুর।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

মহাজাতি সদন (কলিকাতা) ঃ

গত ১২ই জানুআরি মহাজাতি সদন ট্রাষ্টি বোর্ডের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকালে সদনের দ্বিতলে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র ও গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয় এবং সায়াহ্নে একটি সভা হয়। মাত্র একদিন-স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

সায়াহ্নে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া সারগর্ভ ভাষণে বলেন: শিক্ষাই জাতির প্রাণস্বরূপ, শিক্ষার সঞ্জীবনীতে দেশ ও জাতি প্রস্ফুটিত হয়। স্বামীজীর মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব, অমৃতত্ব, দেবভাব ও ব্রহ্মলাভ। স্বামীজী বলিয়াছেন, ব্রহ্মস্বরূপ জীবে প্রথম হইতেই ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব নিহিত থাকে। এই ব্রহ্মত্বকে বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য; অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই শিক্ষা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞানের বীজ নিহিত আছে, শিক্ষা উহাকে প্রকাশ করে মাত্র। অর্থাৎ বাহিরের শিক্ষা অন্তরের শিক্ষাকে প্রকাশ করার উপায় মাত্র।

বর্তমান সাম্যবাদের যুগে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই স্বামীজীর সর্বজনীন নীতি কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বিশ্বের সকল মানুষকে একই মহা মানব-জাতির অংশরূপে বিবেচনা করিলে পৃথিবীতে শান্তি আসিবে।

এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রবৃন্দ ধ্রুপদ ও স্বামীজীর গীত ও রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সকালে মহাজাতি সদনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, ৯৭ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এই দিনটি অতি গর্বের দিন। আজিকার দিনে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু আজি-কার দিনে মানুষ যদি প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহে তবে ভারতের অধ্যাত্মবাদের সাহায্যে মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

মহাজাতি সদনের সম্পাদক শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। স্বামীজী-ব্যবহৃত যষ্টি, কমণ্ডলু ও তানপুরা প্রদর্শনীতে রাখা হয়।

শ্রীরামপুর ঃ গত ২৪শে জানুআরি স্থানীয় টাউন হলে শ্রীরামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের উদ্যোগে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে মাল্যভূষিত স্বামীজীর একটি প্রতিকৃতিতে শ্রীরামপুর, মাহেশ, শেওড়াফুলি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয় এবং রচনা ও বক্তৃতা-প্রতি-যোগিতার পারিতোষিক দেওয়া হয়।

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য (সভাপতি) স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য

আহ্বান জানান। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন সমবেতকণ্ঠে সুন্দরভাবে গীত হইয়াছিল।

সালকিয়া (হাওড়া) : গত ৩০শে জানুআরি সালকিয়া তরুণদল কর্তৃক স্বামীজীর জন্মোৎসব বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীর একটি বৃহৎ মূর্তি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ বর্তমান যুগে স্বামীজীর বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও রূপায়ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

বেলগাছিয়া (কলিকাতা) : গত ২৬শে জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ - সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক, প্রসাদ-বিতরণ ও কালীকীর্তন হয়। অপরাহ্নে স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক কথামৃত পাঠের পর ধর্মসভায় স্বামী ঈশানানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সভাপতি) এবং স্বামী সাধনানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

শিকড়া-কুলীনগ্রাম : শ্রীরামকৃষ্ণ-মানস-পুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৮তম শুভ জন্মোৎসব তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রাম-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৩০শে ও ৩১শে জানুআরি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, ব্রহ্মানন্দ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, কথকতা, তীর্থপরিক্রমা, রামনাম, গোষ্ঠলীলা-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। প্রথম দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা করেন এবং দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ' অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

কার্যবিবরণী

কলিকাতা : স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বেদান্তমঠের (১৯এ, বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিভিন্ন কর্ম-ধারা লিপিবদ্ধ হইল।

শিক্ষা : কলিকাতায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, এখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় ; নৈতিক, শারীরিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ; ছাত্রসংখ্যা ২৫০। ফ্রি লাইব্রেরিতে মূল্যবান ৬০০০ গ্রন্থ আছে ; পাঠাগারে দৈনিক উপস্থিতি ২৫।৩০জন।

প্রকাশন : স্বামী অভেদানন্দের মূল ইংরেজী পুস্তকগুলি এবং কয়েকটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি নূতন বইও ছাপা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র বাংলা 'বিশ্ববাণী' প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

ধর্ম ও সংস্কৃতি : উপনিষদ্, ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে বক্তৃতা, ক্লাস ও আলোচনা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়।

পূজা ও উৎসব : আশ্রমে নিয়মিত পূজা, ভোগ, আরতি ও ভজন-কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট শংকরাচার্যের জন্মদিন যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখাকেন্দ্র : মূলকেন্দ্র ছাড়া ছাতরা (শ্রীরামপুর), দার্জিলিং ও মজঃফরপুরে একটি করিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল শাখাকেন্দ্র আছে। মজঃফরপুরে একটি হাসপাতাল, দার্জিলিংএ একটি বি. টি কলেজ ও একটি এল. টি কলেজ পরিচালিত হইতেছে।

কৃষ্টি-সংবাদ

দার্শনিক বৈঠক : আন্তর্জাতিক দর্শন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কেন্দ্র প্যারিসে। এ বৎসর মহীশূরে ঐ সংস্থার একটি আলোচনা-বৈঠক বসে, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আলোচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি এই সম্মেলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে।

ইউনেস্কো (UNESCO), এবং কয়েকটি দেশের সরকার এই সম্মেলনকে আর্থিক সাহায্য করেন। ইউনেস্কোর অঙ্গীভূত এই আলোচনা বৈঠকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমস্যাটি তিনটি ধারায় আলোচিত হয় : (১) বিজ্ঞান ও দর্শন, (২) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজ, (৩) জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য ও ঐতিহ্য।

বিশ্বধর্ম-সম্মেলন : গত ২রা হইতে ৯ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত কলিকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে শান্তি-স্থাপন ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ-প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ইহার উদ্যোক্তা মুনি শ্রীসুশীল কুমারজী মহারাজ। বিশ্ব অহিংসা সংঘের সভা, মহিলা সম্মেলন ও নিরামিষভোজীদের আলোচনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি অধিবেশনের অঙ্গ ছিল। শেষ দুইদিনের সভায় সাধারণের যোগদানের ব্যবস্থা থাকে।

পরলোকে রাজেন্দ্রলাল দে

গত ১৮ই পৌষ (ইং ৩রা জানুআরি '৬০) রাত্রি একটায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রলাল দে তাঁহার পুরুলিয়াস্থ বাসভবন 'সারদেশ্বরী কুটিরে' ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি অ্যানিমিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রম সংশোধন

মাঘ মাসের উদ্বোধনের ৩৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির পর পড়িবেন, 'আমি তাঁহাকে ময়মনসিংহ যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম'।

এ মাসের পত্রিকায় ৭৩ পৃঃ ৩য় পঙ্‌ক্তি পড়িবেন : হেনরী ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৫ই ফাল্গুন (২৮.২.৬০) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (৬.৩.৬০) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

উদ্বোধন

'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—'

তস্মৈ স হোবাচ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥

তত্রাপরা—ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৪-৫)

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালয়িতা ব্রহ্মা অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরা ঋষি তাহা লাভ করেন।

গৃহস্থশ্রেষ্ঠ শৌনকের মনে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিলে তিনি যথাবিধি অঙ্গিরা সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, কোন্ বস্তু ঠিক মত জানিলে এই সমস্তই জানা হয়?'

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন: 'দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে'—পরমার্থদর্শী বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। ঐ দুটি বিদ্যা—পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ।

তন্মধ্যে চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ [ইহলোকে ও পরলোকে সুখসাধক যাবতীয় জ্ঞান] সকলই অপরা বিদ্যা; এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরকে (ব্রহ্মকে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে) অনুভব করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

উপনিষদ্ বা বেদান্ত—বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বেদকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই পরা বিদ্যার প্রকাশক। —'এক জ্ঞানই জ্ঞান, নানা জ্ঞান অজ্ঞান।'

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মশিক্ষার স্থান ও কাল

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা কতটা এবং কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে—এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য গত আগস্ট মাসে বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি গঠিত হয়, তাহার সদস্যগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন: সমগ্র সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষাজগতে বর্তমানে যে দোষত্রুটি দেখা দিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ জনসাধারণের উপর ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এ অবস্থা প্রতীকারের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায়—অতি শৈশব হইতে দেশবাসীর মনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাদান' কমিটি (Committee on Religious and Moral Instruction) গঠনের প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণ করিতেছে—সারা দেশে নৈতিক মান দিন দিন নামিতেছে এবং ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে। কমিটি দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার পর তাঁহাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হইতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, এ বিষয়ে যদি কোন বাধা বিপত্তি থাকে তো তাহা সবল হস্তে দূর করা কর্তব্য। তাঁহারা মনে করেন না যে এই সিদ্ধান্ত সংবিধান-বিরোধী।

শ্রীপ্রকাশের নেতৃত্বে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণের সমাবেশে গঠিত এই কমিটির সিদ্ধান্তের মূল্য যথেষ্টই আছে। বিভিন্ন দিক দিয়া ইহার আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, ইহা তো কোন নূতন প্রস্তাব নয়। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন (University Commission) অনুরূপ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন; তাহা কেন কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই?

কাহারও মতে ছাত্রসমাজের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, এ যুগেরই ধর্ম। ইহা ভারতের কোন বিশেষ সমস্যা নয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ও শিল্পনির্ভর জীবনের এ একটা অভিব্যক্তি। উচ্ছৃঙ্খলতা বা দুর্নীতি শুধু ছাত্রসমাজেই সীমাবদ্ধ নহে, সমাজে ও রাষ্ট্র-জীবনের সর্বস্তরে ইহা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। শুধু ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দিলেই কি এই ব্যাপক সামাজিক ব্যাধি দূরীভূত হইবে?

যুব-সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তির কিছুটা দূরীভূত করিতে অনেক কল্যাণ-রাষ্ট্রে শিক্ষানীতির সহিত অর্থনীতিকে এমনভাবে যুক্ত করা হইয়াছে যে, শিক্ষালাভের পর প্রত্যেক যুবকের কোন না কোন কর্মসংস্থান হইয়া যাইবেই, এ বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত। মানুষ স্বভাবতই চায়—একটি সুখের সংসার, আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপদ আশ্রয়, নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ! যে আর্থনীতিক কাঠামোতে এইগুলি সম্ভব, সেখানে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় তিরোহিত।

এ-জাতীয় অশান্তি দূর করিবার জন্য শুধু মাত্র ধর্মনৈতিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। প্রথম প্রথম কিছুটা কাজ করিলেও দেখা যাইবে, বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়া ছাত্রেরা যখন বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিতেছে, তখন চারিদিকে যেরূপ দেখিবে, বাধ্য হইয়া সেও সেরূপ ছাঁচে গঠিত হইয়া যাইবে। শিক্ষক, অভিভাবক

ও নেতাদের জীবনে রূপায়িত দেখিলে তবেই উপদেশ ও আদর্শ ছাত্রদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিবে। নতুবা ধর্ম ও নীতি পুস্তকের বেড়া-দেওয়া বাগানেরই শোভা বর্ধন করিবে; বেড়ার বাহিরে ঝোপঝাড় কাঁটার জঙ্গল দেশকে ভরিয়া ফেলিবে। জীবনে রূপায়িত না দেখিলে আদর্শ ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে একটি মাত্র জীবনে রূপায়িত আদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

ছাত্রদের নিকট নীতি ও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, কারণ উহারা সার্থক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু সে শিক্ষা দিবে কে? শিক্ষকগণ যদি পরীক্ষণীয় বিষয়রূপে ইতিহাস ভূগোলের মতো কতকগুলি নীতি ও উপদেশ মুখস্থ করাইয়া যান, তাহাতে কতটুকু কাজ হইবে? হয়তো বহু ছাত্রই নোট বই পড়িয়া ঐ বিষয়ে পাস করিবে! গল্পের আকারে পরিবেশিত হইলে কল্পনাপ্রবণ শিশু-মনে নীতিকথা কিছুটা কাজ করে বটে, কিন্তু বাইবেলের সেই বীজবপকের গল্পটিও (Parable of the Sower) যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। পাথুরে শক্ত মাটিতে পড়িয়া বীজ ঠিকরাইয়া যায়, কাঁটার ঝোপেতে বীজ ব্যর্থ হয়, পাখী আসিয়া কত বীজ খাইয়া ফেলে। শুধু মাত্র নরম পাট-করা জমিতেই বীজ সফল হয়। সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এমন হৃদয়-মন প্রস্তুত করা, যেখানে মহত্ত্বের বীজ উপ্ত হইয়া সার্থক সফল মহৎ জীবনে পরিণত হইতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু একটি শিক্ষকের নয়; বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক যদি একপ্রাণ হইয়া ছাত্রদের জীবনগঠনে উদ্যোগী হন, তবেই তাঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে। বিভিন্ন শিক্ষকের মুখে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা পাইলে ছাত্রেরা বিভ্রান্তই হইয়া থাকে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি সীমাবদ্ধ বিষয়; এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় সম্বন্ধে বড় একটা কিছু বলেন না। কিন্তু ধর্ম বা নীতি এমনই একটি ব্যাপক বিষয়—যে সকলেই এ বিষয়ে বক্তা, সকলেই শিক্ষক। ছাত্রেরা কাহার কথা শুনিবে, কাহাকে মানিবে, অনেক সময় কিছুই ঠিক করিতে পারে না। তবে দেখা যায়—যেখানে তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা, সেখানেই তাহাদের আকর্ষণ। যে শিক্ষকের চরিত্রে ও ব্যবহারে তাহারা মুগ্ধ, যে শিক্ষক প্রাণপাত করিয়া তাহাদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য উদ্যোগী, ছাত্রগণ অজ্ঞাতসারে সেই শিক্ষককেই অন্ততঃ সাময়িকভাবে আদর্শ করিয়া ফেলে, তাঁহার মতো হাতের লেখা করে, চলে ফেরে, কথা বলে,—অনেক সময় তাঁহার কথারই প্রতিধ্বনি করে। এমনও দেখা যায় ছাত্র শিক্ষকের ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারই একটি প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে শিক্ষকছাত্র-সম্পর্ক গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ছিল ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ—গুরুকুলপ্রথার মর্মকথা। আধুনিক ধরনের ঘণ্টা-কণ্টকিত ক্লাসে এই ভাব রূপায়িত করা সম্ভব নয়। একটি শিশুর জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য যেমন একটি গোটা মাতা প্রয়োজন, একটি বালকের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য তেমনি পুরোপুরি একটি শিক্ষক প্রয়োজন। উপনিষদের শান্তিপাঠে তাই ধ্বনিত হইয়াছে, 'সহ নৌ অবতু, সহ নৌ ভুনক্তু'। দ্বিবচনের তাৎপর্য—গুরু-শিষ্যের এই জীবন-বিনিময়ে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষকের সুন্দর সুগঠিত জীবন, অভিভাবকের—বিশেষতঃ মাতাপিতার শান্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ, সর্বশেষে যে সকল খ্যাতনামা নেতা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির

জন্য চিন্তা করেন, বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহাদের জীবনও ছাত্রদের জীবনকে প্রভূত-ভাবে প্রভাবিত করে। যদি কোন নেতার 'ভাবের ঘরে চুরি' ধরা পড়িয়া যায়, বহু জীবন আদর্শ হারাইয়া ফেলে; এবং সেই নেতার প্রচারিত আদর্শ, চিন্তাধারা সমাজে আর বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এজন্য নেতাদের ক্ষণিক লোকপ্রিয়তার প্রতি, আপাতমধুর মতবাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া জাতির শাশ্বত আদর্শের প্রতিই নিষ্ঠা প্রয়োজন। পুরাতন পরীক্ষিত যে সকল ভাব ও নীতি জাতীয় জীবনকে দীর্ঘদিন ধরিয়া চালিত করিয়াছে, সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁহাদিগকে আদর্শ নেতারূপে পরিণত করিয়া দেশবাসীকে, বিশে-ষতঃ ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে; এবং ছাত্রদের মধ্য হইতেই পরবর্তী যুগের নেতাও দেখা দিবে, যাহারা জাতীয় জীবন-ধারা সার্থক অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে।

এতদূর পর্যন্ত গেল আদর্শের কথা। বাস্তব-ক্ষেত্রের কথায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি গত ৬ই ফেব্রুআরি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষতের ২৭তম্ অধিবেশনে বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া বলিয়াছেন :

'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমার মনে হয়, তাহা-দিগকে যথার্থ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যাপারে অভিভাবকের অক্ষমতা এবং তাহাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে শিক্ষকদের অপারগতাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমান বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার মূল কারণ।······ তাছাড়া রাজনীতিক নেতা-রাও তাঁহাদের রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানাভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকেন। তবে একথাও সত্য যে, চিরাচরিত আচারবিচার ও মূল্যবোধ দ্রুত ভাঙিয়া পড়ি-তেছে, অথচ নূতন কোন নিষ্ঠা ও অনুরক্তির ভাব সৃষ্ট হইতেছে না। এই রূপান্তরের সময়ে যে সামঞ্জস্য ও স্থায়িত্ব বিধানের প্রয়োজন আছে, তাহা মিটিতেছে না বলি-য়াই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বর্তমানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।'

প্রতীকারের সন্ধানে গিয়া ডক্টর শ্রীমালি বলিতেছেন, 'যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান-কার্যে আত্মোৎসর্গ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ-সাধনে আন্তরিকতার সহিত সচেষ্ট থাকেন, সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ঘটে না।' আধুনিক সামাজিক আর্থনীতিক পরিবেশে সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক স্নাতকোত্তর (graduate) ছাত্রকে কিছুদিন জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন, তাহা কতদূর কার্যকর হইবে তাহা বলা শক্ত। সেবা হৃদয়ের বৃত্তি। জোর করিয়া কাহাকেও দিয়া যে কাজ করানো যায়, তাহাকে সেবা বলা চলে না। সেবার প্রবৃত্তি জাগে সেবার আদর্শ দেখিয়া; একটি প্রদীপের শিখা হইতে যেমন জলিয়া উঠে আর একটি প্রদীপের শিখা।

ভাষণের শেষাংশে শিক্ষামন্ত্রী ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাদান সম্পর্কে শ্রীপ্রকাশ কমিটির প্রস্তাব সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন : 'ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া হইবে না। কারণ ঐ সুপারিশে সততা, নিয়ম, শৃঙ্খলাবোধ ও তিতিক্ষা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল গুণের দ্বারা জীবন উন্নত ও পরিমার্জিত হয়; উহা ব্যতীত কোন সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে না।

'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচারের বিরোধী—এই ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত ভুল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্ম ও নীতির বিরোধী নয়; প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আদর্শের ভিত্তি না থাকিলে ধর্মনিরপেক্ষ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারে না।'

কোন কোন নেতা মনে করেন, ভারতে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রধান বাধা—দেশে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান, এবং সেইজন্য তাঁহাদের মনে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, কোন্ ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইবে? যাঁহারা এ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা সম্প্রদায়কেই ধর্ম বলিয়া ভুল করেন। ধর্মের একটি শাশ্বত রূপ আছে, সম্প্রদায় তাহারই দেশকাল-অনুযায়ী রূপ। ভারতে বহু সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একত্র শান্তিতে বাস করিয়াছে; মাঝে মাঝে রাজনীতিক কারণে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিকেই রাজনীতিকগণ ধর্মবিরোধ বলিয়া মনে করেন। সেইজন্যই সরকারী প্রচেষ্টায় ধর্ম শিক্ষা দিতে তাঁহারা এত ভয় পান। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিষয়ক নিশ্চেষ্টতার ইহাই প্রধান কারণ।

ইহার প্রতীকার : (১) বিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচীতে ধর্মের সাধারণ ভাব বা মূলনীতিগুলির উপর জোর দেওয়া, (২) নিজ নিজ ধর্মের বিশেষ ভাব ও পদ্ধতিগুলি বিদ্যালয়ের বাহিরে, গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বা নির্দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) সর্বশেষে—একটু পরিণত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন প্রতিবেশীর ধর্ম বুঝিতে ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবে, এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' কথাটি সার্থক হইবে। (৪) প্রথমাবস্থায় সমবেত সঙ্গীত খুবই প্রয়োজন, পরিণত বয়সেই নীরব প্রার্থনা সম্ভব। (৫) ঐতিহাসিক মহাপুরুষ এবং ধর্মপ্রবর্তকদিগের জীবন ও বাণী আলোচনার মাধ্যমে তাঁহাদের প্রচারিত ভাবগুলি ছাত্রদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদের মন উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ইহার অধিক কিছু করিবার ক্ষমতা বিদ্যালয়ের বা শিক্ষকের নাই; তাহা আধ্যাত্মিকতার এলাকা, এবং সেখানে অভিজ্ঞ গুরুর সহায়তা প্রয়োজন।

'ধর্ম' শব্দটির অর্থ বড়ই ব্যাপক; নিম্নস্তরে ইহা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির সমপর্যায়ে, আবার উচ্চস্তরে ধর্ম বলিতে আধ্যাত্মিকতাই বুঝায়—যাহার অর্থ ইহ জীবনেই জড়াতিরিক্ত চৈতন্যসত্তার অনুভূতি—এক আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসপরায়ণ, আত্মনির্ভরশীল ভাব।

'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে ছাত্রদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম শুধু পারত্রিক কোন ব্যাপার নয়, ধর্ম দ্বারা ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণই সাধিত হয়। ধর্ম শুধু মোক্ষেরই সাধক নয়, অর্থকামেরও সহায়ক—অর্থাৎ ধর্ম প্রথমে অভ্যুদয় আনয়ন করে, পরে আনে নিঃশ্রেয়সের সাধনা।

ধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে, সত্যনিষ্ঠ ও সংযত করে, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ সৎকর্মে ব্যয় করিতে বলে, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে সাহায্য করে; ধর্মানুশীলনের ফল মনুষ্যত্ব লাভ। ধর্মহীন মানুষ বিবেক-বুদ্ধিহীন,—পশুরই সমান।

ধর্ম জীবনের শেষ অধ্যায় নয়, প্রথম অধ্যায়—চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ। সারা জীবন অধর্ম করিয়া শেষ জীবনে ধর্ম হয় না। তাই তো প্রাচীন নীতি ছিল, 'যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাৎ'। শৈশব হইতে ধর্মভাব শিক্ষা করিলে তবেই মানুষ যৌবনে ধর্মশীল হইতে পারে, তবেই সমাজে উত্তরোত্তর শান্ত সংযত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এবং দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া শান্তি ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষের 'জানার' আর শেষ নেই! তাই তো মানুষ কয়েক লক্ষ বছর হ'ল এ পৃথিবীতে এসেও এখনও পর্যন্ত তার নিজের দেহ ও মনটাকে জেনেই শেষ করতে পারলো না। যখনই সে মনে করেছে, এই বুঝি দেহের ও মনের চরম কথা, সে তার বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে জেনে ফেলেছে, তখনই আবার পরবর্তী আর একদল এসে সেই 'জানার' মধ্যে দেখিয়েছে—ভুল, ত্রুটি, প্রমাদ, হেত্বাভাস—এমনি কত কি! তাই মনে হয়, জানার প্রস্তুতি-পর্বই আজও মানুষের শেষ হ'য়ে যায়নি, পরিণতির তো কথাই নেই। এইভাবেই তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার একটি চমৎকার 'প্যাটার্ন' সে তার চলার পথে এঁকে রেখে যাচ্ছে মাত্র!

কিছুদিন আগে পর্যন্ত, মানুষ এই পৃথিবীর 'জানা-জায়গা'গুলো নিয়েই তার চিন্তার স্থায়ী 'পিরামিড্' রচনায় ব্যাপৃত ছিল। আর মাঝে-মধ্যে ঐ দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশের দিকে বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে, তারার ঝিকিমিকি দেখে, কিংবা জ্যোৎস্নালোকে অবগাহিত ভেসে-যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে, বিচিত্র ভাব ও ভাষার ডালি গেছে সাজিয়ে। অথবা বড় জোর, তার কল্পনার রহস্যগুণ্ঠিত পক্ষীরাজ ঘোড়াটায় চেপে কিছু মন-গড়া সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে, তাকেই রঙে ও রসে ভিজিয়ে আমাদের মনের খোরাক জুগিয়েছে। জুল ভার্নে বা অস্কার্-ওয়াইল্ড্ প্রভৃতির লেখা পড়লে তো এইরূপ বাণীবাহকদের কথাই মনে জাগে। যদিও আজকের দিনে সত্যকার মূল্যবিচারে তাঁদের কর্মকীর্তির দাম—বোধ হয় কানাকড়িও নয়।

সম্প্রতি 'স্পুটনিক' কথাটা মানুষের বিজ্ঞান-মনকে আরও দুরাকাঙ্ক্ষিত ক'রে বিপদে ফেলেছে। এতদিন মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীটাকে জেনেই তৃপ্তির তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চুপ ক'রে ছিল। এখন তার জানার পরিধি বেড়েছে, সেই সঙ্গে তার মনের দামাল ছেলেটার অস্থিরতাও। এতদিন তার শিশু-মন কেবলমাত্র 'পৃথিবীকে জানা'র দোলনায় দোল খাচ্ছিল—তার বাইরে সে আর পা বাড়ায়নি। সে এখন এই দোলনার বাইরের অবকাশের ও অবস্থানের মধ্যে পেয়েছে ছাড়া। ফলে, চার দেওয়ালে ঘেরা কুতূহলের অর্গল তার গিয়েছে খুলে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহে সে নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারছে, ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্ করবেই। কিন্তু এখানেই কি তার 'জানার' ভৌগোলিক পরিধিটা শেষ হ'য়ে যাবে? তা কে বলছে? এর পরেও মানুষ চাইবে সূর্যে কলোনী গড়তে, কিংবা চাইবে যাযাবর হ'য়ে ঘুরতে, সূর্যের চেয়েও বিরাট ও উজ্জ্বল তারকায়—একটির পর একটিতে। আজ তার আকাঙ্ক্ষা-পুষ্পের অনেক আশার পাপড়ির মুখ খুলে গেছে। বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলে আজ তাই সে সুনীল আকাশে হ'তে চায় উধাও—অসীম।

এমনি ক'রে বাইরে ছুটে গিয়ে, মানুষ কি শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমান্তে এসে পৌছাবে? তার ওপারে যাবার তখন আর কিছু থাকবে না? এই সীমাহীন বিশ্বের সীমা কি সে সত্যই খুঁজে পাবে? মানুষ কি সেদিন জানতে পারবে এই বিশ্বের উৎপত্তির চরম কথা? পারবে কি প্রকৃতির পরিণতির ইতিহাস জানতে—তার ভবিষ্য-পুরাণের অন্ততঃ সূচীপত্রটিকেও?

মানুষের এই বৃহত্তরকে ধরার অভিযানই তার চাঞ্চল্যের শেষ কথা নয়। তার এই বৃহত্তরের উপাদান-কণিকাগুলোর রহস্যটুকু এখনও তার অজানা। বর্তমান জড়বিজ্ঞান তাকে জানিয়ে দিয়েছে 'ইলেকট্রন' ও 'প্রোটনে'র অস্থিরতার সংবাদ, তাদের বিচ্ছুরণ-শক্তির তথ্য, তাদের মহা-মিলনের শক্তিব্যঞ্জক আকর্ষণটিকেও। তাই আজ মানুষ 'এ্যাটম্'-বোমা, 'হাইড্রোজেন'-বোমার নির্মাতা। আর এটা আছে বলেই মানুষ আজ স্পুটনিক চড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার চিন্তা করতে ভরসা পাচ্ছে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম কণিকাসমূহের সঠিক চালচলন এখনও মানুষ জানে না। সে জানে না—কেন তাদের এই অস্থিরতা? কি প্রয়োজনে তাদের ঐ মহাচাঞ্চল্য? —কে জোগায় তাদের মধ্যে এই প্রাণ-স্ফুরণ। কোন অদৃশ্য হস্ত কি তাহলে এর পেছনে কাজ করছে? আছে কি এ সবের পেছনে কোন অনুক্ত উল্লেখ? তাহলে কি সেই অদৃশ্যকে মানুষ তার বিজ্ঞান দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে? মানুষের জড়-বিদ্যার জালে কি ধরা পড়বে সেই অতীন্দ্রিয়? সৃষ্টির এই রহস্যময় অনতিক্রম্য সমুদ্র—মানুষ কি শেষে তার কাগজের নৌকা চড়েই পার হ'য়ে যেতে পারবে? মোট কথা, মানুষকে কেন্দ্র ক'রে জড়বস্তুর সূক্ষ্মত্বেই যাই, আর বিশালত্বেই যাই—মানুষ আজও তার সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারেনি—ভবিষ্যতেই যে পারবে তার সম্ভাবনাই বা কোথায়?

চারিদিকের জড়বস্তুর সাম্রাজ্য ছেড়ে, মানুষের নিজের মনের রহস্য সন্ধানের কথায় এলেও যে, সে রহস্যের সমাধান হ'য়ে যায়, তাও নয়! মানুষ মনের ভেতরকার চেতন, অচেতন প্রভৃতি স্তরের কথা আবিষ্কার করেছে—কত যুক্তি ও বিচার, তথ্য ও তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একটি ঢিল ছুঁড়লে একদল পাখীর প্রত্যেকটি একই দিকে যায় না কেন, তার রহস্য ভেদ করতে সে পারে না। মানুষের নিজের অন্তর-রহস্য আজও তার অজানা। অথচ এই তন্দ্রালু তন্ময়তায় ঘেরা মনকে নিয়েই মানুষ তার বাইরের অজানা রহস্যকে পরিমাপ করতে ছোটে!

আবার কত প্রাণী রয়েছে; তারা তাদের জীবন নিয়েই বেশ আছে, এর বাইরে তাদের চিন্তা নেই। কিন্তু, কে জোগাল মানুষের মধ্যে এই 'মন'টিকে, যার জন্য মানুষ কেবল ইতর প্রাণীর মতন কেবল বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট নয়। চিন্তার জগতে তাই সে তার অনুসন্ধিৎসার শিশু-চোখ মেলে সে নিজের কাছেই নিজে রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। চিন্তার স্থান মাথাকে বা অনুভূতির স্থান হৃদয়কে ভিন্ন (dissect) করেও একে ধরা যায় না; সব ধরার বাইরে দাঁড়িয়েই রহস্য আজও লুকোচুরি খেলছে।

মানুষের কাছে আর এক আশ্চর্য বস্তু—মৃত্যু। সে এলেই এই চির-অভিসারী প্রাণ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তখন মানুষ তার ভাবনার আকাশে আর বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলতে পারে না; বরং তার এই প্রিয় দেহটাকে ছেড়েই তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়। মৃত্যুর এই মাধ্যাকর্ষণ-রহস্য—ভবিষ্যতের কোন নিউটন আবিষ্কার করবে ব'লে আজও তা ফল হ'য়ে জ্ঞানবৃক্ষে ঝুলছে!

এর পরেও এক প্রশ্ন জাগে। এই যে দৃশ্য জগৎ, এই যে মানুষের অনুভূতি, এই যে তার মনের সাহায্যে রহস্য আবিষ্কারের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, এই যে তার চেতনানুভূতি—যা তার সত্যকারের ভাব-বিগ্রহ—এসব কি মানুষকে ঐ সব রহস্য ভেদ করতেই সাহায্য করছে, না কানামাছি খেলার মতো কারো হাতের ভুল ছোঁয়া পেয়ে যথার্থকে ধরার ব্যাপারটিকে ক'রে তুলছে আরও জটিল।

তাছাড়া মানুষ তার বাইরের বোবা অনুভূতির উপর নির্ভর করেই তার চেতনকে চালাচ্ছে, কিন্তু ঐ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল আমাদের এই চেতন মন অন্ধের মতোই তাঁকে আঁকড়ে, ঐ অন্ধের (অনুভূতির সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সংবেদন-সংগ্রহ রূপ) সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে—কোথায়? —তা ঐ দুই অন্ধের একজনও জানে না—জানা সম্ভবও নয়; কারণ একে অন্যের খণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করেই সব কিছু বুঝে নিতে প্রয়াস পাচ্ছে যে!

তাহলে পথিক! আমাদের এই অন্ধের পাল্লায় পড়ে কিছু না বুঝেই কি এই পৃথিবীতে পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্যে ডুবে থাকতে হবে? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই?—উপায় আছে। সেটা বিচারের পথে নয়, বিশ্বাসের পথে। চল, সেই বিশ্বাসের খেয়া-তরী ধরে এই রহস্যময়তার ওপারে গিয়ে আপন আত্মার মুখোমুখি দাঁড়াই। ডাকো খেয়া-পারের সেই কাণ্ডারীকেও। বুঝে নয়, না বুঝেই ডাকো। ছোট ছেলে কি মাকে বুঝে নিয়ে ডাকে? সেই শিশুর আর্তি সম্বল ক'রে চল—মায়ের নির্ভরতার ক্রোড়ে উঠবে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

চৈত্র-বৈরাগী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

তোমার গোপন মনের মাঝে
কে বুঝি গো দেয় দোলা!
বাহির হ'লে উদাস মনে
বৈরাগী গো পথ-ভোলা!

আজকে তুমি ঘর ছেড়েছ
কাহার লাগি কোন্‌খানে?
কোন্ সুদূরের লক্ষ্য তোমায়
টানছে অলখ্ দিক্ পানে?

ভূষণ তোমার লুটায় ধূলায়,
মিলায় তনুর হেম ঘটা,
শ্যামল-বরণ উত্তরীয়ে
ভস্ম-রূপের পায় ছটা!

ভালে তোমার জ্বলছে আগুন,
আস্যে হাসির নাই ভাতি,
বাঁধন হারা ক্ষেপা বাতাস
তোমার পথের আজ সাথী!

তোমার পথে ফুল ফুটে না,
মধুপ যত যায় ফিরে,
বন-বীথির নাইকো ছায়া
স্নিগ্ধ নদীর তীর ঘিরে!

তোমার পথে বেণু-বীণার
সুর যে কোথায় রয় মিশি,
গীতিহারা বিহগ কাঁদে,
নীরব থাকে দশদিশি!

তোমার হাতের একতারাতে
উদাস প্রাণের গান জাগে,
কোকিল-কুহু পায় না আমল,
সুর ভাঁজিছ কোন্ রাগে?

অচিন্ পথের বাউল ওগো,
ব্যাকুল হ'লে কার তরে?
কার পানে আজ চল্‌ছ ছুটে
শূন্য বিরল প্রান্তরে?

কোন্ সে ঘরের আকর্ষণে
ঘর ছেড়ে যাও কোন্ দেশে?
এই ভুবনের রূপের আলো
তোমার চোখে যায় ভেসে!

তোমার পথে আঁধার নামে,
দীপ্ত দিনের নাই আলো,
ঊর্ধ্ব আকাশ বিরূপ হ'ল,
সূর্য-হারা সব কালো!

সুদূর পথের ওগো পথিক,
ওগো বাউল, দিক্-ভোলা!
তোমার গোপন মনের মাঝে
কে এসে আজ দেয় দোলা!

প্রীতিঃ পরমসাধনম্ *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

৩০।৪০ বছরের আগেকার কথা—কন্যাকুমারী যাবার রাস্তায় কেরলে একটি ভক্তের বাড়ীতে ৪।৫ দিন ছিলুম। আগে ভগবান তারপরে সংসার—এই ভাব নিয়ে তিনি সংসার করতেন। আগে সংসার, তারপর ভগবান নয়। ভক্তটি ভগবানকে নিয়েই সংসারের কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর সাথে আলাপ হ'ল। তাঁর কথার আসল ভাবটি এই :

স্ত্রী পুত্র পরিবার—এরা সব হ'ল তাঁর, আমার কেউ নয়। আমি এইভাবে তাদের সেবা করি—সংসারের কর্তব্য পালন করি। এই ভাবে ভাবস্থ হ'য়ে তিনি অনেক কিছু বললেন। আমি চুপ ক'রে সব শুনলুম। তিনি ছিলেন সেখানকার জেলা-জজ। তারপর তিনি আদালতে চলে গেলেন। বিকেল বেলা ফিরে এলেন। এসে আবার আমার কাছে ওই সব কথা ব'লে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঠাকুরঘরে। একটি আলাদা মন্দির, সেখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইখানেই একান্তভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ করতেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে বলছেন—দেখুন মহারাজ, বোধ হয় ভাবছেন, সবই যদি ভগবানের হ'ল, তাহলে আমার কি রইল? আমার একটা আপনার জিনিস চাই তো! ওই দেখুন বসে আছেন। উনিই আমার আপনার। আর এই যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—সব ওঁর। এইভাবে আমি সংসারে চলেছি।

কত বড় কথা একবার ভেবে দেখ—এই ভাবটি। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একটা ভাবকে নিয়ে চলতে হয়—সকলেই তো আমরা চলি সংসারে। 'আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার কন্যা' এই সব ভাব নিয়েই তো সংসারের প্রতি আমাদের কত অনুরাগ, প্রীতি, ভালবাসা। এই ভাবটি না থাকলে তো হয় না। কাজেই এখানে ভগবানকে তিনি আপনার করেছেন; আর স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—সব তাঁর। কি সুন্দর কথা, 'আমার তো একটা আপনার চাই। আমাকে তো একটা ধরে দাঁড়াতে হবে! আমার একজন অবলম্বন, আশ্রয় চাই তো।' এইভাবে তাঁর চোখ দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়ছে, আর তিনি বার বার ঠাকুরকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'এই আমার আপনার।' এই আপনার-ভাবটি এলেই জানবে, যেটুকু তাঁর পূজা-জপ-প্রার্থনা, সংসারের কর্তব্যপালন সেইটুকুই একটা প্রেম-প্রীতির সহিত আমরা করতে সক্ষম হবো। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যদি সব কাজ করো, সংসারী হলেও ধীরে ধীরে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভগবানের দিকে এই প্রীতি-ভালবাসাটুকু নেই বলেই যত গোল। কেবল এক দিকে আছে; আর এক দিকে নেই ব'লে আমরা পারি না।

এই সব যা কিছু স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব হ'ল তাঁর,—আপনার একজন কে হলেন? এই একটা খুব বড় জিনিস আমি তাঁর কাছে শুনেছিলুম। তাই মাঝে মাঝে অনেককে বলি, আগে তিনি তারপর সংসার। কাজেই একটা অবলম্বন, একটা আশ্রয় নিয়ে এইভাবে সংসারে থাকতে হবে।

* ১৪-১১-৫৯, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—(শব্দযন্ত্রে গৃহীত) হইতে সঙ্কলিত। শ্রুত-লেখক শ্রীহরিপদ কর।

একটু প্রীতি নিয়ে ভজন করো,—একটু প্রীতি ভগবানের প্রতি দাও। ঠাকুর বলতেন, ভগবান ভক্ত নইলে থাকতে পারেন না। একটা অপূর্ব সম্বন্ধ! তোমরা সকলেই তো ভক্ত। এই সম্বন্ধ নিয়েই বার বার ভগবান মনুষ্য-শরীর ধারণ ক'রে আসেন—সে দিন পর্যন্ত এসেছিলেন, এই প্রেম-প্রীতিটুকু আস্বাদন করার জন্য। আহা! তিনি কাঙাল—তিনি এই প্রেম-প্রীতির কাঙাল। দেখ না ঠাকুরের এই কথাটি : সাধারণতঃ ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ। আবার কখন কখন ভগবান ছুঁচ, ভক্ত হয় চুম্বক। ভক্ত ভগবানকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণই প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা। ভগবান—বাক্যমনের অতীত হলেও, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা হলেও আর একটি তাঁর ভাব আছে। সেটি আমরা পাই তাঁর অবতারে। সেটি কি?—ভগবানের এই মাধুর্য ভাব। সেখানে ঐশ্বর্যের লেশ নেই। সেই ভাবটি কি? তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে একটা আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। সংসারে যেমন একটা ভাব ছাড়া আমরা চলতে পারি না, তেমনি ভগবানের সঙ্গেও একটা ভাব চাই, একটা সম্বন্ধ, একটা প্রীতির বন্ধন।

গীতায় ভগবান বলছেন :

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—সেই সব ভক্তেরা, যারা প্রীতিপূর্বক একটু ভজনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই। সংসারের যেমন সব কাজ প্রীতিমাখানো—ছেলেকে খাওয়ানো, স্বামীর সেবা, রাঁধা বাড়া—যা কিছু কর্তব্য কর না কেন, সব একেবারে প্রীতিমাখানো। কিন্তু ভগবানের জন্য যেটি করি, সেখানে তো সেই প্রীতি মাখাতে পারি না। তাই তো তৃপ্তি হয় না! সংসারের প্রতিটি জিনিস প্রীতিমাখানো। ছেলে মেয়ে আর সবাই সেই প্রীতিটুকুই তো আস্বাদন করে। তাই এখানে ভগবান বলছেন, 'যে আমাকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজনা করে—'; ওই 'প্রীতি' কথাটি একেবারে স্পষ্ট লেখা আছে। অনুরাগের সহিত, প্রেমের সহিত ভজন চাই। তোমরা জান তো বিষয়ের প্রতি যে ভালবাসা তার কত টান। ওই প্রীতিটুকু আছে বলেই তো সংসার চলছে।

ভগবান বলছেন, 'প্রীতিপূর্বক ভজন কর।—করলে কি হয়?—না, যে করে তাকে আমি বুদ্ধি-যোগ দিই। শুভ বুদ্ধি দিই—বিবেক-বুদ্ধি! যে বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে সে আমাকে লাভ করে, আমাকে প্রাপ্ত হয়।' এই দেখ তোমার কাছে তিনি চাইছেন একটু প্রীতিমাখানো ভজন, তার পরিবর্তে দিচ্ছেন কি?—বুদ্ধিযোগ। এ বুদ্ধি যে-সে বুদ্ধি নয়। এ বুদ্ধি কি করে? তাঁকে লাভ করিয়ে দেয়। তাঁর সঙ্গে যোগ বা মিলন করিয়ে দেয়। বুদ্ধি হ'ল বিচার। তিনি নিজে স্বয়ং দেন এই বুদ্ধি। ভালবাসা হ'লে ভগবানের সঙ্গে একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয়।

আমরা একটু পূজা করেই বলি 'এই নাও ফুল, এই নাও জল,' তার পরিবর্তে এটা চাই ওটা চাই, অভাব মিটছে না। বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। বন্ধনের উপর বন্ধন। একে তো বন্ধন রয়েছে, ভগবানের পূজা ক'রে আবার বন্ধন! কিন্তু এখানে তিনি নিজে থেকে যা দিচ্ছেন, সেটি তা নয়। তাঁকে লাভ করার উপায় ব'লে দিচ্ছেন। দেখেছ কত তফাৎ!

আমাদের ভজন কি রকম? এই পূজা করলাম, এবার দাও।—এটা দাও, সেটা দাও। পেলে, আবার চাই। এ চাওয়ার শেষ নেই, এ পিপাসার শেষ নেই। আর তার সঙ্গে কি আসে? —জ্বালা-যন্ত্রণা। চিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়েছেন এ কথা।

মাছটাকে ফেলে দিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলো—নিশ্চিন্ত। এই বাসনাই মাছ। আর কাকগুলো কি হ'ল? ওই জ্বালা যন্ত্রণা চিন্তা। তবুও আমরা ছাড়ছি না বাসনা! কি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

গীতা হ'ল ব্রহ্মবিদ্যা। কি ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, কি ক'রে ভগবদ্দর্শন হয়, তার উপায় বলছেন ভগবান স্বয়ং: যারা আমার প্রীতিপূর্বক ভজনা করে—তাদের কি করি? 'দদামি বুদ্ধিযোগং'—তাদের বুদ্ধিযোগ দিই, যে বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে ভক্ত আমাকে লাভ করে। তাঁকে লাভ করা ছাড়া আর শান্তি নেই।

আগে তিনি তারপর সংসার। তিনি তো রয়েছেন আমাদের মধ্যে, আর আমরা তাঁকে এই মন্দির-মধ্যে রেখে, দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে ঘুরছি আনন্দ ও শান্তির জন্য। এই অবস্থা, এই দুর্দশা আমাদের কে করেছেন? —তিনিই। বলদটাকে কে ঘানিতে জুড়েছে? —কলু। কে চোখে ঠুলি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে? —কলু। 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। উপায় নেই, যখন কলুর বলদের মতো আমাদের অবস্থা! এই ঘোরাচ্ছেন, তারপরে বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ'। তিনিই ঘোরাচ্ছেন, অন্তর্যামী রূপে হৃদয়ে থেকে তিনিই ঘোরাচ্ছেন। তাঁর শরণাগত হ'য়ে বলতে হয়, 'এই চোখের ঠুলি খুলে দাও। এই বন্ধন মোচন কর, ঘানি থেকে অব্যাহতি দাও।'

'ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
হেরি গো তোর অভয় পদ॥'

এই বন্ধনটা খুলতে হবে। এই বন্ধন মুক্ত হবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হ'তে হয়। আর আমরা করি কি? —আরো গাঁট দিচ্ছি। 'ভগবান, ছেলে দাও, মেয়ে দাও, জমি দাও, জরু দাও। টাকা দাও, গাড়ী দাও, বাড়ী দাও। মোকদ্দমা জিতিয়ে দাও'—এই সব ব'লে চাইছি। অন্ত নেই বাসনার। যদি বুঝতুম যে লক্ষ টাকা পেলে সব হ'য়ে গেল—তা তো নয়। সারা রাজ্য পেলেও, এই সমস্ত পৃথিবীটা পেলেও নয়। শান্তির এ রাস্তা নয়। আমরা ঠিক উল্টো রাস্তায় চলেছি—শান্তি পাচ্ছি না। ভোগ-বাসনার জন্যই জ্বালা-যন্ত্রণা—ওই সেই চিলটির অবস্থা। সে একটু ভোগ করবে বলেই তো ছোঁ মেরে মাছটাকে নিয়ে উপরে উঠছিল। ভোগ করতে পারলে? দু'চার-শো কাক তাকে তাড়া করেছে। ভোগবাসনা ধরে আছে বলেই তো মানুষের এত জ্বালা-যন্ত্রণা। ঠাকুরের এই সব উপদেশ গীতার মতো; এগুলি ভাবতে হয়, ধ্যান করতে হয়, চিন্তা করতে হয়।

কোথায় প্রীতি—ভগবান সব জানেন। তাই গীতায় বলছেন, 'আমায় প্রীতিপূর্বক ভজনা কর, আমি তো তোমায় বুদ্ধিযোগ দেবার জন্য তৈরী।' এ হ'ল ভক্তের জন্য। যারা অন্যভাবে উপাসনা করে, এ ব্যাপার তাদের জন্য নয়।

ভক্ত-ভগবান্ সম্বন্ধ একটি আলাদা। ভগবান বলছেন, ভক্ত যে আমার প্রাণ! ভক্তকে আমি কত ভালবাসি। তিনি তোমার কাছে চাইছেন কি? এতটুকু ভালবাসা—একটু প্রীতি। তোমরা সংসারেই সবটুকু দিয়ে রেখেছ! একটু তাঁকে দাও দেখি। একটু সেই প্রীতির সঙ্গে ভজনা কর, একটু প্রীতির সঙ্গে প্রার্থনা কর। একটু প্রীতিমাখানো ফুল তাঁকে অর্পণ কর। তাতেও আমরা নারাজ। তাই তো বলছেন, প্রীতিটুকু চাই।

ভগবান কি দেখেন? সংসারে মনুষ্যদৃষ্টি আছে, আর ভগবানের ভগবদ্দৃষ্টি আছে। মানুষের দৃষ্টি কি, তা তো সবাই জানো।

আর ভগবদ্‌দৃষ্টি কি ? একজনের যদি ৯৯টি গুণ থাকে আর একটা দোষ থাকে, সংসার কি দেখে ? ৯৯টি গুণ ভুলে ওই একটা দোষ নিয়ে তাকে একেবারে যা খুশি তাই বলবে। এই হ'ল মনুষ্যদৃষ্টি। আর ভগবদ্‌দৃষ্টি কি জানো ? যদি ৯৯টি দোষ থাকে, আর যদি একটি গুণ থাকে, তিনি সেই একটি গুণ দেখেন। একটি গুণকে—বিন্দুকে সিন্ধু দেখেন। এই হ'ল দুটির তফাৎ। তিনি যদি এরকম না করেন, আমরা কি উদ্ধার হ'তে পারি ? আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি কি ? কাজেই ভগবান আসেন যুগে যুগে ; এসে বলেন, আমাকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজনা কর। একটু ভালবাসা, প্রীতি দাও। শুধু এই বললেন না ; আবার বলছেন, আমার ভজন-পূজা, জপ-ধ্যান যা কিছু কর, এগুলি সব প্রীতিপূর্বক কর। তাহলেই আমি তোমাকে কি দেবো ?—আপনা থেকে দেবো, তোমাকে চাইতে হবে না। একটু প্রীতিমাখানো ভজন কর, আমি তোমাকে শুভ বুদ্ধি দেব—যে বুদ্ধির আশ্রয় ক'রে আমাকে লাভ করতে পারবে।

তারপর আবার দেখ তিনি বলছেন—দেখ একবার কতটা উৎসাহ দিচ্ছেন ভগবান—'কতটা এগিয়ে যাই জানো অর্জুন ? শুধু বুদ্ধিযোগ দিয়েই ক্ষান্ত হই না। এই সব ভক্তদের—যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, তাদের উপর করুণাপরবশ হ'য়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করি, যে আমি অন্তর্যামী হ'য়ে সকলের হৃদয়ে রয়েছি, অজ্ঞান-তম যাকে আবৃত ক'রে রেখেছে, ঢেকে রেখেছে সেই আমি ভক্তের কাছে আত্মপ্রকাশ করি, অন্ধকার মায়া মোহ আমার প্রকাশে দূর হ'য়ে যায়—নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।' এতটুকু প্রীতিমাখানো ভজনের ভেতর দিয়ে তিনি কোথায় কি ভাবে কৃপা করছেন ভক্তকে। একেবারে আমাদের মায়ামোহ কাটিয়ে হৃদয়ে মধ্যে স্বপ্রকাশ। তাই ঠাকুর বলতেন, ভগবানের দিকে এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন।

দেখেছ গীতায় এই দুটি শ্লোকের সঙ্গে ঠাকুরের বাণীর কত মিল ! এইটি হ'ল তাঁর দৃষ্টিকোণ। ভুলে যেওনা মনুষ্যদৃষ্টি, ভুলে যেও না ভগবদ্‌দৃষ্টি,—ঠিক উলটো। এই হ'ল ব্যাপার। এই প্রীতিপূর্ণ ভজন,—এইটি সংসারে থেকে করতে হবে ! আগে ভগবান, তারপর তো সংসার ?

তারপর আবার দেখ পূজা করতে শেখাচ্ছেন : প্রীতিপূর্বক 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—এই যে পত্রপুষ্প ফলজল, যাতে এক পয়সাও খরচ নেই। গাছের ফল, গাছের পাতা তুলসী-বেলপাতা আর জল নাও। এই সবই তো ভগবানের, তোমার কোন্‌টা ? এই যে আমরা ফল-জল দিয়ে পূজা করি, সবই তো তাঁরই জিনিস। এগুলি কি তোমার জিনিস ? তাঁরই জিনিস নিয়ে তাঁরই পূজা করছি। তারপর বলছেন, এইগুলি আমার জিনিস হলেও যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি, এইগুলি ভক্তি মাখিয়ে—এই প্রেম মাখিয়ে যে আমাকে অর্পণ করে তারটাই আমি গ্রহণ করি। সেই ভক্তিটুকুই আমি আস্বাদন করি। পাতাটা তো আর খান না তিনি। ভক্ত যখন প্রীতি মাখিয়ে, এই একটু প্রেম মাখিয়ে আমাকে ভজন করে, আমি তখন যেন ভরে যাই। ভোজন ক'রে যেমন তৃপ্তি লাভ হয়, ভক্তের ভজনে সেই তৃপ্তি আমি লাভ করি—ভক্তের কাছে ওই প্রীতিমাখানো বেলপাতাটি কি তুলসীপাতাটি গ্রহণ করি। এখন দেখ, এই প্রীতিটুকু হ'ল আসল জিনিস,—আর এইটি

এলেই বুঝতে পারবে, ভগবানের কাছে যাবার রাস্তা সহজ হ'য়ে গেল।

দুরকম ভক্তি আছে—বৈধী ভক্তি আর রাগানুগা ভক্তি। প্রথমে বৈধী ভক্তি—এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এই ভাবে পূজা করতে হবে—এই সব নিয়মে। এইটে দরকার প্রথমে। সেই জন্য দীক্ষার পর গুরু যা ব'লে দেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে হয়। বৈধী ভক্তির পর কি আসে?—রাগভক্তি, প্রেমভক্তি। রাগভক্তিটা হ'ল প্রীতিমাখানো। বৈধী ভক্তিটা এল গেল, কিছু দিন করলে তারপর ছেড়ে দিলে। কিন্তু সংসারের কোন কাজ অসমাপ্ত রাখবার উপায় আছে কি? যে কাজটা আরম্ভ করলে সেটা তো শেষ করো প্রীতি মাখিয়ে। আর জপ ধ্যান-পূজা—সেখানেই যত কিছু গোলমাল। এখানেও ঠিক থাকা চাই। সংসারের কোন কাজে যদি গোলমাল ক'রে ফেল রক্ষা আছে? স্বামী এসে ধমক দেবে, ছেলে এসে বলবে, আজ কি রেঁধেছ মা? সংসারে জব্দ ক'রে রেখেছে এই প্রীতির শাসন। আর এখানে শাসন করার কেউ নেই। এখানে গুরু মন্ত্র দিয়ে চলে গেলেন। এখানে বাইরে থেকে তো কোন শাসন আসছে না। কাজেই যা খুশি তাই। সংসারে যথেচ্ছাচার করার জো নেই। অফিসেও তাই। মাইনে বাড়বে না—উন্নতি হবে না, সব ভয়ে ভয়ে করছে। কাজেই এই বৈধী ভক্তিতে প্রথমে একটা নিষ্ঠা, একটা শ্রদ্ধা, একটু ভয় আছে,—পরে রাগভক্তি হবে। সে ভক্তি কি সহজে আসে? প্রথমে যাঁর কাছে দীক্ষা নিলে, তাঁর প্রতি চাই শ্রদ্ধা—তাঁর কথা তিনি যা বলেছেন, তার উপর চাই বিশ্বাস। সেই শ্রদ্ধাটিকে নিয়ে তারপর কাজে লাগতে হবে। যা তিনি বলেছেন সেই আদেশ পালন করতে হবে। সংসারে দেখ, কোন ফাঁকি দেবার জো নেই। এইটির বেলায় যত ফাঁকি। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর আদেশ পালন—এইটি হ'ল বৈধী ভক্তি।

কিসের জন্য? একটা উদ্দেশ্য আছে তো—সবেরই তো একটা উদ্দেশ্য আছে। তুমি রাঁধতে জানো, ভাল রাঁধতে হবে। গাইতে জানলে ভাল গাইতে হবে। উন্নতি নইলে আমরা থাকতে পারি কি? এক জায়গায় এক অবস্থায় আমরা কি রাখতে পারি নিজেকে? ছেলে ক্লাসে প্রমোশন পাচ্ছে। তারপর একটা পাস ক'রল, দুটো পাস ক'রল। সবাই তো উন্নতি করতে চায়। এখানে উন্নতি হয় না কেন? ওই বিবেকটুকু নেই; তাই ভগবান বলছেন, 'দদামি বুদ্ধিযোগং'। আমার ভজন কর দেখি প্রীতিপূর্বক, বুদ্ধিযোগ বিবেক আমিই সব দেব। কাজেই এই বৈধী ভক্তি প্রথমে করতে হয়, তারপর রাগভক্তি আসে। রাগভক্তি আনবার জন্য কতগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। গুরু যা দিয়েছেন, তা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করবে। ছেলেদের যা পড়তে বলেছে—পাঠশালে স্কুলে বা কলেজে—ছেলেরা সেইগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে না পড়লে কখনও বিদ্যা অর্জন করতে পারে? সেইখানে তারা যদি গোলমাল করে, তাহলে পাস করতে পারবে? বিবেকটি হ'ল হাল। নৌকার হালটি হ'ল আসল জিনিস। হাল ধরে থাকে যে মাঝি, সেই তো আসলে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। হাল যদি ভেঙে গেল, তাহলে আর কি হবে? এই বিবেক হাল। এই বিবেক কিসের জন্য? এই যে আমরা পূজা জপ করছি, গুরুর আদেশে—কিসের জন্য? প্রেমভক্তি, রাগভক্তি আনবার জন্য। কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! পাখা করছি, বাতাস পাবার জন্য। যেই বাতাস উঠল পাখাটি ফেলে দিলুম। এই বৈধী ভক্তির ভেতর দিয়ে রাগভক্তি এলে আর বৈধী ভক্তির দরকার নেই, প্রমোশন উন্নতি হ'ল আর কি!

বৈধীভক্তির ও রাগভক্তির কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন মাঠে ধান ভরে

আছে, ধান কাটা হয়নি। তখন কি ক'রে যেতে হয় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে?—আল ঘুরে যেতে হয়। কত ঘুরতে হয়! ঘুরে ঘুরে তবে একটা গ্রামে পৌছতে হয়। আর যখন ধান কাটা হ'য়ে গেল, তখন আর আল ঘুরতে হবে না—সোজা একেবারে যেতে পারবে। তেমনি রাগভক্তি একেবারে সোজা ভগবানের কাছে পৌছায়। তাহলে এই প্রেমপ্রীতিটুকুই হ'ল আসল।

ভগবান চান ভক্তের কাছে এই প্রীতিটুকু। গীতায় তাই বললেন, ওই প্রীতিটুকু দিয়ে ভজন কর, বাকি সব আমি ক'রে দেব। সামান্যটুকুও আমরা করতে নারাজ।

ভজন করতে-করতেই সব আসবে। সব তিনি দেন। ক্ষুদ্রকে তিনি কত বড় ক'রে দেখেন। সেইজন্য তিনি কত কৃপা ক'রে একশো পা এগিয়ে আসেন—সত্যি। এইটি একটি বড় কথা। মনে থাকে যেন সংসার করতে গিয়ে তাঁকে ভুলবে না, কখনও তাঁকে ভুলবে না। তাঁকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজন কর। মীরার দেখ, 'প্রীত করনা চাহি রে মনওয়া প্রেম লগানা চাই'। তা না হ'লে গিরিধারীলালকে লাভ করতে পারতেন কি তিনি?

একটি চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে—আখের ক্ষেতে জল নিয়ে যাবে ব'লে—তাহলে ভাল ফসল হবে। সেই আখ বিক্রি ক'রে সংসার প্রতিপালন করবে। কাজেই সে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে—ডোঙা ক'রে জল সেঁচে আখের ক্ষেত ভরতি করছে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই—ভাবছে কিছুক্ষণ পরেই যখন এই জল সেঁচা শেষ হবে, দেখব আখের ক্ষেত জলে ভরে রয়েছে। কিন্তু কাজ শেষ ক'রে চেয়ে দেখে এক ফোঁটা জলও আখের ক্ষেতে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কি সর্বনাশ, এত পরিশ্রম করেও কিছু হ'ল না! কোথায় গেল এত জল? খুঁজতে খুঁজতে আসছে—কোথায় গেল এত জল। দেখলে কতকগুলো ঘোগ—ইঁদুরের গর্ত, তার ভেতর দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এতটুকুও আখের ক্ষেতে নেই। তেমনি এই কামনা-বাসনা আমাদের কিছু হ'তে দিচ্ছে না।

আসক্তি-নোঙর ফেলা আছে, এইজন্য আমাদের নৌকা এগোতে পারছে না। কাজেই এইগুলো সব ভাল ক'রে মনে বিচার করবে, তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে ভজনের সঙ্গে—আমাকে প্রেম দাও, প্রীতি দাও।

ঠাকুর প্রার্থনা করতেন 'শুদ্ধা, অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি দে মা' ব'লে। দেখেছ! ঠাকুরের প্রার্থনা ছিল মার কাছে, 'আমি দেহ-সুখ চাই না মা।' থুথু ফেলে থুথু খেতে নেই। তারপর প্রার্থনা করতেন, 'আমাকে শুদ্ধা, নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি দাও।' শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি গোপীদের ছিল—কৃষ্ণকে তাঁরা বেঁধেছিলেন। অহেতুকী ভক্তি প্রহ্লাদের ছিল, কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। ঠাকুর ওই সব চাইছেন, বলছেন, 'মা, তোকে চাই।' তাঁকে পেতে গেলে কি করতে হবে?—প্রীতিপূর্বক ভজন।

তুমি এতটুকু ভজন কর, তিনি সেইটে এতটা দেখবেন! একেবারে একশো পা এগিয়ে আসবেন। এগুলি সব মনে রাখবে—ঠাকুরের উক্তি। দৈনন্দিন জীবনে একটা মনের খাদ্য চাইতো! এখন ক'রছ সব তো পেটের জন্য, দেহ-সুখের জন্য। মনও একটা খাদ্য চায় তো, মনকে দিতে হবে কিছু। এইগুলিই খাওয়াচ্ছ মনকে।

রোজ একটু ক'রে ভজন করতে হবে; ঘটি রোজ মাজতে হবে—পেতলের ঘটি। তবেই এখানে আসা সার্থক হবে। ভজন চাই—ভজন চাই, তারপর কৃপা। অহেতুক কৃপাসিন্ধু চান শুধু একটু প্রীতিপূর্বক ভজন।

হাক্স্‌লির দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আলডুস্‌ হাক্স্‌লির (Aldous Huxley) Ends and Means বইখানিতে চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় আছে। হাক্স্‌লির মতে বৈজ্ঞানিকের ভুল হচ্ছে একদেশ-দর্শিতায়। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে কেবল সেইগুলিকে বেছে নেওয়া—যেগুলি আমরা ওজন করতে, মাপতে অথবা গুনতে পারি এবং এই বাছাই-করা কতকগুলি সত্যকে সমগ্র সত্য ব'লে চালু করতে যাওয়া নিশ্চয়ই ভুল। এই ভুলের পথে গিয়ে বিজ্ঞান কিছু লাভ করেনি—এমন কথা বলা ঠিক নয়। লাভ সে যথেষ্ট করেছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতোই বিজ্ঞান তার বিজয়-রথকে চালিয়ে দিয়েছে দিকে দিকে। জড়-প্রকৃতির দুর্গ-প্রাকার লুটিয়ে পড়েছে ধূলিতলে সেই দুর্বার অভিযানের সম্মুখে। জড়প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে বিজ্ঞানলক্ষ্মী মর্ত্যের ধূলায় স্বর্গের দরজা খুলে দেবে, মানুষের আর কিছুই চাইবার থাকবে না—এই গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিককে যুগিয়েছে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। কিন্তু যাকে আমরা জড়প্রকৃতি বলছি (টয়েন্‌বীর ভাষায় Non-Human Nature), যাকে জয় ক'রে মানুষ এতকাল ধরে ভাবছিল, স্বর্গ তার করতলে-- সে তো প্রকৃতির আধখানামাত্র। শুধু আধখানা নয়, 'the less formidable half' (অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ আধখানা) বলাই ঠিক। প্রকৃতির বাকী আধখানা রয়েছে মানুষের নিজেরই মধ্যে, যাকে এখনও সে জয় করতে পারেনি। আজও আমাদের স্বভাবের কোন্‌ গভীরে বিচরণ করছে সেই আদিম উলঙ্গ বর্বর, যার প্রকাশ যুদ্ধবিগ্রহের হানাহানির মধ্যে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধি এই বর্বরটাকে বাগে আনতে গিয়ে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে। কখন যে স্বভাবের কালো অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসে বুনো ষাঁড়টা, শিঙের আগায় আমাদের বুদ্ধি এবং সঙ্কল্পকে কোথায় ফেলে দেয় ছুঁড়ে! আগ্নেয়গিরির এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের সামনে আমাদের মনের অবচেতন দিকটা চকিতে ধরা পড়ে যায় এবং মগ্নচৈতন্যের এই চেহারা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্‌ হ'য়ে যাই। প্রকৃতির এই ভয়াবহ আধ-খানাকে লক্ষ্য করেই টয়েন্‌বী মন্তব্য করেছেন: The other half of Nature, with which man still has to cope, is Nature as he finds her within himself.

ইচ্ছাশক্তির এবং বুদ্ধির জয়জয়কার সর্বত্র—এই অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে গেলে তবেই না আমরা ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন অনুভব করি! তবেই না আমরা 'কথামৃতে'র সেই বাছুরের মতো বলতে আরম্ভ করি, নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু! আমি নই, আমি নই, তুমি তুমি! টয়েন্‌বী ঠিকই বলেছেন, Self-centredness is an intellectual error, because no living creature is in truth the centre of the universe.—(স্বার্থ-কেন্দ্রিকতা একটা বুদ্ধির ভুল, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাণী বিশ্বের কেন্দ্র হ'তে পারে না)।

আমাদের বুদ্ধির অহঙ্কার আর একটা জায়গায় এসে আজ বিষম আঘাত খেতে আরম্ভ করেছে! আরব্যোপন্যাসের সেই জেলে জালার মুখটা খুলে দিতেই বেরিয়ে পড়লো একটা দৈত্য, আর তার আকার ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হ'তে লাগলো। বৈজ্ঞানিক সেই জেলের মতোই একান্তভাবে বিজ্ঞানের সেবা করতে গিয়ে আজ মুক্তি দিয়েছে পরমাণু-বোমার

দানবীয় শক্তিকে, যে-শক্তি পৃথিবীকে যে কোন মুহূর্তে রসাতলে পাঠাতে পারে।

আসন্ন প্রলয়ের সামনে মানুষের নাড়া-খাওয়া মন আজ ভাবতে আরম্ভ করেছে, বিজ্ঞানের এবং টেক্‌নলজির রাস্তায় 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছানো আদৌ সম্ভব কি না!

বৈজ্ঞানিকের এবং টেকনিশিয়ানের প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির ঔদ্ধত্যে মানুষের আড়াইশো বছরের শ্রদ্ধা যখন ভাঙতে আরম্ভ করছে, তখন ধর্ম আবার তার হারানো সিংহাসন অধিকার করতে পারে। যা ওজন করা, মাপা অথবা গোনা যায়, তারই মধ্যে কি সত্যের রাজ্য সীমাবদ্ধ? প্রেম, সৌন্দর্য, ধ্যানের আনন্দ—এরা কি মিথ্যে? এদের কি কোন মূল্য নেই? সার্থকতা নেই? আলডুস্ হাক্স্‌লি বলছেন: Reality as actually experienced contains intuitions of value and significance, contains love, beauty, mystical ecstasy, intimations of godhead. মানুষের উপলব্ধিতে যে-সত্য ধরা দেয়, তার মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সহজ অনুভূতি—ভালোবাসার অনুভূতি, সৌন্দর্যের অনুভূতি, ঈশ্বরের আনন্দের অনুভূতি, অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস। বিজ্ঞানের হাতে এমন কোন যন্ত্রপাতি আগেও ছিল না এবং এখনও নেই, যা দিয়ে সত্যের এই সব গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণ করা যায়। তাই বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-চেতনার দিকটাকে উপেক্ষা করেছে, জগতের যে-সকল দিককে পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং উচ্চতর গণিতের নানাশাখার সাহায্যে জানা যায়, তাদেরই উপর সমস্ত জোর দিয়ে এসেছে।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা বলেন—ঈশ্বরের আনন্দ নেহাত কল্পনা-প্রসূত, ওর কোন বাস্তব সত্তা নেই, ও নিছক মায়া। কিন্তু যারা সংসার নিয়ে ডুবে আছে, ঈশ্বরের আনন্দের আস্বাদন যারা পায়নি কখনও, তাদের কাছে ঐ আনন্দ তো মন-গড়া ব'লে মনে হবেই। পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখেনি—পাতকুয়াটিই জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে। জন্ম থেকে যে বধির, তাকে কেমন ক'রে বোঝানো যাবে সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মাধুর্য? একজন ভারতীয় ইওরোপীয় সঙ্গীতের সুর প্রথম শুনলে মনে করবে ভেড়ার গোয়ালে কে আগুন দিয়েছে। কিন্তু অনেকদিন ধরে শুনতে শুনতে তার একদিন মনে হবে, ইওরোপীয় সঙ্গীত উপেক্ষার বস্তু নয়। হাক্স্‌লি বলছেন: জীবনের আনন্দময় অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে যেগুলি নিতান্ত সহজবোধ্য কেবল সেগুলিরই দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত। The rest cannot be had except by those who have undergone a suitable training. জীবনের বাকী আনন্দগুলির অনুভূতি সাধনা-সাপেক্ষ। রবিঠাকুরের গীতি-কবিতাগুলিকে প্রথমটায় মনে হবে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, কিন্তু পড়তে পড়তে একদিন মনে হবে—সাহিত্যে ওদের সত্যি সত্যি কোন তুলনা নেই। হাক্স্‌লি বলছেন, Knowledge is always a function of being. আমরা যে-রকমটি, তারই উপর নির্ভর করে আমাদের জানা। আর আমরা কোন্ স্তরের মানুষ, তা নির্ভর করে আমাদের আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে আমরা কতখানি চেষ্টা করেছি তার উপর, আমাদের আদর্শের ধরনের উপরেও অনেকখানি।

হাক্স্‌লি বলছেন, সাধনার রাস্তায় যাঁরা ঈশ্বরের আনন্দের আস্বাদন পেয়েছেন, তাঁদের অনুভূতির অভিজ্ঞতা পেতে হ'লে নিজে সাধক হওয়া চাই। সাধন ক'রব না, তবুও আশা ক'রব ঈশ্বরের আনন্দের অনির্বচনীয় অনুভূতির—এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি হ'তে পারে?

বৈদিক ঋষির জীবন-দর্শন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বৈদিক ঋষি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। রৌদ্রস্নাত পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছবি তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিত। তাঁহারা ভালবাসিতেন বনকুন্তলা শ্যামা ধরণী-জননীকে—ভালবাসিতেন পৃথিবীর লীলাচঞ্চল জীবন। তাঁহাদের প্রার্থনা সত্য, শিব ও সুন্দরের উদ্দেশ্যে।

ঋগ্বেদে শ্যাবাশ্ব আত্রেয় প্রার্থনা করিতেছেন:

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব॥
অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে।
বিশ্বা বামানি ধীমহি॥
আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে।
সত্যসবং সবিতারম্॥ ৫.৮২।৫-৭

—হে জগৎ-প্রসবিতঃ! হে দিব্যদ্যুতি সবিতঃ! তুমি পরম জ্যোতির্ময় দেবতা—যত কিছু দুঃখ, যত কিছু পাপ, অন্যায়, কলঙ্ক তুমি দূর কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণময়, যাহা শুভ ও শঙ্কর, তাহাই প্রেরণ কর।

পাপহীন অদিতি সবিতার কল্যাণে দোষহীন সেই দেবতার অনুপম শক্তিতে আমরা যেন পাই—যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শোভন ও উজ্জ্বল।

এস আমরা সেই পরমদেবতার নিগূঢ় সত্যকে বরণ করি, আমাদের হৃদয়ের উৎসারিত স্তোত্রে সেই বিশ্বদেব সৎপতি সত্যপালককে গ্রহণ করি।

তিনি শিবতম। কল্যাণ ও ভদ্র তাঁহারই প্রসন্ন প্রসাদ। শিব যেখানে, কমনীয়তা সেখানে, সৌন্দর্য সুষমা কান্তি সেখানে; কিন্তু শিব ও সুন্দর তো একক নন, অনন্ত নন; তাঁহাদের আসন সত্যের সুদৃঢ় বেদীর উপর। সত্যের ভিত্তিতেই শিব ও সুন্দরের উদ্দীপন।

বৈদিক ঋষির দেবতা তাই শূন্য নয়, মায়া বা ছায়া নয়, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেই আনন্দ-সাগরে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষিদের জগৎ মধুময়। বৃহস্পতি-তনয় ভরদ্বাজ তাই প্রার্থনা করিয়াছেন:

মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং
মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা
মহিশ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্॥৬।৭০।৫

—দ্যৌ ও পৃথিবী মধুধারা বর্ষণ করুন, মধুক্ষরণ করুন। আমরা যেন দ্যাবাপৃথিবী হইতে মধু দোহন করি, কারণ তাহারা মধুব্রত। দ্যাবা-পৃথিবী আমাদিগকে যজ্ঞ ও সম্পৎ দিন, দিন আমাদিগকে বিপুল কীর্তি, সুবীর্য এবং প্রচুর ধন।

যিনি প্রাণারাম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই জীবনকে দেখিতেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য বায়ু মধুর হইয়া বহে, নদী মধুর স্রোতে স্রোতস্বিনী হয়। তাঁহাদের জন্য বনস্পতি মধুময়, ওষধি মধু ভরিয়া রাখে, রাত্রি ও দিন মধুরতায় সিক্ত হয়, সূর্য মধুর আলোক দেয়, দশদিক মধুতে ভরিয়া যায়।

ভগবানকে লইয়া ঋষিরা তর্ক করেন নাই। তাঁহাকে তাঁহারা দিব্যানুভূতিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহারা নানা নামে ডাকিয়াছেন—নানা মূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনিই এক।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥১০।৮২।৩

—যে পিতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমস্ত ধামকে জানেন—বিশ্বভুবন যাঁহার ক্রীড়াস্থল, যিনি এক হইয়াও বিবিধ দেবতার নামে পরিচিত, অন্য সকলে সপ্রশ্ন হইয়া তাঁহাকেই অনুসন্ধান করে।

এক অদ্বিতীয়ের বিচিত্র বিলাস বিশ্বজগৎ—নানা শক্তির প্রকাশ সেই একেরই শক্তি; অথর্ববেদ ও যজুর্বেদে এই পরমকে দূরে না রাখিয়া অনুরাগের আবেগে বলা হইয়াছে:
স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধু।

প্রিয়তম সেই সখাকে প্রেমের ছন্দে দর্শন করিতে পারাই চরম পুরুষার্থ। তিনি তো পরম ত্রাতা, তিনি মঘবা—তাঁহার স্নেহের অমৃতধারা আমাদের জন্য সতত বহমান, তাই—
অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবক শোচিষম্।
হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে ॥৮।৪৩।৪১

—পুলকিত হৃদয়ে উল্লসিত অন্তরে সেই আনন্দময় দেবতার উপাসনা করিব, তিনি যে সর্বজনপ্রিয়, তিনি জ্যোতির্ময়, পবিত্র ও শুচি।

খৃষ্টীয় পাপবোধ বৈদিক ঋষিকে পীড়িত করে না। তিনি জানেন মানুষ চিরদীপ্ত, পবিত্র, অমৃতের সন্তান। সেই অমৃতত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ অন্তরের উদ্বেল আনন্দে। সেই আনন্দের মাধ্যমেই অন্তর-দেবতাকে উপাসনা করিতে হইবে। সান্ত অনন্তকে ধরিবে, অপূর্ণ পূর্ণতাকে আলিঙ্গন করিবে, খণ্ড অখণ্ডকে আকর্ষণ করিবে। ইহা সম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বরূপতঃ এক।

তিনি তাঁহার অশেষ মাধুর্য লইয়া দূরে নহেন, তিনি নামিয়া আসিতেছেন, ভক্তকে প্রতি মুহূর্তে আহ্বান করিতেছেন—এই লীলাই তাঁহার করুণার মহৎ পরিচয়। তাই
গাব ইব গ্রামং যুযুধিরিবাশ্বান্
বা শ্রেব বৎসং সুমনা দোহনা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু
ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥১০।১৪৯।৪

—গরু যেমন গ্রামে ফেরে, যোদ্ধা যেমন প্রিয় অশ্বের নিকট ধাবমান হয়, বৎসের নিকট যেমন গাভী চঞ্চল হইয়া ধায়, পতি যেমন জায়ার নিকট যায়, তেমনই সেই প্রিয়তম যিনি দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন—যিনি ধাতা, যিনি সবিতা, সমস্ত সুখের যিনি জনক, তিনি আমাদিগের নিকট আসুন।

ভাগবত জ্ঞানের এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত বৈদিক ঋষি কর্মবাদী ছিলেন, পৃথিবীর জীবনকে ধন্য ও পুণ্য করিবার জন্য তিনি অতন্দ্র কর্মের উপাসক। আলস্যের জড়িমা তাঁহার কাম্য নহে, তাঁহার চাই সদাজাগ্রত অধ্যবসায়। নব নব কর্মে নবীন অভ্যুদয়ের দিকে চলাই তাঁহার লক্ষ্য। স্বাস্থ্যে সবল, বীর্যে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, জীবনের পরিপূর্ণতা বৈদিক ঋষির অভিপ্রেত। শতায়ু হইবার উদগ্র বাসনা তাঁহার—অকালমৃত্যু তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তাই ঋষি শত শরৎ অজর হইয়া বাঁচিতে চাহেন। সেই কর্মোজ্জল জীবনে তাঁহার প্রার্থনা:
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্। ঋগ্বেদ ২।২১।৬

—হে পরমেশ! যাহা শ্রেষ্ঠ ধন, যাহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পৎ, তাহাই আমাদিগকে দাও, দাও সুনিপুণ চিত্ত, দাও সৌভাগ্য। আমাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ধন দিনে দিনে নবতর

পুষ্টি লাভ করুক, আমাদের তনু নিরাময় হউক, আমাদের বাক্য সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হউক, আমাদের প্রতিটি দিন যেন আনন্দে ও উৎসবে সুদিন হইয়া উঠে।

আমাদের প্রত্যহকে সৌভাগ্যপ্রদীপ্ত সুদিন করিতে হইলে চাই অতন্দ্র অধ্যবসায়—চাই অনলস কর্ম। দেবতারা প্রমাদকে ঘৃণা করেন—তাঁহারা ব্রতীকে, কর্মীকে স্নেহ করেন :

ত্রাতারো দেবা অধিবোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরা সো বিদথমা বদেম ॥ ৮।৪৮।১৪

—হে পরিত্রাতা দেবগণ, আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। নিদ্রা যেন আমাদিগকে মোহিত না করে, অলস জল্পনায় যেন আমরা কালক্ষেপ না করি। আমরা যেন বাক্‌পটু হইয়া সভায় বিদগ্ধ বক্তা হই—আমরা যেন দেবপ্রিয় হই—যেন সুবীর হই। স্বপ্নালু হইলে চলিবে না—অতন্দ্র কর্মী হইতে হইবে। কর্ম করিয়া যে শ্রান্ত, তপস্যায় যে আসক্ত, ব্রতে যে নিষ্ঠ—দেবতারা তাহাকেই আপ্যায়িত করেন। ধৃতব্রত ব্যক্তিই সমাজে শ্রেষ্ঠ। তাহাকে বলিতে হইবে, 'চরৈবেতি চরৈবেতি' সূর্য-চন্দ্রের মতো অবিরাম গতিতে কেবল চলিতে হইবে—চলার মাঝেই মানুষ মধুলাভ করে। সূর্যের যেমন বিশ্রাম নাই—মানুষকে তেমনই অবিশ্রাম কাজ করিতে হইবে। যে যতদিন বাঁচিবে, ততদিন কর্ম করিয়াই তাহাকে বাঁচিতে হইবে—ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

জীবনবাদী ঋষির কর্ম কিন্তু আত্মস্বার্থের জন্য নহে, তাহাকে যজ্ঞ-জীবন যাপন করিতে হইবে। যজ্ঞ দেবোদ্দেশে ত্যাগ; বিষ্ণুর প্রীতিকাম হইয়া জীবন চালাইতে হইবে—সকলকে খাওয়াইয়া তাহাকে যজ্ঞাবশেষ খাইতে হইবে, আপনাকে লইয়া বিব্রত হওয়া তাহার চলিবে না।

ধন আহরণ করিতে হইবে, কিন্তু সত্যের পথে সে আহরণ—নমস্কার এবং তপস্যায় তাহার আয়োজন। প্রতিদিন আত্মানুশীলনের দ্বারা মানুষ দক্ষ হইবে; ঋতপালনে তাহার আসিবে নবতর শক্তি, জাগ্রত হইবে তাহার অন্তর্লীন প্রতিভা। কিন্তু মানুষের এই ধন, এই অন্ন লোকসেবায়। সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত অন্নই মানুষের অমৃত—যে লোক নিজের বিলাস-ব্যসনে ধন ব্যয় করে, সে তস্কর।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ ১০।১১৭।৬

—যে জ্ঞানহীন সে বৃথাই অন্ন সঞ্চয় করে, তাহার শ্রম ব্যর্থ, কারণ যে অন্ন লোকে কলঙ্কিত, তাহা তাহার মৃত্যু আনয়ন করিবে। যে একক খায়, সেই স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল পাপই ভক্ষণ করে; বন্ধুকে যে দেয় না, দেবতাকে যে দেয় না—সেই স্বার্থান্ধ লোভী পাপেই ডোবে।

দিব্য জীবনের উদ্গাতা বৈদিক ঋষি ছয়টি জিনিসকে তাঁহার দেব-জীবনের ভিত্তি বলিতেন; অথর্ব বেদে পাই :

সত্যং বৃহৎ ঋতমুগ্রং দীক্ষাতপে।
ব্রহ্ম যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়ন্তি ॥ ১২।১।১

—পৃথিবীকে ধারণ করে ছয়টি বস্তু : সত্য, বৃহৎ ও উগ্র ঋত, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ।

সত্যই ধর্মের প্রথম ও প্রধান সোপান। সবিতা সত্যধর্মা। সত্য বাক্‌ এবং সত্য কর্ম অভ্যুদয়ের পথ। সত্যেরই জয়, অনৃতের ক্ষয়। অঘমর্ষণ ঋষি বলিয়াছেন :

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।

—ঋত এবং সত্য তপস্যার তীব্রতায় জন্ম-

লাভ করে। তপস্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে চাই দীক্ষা। দীক্ষিত হইয়া পরমার্থের জন্ম চাই মানুষের অতন্দ্র সেবা। তাহার দুইটি সহায়—উপাসনা এবং যজ্ঞ।

এই যে দিব্য জীবনের স্বপ্ন—ইহা অসম্ভব নয়। ঋষির বোধিতে নিগূঢ় অনুভূতিতে তাহা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে এই অধ্যাত্ম-বিদ্যা ঋষি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা একান্ত মিথ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা সর্বসাধারণের জন্ম তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই অমৃত-তত্ত্ব সকলকে দিবার জন্ম তিনি অনুশাসন দিয়াছেন, বিশ্ব-মানবকে আর্য করিবার কথা বলিয়াছেন।

সেই ঋষিবাক্য পূর্ণ করিবার চেষ্টা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কল্যাণী বেদবিদ্যা তাপতপ্ত জগতের মানুষকে দিবার যুগ আজ আসিয়াছে। বিশ্বমানবকে দ্বিজ করিবার, সত্যে ও ঋতে দীক্ষা দিবার সুবর্ণ সুযোগ আজ উপস্থিত। আমরা যেন অকারণে সেই সুযোগ হেলায় না হারাই।

বৃহৎ পৃথিবীর বৃহত্ত্বের মাঝে আজ সমগ্র মানবজাতির নবীন উজ্জীবন হউক। বিবর্ধন এবং প্রগতির পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠুক। আবার সংবলন ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা উদাত্ত স্বরে গাহি :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥
ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২-৪

—তোমরা সকলে একত্র হও, এক স্বরে কথা কও, তোমাদের মন ঐকতানে বাজুক। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, তোমাদের সমিতি এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমাদের চিন্তা এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই অভিপ্রায়ে নিযুক্ত হইতে বলি, একই উপচারে তোমরা পূজা করিবে। তোমাদের আকূতি এক হউক, তোমাদের সুসঙ্গতি হউক, মনে প্রাণে ঐক্য হউক, তোমাদের সকলের চিন্তা ও ভাবনা এক হউক, তাহা হইলে তোমরা একমত হইতে পারিবে।

বিশ্বজনীনতা বৈদিক ঋষির অতিমানবত্বের পরিচয়। যেদিন ব্যবধান ছিল দুস্তর, মরু-কান্তার এবং অভ্রংলিহ পর্বতমালা, সীমাহীন বারিধি যেদিন মানুষে মানুষে ভেদ ও অপরি-চয়ের অর্গল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই অতীতেই বৈদিক ঋষি বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবিতেন। তিনি বিশ্ব-নরের দেবতাকে বৈশ্বানর নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। ইন্দ্র সাধারণের দেবতা। সেই ঋষি-দৃষ্ট বিশ্বমৈত্রী আজ সত্য হউক। আজ যেন আমরা বলিতে পারি :

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ যজুর্বেদ ৩৬।১৮

—বিশ্বজগতের সকল প্রাণী যেন মিত্রের মতো আমাকে অবলোকন করে, আমিও যেন সকলকে মিত্রের চক্ষুতে দেখি। আমরা যেন মৈত্রীর মাধ্যমে পরস্পরকে দেখিতে শিখি। বৈদিক ঋষির জীবন-দর্শনের শেষ কথা এই বিশ্বাত্মবোধ—বিশ্বানুভূতি।

সংস্কৃতের মহাকাব্য

ডক্টর শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্যকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি দৃশ্য আর একটি শ্রব্য। যে কাব্য অভিনয়োপযোগী তাই দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ নাটকই দৃশ্যকাব্য, এর আর একটি নাম রূপক। রূপকালংকারে একটি বস্তুর ওপরে আর একটিকে এমনভাবে আরোপিত করা হয়, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে নিজের রূপে রূপায়িত ক'রে তোলে। এ অলংকার আরোপ-প্রাণ, আর আরোপ আছে বলেই এর নাম হয়েছে রূপক। নাটককেও আরোপ-প্রাণ ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে; কারণ যতক্ষণ অভিনয় চলতে থাকে, ততক্ষণ দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পাত্র-পাত্রী বলেই মনে করেন। এইজন্যই নাটকের আর একটি নাম হচ্ছে রূপক। যে কাব্য কেবল শ্রোতব্য,—যাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা চলে না, তার নাম শ্রব্য কাব্য। এ কাব্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে—পদ্যময়, গদ্যময় ও মিশ্রকাব্য। মিশ্রকাব্যই আলংকারিক-গোষ্ঠীতে চম্পূ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। পদ্যময় কাব্যের প্রভেদ দুটি--মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ কাব্য সর্গাকারে নিবদ্ধ হয় ব'লে এর আর একটি নাম হচ্ছে সর্গবন্ধ। সর্গবন্ধ মহাকাব্যের কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হওয়া চাই,—এর ইতিবৃত্ত-নির্মাণে কবি-কল্পনার কোন অবকাশ নেই। যদি নিতান্তই কবি-কল্পিত ইতিবৃত্ত পরিবেশিত হয়, তাহলে তা যেন কোন মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়। মহাকাব্যের নায়ক চতুর ও উদাত্ত দেবতা কিংবা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হওয়া চাই। সহজ কথায় মহাকাব্য অভিজাত-জীবনের আলেখ্যরূপে গড়ে উঠবে, এতে প্রতিবিম্বিত হবে সমাজের উন্নত স্তরের জীবন। মহাকাব্যের আরম্ভে থাকবে পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে রচিত আশীর্বাণী, কিংবা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপক শ্লোক। কখনও কখনও সরাসরি নায়কের বর্ণনার দ্বারা বা কাহিনীর সূচনার দ্বারাও মহাকাব্য আরম্ভ হ'তে পারে। এর সর্গগুলি আকারে খুব বিস্তৃতও হবে না, আবার সংহতও হবে না। সাধারণতঃ এক ছন্দে সর্গের শ্লোকগুলি রচিত হবে; কেবল শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকে ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার থাকবে। আগামী সর্গের কাহিনীর সূচনা সর্গের শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকে থাকবে। এই লক্ষণগুলিই সব নয়। মহাকাব্যের কলেবর-স্ফীতির জন্য যে যে বিষয়ের বর্ণনা এতে স্থান লাভ করবে, তারও একটি নির্দিষ্ট তালিকা আলংকারিকেরা দিয়ে দিয়েছেন। এতে স্থান লাভ করেছে নগর, সমুদ্র, পর্বত, ঋতু, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, চন্দ্রাস্ত, জলকেলি, উদ্যান, মদ্যপান, সম্ভোগ, বিবাহ, বিচ্ছেদ, কুমারোৎপত্তি, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, নায়কের উন্নতিলাভ এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা মহাকাব্যে প্রবেশ লাভ ক'রে কাব্যকে মহৎ ক'রে তুলবে। নগর প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা ব্যাহত হ'য়ে মূল কাহিনীর

সূত্র যাতে ছিন্ন না হ'য়ে যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

আলংকারিকেরা তাই বলেছেন, নাটক-প্রসিদ্ধ পঞ্চ সন্ধি মহাকাব্যে স্থান লাভ ক'রে কাহিনীকে সুসংহত ক'রে তুলবে। নাটকীয় কাহিনীর পাঁচটি অবান্তর ভাগের কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দ্বিবিধ আলংকারিকই স্বীকার করেছেন। এই ভাগগুলি হচ্ছে—প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা এদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে: Exposition, Growth of Action, Climax, Resolution ও Catastrophe; সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে এরাই হচ্ছে যথাক্রমে মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্শসন্ধি ও নির্বহণসন্ধি। মহাকাব্যের কাহিনী বীজবপন থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফলপ্রাপ্তিতে পৌঁছাবে,—এইটাই বোধ করি আলংকারিকেরা 'পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্' বিশেষণের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। এ-রকম মহাকাব্যের ছন্দ যদি শ্রুতিসুখকর হয়, আর শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বিন্যাস যদি তাকে রমণীয় ক'রে তোলে, সহজ কথায়—তার আঙ্গিক যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তাহ'লে তা জাতীয় স্মৃতির অমরাবতীতে চিরদিনের জন্য স্থানলাভ করবে।

আচার্য দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালের আলংকারিক রুদ্রট তাকেই সামগ্রিক ভাবে অপরিবর্তিত রূপে মেনে নিয়েছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ এ সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসের মধ্যে একটা প্রধানভাবে পরিবেশিত হবে; কোথাও দুর্জনের নিন্দা, কোথাও বা সুজনের গুণকীর্তন থাকবে, সর্গসংখ্যা হবে আটের বেশী, আর নাম হবে কবি, ইতিবৃত্ত, নায়ক বা কাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কোন চরিত্রের নামানুসারে। যে আলংকারিক সর্বপ্রথম মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন, তাঁর প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালিদাসোত্তর যুগের। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মহাকাব্যগুলিকে সামনে রেখে, তাদের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি মহাকাব্যের ধর্ম আবিষ্কার করেছেন।

কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ-রচিত মহাকাব্য দুটি—বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ। মূল সংস্কৃতে লেখা 'বুদ্ধচরিতে'র মাত্র তেরটি সর্গ এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে; অবশ্য অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, এতে বাইশটি সর্গ ছিল। 'বুদ্ধচরিতে' বুদ্ধের মানসিক পরিবর্তন, সিদ্ধিলাভ, মারের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরিশেষে জয়লাভ, এই সমস্ত বর্ণিত হয়েছে। জরাতুর ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্বপ্নাবিষ্টা নিরাবরণা নারী ও মৃতদেহ দর্শন ক'রে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারের বর্ণনার দ্বারা অশ্বঘোষ সংসারের অসারতা ও অনিত্যতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন,—বলতে চেয়েছেন যে বন্ধন কাটিয়ে উঠতে না পারলে, চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় না করলে পুরুষার্থ লাভ হয় না। অশ্বঘোষের এ কথা চিরকালের সত্য, আর এই জন্যেই তাঁর কাব্য মহাকাব্য। 'সৌন্দরানন্দ' সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। এ কাব্যে কবি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের বলপূর্বক দীক্ষা গ্রহণের বর্ণনা করেছেন। নন্দ দীক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু ভোগের প্রতি আসক্তিকে ত্যাগ করতে পারেননি। তীব্র ভোগাসক্তির অনলে তিনি দগ্ধ হয়েছেন; এতে ইন্ধন জুগিয়েছে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সুন্দরার বিলাপ। তাই স্বর্গে গিয়েও নন্দের শান্তিলাভ হয়নি,—অপ্সরাদের সান্নিধ্য খুঁজতে হয়েছে। এ কাব্যে বোধ হয়, অশ্বঘোষ আসক্তি-

ত্যাগের ওপর জোর দিয়েছেন ; বলেছেন—শুধু বস্তুত্যাগ করলেই হল না, ভোগের ইচ্ছাকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হবে। পূর্বের মতোই এ-আদর্শও শাশ্বত ও ব্যাপক। 'সৌন্দরানন্দে'র সর্গসংখ্যা হচ্ছে আঠারটি। মহাকাব্যের লক্ষণ অনুযায়ী এতে নগর, ঋতু প্রভৃতির শব্দচিত্র স্থান পেয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের কবিপ্রতিভাও আমাদিগকে দুটি মহাকাব্য উপহার দিয়েছে। একটি 'কুমারসম্ভব', আর একটি 'রঘুবংশ'। 'কুমারসম্ভবে'র সর্গসংখ্যা আটের বেশী ও পরিবেশিত প্রধান রস শৃঙ্গার। এর আরম্ভ হয়েছে কাহিনীর অন্যতম চরিত্র হিমালয়ের বর্ণনার দ্বারা এবং পর্বত, ঋতু, বিবাহ, সম্ভোগ, কুমারোৎপত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাও এতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু 'কুমারসম্ভবে'র মহত্ত্ব এর ওপরে নির্ভর করে না। এ কাব্য মহৎ, কারণ মদনভস্মের কথা ব'লে এ কাব্য নারীর ললিত দেহসৌন্দর্যের চরম ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছে ; বলেছে যে, প্রিয়জনের চিত্ত জয় করার প্রকৃত পথ হচ্ছে তপস্যা ও ত্যাগ—বলেছে যে, ত্যাগ ও প্রেমকে আশ্রয় ক'রে যে মিলন সংঘটিত হয়, তার থেকেই কার্তিকেয়ের মতো কুমারোৎপত্তি আশা করা যেতে পারে। ফাল্গুনের পত্রপুষ্প-পর্যাপ্তির মধ্যে যখন বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্বতী মহাদেবের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন, তখনই যদি মহাদেব তাঁকে গ্রহণ করতেন, তাহলে সে মিলনের ফলস্বরূপ কার্তিকেয়কে পাওয়া সম্ভব হ'ত না। 'কুমারসম্ভবে'র সত্য শাশ্বত সত্য, নারীর ললিত লাবণ্যের ব্যর্থতা চিরকালের। তাই এ কাব্য মহাকাব্য।

'রঘুবংশে' মহাকবি রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ কাব্যের আরম্ভ হয়েছে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা দিয়ে ও ঋতু, যুদ্ধযাত্রা, সন্তানজন্ম প্রভৃতির বর্ণনা এর কলেবরকে স্ফীত করেছে। এর প্রধান রস বীররস। যদিও মহাকাব্যের লক্ষণের সঙ্গে এর সঙ্গতি স্পষ্ট, তা হলেও কেবল এই কারণেই রঘুবংশ মহাকাব্য হয়েছে, এ কথা বললে কাব্যের প্রতি অবিচার করা হবে। 'রঘুবংশে' ভারতীয় আদর্শের জয়-ঘোষণা ক'রে কবি তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনারই পরিচয় দিয়াছেন। রঘুবংশের রাজারা শৈশবে বিদ্যা অভ্যাস করতেন, যৌবনে বিষয় উপভোগ করতেন, বার্ধক্যে মুনির বৃত্তি অবলম্বন ক'রে পরিশেষে যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করতেন। এঁরা দান করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন, যশ লাভের জন্য রাজ্যজয় করতেন ও সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করতেন। প্রজাবর্গের শিক্ষাদান, ভরণ-পোষণ সব কিছুর ভার এঁরা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে এঁরাই ছিলেন প্রজাদের পিতৃস্থানীয়। কালিদাস আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যতদিন আদর্শের প্রতি রঘুবংশীয় রাজাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন তাঁরা সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে পেরেছেন—ইহকালে ও পরকালে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন। রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সব কিছু নিঃশেষে দান ক'রে মখজ অকিঞ্চনত্বের পরিচয় দিয়েছেন ; তাতে তাঁর লাভই হয়েছে, কারণ যশোবৃদ্ধি ঘটেছে। রাম প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সীতাকে নির্বাসিত করেছেন—বিবেকের বৃশ্চিকদংশন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন ; তাঁরও তাতে লাভ হয়েছে, কারণ আদর্শ রাজা ব'লে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছেন। 'রঘুবংশে'র মহাকবি সকলের শেষে অগ্নিবর্ণ নামে এক রাজার বর্ণনা করেছেন। অগ্নিবর্ণ আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন না, প্রজাবর্গের কল্যাণ ও সুখের দিকে আদৌ দৃষ্টি দিতেন না। তিনি ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগপরায়ণ।

কালিদাস বলেছেন, মধুরভাষিণী নারী ও বীণা—এ দুটির সঙ্গসুখের মোহ রাজা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এরাই ছিল তাঁর নিত্য-সহচরী। তাই আদর্শ-চ্যুত নৃপতি অগ্নিবর্ণকে ঘৃণ্য মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তিনি স্থান পাননি। আদর্শনিষ্ঠের উন্নতি ও আদর্শচ্যুতের ধ্বংস চিরকালই হ'য়ে থাকে। 'রঘুবংশে'র মধ্যে এই চিরকালের সত্য স্থান পেয়েছে বলেই এ কাব্য মহৎ, এর আবেদন এত বেশী।

যদিও দণ্ডী ও তাঁর উত্তরসূরিরা 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'কে সামনে রেখেই তাঁদের মহাকাব্য-লক্ষণ রচনা করেছেন, তা হলেও ঐ দুইটি কাব্যের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁদের লক্ষণ মহাকাব্যের বহিরঙ্গের বর্ণনা করেছে, তা তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। দণ্ডী বা বিশ্বনাথ উভয়েই মহাকাব্যের মহত্ত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে নীরব থেকে গেছেন। বুদ্ধচরিত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কবির বৃহৎ পরিকল্পনা ও পরিবেশিত আদর্শের মহত্ত্বের জন্যেই কাব্য মহাকাব্য হয়। বস্তুসত্তার প্রাধান্য মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিই সব নয়। আচার্য দণ্ডী প্রমুখ সংস্কৃত আলংকারিকেরা একেই বড় ক'রে দেখেছেন, প্রাণকে উপেক্ষা ক'রে। এর ফলও হয়েছে মারাত্মক। কালিদাসের পরবর্তী যুগের যে সমস্ত কবিযশঃপ্রার্থীরা আলংকারিকদের লক্ষণ বর্ণে বর্ণে অনুসরণ ক'রে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের সৃষ্টিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। তাই কালিদাসোত্তর যুগের মহাকাব্য অনেক নিম্নস্তরের। যেমন রঘুবংশ-কুমারসম্ভবকে রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না, তেমনি কিরাতার্জুনীয়-শিশুপালবধকেও প্রথম দুটির সমশ্রেণীর ব'লে গণনা করা চলে না।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ে'র কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব থেকে সংগৃহীত। বার বছরের জন্য পাণ্ডবেরা বনে এসেছেন। দ্রৌপদীর শ্লেষপূর্ণ উক্তি ও ভীমের ক্রোধ যুধিষ্ঠিরকে টলাতে পারেনি,—কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে উৎসাহিত করতে পারেনি। এই সময় ঋষি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর নির্দেশমত পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন থেকে কাম্যকবনে গেছেন। সেখানে এসে অর্জুন মহাদেবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ইন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে এসে অর্জুনকে তপস্যা করতে নিষেধ করেছেন। শেষে তাঁর দৃঢ়তা দেখে আশীর্বাদ ক'রে ফিরে গেছেন। পরিশেষে ব্যাধের বেশ ধারণ ক'রে মহাদেব এসে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্জুনের সঙ্গে বরাহ-হননকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর কৃত্রিম কলহ হয়েছে। এর পর প্রসন্ন মহাদেব আত্মপ্রকাশ ক'রে শৈব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করেছেন। এই ছোট কাহিনীটি যে কি ক'রে ১৮টি সর্গের বর্ণনীয় বিষয় হ'তে পারে, তা ভেবে সত্যি বিস্মিত হ'তে হয়। অবশ্য, আলংকারিকেরা এ বিষয়ে ভারবিকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের উপদেশমত ঋতু, পর্বত, কামক্রীড়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা ক'রে কবি তাঁর কাহিনীর কলেবর-স্ফীতি ঘটিয়েছেন। ভারবির বর্ণনা-শক্তি প্রশংসার দাবি রাখে; তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি উক্তিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিক দিয়ে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু যখন শব্দালংকারের বিন্যাসের দ্বারা তিনি নিজের চাতুর্যের পরিচয় দিতে গেছেন, তখন অলংকার

কাব্যলক্ষ্মীর শোভাকর না হ'য়ে পীড়াকরই হ'য়ে উঠেছে।

সব থেকে বেশী নিজের চাতুর্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেছেন কবি ভট্টি। এঁর রচনা ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত সমগ্র রামায়ণের কাহিনী। ভট্টি কাব্য রচনা করতে যাননি,—গিয়েছেন ব্যাকরণের মূল সূত্র ও অলংকারের উদাহরণ দিতে। তাই তাঁর কাব্যের আর একটি নাম উদাহরণ-কাব্য। ব্যাকরণ ও অলংকার কবি-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করলেও ভট্টি মাঝে মাঝে তাঁর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় ভালভাবেই দিয়েছেন। তবে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে এ কথা বলতেই হয় যে, এটি সুধীসমাজের সুখপাঠ্য, সাধারণের প্রবেশ এখানে নিষেধ। একথা কবির নিজের। নিজের কাব্যের আবেদন সীমিত, এ কথা ব'লে কবি হয়তো যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন আবেদন বিসর্জন দিয়ে কাব্য মহত্ত্ব হারিয়েছে।

কবি মাঘ সম্পূর্ণরূপে ভারবির অনুগামী। তাঁর 'শিশুপালবধে'র বিষয়বস্তুও মহাভারত থেকে সংগৃহীত। এ কাহিনীটিও আকারে ক্ষুদ্র। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেবার কথা তুলেছেন। এতে চেদিরাজ শিশুপাল ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। তিনি ভীষ্মকে অপমান করেছেন এবং কৃষ্ণের চরিত্রের ওপর দোষারোপ করেছেন। শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করার পর এটি কৃষ্ণের কাছে অসহ্য হয়েছে। ফলে তাঁর চক্রাঘাতে চেদিরাজের মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখানেই কাহিনীর শেষ। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনা সন্নিবেশিত ক'রে একেই স্ফীত করা হয়েছে। মাঘ নীতিশাস্ত্র, অলংকার-শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে ভারবির মতো দুরূহ শব্দালংকার প্রয়োগ ক'রে নিজের নৈপুণ্যও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে রস-সমাহিতচিত্ত থাকতে পারেননি; দৃষ্টি বিখণ্ডিত হয়েছে। ফলে কাব্যেরও ত্রুটি ঘটেছে।

নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিত' রচনা করেছেন। কাব্যের পদ-লালিত্য প্রশংসা অর্জন করেছে, এখানেও শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত করায় কাব্য সর্বজনীন আবেদন হারিয়েছে। ভট্টির মতোই শ্রীহর্ষও বলেছেন যে, দুর্জনের প্রবেশ নিষেধ করার জন্য ইচ্ছে করেই তিনি গ্রন্থ-গ্রন্থি বিন্যস্ত করেছেন। যে কবির দৃষ্টি গ্রন্থ-গ্রন্থি-বিন্যাসে নিবদ্ধ, সে কবির পক্ষে শাশ্বত মহৎ আদর্শ পরিবেশন ক'রে রচনাকে মহত্ত্ব দান করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে বৈয়াকরণেরা 'আদি পণ্ডিত' ব'লে সম্মানিত হতেন। বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীতে প্রাদুর্ভূত আলংকারিকদের সম্মানও কম ছিল না। এঁদের নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হ'ত। মহাকাব্যের লক্ষণে কেবল বহিরঙ্গের আলোচনা ক'রে কবিযশঃপ্রার্থীদের তাঁরা বিভ্রান্ত করেছেন। তাঁদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তা আর যাই হোক, মহাকাব্য হয়নি। বুদ্ধচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব—এ সবই আলং-কারিকদের লক্ষণ-নির্দেশের আগের রচনা, তাই এগুলি সার্থক মহাকাব্য।

ডিরোজিও-প্রসঙ্গে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনে। এ দিকে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও সুনিপুণ অধ্যাপনা দুইই সহায়ক হয়েছিল। শুধু ক্লাসে পড়িয়েই তিনি তৃপ্ত হতেন না, ক্লাসের বাইরে—এমন কি নিজের বাড়ীতে ছাত্রদের নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রে তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন। সাধারণতঃ কোন একটি প্রসঙ্গ তুলে তিনি ছাত্রদের সেই বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন, এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে ঐ প্রসঙ্গের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মনীষীদের যুক্তিরাশি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন। এমনি ক'রে স্বাধীন চিন্তাশক্তির চালনার ফলে ছাত্রদের মৌলিক মানসিকতা গড়ে উঠত। উত্তরকালে তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য ধর্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ী এই পন্থা অনুসরণ করেই শিক্ষক-জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্র এবং ছাত্রকল্প ব্যক্তিদের মধ্যে উনিশ শতকে বাঙালী-মানসের নব জাগরণের ইতিহাসে এই কয়জন বিশেষভাবে স্মরণীয়: রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

ছাত্রদের সঙ্গে নিরলস জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনেই একটি আলোচনা-সভার প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' সভাটির উদ্ভব হয় (১৮২৮ খৃঃ)। এই আলোচনা-সভায় যোগ দিতে আসতেন ডেভিড হেয়ার, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডক্টর মিল প্রভৃতি সেকালের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা। এই সভার আলোচনার উন্নত মান দেখে তাঁরা অবাক্ হ'য়ে যেতেন। আলোচনার বিষয় থাকত: স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বনাম অদৃষ্টবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি, পুতুল পূজা[১] ও পুরোহিত-তন্ত্রের অসারতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি। তদানীন্তন হিন্দুসমাজে সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, বিধবাদের দুর্দশা, জাতিভেদ, প্রাচীন দেশাচারের বাড়াবাড়ি—এ-সব কিছুর বিরুদ্ধেই ডিরোজিওর ছাত্রদের শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন মতামত এই সভায় প্রকাশিত হ'ত।[২] ক্রমে ছাত্রদের ঘরে ঘরে এবং ব্যাপকভাবে কলকাতার প্রাচীনতম হিন্দুসমাজে মতামতের সংঘর্ষ দেখা দিল। এ সংঘর্ষের সামাজিক দিকটিই সেকালে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, একালে সে ইতিহাসের মানসিক প্রভাবই আমাদের লক্ষণীয়।

সমকালীন সমাজে ইংরেজ বণিকবৃত্তির দূষিত প্রভাবে ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজে যে সমস্ত ব্যভিচার ও মিথ্যাচার বহুল-প্রচলিত ছিল, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে সেগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। পর-

১ প্রতিমাপূজা ও পুতুলপূজার পার্থক্য তাঁরা ধরতে পারেননি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবে সে যুগের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই প্রতিমাপূজার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি।

২ দ্রষ্টব্য—Life of Derozio : Edward Thomas.

বর্তীকালে রাধানাথ শিকদার গুরুর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন :

ডিরোজিও ছিলেন দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক। বিদ্যা-বত্তার অভিমান করলেও তিনি সত্যি সুবিদ্বান্ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁর শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে এত গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, আজও সে আকাঙ্ক্ষা আমার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে চলেছে। তাঁরই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। তাঁর কাছ থেকে আমি এমন কতগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, যেগুলি চিরকাল আমার কর্মধারাকে প্রভাবিত করবে।... একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা—যে দুটি গুণ এখনকার শিক্ষিতসমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়—যা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ—এ সব কিছুর মূলে ছিলেন ডিরোজিও।৩

প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন :

তিনি ছাত্রদের স্বাধীনচিন্তার পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ক'রে দিতেন। যাতে তারা কোন রকমেই বেকন-কথিত কোন মায়াবিগ্রহ (idols) দ্বারাই প্রভাবিত না হয়, সত্যের জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করে এবং সর্বপ্রকার পাপ বর্জন ক'রে চলে—সেই সম্বন্ধে তাদের মনে বিশেষভাবে ছাপ দিয়ে দিতেন। প্রায়ই তিনি প্রাচীন ইতিহাস থেকে ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ পড়ে শোনাতেন। যে ভাবে তিনি এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলতেন তার ফলে ছাত্রদের মনে সেগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রত। কোন ছাত্র হয়তো ন্যায়বিচারের মহিমায় মুগ্ধ হ'ত, কেউ বা সত্যনিষ্ঠার পরম গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'ত, কেউ দেশপ্রেমে, কেউ বা মানব-কল্যাণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।৪

ছাত্রসমাজে ডিরোজিওর প্রভাব সম্বন্ধে সেই সময়কার হিন্দু কলেজের কেরানী শ্রীহর-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যও মূল্যবান :

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ডিরোজিও-স্থাপিত আলোচনা-সভায় যোগদানের সুযোগ ছিল। এই আলোচনা-সভায় পড়া হ'ত কবিতা, সাহিত্য, আর দর্শনের বই। প্রায় রোজই বিদ্যালয় আরম্ভ হবার আগে বা ছুটির পরে আলোচনা-সভা বসতো। কর্তৃপক্ষের অগোচরে অথবা বিনা অনুমতিতেই এই অধিবেশনগুলি হ'ত। কিন্তু ছাত্রদের সাহিত্যে ও দর্শনে কৃতবিদ্য ক'রে তোলার কাজে ডিরোজিওর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। এ উৎসাহের মূলে যে ভালবাসা ও মানব-প্রীতির প্রেরণা ছিল, তেমন প্রেরণা আজ অবধি কোন শিক্ষকের মধ্যে দেখা যায়নি। বাস্তবিক পক্ষে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁর ছাত্রেরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ ছাড়া চলত না। অপরপক্ষে ডিরোজিও তাদের সাহিত্যরুচি জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং তাদের নৈতিক ধারণা ও অনুভূতিকে সমসাময়িক অন্ধতার অনেক উর্ধ্বে তুলেছিলেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির এমনই জোর ছিল যে, তাঁর ছাত্রেরা শুধুমাত্র সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার জন্যই বাইরের জগতে সম্মান পেতেন না, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মান পেতেন খাঁটি সত্যবাদী মানুষ ব'লে। সত্যি সত্যি, 'কলেজের ছাত্র' কথাটি তখন 'সত্যবাদী' কথাটির সমার্থ-বাচক ছিল; এবং তখনকার লোকেরা একথা বিশ্বাস করতেন যে 'কলেজের ছাত্র' কখনও মিথ্যাবাদী হ'তে পারেন না।৫

ডিরোজিওর জীবনে ও কাব্যে যে অন্বেষণ-বৃত্তি দেখতে পাই, তার মূলে ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই। এই অন্বেষণেরই সাহিত্যফল রোমান্টিক মনোধর্ম। ডিরোজিওর কবিতা তাই মূলতঃ রোমান্টিক। অপরপক্ষে যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবে ইন্ধন যুগিয়েছিল, সেই যুক্তি-বাদের প্রভাব দেখা দিল ডিরোজিওর শিক্ষক-জীবনে। নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ডিরোজিও তাঁর বিখ্যাত পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন :

আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে তাদের মন থেকে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করতে সচেষ্ট ছিলাম। এক

৩ আর্যদর্শন, ১২৯১—উদ্ধৃতি অবলম্বনে।

৪ Life of David Hare—প্যারীচাঁদ মিত্র (অনুবাদ—বর্তমান লেখক কৃত)

৫ Life of Derozio—Edward Thomas. (অনুবাদ—বর্তমান লেখক কৃত)

একটি বিষয় নিয়ে তার সপক্ষে বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তা বুঝিয়ে দিতাম। এ ব্যাপারে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ; তিনি বলতেন,—যদি কেউ কোন বিষয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে, তাহলে শেষ অবধি তার সন্দেহ থেকেই যায়, সন্দেহ দূর করার উপায় থাকে না। মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি সন্দেহ জাগবে। ফলে সব বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মাবে। কাজে কাজেই আমি কলেজের ছাত্রদের যেমন হিউমের ক্লিয়ান্থেস (Cleanthes) ও ফিলোর (Philo) বিখ্যাত কথোপকথনের সারাংশ পড়িয়ে আস্তিক্যের (Theism) বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মতবাদগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি, তেমনি হিউমের বিরুদ্ধপন্থী ডক্টর রীড ও ডুগালড্ স্টুয়ার্ডের* আস্তিক্যের সপক্ষে সূক্ষ্মতর জবাবগুলির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছি—সে সব যুক্তি আজ পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছে।......আমি যে পন্থা অনুসরণ করেছি, তাতে যদি ছেলেদের ধর্মবিশ্বাস টলে থাকে, তার দোষ আমার নয়। তাদের মনে কোন বিশ্বাস জন্মানো আমার সাধ্য নয়। যদি কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমাকে দায়ী করা হয়, তবে অন্যদের আস্তিকতার জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার্য। বিশ্বাস করুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতামতের পরিবর্তন সম্বন্ধে এত সচেতন যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এমনভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে, কোন রকম গোঁড়ামির সাহসই আমার নেই। কাজেই আমি কখনই বলতে পারি না—'এটা ঠিক, অথবা ওটা ঠিক নয়।' বিজ্ঞানের নানান্ গবেষণা এবং মনীষীদের নানান্ চিন্তার ফলে একথা বুঝা গেছে যে বিনয়ই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আর এই জ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ৬

ডিরোজিওর এই বিনম্র চিত্তের জ্ঞানান্বেষী সংশয় অনুধাবনযোগ্য। কারণ চিরাচরিত পন্থাকেই একমাত্র সত্য ব'লে স্বীকার না করার দুঃসাহস ডিরোজিওর শিষ্যেরা এই চিন্তাধারা থেকেই গ্রহণ করেন।

* Dr. Roid, Dugald Steward.

৬ Life of Derozio—Edward Thomas.

(অনুবাদ – বর্তমান লেখক কৃত)

১৮৩০ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মিলিত উৎসাহে Parthenon নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য—'হিন্দুর ঘরে জন্মালেও যারা শিক্ষা-দীক্ষায় ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন, তারা নিজেদের মনোভাবের আদানপ্রদানের জন্য এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ প্রয়োজন মনে করে, যেখানে তারা নিজেদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারবে।'৭ প্রথম সংখ্যায় ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের স্বপক্ষে প্রবন্ধাদি ছিল। সেই সঙ্গে ছিল হিন্দুসমাজের প্রচলিত কুসংস্কারগুলির নিন্দা এবং স্বল্পব্যয়ে বিচার-ব্যবস্থার জন্য আবেদন।৮ এই সব অত্যুগ্র মতামতের দরুণ কলেজ-পরিদর্শক ডঃ এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব দু'সংখ্যা প্রকাশের পরেই পত্রিকাটি বন্ধ ক'রে দেন।

১৮৩১ খৃঃ এই ছাত্রদল 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই (১৮৩১-১৮৪৪) পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল Government and Jurispudence (শাসন-ব্যবস্থা ও আইনবিধি) সম্বন্ধে জনসাধারণের বোধগম্য আলোচনা প্রকাশ করা। এ দুটি সংবাদপত্রের পিছনেই ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল।৯

সত্যিকার শিক্ষক যাঁরা, তাঁরা চিরদিন ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ কামনা ক'রে থাকেন। এই কবি-অধ্যাপকের মনে ছাত্রপ্রীতি কতখানি প্রেরণার আগুন জেলে দিয়েছিল, তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন একটি চতুর্দশপদী কবিতায়:

৭ ৮,৯ : দ্রষ্টব্য History of Political Thought. —Dr. Biman Behari Mazumdar.

(To the students of the Hindu College)
Expanding like petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
that stretch
(Like young birds in soft summer hour)
Their wings to try their strength.
O how the winds
Of circumstance, and freshening April
showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's Omnipotence!
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Wearing the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain. [১০]

ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ক'রে তাদের চিৎ-পদ্মের বিকাশ ঘটিয়েই ডিরোজিও ক্ষান্ত ছিলেন না। ব্যাবহারিক জীবনে যাতে তারা সৎ, সত্যবাদী ও ঋজুচরিত্র হ'য়ে ওঠে সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে সাহেবী রীতির অনুকরণে মদ খাওয়ার ফ্যাশান-প্রবর্তনেও ডিরোজিওর প্রভাব ছিল। মদ খাওয়া বা নিষিদ্ধ মাংসাদি খাওয়াকে ডিরোজিও-শিষ্যেরা কুসংস্কার-বিরোধী কাজ ব'লে মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন :

তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।[১১]

এই মদ খাওয়ার অভ্যাস সেকালের শিক্ষিত সমাজে কি বিপর্যয় এনেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় এবং দীনবন্ধুর নাটক 'সধবার একাদশী'তে। রাজনারায়ণ নিজেও এই নেশার আকর্ষণে মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছিলেন; রোগযন্ত্রণায় তাঁর শুভবুদ্ধি ফিরে আসে। অবশ্য রাজনারায়ণ ডিরোজিওর গুণের দিকটাই বড় ক'রে দেখেছেন :

ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এমন বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।[১২]

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পক্ষে যেটা একান্ত করণীয় ছিল, অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ অবধি করা হয়নি, ডিরোজিও একাকী উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে সেই কাজটি করতে পেরেছিলেন।

ডিরোজিওর সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী পরবর্তীকালে দেশের আর্থিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষাগত আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করেছেন। বাংলা সাহিত্যও তাঁদের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়েছে। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্মচেষ্টায় যে 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়, তাতে চলতি ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ডিরোজিও-শিষ্যের উপযুক্ত অগ্রগামিতারই চিহ্ন। মধুসূদন অবশ্য ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র নন। কিন্তু ডিরোজিও যে শৃঙ্খল-মোচনের বাণী প্রচার ক'রে যান, তার ফলেই মধুসূদনের মানসলোকে প্রাচীন সাহিত্যের নবমূল্যায়ন সম্ভব হয়। এক হিসাবে ডিরোজিওর যুক্তিবাদী বলিষ্ঠতার ফলেই রাবণ-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ সুস্থ প্রকাশ সম্ভব হয়। ক্লাসিক সাহিত্যের প্রেরণাপুষ্ট মধুসূদন যে

১০ দ্রষ্টব্য : Poems of Henry Louis Vivian Derozio—Bradley-Birt.

১১ দ্রষ্টব্য : সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু।

১২ দ্রষ্টব্য : সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু।

রোমান্টিক রস-পিপাসাকেই জাগিয়ে তুলেছেন—তার কারণ ডিরোজিও-প্রভাবিত নব্যবঙ্গের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা। ডিরোজিওর ব্রত ছিল, মানুষকে তার চিন্তা ও কর্মের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। ডিরোজিওর ভাবশিষ্যদের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তা উনিশ শতকের প্রথম দিকে এক নূতন ভাবাদর্শের সন্ধান পেল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অনেক পরিমাণে এই ভাবাদর্শেরই সৃষ্টি।[১৩]

কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে যে ভাববিদ্রোহ দেখা দিল, তা কলকাতার হিন্দুসমাজের, বিশেষ ক'রে হিন্দু কলেজের হিন্দু কর্তৃপক্ষকে চঞ্চল ক'রে তুলল। পাশ্চাত্যশিক্ষার নবমদিরাপানে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রেরা কি ধরনের বাড়াবাড়ি ক'রত, তার কৌতুককর বিবরণ আছে 'সেকাল ও একাল' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই দুটিতে।

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়—(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং ছাত্রদের মনে সেই অবিশ্বাস জাগানো, (২) পিতামাতাকে অবহেলা করতে শেখানো, (৩) ভাইবোনের বিবাহ অনুমোদন করা। ডিরোজিওর প্রদত্ত প্রথম অভিযোগটির উত্তর সংক্ষিপ্তাকারে আগেই দিয়েছি।* দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'এমন শিক্ষা আমি কখনো দিই না। আমি নিজে পিতামাতার অতি বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আলাদা বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চান। আমি তাতে রাজী হইনি।' তৃতীয় অপবাদটি 'সম্পূর্ণ আজগুবি।'

অনেক বৎসর পরে আজকের দিনে এই অভিযোগগুলি লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতিকে ভুল বুঝেই প্রথম দুটি অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু তৃতীয় অভিযোগটি সম্বন্ধে জনৈক গুজব-ব্যবসায়ীর দায়িত্ব ছিল। তাঁর নাম বৃন্দাবন ঘোষাল—'যার কর্ম কেবল বাবুদের কাছে গল্প ক'রে বেড়ানো।'[১৪] বৃন্দাবনঘোষাল-জাতীয় জীবেরা এখনও এইভাবে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় এবং তথাকথিত 'বড়মানুষেরা' সে সব গুজবকেই ধ্রুব সত্য জ্ঞান করেন, হিন্দু কলেজের জ্ঞানী গুণী কর্তৃপক্ষও অনেক পরিমাণেই করেছিলেন। ডিরোজিওকে তাঁরা এই ব'লে পদচ্যুত করলেন যে 'দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলে হিন্দু কলেজের অনিষ্ট হবে।' এ আশঙ্কা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। আতঙ্কগ্রস্ত অভিভাবকেরা সত্যসত্যই পুত্রদের সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছিলেন। কলেজ-পরিদর্শক ডঃ উইলসন ডিরোজিওকে এই পদচ্যুতির সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন এবং পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তাঁর কোন বক্তব্য থাকলে জানাতে বললেন। ডিরোজিওকে পূর্বাহ্নে ডেকে তাঁর বক্তব্য নিবেদনের সুযোগও দেওয়া হ'ল না। মর্মাহত ডিরোজিও সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র পাঠালেন। সে পদত্যাগপত্র তাঁর স্বাধীনচিত্ত পৌরুষের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

কলেজ-জীবনই ডিরোজিওর আসল জীবন। ১৮৩১ খৃঃ এপ্রিলে কলেজ ছাড়বার পর কয়েক মাস তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের উন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ছাত্রদের জ্ঞানচর্চায় সহায়তা করার ব্রত। ১৮৩১ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর কলেরায় তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। যে ছাত্রদল তাঁকে ঘিরে

* ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৩ নং উদ্ধৃতি।

১৩ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর কাছে এই চিন্তাধারার জন্ত আমি ঋণী।

১৪ দ্রষ্টব্য : Life of Derozio : Edward Thomas.

দলবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল, তাদের সকলের সম্মিলিত সেবা তাঁর মৃত্যুমুহূর্তকে গুরুশিষ্যের চিরন্তন প্রীতিসম্বন্ধে করুণ-রঙীন ক'রে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সমগ্র উনিশ শতক ধরে ডিরোজিওর চিন্তাদর্শ নানা সমালোচনার নির্মম আক্রমণ সহ্য করেও নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর মননশীলতাকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। কারণ, সে চিন্তাধারার মূল কথা ছিল মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস; সেই সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে স্থির অনড় সিদ্ধান্তের বদলে সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কার ক'রে দেশ ও কালের পরিবর্তনকে নতুন পৃথিবীর সঙ্গে সমন্বিত ক'রে দেওয়া।

সেকালে ডিরোজিওর এই শিষ্যগোষ্ঠী পরিচিত হয়েছিলেন নব্যবঙ্গ বা Young Bengal নামে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁরা সমসাময়িক দেশবাসীর চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। তাঁদের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল স্বদেশের উন্নতিকল্পে; কারণ, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের অন্তরে 'Mother India' বা জননী ভারতবর্ষের অনুধ্যান জাগরিত করেছিলেন। ভারতবর্ষ যুগে যুগে এমনি ক'রে নব নব চিন্তার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পরিশেষে সেই চিন্তাধারাকে নিজস্ব ক'রে নিয়ে আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ডিরোজিওর চিন্তাধারায় ভারত-সংস্কৃতির সনাতন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী শিষ্যবৃন্দ সত্যের অন্বেষণে শেষ অবধি এই উত্তরাধিকারও লাভ করেছিলেন। তাই রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ধিত ব্রাহ্মসমাজের ঔপনিষদিক চিন্তাধারাকে ডিরোজিও-শিষ্যদের অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব—এ তিনজন তো ব্রাহ্মধর্মেই দীক্ষিত হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের খৃষ্টানী কোন সামাজিক বা আর্থিক পুরস্কার-প্রণোদিত নয়। বিশেষভাবে মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং ডিরোজিওর প্রভাবেই তিনি সৎপথে পরিচালিত হন। ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ততায় এঁরা নিজস্ব অভিরুচি-অনুযায়ী খৃষ্টান হয়েছিলেন। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের উৎপীড়নও অনেকটা দায়ী। একথাও স্মরণীয়, ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।[১৫] পরবর্তী জীবনে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুর 'ষড়্দর্শন-সংবাদ' লিখেছিলেন।

বর্তমানে যখন শাসন-ব্যবস্থার সর্বস্তরেই চুরি ঘুষ এবং দায়িত্বহীনতার নিদর্শন দেখতে পাই, তখন একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে ডিরোজিও-ছাত্রেরা সেকালের সমাজ-জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে সততার আদর্শ স্থাপন করেন। সত্য কথা যদি কলির তপস্যা হয়, তবে ডিরোজিও-শিষ্যেরা আজীবন সে তপস্যা ক'রে গিয়েছেন। সেই সত্যেরই প্রেরণায় দেখা দিয়েছিল রামতনু লাহিড়ীর মতো ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তি-তন্ময় ব্যক্তিত্ব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রামগোপাল ঘোষের মতো নির্ভীক স্পষ্ট বক্তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। স্বয়ং ডিরোজিও সতীদাহ নিবারণের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা নীলবিদ্রোহ, বিধবাবিবাহ, তথাকথিত কালা আইন প্রভৃতি আন্দোলনে জনসাধারণের

১৫ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ': শিবনাথ শাস্ত্রী (নিউ এজ সংস্করণ) পৃঃ ১০৭।

মুখপাত্ররূপে স্বদেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন ক'রে গেছেন।[১৬]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও নবযুগের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে যে মননভূমি গড়ে উঠল—তার সঙ্গে ডিরোজিও-গোষ্ঠীর চিন্তাধারার সম্পর্ক কতখানি?—এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় সত্যানুসন্ধানের যে আদর্শ ডিরোজিও-গোষ্ঠীর অন্তরে ছিল, সেই আদর্শই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'য়ে ক্রমে বাঙালী মনীষাকে স্বদেশ ও বিশ্বের সংযোগসাধনে ব্যাপৃত করেছে। তাই ডিরোজিও-গোষ্ঠীর বিদ্রোহেই নব্যবঙ্গের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ইঙ্গিত নিহিত ছিল। অবশ্য কেবলমাত্র এই একটি গোষ্ঠীর দ্বারাই বাঙালীর মনোজগতের বিপ্লব সাধিত হয়নি এবং এই গোষ্ঠীর চিন্তাধারায় অসঙ্গতিও প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু রামমোহন প্রমুখ মহারথীরা যখন সমগ্র দেশের বিশালতর পটভূমিতে সঞ্চরণশীল, তখন তরুণতরদের জীবনে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত করার প্রধান কৃতিত্ব ডিরোজিওর। তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যেরাই তখন বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ। কালের জোয়ারে তাঁদের প্রাথমিক মত্ততার কাহিনীগুলি অনায়াসে ভেসে চলে গেছে, কিন্তু মুক্তমানসের যে পলিমাটি তাঁরা নতুন যুগের শিক্ষিতমানসে ছড়িয়ে গেলেন, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তারই অপর্যাপ্ত ফসল।

কিন্তু এই সাধনার মূল্য তাঁদের দিতে হয়েছে লোকনিন্দা, সামাজিক অত্যাচার, ধনী ও পরাক্রান্তদের বিরুদ্ধতা—সব কিছু সহ্য ক'রে। তার বদলে তাঁরা সমাজকে দিয়েছেন যুক্তিবাদের প্রতি নিষ্ঠা, সত্য ও সততার প্রতি অনুরাগ, অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় সাহস। এ সব কিছুর মূলে যে তরুণ শিক্ষকের প্রেরণা ছিল, পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় তাঁর শেষ শয্যা রয়েছে। বহুদিন অনাদৃত থাকার পর অবশেষে তাঁর গুণমুগ্ধ কোন স্বদেশবাসী সেই শয্যার উপর একখানি প্রস্তরলিপি স্থাপন করেন। বোধ করি, নিজের এই নিরলঙ্কার শেষ শয্যাটির কথা ভেবেই একদা ডিরোজিও লিখেছিলেন:

There, all in silence, let him sleep his sleep,
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing o'er him
but the heavens shall weep,
There, never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nightly vigils keep[১৭]

১৬ "১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারত-বাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাই আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির 'কালা আইন' (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন"—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (পৃঃ ১১৯)।

১৭ Poems of H. L. V. Derozio—Bradley-Birt.

শঙ্করের নিগুর্ণব্রহ্মবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শঙ্কর দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারও ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যে তাঁহার দার্শনিক মত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক মত কেবলাদ্বৈতবাদ বা 'নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ' নামে আখ্যাত। 'নির্বিশেষ' শব্দের অর্থ বিশেষহীন। শঙ্কর যে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে জগতের বিশিষ্ট বস্তুসকলের স্থান নাই, বিশিষ্ট চৈতন্যবিশিষ্ট (individual) জীবের স্থানও তাহাতে নাই। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত, তিনি সার্বিক (universal), কখনও তিনি সান্ত হন না, বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন না। তিনিই একমাত্র সত্য; তিনি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর প্রকৃত (পারমার্থিক) অস্তিত্ব নাই। 'নানা'র অস্তিত্ব নাই, কেবল 'এক'ই আছে। নানাত্বের যে বোধ হয়, তাহা অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত, তাহা মায়া (illusion), যাদুকরের যাদুর মতো তাহা ভ্রান্তিমাত্র। ইহাই নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ, বিশেষহীন, দ্বৈতহীন, এক ও অদ্বিতীয় নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ। শঙ্করের মতে ইহাই উপনিষৎসম্মত ব্রহ্মবাদ। উপনিষদে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ইহাই তাঁহার মত।

ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্য এ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। বৌধায়ন-রচিত এক ভাষ্য ছিল। তাহা অতি প্রাচীন। কথিত আছে, রামানুজের ভাষ্য বৌধায়নের ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্রের যতগুলি ভাষ্য আছে—শঙ্কর-ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্যেই নির্বিশেষাদ্বৈতের সমর্থন নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং নিম্বার্ক ব্রহ্মের সবিশেষ রূপই স্বীকার করেন। মধ্বাচার্য তো পুরাপুরি দ্বৈতবাদী; ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন প্রকার অভিন্নতা তিনি স্বীকার করেন না।

শঙ্কর অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসর পরমায়ুর মধ্যে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইয়া আধুনিক বিদেশী পণ্ডিতেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো, আরিস্টটল, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট ও হেগেল ভিন্ন অন্য কাহারও মতের সহিত তাঁহার মতের তুলনা হয় না। তিনি যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা ভারতীয় দার্শনিকগণের জ্ঞানের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে। তাঁহার স্বকীয় দর্শনের আলোকেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ খ্যাপিত হয় নাই, ইহাও অনেকের মত। এই মতের প্রমাণেরও অভাব নাই।

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনে শঙ্করের প্রধান অবলম্বন 'অবিদ্যা'। অবিদ্যা ও মায়া শব্দদ্বয় শঙ্কর অধিকাংশ স্থলে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দুই এক স্থলে অর্থের ভিন্নতাও দেখা যায়। অবিদ্যা ও মায়া শব্দদ্বয় উপনিষদে

ও বেদসংহিতাতেও পাওয়া যায়—কিন্তু শঙ্কর একটু নূতন অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে মায়াকে 'প্রকৃতি,' এবং 'মহেশ্বর' (ব্রহ্ম)-কে মায়ী (মায়াধীশ) বলা হইয়াছে। সেখানে মায়া অর্থে ঈশ্বরের শক্তি। উক্ত উপনিষদের প্রথমেই আছে :

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢাম্। ১।৩

—তাঁহারা (ঋষিগণ) ধ্যানযোগে স্বগুণদ্বারা আচ্ছাদিত ঈশ্বরের আত্ম-শক্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে 'স্বগুণ' শব্দের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপ ঈশ্বরের গুণ, অথবা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বিষয়সমূহ। এই ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) অথবা জাগতিক বস্তুসকলের অন্তরালে যে দেবাত্মশক্তি ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই 'মায়া'। শঙ্কর কিন্তু মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন বস্তুর ব্যাবহারিক (phenomenal) অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নাই। কেননা তাঁহার মতে পরমার্থতঃ ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মে এই জগৎ অধ্যস্ত—অর্থাৎ জগতের অন্তরালে যে অক্ষর নিষ্কল পরিবর্তনহীন ব্রহ্ম নিত্য বর্তমান, তাঁহারই উপরিভাগে এই চঞ্চল নিত্য পরিবর্তনশীল বিনশ্বর জগৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু তাহার কোন অবাধিত অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যাকে শঙ্কর 'অধ্যাস'ও বলিয়াছেন। 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' (পূর্বদৃষ্ট বস্তুর অন্য স্থানে যে অবভাস স্মৃতি হইতে হয়) বলিয়া অধ্যাসের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি পরে বলিয়াছেন, 'এই লক্ষণযুক্ত অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা অবিদ্যাও বলেন।' আরও বলিয়াছেন, 'যেখানে অধ্যাস হয়, সেখানে যাহাতে অধ্যাস হয়, তাহার (অধিষ্ঠানের) সহিত অধ্যস্ত বিষয়ের ভেদ-অনুপলব্ধিবশতঃ ভ্রমই অধ্যাস। কাহারও কাহারও মতে অধিষ্ঠানভূত বস্তুর বিপরীত ধর্ম-কল্পনাই অধ্যাস। বস্তুতঃ এক বস্তুর অন্য ধর্মযুক্ত বস্তুরূপে অবভাসই অধ্যাস। জগৎরূপে ব্রহ্মের অবভাস সেই জন্য অধ্যাস।

কিন্তু কেন এবং কাহার এই মিথ্যা জ্ঞান হয়? যিনি চিৎ ও আনন্দস্বরূপ নিশ্চল ও নির্বিকল্প, দেশ ও কালের অতীত, এবং যিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই ব্রহ্ম কেন ও কাহার নিকট দেশ ও কালে অবস্থিত চঞ্চল অচেতন জগৎরূপে প্রতীয়মান হন? যিনি অখণ্ড ও নিষ্কল, কেন তিনি নানা ভাগে বিভক্ত নামরূপে খণ্ডিতরূপে দৃষ্ট হন? ইহার একটি উত্তর হইতে পারে এই যে, আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ এমনভাবে গঠিত যে তাহারা এক অনন্ত অখণ্ড বস্তুকে ধরিতে পারে না, তাই অসীম অখণ্ড জগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে নামরূপে খণ্ডিত আকারে আমাদের গোচর হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যাহা যাহা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেশ ও কালের ছাঁচে ঢালিয়া, তাহাদের দেশ ও কালের ছাঁচযুক্ত রূপই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি সেই-রূপেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ন্যায়ের (logic) নিয়মানুসারে তাহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করে। বুদ্ধির এই নৈয়ায়িক কাঠামো (logical frame), এবং ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ দর্শনের অপটুতাই আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের মূলে বর্তমান। চক্ষুর দোষবশতঃ যেমন রজ্জু সর্পরূপে এবং এক চন্দ্র দ্বিচন্দ্ররূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির স্বাভাবিক অপটুতাবশতঃ এক অখণ্ড বস্তুকে আমরা খণ্ডিত আকারে দেখিতে পাই। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ বলিয়াছেন যে, প্রাণের অভিব্যক্তি-ক্রমে বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়াছিল—জড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত,

সত্যের আবিষ্কার বুদ্ধির (Intellect) প্রয়োজনের বাহিরে। তাই বুদ্ধি এক অবিশ্রাম-গতিমান বস্তুকে গতিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় কার্য সম্পাদন করে।

আমরা জগতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি, তাহা যে তাহার সত্য রূপ নহে—আধুনিক বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। জড়ের উপাদানরূপে বিজ্ঞান যে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারা স্পন্দনে প্রকাশিত শক্তির বিভিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু জড় বস্তু মানুষের গোচর হয় স্থূল নিরেট ও দেশে বিস্তৃত রূপে। যে বস্তুকে আমরা রন্ধ্রহীন নিরেট রূপে দেখি তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থানই শূন্য। সৌরজগতের অতি অল্প মাত্র স্থান সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণ এবং গ্রহদিগের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, অবশিষ্ট স্থান শূন্য। তেমনি প্রত্যেক জড় বস্তু যে যে পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, তাহাদের মধ্যস্থ অতি অল্পমাত্র স্থান প্রোটন ও ইলেকট্রন কর্তৃক অধ্যুষিত, অবশিষ্ট সমস্ত স্থান শূন্য। আর প্রোটন বা ইলেকট্রনও স্থূল জড়কণা নহে, তাহারা শক্তির স্পন্দনমাত্র; সুতরাং জড়জগতের যে রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা তাহার সত্য রূপ নহে, তাহা মিথ্যা। শক্তিই সত্য, শক্তিই প্রকৃতি, তাহাই ব্রহ্মের মায়া। সুতরাং জগৎ অর্থাৎ জগতের অনুভূত রূপ মিথ্যা। শঙ্করের সহিত এখানে বিজ্ঞানের বিরোধ নাই।

শঙ্কর জড়জগৎকে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়াছেন, তাহাকে আকাশকুসুমের মতো কল্পনা বলেন নাই। ব্রহ্মে যে নাম-রূপ অধ্যস্ত হয়, তাহাই জড়জগৎ, তাহা মিথ্যা। তাহাও আবার একান্ত মিথ্যা নহে। তাহার যে ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে, তাহা শঙ্কর বলিয়াছেন। নামরূপ-সংবলিত জড়জগৎ 'সৎ' নহে, ত্রিকালে সত্য নহে, তাহা নশ্বর—তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ইহাই শঙ্করের মত। কিন্তু এখানে নাম-রূপের অন্তরালে ব্রহ্ম বর্তমান। নাম-রূপ ব্রহ্মের ছদ্মবেশ।

কিন্তু জীব? শঙ্করের মতে অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার)-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। উপাধির নাশ হইলে ব্রহ্মই থাকেন স্ব-স্বরূপে। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জীবের নাই। 'জীবো ব্রহ্মৈব, নাপরঃ।'

কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে 'উপাধি' আসে কোথা হইতে? শঙ্কর বলেন উপাধি 'অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতঃ'—অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃক উৎপন্ন। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় সকলই অবিদ্যা-জাত—তাহাদের অবাধিত সত্তা বা পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তাহারা বিনশ্বর—চিরকাল থাকে না। বিদ্যার উদ্ভবের সঙ্গে তাহারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং মন-বুদ্ধি-অহংকার সমন্বিত জীবের অস্তিত্ব থাকে ততদিন, যতদিন অবিদ্যার নাশ না হয়। জীবের অবিদ্যার নাশ হইলে বহির্জগতে প্রতীয়মান জড়জগতের সহিত অন্তর্জগতে প্রতীয়মান খণ্ড জ্ঞানেরও নাশ হয়, তখন বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। প্রত্যেক জীবও তাহার জীবত্ব-জ্ঞান ব্রহ্ম-সমুদ্রে অবিদ্যা-বুদ্বুদ্‌রূপে উত্থিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিনশ্বর হইলেও এই অবিদ্যা-বুদ্বুদেরও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে।

সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি—অর্থাৎ ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাস অর্থাৎ জগতের মিথ্যা-প্রতীতি হয় জীবের; জীবও অনাদি, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া অন্তঃকরণ-রূপ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত

উপাধি সহযোগে জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। এই অবিদ্যার আশ্রয় কি? পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যার অবস্থান অসম্ভব, যেমন সূর্যে অন্ধকার অসম্ভব। অবিদ্যা ব্যতীত জীবের উদ্‌ভবও অসম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদের ৩০নং সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন :

'যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ তাবদেব অস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বং চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিত-স্বরূপ-ব্যতিরেকেণ অস্তি। ন হি নিত্যমুক্তস্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ ঈশ্বরাৎ অন্যঃ চেতনধাতুঃ দ্বিতীয়ঃ বেদান্তার্থনিরূপণায়াম্ উপলভ্যতে।'

—অর্থাৎ যে পর্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্যন্ত জীবের জীবত্ব ও সংসারিত্ব। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত জীবত্ব ব্যতীত জীব নামক কিছুর অস্তিত্ব নাই। নিত্যমুক্ত-স্বরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোনও চেতন বস্তু বেদান্তের অর্থনিরূপণে পাওয়া যায় না। যে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা জীবত্ব কল্পিত, অবিদ্যা কর্তৃক তাহা প্রত্যুপস্থাপিত হইবার পূর্বে জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। অবিদ্যা যদি সত্য হয়, এবং জীব ও ব্রহ্মের কেহই যদি তাহার আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব শঙ্কর স্বীকার করেন না।

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য কোন চেতন ধাতু যদি না থাকে (যাহা শঙ্কর বলিয়াছেন), তাহা হইলে জীবের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান হইলেও ঈশ্বরেরই জ্ঞান। কেন না জ্ঞান চেতন পদার্থেরই ধর্ম। কিন্তু শঙ্কর বলিয়াছেন (২।১।১৪) :

অবিদ্যাত্মক-উপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষম্ এব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চ। ন পরমার্থতঃ বিদ্যয়া অপাস্তসর্বোপাধি-স্বরূপে আত্মনি ঈশিতৃ-ঈশিতব্য-সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহারঃ উপপদ্যতে।

—অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব অবিদ্যাত্মক উপাধিসাপেক্ষ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিদ্যা কর্তৃক অপসারিত-সর্বোপাধি আত্মায় নিয়ন্তা, নিয়ম্য, সর্বজ্ঞত্বাদি ভাব কিছুই নাই। অপগত-সর্বোপাধি আত্মাই ব্রহ্ম। শঙ্কর বলেন, আত্মায় সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি নাই। সুতরাং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও জীবেরই মতো অবিদ্যাকল্পিত। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সকলই যদি অবিদ্যাকল্পিত হয়, তাহা হইলে সে অবিদ্যাকে ব্রহ্মেরই অবিদ্যা বলিতে হয়। নতুবা তাহাকে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কামারপুকুর

[সঙ্গীত : বেহাগ—ত্রিতাল]

স্বামী অলোকানন্দ

কামারপুকুর—বল আর কত দূর?
ব্যাকুল পরাণ মোর দরশন আশে,
চরণ চলে না আর দূরপথ-ক্লেশে,
শ্রবণে বাজিছে মোর এই শুধু সুর,
'রঘুবীর গদাধর হাল্‌দারপুকুর'॥

নাহি মোর অনুরাগ সাধন-ভজনে,
বিবেক-বৈরাগ্য নাই বঞ্চিত পরাণে,
নিজগুণে কৃপা করি দেহ দরশন,
জনম সফল কর এই আকিঞ্চন,
হৃদয়ে ধ্বনিছে মোর এই শুধু সুর,
'রঘুবীর গদাধর কামারপুকুর'॥

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[তৃতীয় প্রবন্ধ—বনগমন]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনগমন বর্ণিত হইয়াছে। সে কাহিনী করুণ ও চিত্তস্পর্শী। ঘটনা কিঞ্চিৎ আকস্মিক, কিন্তু কাব্যের গতি এত সহজ ও সাবলীল যে, কোথাও অসঙ্গতি দেখা যায় না। দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে পুনরাবৃত্তি দোষ দৃষ্ট হয়। মনে হয়, পরে ঐগুলি সংযোজনা করিয়া কাব্যের আকার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সমৃদ্ধ নগরী অযোধ্যার সৌন্দর্য-সম্ভার ও রামের বনগমন সংবাদে উহার ম্লান বিষাদশ্রী উভয় চিত্রই সুন্দর। রাজপরিবারের সব চরিত্রগুলিই এই অধ্যায়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের বনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসহায় বৃদ্ধ দশরথের কাতরতা, কৌশল্যার করুণ বিলাপ, রামের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের ক্রোধ, কৈকেয়ীর নির্মম আচরণ, প্রজাবর্গের আকুল শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার যে আদর্শগুলি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের নরনারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া অনুপ্রেরণা দিয়াছে, রামচন্দ্রের সেই অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার দৃঢ়তা ও পাতিব্রত্য অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চৈত্র মাসে। কয়েক বৎসর সুখে অতিবাহিত হইলে বৎসর ঘুরিয়া পুনরায় পুষ্পিত-কানন-সমন্বিত শুভ চৈত্র মাস আসিল। বৃদ্ধ দশরথ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। অভিষেকের দিন বড় তাড়াতাড়ি স্থির হইয়াছিল। যে রাত্রে নানারূপ অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া দশরথ বিচলিত হন, তাহার পরদিনই তিনি রামের অভিষেক সম্বন্ধে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। জ্যোতিষিবর্গ যখন বলিলেন, পরদিবস পুষ্যা নক্ষত্রে সময় শুভ, তখন কাল বিলম্ব না করিয়া ঐদিনই অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভরত তখন শত্রুঘ্ন-সহ মাতুলালয়ে ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁহার আচরণে রামের প্রতি প্রতিকূলভাব দেখা না যাইলেও ভরত হইতে রামের বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা দশরথের মনে জাগিয়াছিল। কারণ, শ্রীরামচন্দ্রকে অভিষেকের সংবাদ-প্রদানকালে তিনি বলিয়াছিলেন, ভরতের বিদেশে অবস্থানকালেই রামের অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রামের অভিষেক-বার্তা ঘোষিত হইবামাত্র সমগ্র রাজধানী বিচিত্র উৎসব-সজ্জা ধারণ করিল। আনন্দোৎসব-মত্ত নাগরিকগণ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত হর্ষ বিষাদে পরিণত হইবে।

যেদিন রামের রাজ্যাভিষেক-বার্তা ঘোষিত হইল, সেদিন যেন দৈববশে পরিচালিত হইয়াই কৈকেয়ীর অন্যতম পরিচারিকা মন্থরা রাজপ্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিল। তারপর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরীর উৎসব-সজ্জা দর্শনে বিস্মিত হইয়া একজন ধাত্রীকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, পরদিবস রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সমগ্র পুরবাসী আনন্দে মগ্ন। তখন ঈর্ষাপরায়ণা

মন্থরা ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুত অবতরণপূর্বক একেবারে কৈকেয়ীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল,

'উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং তে ঘোরমাগতম্।
সমুপপ্লুতমাত্মানং দুর্ভগে নাববুধ্যসে ॥'

—মূঢ়ে, উঠ, এখনও কেন শয়ন করিয়া আছ? তোমার ভীষণ বিপদ সমুপস্থিত। হে দুর্ভগে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি দুর্দশাগ্রস্ত।

রামের বনবাস ও রামসীতার সমগ্র দুঃখের কারণ মন্থরা ও কৈকেয়ী। কৈকেয়ী-চরিত্র নিন্দিত। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—দশরথের এই তিন মহিষীর চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা সংক্ষেপে ভরতের উক্তিতে পাওয়া যায়। রামের বনগমন ও দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য অমাত্যগণ প্রেরিত দূতকে অযোধ্যার সকলের কুশল-প্রশ্ন করিতে গিয়া ভরত বলিয়াছিলেন,

'কচ্চিদম্বা কুশলিনী কৌশল্যা ধর্মচারিণী।
মাতা রামস্য ধর্মজ্ঞা ভর্তৃব্রতপরায়ণা ॥
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা লক্ষ্মণং যা ব্যজায়ত।
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানমরোগা চাপি মধ্যমা ॥
আত্মকার্যপরা চণ্ডা ক্রোধনা নিত্যগর্বিতা।
কৈকেয়ী চাপি মে মাতা কচ্চিৎ কুশলিনী দৃঢ়ম্ ॥'

—ভর্তৃব্রত-পরায়ণা, ধর্মচারিণী, ধর্মজ্ঞা, রামজননী কৌশল্যা কুশলে আছেন তো? যিনি মহাত্মা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্মজ্ঞ, মধ্যমা মাতা সুমিত্রাও নীরোগ অবস্থায় আছেন তো? আর স্বকার্যসাধনপরায়ণা, উগ্রস্বভাবা, ক্রোধশীলা, নিত্যগর্বিতা আমার মাতা কৈকেয়ী স্থির কুশলসম্পন্না কি?

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্মজ্ঞা কথাটি কৈকেয়ীর সম্বন্ধে একেবারেই প্রযুক্ত হয় নাই। কৈকেয়ী সুন্দরী, উগ্রস্বভাবা, ক্রোধপরায়ণা, দশরথের প্রণয়ভাগিনী বলিয়া সৌভাগ্যমদে গর্বিতা, কিন্তু রামের প্রতি অতীব স্নেহসম্পন্না।

মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রদানান্তে দশরথের প্রতি অশেষ কটূক্তি করিয়া রামের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিমুখ করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুত্তরে কিন্তু কৈকেয়ী একখানি সুন্দর আভরণ নিজ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে উপহার দিয়া বলিলেন,

'মন্থরে, যৎ ত্বয়া মেঽদ্য প্রিয়মাখ্যাতমীপ্সিতম্।
তদিদং প্রীতিদানং তে প্রীত্যা ভূয়ো দদামি তে ॥
রামে বা ভরতে বাপি বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
তস্মাৎ প্রিয়ং মে যদ্রামং রাজা রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥'

—মন্থরে, তুমি আজ আমার নিকট যে অভীষ্ট প্রিয়বার্তা নিবেদন করিলে, তাহার জন্য তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ পুনরায় আমি তোমাকে এই প্রীতিদান প্রদান করিতেছি। রাম ও ভরতের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। রাজা রামকে অভিষিক্ত করিবেন, এ সংবাদ আমার নিকট প্রিয়।'

কৈকেয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রাম হইতে কাহারও অকল্যাণ হইতে পারে না। রামের প্রতি তাঁহার স্নেহপূর্ণ চিত্তকে বিমুখ করা মন্থরার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। অবশেষে মন্থরা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে দুইটি মোক্ষম বাণ নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্র একবার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে অযোধ্যার রাজবংশ রামের পুত্রপৌত্রাদির অনুগামী হইবে। ভরতের বংশ কখনই রাজত্ব করিতে পারিবে না! দ্বিতীয়তঃ সৌভাগ্যমদে মত্ত কৈকেয়ী ইতিপূর্বে কৌশল্যাকে যে অবমাননা করিয়াছেন, রাজমাতা হইয়া কৌশল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না?

মন্থরার এ অস্ত্র অব্যর্থ। বংশানুক্রমে প্রিয় পুত্রের রাজ্যচ্যুতি ও সপত্নীর সৌভাগ্যোদয়ের চিন্তা কৈকেয়ীর সমগ্র চিত্ত অধিকারপূর্বক বহুবিধ কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি করিয়া রামের

প্রতি স্নেহশূন্য করিল। তখন মনে হইল মন্থরার সকল পরামর্শই হিতকর ও যুক্তিসঙ্গত। কৈকেয়ীর চিত্ত ঐরূপে প্রভাবিত করিয়া মন্থরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দেশ করিল। পূর্বে একবার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পরিচর্যায় আরোগ্যলাভপূর্বক প্রীত হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্থরা যুক্তি দিল, ঐ বরদ্বয় প্রার্থনা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়—এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে রামের চতুর্দশ বৎসর নির্বাসন।

অতঃপর দশরথের কাতর অনুনয়, ভর্ৎসনা আবেদন সমস্তই ব্যর্থ হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৈকেয়ী বলিলেন,

'যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি বনং রামং বিসর্জয়।
ভরতঞ্চাপি মে পুত্রং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়॥'

—যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তবে রামকে বনে প্রেরণ করিয়া আমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

রাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে পুরোহিতবর্গের নির্দেশানুসারে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নানারূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পিতার আহ্বানে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কৈকেয়ীর মুখ হইতে তিনি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কিন্তু রামের নিকট কি ঐ সংবাদ সত্যই নিদারুণ ছিল? কৈকেয়ীর নির্দেশ শুনিবামাত্র তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

'এবমস্তু নিবৎস্যামি বনে চীরজটাধরঃ।
চতুর্দশৈব বর্ষাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ পিতুঃ॥'

—তাহাই হউক, বল্কল ও জটাধারী হইয়া আমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসরই বনে বাস করিব।

তৎক্ষণাৎ তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে সংকল্প করিলেন। একবারও কোন প্রশ্ন তুলিলেন না, বৃদ্ধ পিতাকে দোষারোপ করিলেন না, কৈকেয়ীকে অপ্রিয়বাক্য বলিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের এই অপূর্ব ত্যাগ সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। পার্থিব শ্রেষ্ঠ সুখসম্পদ্ রাজৈশ্বর্য, নবপরিণীতা পত্নী সমস্তই মুহূর্তমধ্যে পরিত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যে তাঁহার অনুগমন করিবেন, তাহা তিনি চিন্তাও করেন নাই; এবং পরে সর্বতোভাবে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন কোন আধুনিক যুক্তিবাদীর চক্ষে হয়তো এই ত্যাগ মহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিবেন—স্ত্রীবশীভূত বৃদ্ধ পিতার কথায় রাজ্যপালনের ও স্বীয় জননী ও পত্নীর প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করা কি সঙ্গত হইয়াছিল? ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? যুক্তির অভাব সে যুগেও দেখা যায় নাই। কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ দশরথের উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ এবং কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া রামচন্দ্রের রাজ্য পরিত্যাগ ও বনগমনের বিপক্ষে সবপ্রকার যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আর পার্থিব সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া বনবাসের মহৎ দুঃখ প্রসন্নচিত্তে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ পর্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে রামচন্দ্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! ভক্তহৃদয় তাই শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছেন,

'প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকত-
স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে
সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা॥'

—রঘুনন্দনের মুখকমলের যে শ্রী রাজ্যাভিষেকেও প্রফুল্লভাব ধারণ করে নাই, এবং বনবাসের দুঃখেও

যাহা ম্লান হয় নাই, সেই মুখশ্রী আমাকে সর্বদা মঙ্গল প্রদান করুক।

শ্রীরামচন্দ্রের মহৎ, বিশাল হৃদয় সকলের প্রতি প্রেম ও ক্ষমায় পূর্ণ। দশরথ ও কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজান্তঃপুরের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি কৈকেয়ীকে অভিসম্পাত না করিয়াছেন। এমনকি, যে প্রিয় পুত্রের রাজ্যলাভের কামনায় কৈকেয়ী হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন, সেই ভরতও জননীকে ক্ষমা করেন নাই। অযোধ্যার প্রজাবর্গ সকলেই কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া কখনও তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরূপ বাক্য নির্গত হয় নাই। রাম তাঁহার আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দায়ী করিয়াছিলেন দৈবকে; লক্ষ্মণের ক্রোধপূর্ণ উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন,

'কৈকেয়ী তু প্রকৃত্যৈব সদা মাং প্রতি বৎসলা।
সত্যং মৎপরিপীড়ার্থং বলাদ্দৈবেন মোহিতা॥'

—আমার প্রতি স্বভাবতই সর্বদা স্নেহসম্পন্না কৈকেয়ীকে নিশ্চয়ই দৈব আমার দুঃখ বিধানের নিমিত্ত বলপূর্বক মোহিত করিয়াছে।

মহাপুরুষগণের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য। মানবের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, তাঁহাদিগের চিত্তে ক্রোধ সঞ্চার করে না। বরং তাহাদের প্রতি অনুকম্পায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা কি তাঁহাদের আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পরিচয় নয়?

রামের বনগমনের সংবাদ শ্রবণে অন্তঃপুরে সকলের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, মহাকবি তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সর্বদা রামের অনুগত। রামের প্রতি বনবাসের নির্দেশ তাঁহার এত অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, নানারূপ যুক্তি দিয়া পরিশেষে বলপূর্বক বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া রামকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, বনগমনে রাম দৃঢ়সংকল্প, তখন প্রকৃত কর্তব্য নির্ধারণে তাঁহার বিলম্ব হইল না। রামের সহিত তিনিও বনে বাস করিবেন। রাম-পরিত্যক্ত রাজপুরীতে বাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আনুগত্য আদর্শস্থানীয়।

রাম যখন তাঁহার বনগমন-বার্তা কৌশল্যাকে নিবেদন করিতে গেলেন, শুক্লবস্ত্রপরিহিতা, প্রযত্নবতী, উপবাসাদিপূর্বক সংযতচিত্তা, ব্রত-ধারিণী কৌশল্যা তখন পুত্রের কল্যাণ-কামনায় দেবতাগণের পূজায় নিরতা ছিলেন। কৌশল্যার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় নারীর সাক্ষাৎ পাই—যে নারী পতিব্রতা, পুত্রবৎসলা, সর্বদা ব্রত উপবাস ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রত, দেব-পরায়ণা, কল্যাণময়ী। রামের বনগমন সংবাদে শোকে কাতর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

'ন প্রাপ্তপূর্বং কল্যাণং ময়া পতিপরিগ্রহাৎ।
আশংসিতং মে সুচিরং ত্বত্তোঽপি প্রাপ্নুয়ামিতি॥
তদদ্য বিফলীভূতং মম রাম বিচিন্তিতম্।
দুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী॥'

—পূর্বে আমি পতির নিকট সুখলাভ করি নাই। চিরকাল প্রত্যাশা করিয়াছি, তোমা হইতেই সুখলাভ করিব। রাম, অদ্য আমার সুখের সকল চিন্তা বিফল হইল। বৎস, বিধাতা আমাকে অপরিসীম দুঃখভাগিনী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৌশল্যাকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া রাম সীতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন।

সীতা চরিত্র বাস্তবিকই অতুলনীয়। সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্যই সমধিক কীর্তিত; কিন্তু তেজ, সাহস, দৃঢ়তা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতাও কি তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? সীতা রামের যোগ্য পত্নী। রামের বনবাস-গমনের সংকল্প জানিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি রামের অনুগমনে

প্রস্তুত হইলেন। একবারও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন না যে, রামের বনগমন সঙ্গত নহে। তাঁহার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আপাতদৃষ্টিতে যাহারা দায়ী, তাহাদের উপর একবারও দোষারোপ করিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাতিব্রত্য-আদর্শের অভাব নাই। সীতা কেবল পতিব্রতাই নহেন, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও অপরিসীম ক্ষমার তুলনা নাই। তিনি রাজকন্যা, রাজবধূ—আবাল্য রাজপ্রাসাদে সুখৈশ্বর্যে প্রতিপালিতা। কত অনায়াসে তিনি বনবাসের ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত হইলেন! বনবাস সম্বন্ধে যে তাঁহার কোনরূপ ধারণা ছিল না, তাহা বলা যায় না। কারণ রাম বনবাসের দুঃখসমূহ বর্ণনা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

'কন্যয়ৈব ময়া সর্বে বনদোষাঃ শ্রুতাঃ পুরা।
ভিক্ষুক্যাঃ সাধুবৃত্তায়াঃ কথয়ন্ত্যা পিতুর্গৃহে॥'

—পূর্বে পিতৃগৃহে কন্যাবস্থায় অবস্থানকালে আমি সাধুচরিত্রা কোন তাপসীর নিকট কথাপ্রসঙ্গে বনবাসের সমস্ত দোষ (দুঃখ) শ্রবণ করিয়াছিলাম।

সীতার ঐকান্তিক প্রার্থনা সত্ত্বেও রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না, তখন সীতা ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন,

'অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদনুপশ্যতি।
তেজস্বী রাম এবৈকঃ সূর্যবদ্দ্যুতিমানিতি॥
কিংবা পশ্যন্ বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
ত্যক্তুমিচ্ছসি মাং যেন প্রিয়াং নান্যপরায়ণাম্॥

—একমাত্র রামচন্দ্রই তেজস্বী ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, অজ্ঞানতাবশতই লোকে এইরূপ মিথ্যা বিবেচনা করিয়া থাকে। আপনি কি দেখিয়া বিষণ্ণ হইতেছেন, আপনার ভয়েরই বা কি কারণ,—যাহার জন্য অনন্যপরায়ণা আমাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছেন?

কৈকেয়ী যখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে পরিধানের নিমিত্ত চীর (কুশ-নির্মিত বস্ত্র) প্রদান করেন, তখনও সীতা কৈকেয়ীর প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া চীরদ্বয় গ্রহণ করেন। কেবল চীর পরিধানে অনভিজ্ঞা তিনি একখণ্ড চীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অপর খণ্ড কিরূপে পরিধান করিতে হয় তাহা ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইলেন।

বনগমনে উদ্যতা সীতাকে কৌশল্যা যখন নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন সীতা বিনীতভাবে বলিয়াছেন,

'পৃথগ্জনসমামার্যে ন মাং ত্বং কর্তুমর্হসি।
ধর্মাদ্ বিচলিতুং নালমহং সূর্যাদিব প্রভা॥'

—আর্যে, আপনি আমাকে সাধারণ রমণী বলিয়া মনে করিবেন না। সূর্য হইতে সূর্যের প্রভা যেমন পৃথক থাকিতে পারে না, তেমনি আমিও ধর্ম হইতে বিচলিত হইতে পারি না। সত্যই সীতা সাধারণ নারী নহেন। সীতার কথা বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতার চরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। ......ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা চরিত্রেরই আশ্রিত। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।

অবশেষে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার যাত্রার সময় আসিল। মন্ত্রিগণ, পুরোহিতবর্গ ও পৌরজন

নিশা-অবসানে অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাজদর্শনপ্রার্থী হইয়া জানিতে পারিলেন, মুহূর্তে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যার সেই মহাশোকের কাহিনী আজ পর্যন্ত কত পণ্ডিত, কত কবি কতভাবেই না লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! সমগ্র অযোধ্যাবাসী 'হা রাম' বলিয়া আকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে রামচন্দ্রের রথের অনুগমন করিলেন। ভারতবর্ষে আর একবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করেন, সেদিন এমনি করিয়াই গোপীগণ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার রথের অনুধাবন করিয়া অবশেষে রথের অদর্শনে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

পুরনারী-সমাবৃত দশরথ ও কৌশল্যা যখন রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া প্রজাবৃন্দের সহিত বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন সে দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্র দ্রুত রথ পরিচালনার আদেশ দিলেন। এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি সে দৃশ্য কল্পনা করিয়া 'পুরস্কারে'র কবির কণ্ঠে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:

(কবি) কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে,
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে—

ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়-রথে।

রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে—

অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।'

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পবিত্র জাহ্নবীতীরে মায়ের মন্দির,
মানব-কল্যাণ-গীতি সেথা উচ্ছ্বসিত,
স্বরগের স্বস্তি-বাণী ধ্বনিছে গম্ভীর
রামকৃষ্ণ-কথামৃতে মন সম্মোহিত।

মাতৃ-আরাধনা-মন্ত্রে নিয়ত মুখর
ধ্যানরত সদানন্দ পরম-পুরুষ
ভাবেতে বিহ্বল সদা, জ্ঞানেতে প্রখর,
বাণীর বিভূতি নিত্য নাশিছে কলুষ।

পঞ্চবটী-পুণ্যছায়ে প্রজ্ঞার প্রকাশ,
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানে সিদ্ধ জীবন সাধন,
রামকৃষ্ণ-সারদার ব্রত অনায়াস—
সংসার-জীবন মাঝে সন্ন্যাস যাপন।

অনাসক্ত প্রেমধারা জীয়ায় জীবন
জীবের মাঝারে শিব নিত্য-নিরঞ্জন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

স্বাধীন ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্যাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটি প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা-লাভের আজ এক যুগ অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে কোন একটী স্থির ও সুষ্ঠু পন্থা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। যে শিক্ষা জাতির প্রাণস্বরূপা, যে শিক্ষার সঞ্জীবনী শক্তিতে বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীন, প্রপীড়িত ভারত নবজীবন লাভে ধন্য হবে, সেই শিক্ষাকেই এই ভাবে অবহেলা করা নিশ্চয়ই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। আজ স্মরণ হচ্ছে ভারতাত্মার মূর্ত প্রতিচ্ছবি স্বামী বিবেকানন্দের সেই সখেদ উক্তি:

ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণকালে আমি দেখতাম, কি আরামেই না সেখানকার দরিদ্র জনেরাও জীবন যাপন করছে, কি সুন্দর শিক্ষাই না তারা লাভ করছে; আর যখন আমাদের দেশের দরিদ্র জনদের কথা ভাবতাম, তখন আমি অশ্রুবর্ষণ করতাম। এই প্রভেদের কারণ কি? 'শিক্ষা'—এই উত্তরই আমি পেলাম।

এই উত্তরকেই স্বামীজী তাঁর সুধন্য জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে শিক্ষার স্বরূপ, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচেষ্টা করেছেন।

এস্থলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: 'শিক্ষা' বলতে আমরা কি বুঝি? শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কি? তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল মধুরভাবে স্বামীজী শিক্ষার কয়েকটী সংজ্ঞা বা বিবরণ দিয়ে বলেছেন:

শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সকলের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগ্রত হন।

আমাদের সেরূপ ভাবধারাকেই আত্মস্থ ক'রে নিতে হবে, যাতে জীবন গঠিত হয়, মানুষ গঠিত হয়, চরিত্র গঠিত হয়।

আমরা সেই শিক্ষাই চাই, যা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিস্তৃত হয়, এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়।

সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষ-গঠন। সকল শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মানুষকে বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করা।

মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই হ'ল শিক্ষা।

এইভাবে স্বামীজীর মতে শিক্ষার সাতটী প্রধান লক্ষণ:

অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের জাগরণ, অন্তরস্থ পূর্ণতার প্রকাশ, জীবনের গঠন, মানুষের গঠন, চরিত্রের গঠন, বুদ্ধি-অনুভূতি-ইচ্ছা-শক্তির বর্ধন, আত্ম-বিশ্বাস।

প্রথমতঃ বেদান্তবাদী স্বামীজীর মতে প্রত্যেক মানুষই ব্রহ্মস্বরূপ, নিত্যবুদ্ধশুদ্ধমুক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কিন্তু এই ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরত্ব, পূর্ণত্ব ভূমারূপ ও আনন্দরসঘনত্ব জীবে শাশ্বত-কাল ধরে নিহিত হ'য়ে থাকলেও প্রকাশিত হয় না। সেইজন্যই জীব নিজেকে 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র', পাপী তাপী শোকক্লিষ্ট প্রভৃতি ভেবে আকুল হয়। কিন্তু এ সবই তার নিজের অজ্ঞানের ফল মাত্র। যেমন মেঘাবৃত সূর্যকে আমরা দেখতে পাই না সত্য, কিন্তু সেজন্য সূর্যের অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যও বিলুপ্ত হয় না; তেমনি অজ্ঞানাবরণের জন্য আমাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে না পারলেও তিনি চিরকালই

আছেন। অর্থাৎ আমরা শাশ্বতকালই ব্রহ্ম, সেই সত্যটী আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ আমরা চিরব্রহ্ম ব'লে চিরপূর্ণ। ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্ব সমার্থক, সেজন্য এই পূর্ণতাও আমাদের মধ্যে শাশ্বতকাল নিহিত হ'য়ে আছে। শিক্ষার দ্বারা তার প্রকাশমাত্রই হয়।

স্বামীজী এই যে বলেছেন, ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্ব আমাদের আগন্তুক গুণ নয়, আমাদের মধ্যে নূতন সৃষ্টি নয়, আমাদের নূতন লাভ নয়, কিন্তু আমাদের চিরন্তন, অবিনাশী সত্তা বা স্বরূপই মাত্র, তা ভারতীয় দর্শনের একটি অভিনব, নিগূঢ়, মূলীভূত তত্ত্ব। এই মতানুসারে 'সত্য' ও 'নিত্য' সমার্থক; যা সত্য তার জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। সেজন্য সত্যের 'সৃষ্টি' হয় না, সত্য 'লব্ধ' হয় না, নিত্যস্থিত, নিত্যলব্ধ সত্যের 'প্রকাশ'ই হয় মাত্র।

এস্থলে অদ্বৈত বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ 'কণ্ঠ-চামীকর ন্যায়', 'রাজপুত্র-ব্যাধ-ন্যায়', 'দশমস্ত্বমসি ন্যায়' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সুন্দর উদাহরণগুলির অর্থ হ'ল এইঃ এক ব্যক্তির কণ্ঠে প্রথম থেকেই চামীকর বা স্বুবর্ণ-হারটী আছে; সে কিন্তু তা না জেনে সেই হারটীকে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে; সেই সময়ে অন্য এক ব্যক্তি যদি সেই হারটিকে নির্দেশ ক'রে বলে, 'হার তোমার কণ্ঠেই তো আছে, তাহলে সে হারকে নূতন ক'রে লাভ করে না, যে হার তার পূর্বেই ছিল, তার প্রকাশ মাত্রই তার কাছে হয়। একই ভাবে—যে রাজপুত্র শৈশবেই ব্যাধ কর্তৃক অপহৃত হ'য়ে প্রথমে নিজেকেই ব্যাধই মনে করে, এবং পরে অন্যদের নিকট থেকে সে যে রাজপুত্র তা জানতে পারে, সেও নূতন ক'রে রাজপুত্র হয় না, তার পূর্ণ রাজ-পুত্রত্বের প্রকাশ মাত্রই তার কাছে হয়। একই ভাবে—দশজনের দলের দলপতি সংখ্যাগণনা-কালে ভ্রমক্রমে নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা ক'রে নয়-জন আছে ভেবে যখন ব্যাকুল হয়, তখন যদি অন্য কেহ তাকে বলে, 'তুমিই তো দশম জন' তাহলে সে নূতন ক'রে দশম হয় না; তার পূর্ব দশমত্বের প্রকাশই কেবল তাঁর কাছে হয়। এরূপে—আমরা যখন উপলব্ধি করি যে, আমরা ব্রহ্ম ও পূর্ণ, তখন আমরা নূতন ক'রে ব্রহ্ম ও পূর্ণ হই না; আমাদের সত্তাগত, শাশ্বত ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্বের প্রকাশই কেবল আমাদের কাছে হয়। সে জন্য সাধনার অর্থ এই নয় যে, আমরা একটী নূতন স্বরূপ ও গুণ লাভের জন্য প্রচেষ্টা করছি, সিদ্ধির অর্থ এই নয় যে, আমরা একটী নূতন অবস্থায়, অব্রহ্মত্ব থেকে ব্রহ্মত্বে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় উপনীত হচ্ছে। নিত্য বিরাজমান আত্মার স্বরূপের আবরণ উন্মোচন প্রচেষ্টাই সাধনা, অনাবৃত আত্মার, স্বরূপের প্রকাশ বা উপলব্ধিই সিদ্ধি।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কথা খাটে। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি যে, আমরা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ণ-স্বরূপ আমরা অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপও—একই সঙ্গে। সেজন্য নতুন ক'রে জ্ঞান লাভ হয় না; অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হ'লে আমাদের নিকট সেই নিত্য জ্ঞানের প্রকাশই হয় মাত্র।

স্বামীজী শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা-কালে এই কথাটাই বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন :

জ্ঞান মানবের মধ্যেই নিহিত হ'য়ে রয়েছে, বাইরে থেকে কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান অন্তরেই রয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জানার অর্থ 'আবিষ্কার করা' বা 'আবরণ উন্মোচন করা।' আত্মা অনন্ত জ্ঞানের আকর এবং শিক্ষার অর্থ হচ্ছে আত্মার আবরণ অপসারণ ক'রে তাকে আবিষ্কার করা। আমরা বলে থাকি যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু এটা কি তাঁর জন্য বাইরে এক কোণে অপেক্ষা ক'রে বসে ছিল? এটা ছিল তাঁর নিজেরই মনে; সময় সমুপস্থিত হ'লে তিনি তা আবিষ্কার করলেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানই মনের থেকেই আসে; বিশ্বের অনন্ত গ্রন্থাগার তো পৃথিবীর ঘটনাবলী তোমার নিজের মনের গ্রন্থটাকেই পাঠ করবার জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে। একটা আপেল ফলের পতন নিউটনকেও নিজে মনোগ্রন্থকে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর পূর্বের চিন্তা ধারাকে পুনর্গঠিত ক'রে, তাদের মধ্যে একটা নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করেন—একেই আমরা বলি 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'! এটা আপেল ফলেও ছিল না, পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কিছুতেও ছিল না। সেজন্য পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল জ্ঞানই মানব-মনের মধ্যেই রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত হয়েই থেকে যায়, এবং যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হয়, তখন আমরা বলি যে আমরা শিক্ষা লাভ করছি, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এই প্রণালীতেই। যার ক্ষেত্রে এই আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন অধিকতর জ্ঞানবান, যার ক্ষেত্রে তা ঘন হ'য়ে পড়ে রয়েছে, তিনিই হলেন অজ্ঞ; যাঁর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হ'য়ে গেছে, তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ। চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত হ'য়ে থাকে, তেমনি মনেও জ্ঞান নিহিত হ'য়ে আছে; ঘর্ষণের দ্বারা যেমন সেই অগ্নি প্রকাশিত হয়, শিক্ষার দ্বারাও তেমনি সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হয়। সেজন্য সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি থাকে এই মনেই। যাকে আমরা প্রাকৃতিক শক্তি বলি, প্রকৃতির গুপ্ত ঐশ্বর্য বলি, তা সবই আছে এই অন্তরেই। সকল জ্ঞানই আসে মানবাত্মা থেকে! মানব প্রকাশিত করে, নিজের মধ্যে আবিষ্কৃত ক'রে সেই জ্ঞানকেই যা অনন্তকাল ধরে বিরাজমান।

এই ভাবে স্বামীজী মানবের নিত্য অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির কথা বলেছেন বারংবার স্থির বিশ্বাসভরে। এর থেকেই আসছে শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ—জীবন গঠন। যে জীবনকে আমরা সাধারণতঃ জীবন বলে থাকি তা তো প্রকৃত জীবন নয়—মরণ; কারণ তাতে আমরা ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে মরছি আমাদের নিজেদের অজ্ঞান বাষ্পের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে, আমাদের বাসনা কামনার দ্বারা দগ্ধ হ'য়ে, আমাদের আচার-কদাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হ'য়ে। এই 'মরণ' থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার একমাত্র উপায় সকল ক্ষয়-ক্ষতির উর্ধ্বে যে এক অক্ষয় পূর্ণ জীবন, তারই গঠন। বস্তুতঃ আমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্বের প্রকাশ হলেই এই জীবনেরও প্রকাশ হয়।

এরূপ একটি পূর্ণ জীবনই 'মানুষ', এই হ'ল শিক্ষার চতুর্থ লক্ষণ—মানুষ-গঠন। মানুষ জীব নয়, মানুষ জন্মমরণশীল শোকতাপতপ্ত, ক্লেশক্লেদ-ক্লিষ্ট প্রাণী নয়; মানুষ অনন্ত অসীম অমৃত জীবনের অধিকারী, ব্রহ্মত্বের অধিকারী—পূর্ণত্বের অধিকারী। এরূপ বোধই তো মনুষ্যত্ব এবং এরূপ মনুষ্যত্ব জীবত্বের নিবারণ ও ব্রহ্মত্বের স্ফুরণ। মানুষ নিত্যবদ্ধ জীব নয়, নিত্যমুক্ত ব্রহ্মও নয়, কিন্তু বদ্ধমুক্ত মানুষ—জীবত্বের অন্ধকার আবরণ মায়া ভেদ ক'রে আলোক-দ্রষ্টা। এই আলোক দর্শনই হ'ল শিক্ষা, সাধনা, সংস্কৃতি।

চরিত্রের গঠন সর্বজনীন ও সর্বপূর্ণ জীবনের প্রতি দিকটার তুল্য পূর্ণ প্রকাশ, সেজন্য শিক্ষার অর্থ কেবল বুদ্ধিবৃত্তির, কেবল চিন্তাশক্তির, কেবল জ্ঞানের প্রকাশ নয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে ধীর, শান্ত, পূর্ণ অনুভূতিরও সুন্দরতম প্রকাশ; সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পুণ্য নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিরও প্রকাশ; শিক্ষা যদি প্রকাশই হয়, তাহলে তা হবে পরিপূর্ণ। সূর্য প্রকাশিত হ'লে সবই তো আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে

উঠে। একই ভাবে যে শিক্ষার আলোকে সমগ্র সত্তাই আলোকিত হ'য়ে উঠবে—সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। বস্তুতঃ, জ্ঞান, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি, সেই একই স্বরূপের বিভিন্ন দিক সেজন্য একে অপরের পরিপূরক ; জ্ঞানের কোমল দিক অনুভূতি, অনুভূতির কার্যিক দিক প্রবৃত্তি। এরূপে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানের দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হলেও অনুভূতি ও প্রবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞানের পূর্ণতা কোথায় ?

উপরে যে ছয়টি শিক্ষার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই সমার্থক, একই বস্তুর বিভিন্ন দিক্ মাত্র, যেহেতু বস্তুতত্ত্ব বা সত্য সেই একই ; বস্তুতত্ত্ব বা সত্য বহু ও বিভিন্ন হ'তে পারে না। অন্যথায় সেই সব বহু ও বিভিন্ন বস্তু-তত্ত্ব বা সত্য স্বভাবতই পরস্পরবিরোধী হবে। সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তো একটি সর্বাপেক্ষা শক্তি-মান বস্তুর অধীনেই অন্য সবগুলিকে আনতে হবে; একই ভাবে শিক্ষাতত্ত্ব সেই একই এবং শিক্ষার ছয়টি লক্ষণ সেই একটি তত্ত্বেরই বিভিন্ন লক্ষণ, সেই একটি বস্তুরই বিভিন্ন গুণ, সেই একটি সত্যেরই বিভিন্ন রূপ। পুন-রায়, সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে এই লক্ষণ বা গুণ বা রূপের নবসৃষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছে কেবল প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই মাত্র, যা পূর্ব থেকেই অন্তর্নিহিত, যা শাশ্বত—অথচ যা অজ্ঞাত, তারই বহিঃপ্রকাশ—তারই উপলব্ধি মাত্র। ঐ ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এই প্রকাশ হবে কার দ্বারা, কি উপায়ে ?

এরই উত্তরে স্বামীজী শিক্ষার সপ্তম লক্ষণের উল্লেখ করেছেন—আত্মবিশ্বাস ও তারই কার্যিক দিক বা আত্মপ্রচেষ্টা। বস্তুতঃ যা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত হ'য়ে রয়েছে, আবৃত হ'য়ে রয়েছে, অনভিব্যক্ত হ'য়ে রয়েছে, তাকে জাগ্রত অনা-বৃত অভিব্যক্ত করতে তো বাহিরের কোন যন্ত্র, কোন শক্তি বা কোন কর্তা পারে না; পারে কেবল অন্তরের যন্ত্র, অন্তরের শক্তি, অন্তরের কর্তা, এক কথায়—পারি কেবল আমরা নিজেরাই, অন্য কেহই নয়। অতি জোরের সঙ্গে স্বামীজী বলছেন :

প্রকৃতপক্ষে, কেহই কোনদিন অন্যের দ্বারা শিক্ষালাভ করেনি। আমাদের প্রত্যেককেই নিজেকে নিজেই শিক্ষা দিতে হয়। বাহিরের শিক্ষক কেবল সেই পরিবেশের সৃষ্টিই করেন, যাতে অন্তরের শিক্ষক বস্তু-অবধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ হন। তারপর আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ ও চিন্তাশক্তির দ্বারা সব কিছুই আমাদের নিকট সহজতর হ'য়ে আসবে। বহু যোজনব্যাপী বিশাল বটবৃক্ষ একটি অতি ক্ষুদ্র বীজে নিহিত থাকে। সেই পুঞ্জীভূত শক্তি সেইখানেই তো আবদ্ধ হয়েছিল। একই ভাবে মহতী বুদ্ধি একটি ক্ষুদ্র জীবকোষে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। এই তত্ত্বটিকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধদোষ-দুষ্ট বলে মনে হলেও এটি পূর্ণসত্য। আমরা প্রত্যেকেই সেই একটি ক্ষুদ্র জীবকোষ থেকেই আবির্ভূত হয়েছি, এবং আমাদের সমস্ত শক্তিই সেইখানেই প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। একথা বলা যায় না যে, সেই সব শক্তি খাদ্যাদি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, কারণ বহু খাদ্যাদি একত্র করলেও এর থেকে কোন শক্তির উদ্ভব হ'তে পারে না। এরূপে মানবা-ত্মার মধ্যেই অনন্ত শক্তি বিরাজ করছে, তা আমরা জানি বা না জানি। সেই শক্তি প্রকাশিত হয় তখনই, যখন আমরা তা উপলব্ধি করি।

এইভাবে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি আমাদের নিজেদের আত্মার মধ্যেই নিহিত হ'য়ে রয়েছে শাশ্বতকাল, তাদেরই আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত করতে হবে—এরই নাম 'শিক্ষা'। তাহলে কি বাহিরের শিক্ষক ও

শিক্ষালয়ের প্রয়োজন নেই ? অতি সহজ, সুন্দর একটি উপমা দিয়ে স্বামীজী বলেছেন—

'তুমি যেমন একটি বৃক্ষকে বর্ধিত করতে পার না, তেমনি একটি শিশুকেও শিক্ষিত করতে পার না। বৃক্ষটি নিজেই নিজের স্বরূপানুসারে বর্ধিত হয়। শিশুটিও নিজে নিজেই শিক্ষিত হয়। কিন্তু তুমি কেবল তাকে তার চলার পথে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করতে পার। তুমি তার বাধা অপসারণ করতে পার, এবং তার জ্ঞানের প্রকাশ তখন আপনিই হবে। যেমন মাটীটা একটু নরম ক'রে দাও, যাতে সে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে; তার চারি-পাশে বেড়া দিয়ে দাও যাতে সে নষ্ট হ'য়ে না যায়, তার কাছে আলো, বাতাস, জল এনে দাও, যাতে ক্ষুদ্র বীজ অচিরেই বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হ'তে পারে; এইখানেই তোমার কাজ শেষ।'

এই হ'ল সংক্ষেপে স্বামীজীর অপূর্ব শিক্ষা-তত্ত্ব। আজ আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। স্বামীজীর শিক্ষা-তত্ত্বের দুটি মূল ভিত্তি হ'ল: (১) শিক্ষার অর্থ বাহিরের নূতন সত্তা, গুণ ও শক্তির প্রাপ্তি নয়, অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তা, গুণ ও শক্তির বিকাশ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের 'হেরিডিটি'-তত্ত্ব এরই প্রতিধ্বনি। এই মতানু-সারে—শিশু একটি মূলীভূত স্বরূপ, কয়েকটি মূলী-ভূত গুণ ও শক্তি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে; উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশঃ বিকশিত হ'য়ে উঠে তার জীবন গঠন করে। অবশ্য 'হেরিডিটি ও এন্‌ভাইরন্‌মেণ্ট' অর্থাৎ জন্ম-গত গুণ ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর শক্তিমান, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বাদ-বিসংবাদের শেষ এখনও হয়নি; তা সত্ত্বেও জন্মগত গুণ প্রভৃতির বিশেষ গুরুত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। (২) শিক্ষার অর্থ স্ব-শিক্ষা, নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান। এটিও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের একটি সর্বসমাদৃত মতবাদ। সেইজন্যই বাইরে থেকে শিশুর মাথায় বিদ্যার ভার না চাপিয়ে, কঠিন শাসনের দ্বারা তাকে জ্ঞানাহরণে বাধ্য না ক'রে আজ তাকে স্বাধীনভাবে, খেলাধূলার মধ্যে, আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের সাহায্যে শিক্ষা লাভের নানারূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু এইভাবে পরিপূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত হলেও স্বামীজীর শিক্ষা-তত্ত্ব, তথা অন্যান্য সকল তত্ত্বেরই মূল ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান বা 'সায়েন্স' নয়, বিশেষ জ্ঞান বা 'দর্শন'। বিজ্ঞান ও দর্শনে মূলীভূত প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সীমা, দর্শনের লক্ষ্য ভূমা। বিজ্ঞান দিতে পারে কেবল সীমাবদ্ধ সুখ; দর্শন এনে দেয় ভূমার মহান্ আনন্দ। সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমোদ বৃদ্ধি হলেও আনন্দ বৃদ্ধি হচ্ছে না; পার্থিব শক্তি বৃদ্ধি হলেও প্রকৃত শান্তি বৃদ্ধি হচ্ছে না; আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি হলেও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হচ্ছে না; সংযোগ বৃদ্ধি হলেও সমন্বয় বৃদ্ধি হচ্ছে না। তাহলে সেই প্রগতি তো প্রতিহত গতিই মাত্র, প্রকৃষ্ট গতি কোনক্রমেই নয়। এরূপ প্রতিহত গতি কি ক'রে নিয়ে যাবে আমাদের গন্তব্য পথে, আমাদের চরম লক্ষ্যে, আমাদের পরম শ্রেয়ে? সেজন্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষি, শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামীজী এই বেদান্ত-দর্শনকেই করেছিলেন জীবনের মূল ভিত্তি; অন্যদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই করতে। সেজন্যই তিনি বারংবার বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধি লাভ নয়, চাকুরী লাভ নয়, অর্থ লাভ নয়—অন্তরস্থ ব্রহ্মোপলব্ধি। এই ব্রহ্মোপ-লব্ধিতে লাভ কি হবে? প্রকৃতপক্ষে লাভা-লাভের কোনোরূপ প্রশ্নই এস্থলে নেই। কারণ, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পরিপূর্ণ বৃক্ষের

ফলপুষ্পের বিকাশ যখন হয়, তখন তা অনিবার্য ভাবেই, অবশ্যম্ভাবী ভাবেই, স্বভাবগত ভাবেই সংঘটিত হয়; এবং যা হবেই হবে, যা হতেই হবে, যা না হ'য়ে উপায় নেই, তা সাধারণ লাভ-ক্ষতির পরিমাপের বহু ঊর্ধ্বে। একই ভাবে জীবের মানবে, মানবের ব্রহ্মে যে প্রকাশ—তাও লাভালাভের ব্যাপার নয়, কেবলমাত্র সংঘটনের ব্যাপার; এমন কি তাও নয়, কেবলমাত্র ঘটন-বিহীন, কালাতীত শাশ্বত অস্তিত্ব ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়।

তা সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে এস্থলে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপিত করাই যায়, তাহলে কি এস্থলেও অল্প লাভ হবে? না। তবে কি সেই মহালাভ? ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে কি মহালাভ আমাদের হবে? ধন নয়. মান নয়, পদ নয়। তবে তা কি? স্বামীজীর অমৃত-মধুর ভাষাতেই বলি:

'পৃথিবীর দিক্ থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির এই মহান লাভ এই যে, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরও যদি এই উপলব্ধি হয়, তাহলেও সমগ্র জগৎ পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে; এবং বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করবে। তখন আমাদের মধ্যে অপরকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে যাবার যে পশুপ্রবৃত্তি আছে, তা পৃথিবী থেকে তিরোহিত হ'য়ে যাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল দ্বন্দ্ব, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল দ্বেষ; সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল ঈর্ষ্যা, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশেষে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল পাপ। তখন দেবতারাই এই পৃথিবীতে বাস করবে, তখনই এই পৃথিবী হবে স্বর্গরাজ্য। যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের লীলা হয়, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের কাজকর্ম চলে, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের প্রীতির বন্ধন থাকে, সেখানে পাপের অস্তিত্ব কোথায়? এই তো হ'ল ব্রহ্মোপলব্ধির মহান লাভ, মহৎ প্রয়োজন। সমাজে যা কিছু তোমরা দেখছ, তা সবই তখন পরিবর্তিত পরিমার্জিত হ'য়ে যাবে। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই পাপী বলে মনে করবে না। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই তার ভুলভ্রান্তির জন্য বিদ্রূপ করবে না। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই তার দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করবে না। কারণ তোমরা তখন প্রত্যেকের মধ্যেই সেই একই ঈশ্বর দর্শন করবে। তোমরা তখন কাকেও ঈর্ষ্যা করবে না, কাকেও শাস্তি প্রদানে উৎসুক হবে না। এ সবই তখন তিরোহিত হ'য়ে যাবে, বিরাজ করবে কেবল প্রেম, এই প্রেমের মহাদর্শ তখন একরূপ শক্তিশালী হবে যে, মনুষ্যজাতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আর কোন শাসন, কোন বন্ধনেরই প্রয়োজন হবে না।'

কি অপূর্ব স্বামীজীর এই স্বপ্ন; কেবল তা নয়, কি অপরিসীম তাঁর আশা, কেবল তা নয়, কি অনমনীয় তাঁর বিশ্বাস!—

পৃথিবীর কোটী কোটী জনগণের মধ্যে একটি মাত্র অংশও যদি কয়েক মুহূর্ত মাত্র বসে বলেন, 'তোমরা সকলেই দেবতা! হে মানুষ! হে পশু! হে সকল প্রাণী! তোমরা সকলেই সেই একই পরম দেবতার প্রকাশ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে।

তখন আকাশে বাতাসে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হবে 'তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি!' তখন সমগ্র পৃথিবীতে, কোটী কোটী সূর্যচন্দ্রে, প্রত্যেক বস্তুতে সেই একই সম্মিলিত ধ্বনি উত্থিত হবে, 'তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি!'

প্রান্তে

'অনিরুদ্ধ'

প্রান্তে আসিনু আজ
এতদিন পথে ছিল যত ভয়
চিত্তে হানিত যত সংশয়
সাশ্রু নয়নে সহিয়া এসেছি
যত অপমান লাজ—
সকলি ফুরালো আজ!
প্রান্ত-মহিমা প্রান্তেই বুঝা যায়
দূর হ'তে দেখা বৃথা কল্পনা হায়।

প্রান্ত হইতে চাহি—
দূর পশ্চাতে দীনতার রূপ
সঞ্চিত মোহ কালিমার স্তূপ
দেখি বিস্ময়ে কোথাও আজিকে
কালো কিছু আর নাহি
সমুখে পিছনে চাহি!
প্রান্তের আলো দিগ্‌দিক্ পানে ধায়
পুঞ্জিত তম দীপ্ত করিতে চায়।

প্রান্তে দাঁড়ায়ে রই।
নাহি আর কোন চলার ভাবনা
মিটেছে যতেক কর্ম-তাড়না
অতীতের সেই দুর্বার আশা
উন্মত্ততা কই?
শান্ত দাঁড়ায়ে রই!
মহাসমুদ্রে মিশে তটিনীর ধারা
গতির ধর্ম স্তব্ধ স্বরূপে হারা।

প্রান্তে এসেছি ফিরে।
ভেবেছিনু যারা গেছে চির দূর
বিরহ রাখিতে হৃদয় আতুর
কালের গর্ভ হ'তে তারা উঠি
দাঁড়ালো আমায় ঘিরে
হারানো এসেছে ফিরে
সব বিচ্ছেদ প্রান্তেই হয় এক
শূন্যতা পায় পূর্ণের অভিষেক।

গাহি প্রান্তের গান
অখিল সীমার বাঁধন টুটিয়া
নিজ উল্লাসে চলে যা ছুটিয়া
স্বর্গ মর্ত্য ভাস্বর প্রেমে
যেই সুরে একতান—
মাতায় বিশ্বপ্রাণ।
প্রান্তের গীত হরিল সকল ব্যথা
নামিল জীবনে পরম সার্থকতা।

সমালোচনা

সৎপ্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, আসাম। পৃষ্ঠা—১৫২, মূল্য—টাকা ২·৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ-কথিত 'সৎপ্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ডে'র পর অনেকেই সাগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গগুলি অধিকাংশই আসাম অঞ্চলে প্রদত্ত। এই খণ্ডের প্রসঙ্গগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত এবং যথাসময়ে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পূর্বে পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া এবং সাধক-জীবনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রসঙ্গগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন-পত্রিকায় প্রকাশিত পূজ্যপাদ মহারাজের লেখা 'শ্রীশ্রীমা' প্রবন্ধটি গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকটির সৌন্দর্যের সহিত মাধুর্য শতগুণে বাড়িয়াছে। কুড়িটি প্রসঙ্গ সময়ানুক্রমে (১৯৫৪-১৯৫৯) সাজানো আছে। সাধক পাঠকগণ পুস্তকখানি হইতে নিজ নিজ সাধন-জীবনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিবেন। গীতা ও 'কথামৃতে'র কথাগুলি জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, জ্ঞান ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ সর্বদা সহজপ্রাপ্য নহে, সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গের স্মৃতি বহন করে। 'সৎপ্রসঙ্গ' সাধুসঙ্গের অভাব মিটাইতে পারে। 'সৎপ্রসঙ্গ' সাধকগণের নিত্যসঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সাধনপথে সহায় হউক।

* * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ গদ্য সংস্করণ (প্রথম খণ্ড—আদিলীলা)। অনুবাদক—শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য; প্রকাশক—ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রচারিণী সমিতি, ১৩।এ ডোভার রোড, কলিকাতা-১৯; পৃষ্ঠা—২৯১+৪০; মূল্য—৫·০।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বাঙালীর হৃদয়-দেবতা। 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' নদীয়ার চাঁদ নিমাইরূপে যিনি কায়া ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতীরূপে সমগ্র ভারতের তথা বিশ্ববাসীর প্রণম্য আচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিয়াছিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল।'

বাঙালীর জাতীয় জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিমেয়। বাঙলার ভাগ্যাকাশ একদিন এই চৈতন্যচন্দ্রের উচ্ছলিত বিমল কিরণে সমুদ্ভাসিত ছিল। জাতির মর্মে মর্মে—তাহার সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্মে, একদা চৈতন্যের স্পন্দন দেখিয়া সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হইয়াছিল। অতি স্বাভাবিক নিয়মেই সারা ভারতে সেদিন এই চৈতন্য-প্রবাহের স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। বর্তমান-সমস্যাপীড়িত আত্মিক অবনতির দিনে, এমন একটি অমিয়জীবনের রসাস্বাদনের জন্য তৃষ্ণাজাগরণ বড়ই শুভ লক্ষণ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থ যথার্থই এক-

খানি অনবদ্য সঞ্জীবনী-কাব্য। কবিশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ্ কবিরাজ গোস্বামী ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই এই সুবিশাল অমৃত-সিন্ধু মন্থনে সমর্থ হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজ উক্তি স্মরণীয়:

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ-রূপ-সনাতন॥'

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্যের অন্যতম এই 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বকালের শান্তিকামী মানবের নিকট চির আদরণীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সুসংগ্রথিত এই দিব্যসাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নহে। বাংলা ভাষায় পয়ার-ত্রিপদী-ছন্দে লিখিত হইলেও উহার বিন্যাস-পারিপাট্য ও স্থানে স্থানে সুমার্জিত সংস্কৃত-বহুল ভাষার ভাব-গাম্ভীর্য জনসাধারণের নিকট কিঞ্চিৎ অসুবিধাকর সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ, উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত, হরিভক্তিবিলাস, বাল্মীকি-রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্ত, পদ্মপুরাণ, ললিতমাধব, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রপুরাণাদি হইতে অধিক পরিমাণে উদ্ধৃতি-প্রমাণাদির উল্লেখ থাকায় সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ বাস্তবিকই দুরধিগম্য।

সুতরাং এমন একখানি অমূল্য গ্রন্থের সহজ-সরল বাংলা গদ্যানুবাদের অভাব আমরা মনে-প্রাণে বোধ করিতেছিলাম। বড়ই আনন্দের কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলং শাখার সম্পাদক শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় সাধকের নিষ্ঠা লইয়া এই শ্রমসাধ্য কার্যে হাত দিয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলা অংশের গদ্য সংস্করণ। আমরা আশায় থাকিলাম, সুযোগ্য লেখক অনুরূপভাবে মধ্য ও অন্ত্যলীলাভাগেরও গদ্য সংস্করণ শীঘ্রই দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিবেন। সপ্তদশটি সুবিন্যস্ত পরিচ্ছেদ লইয়া এই আদিলীলা। প্রকাশিত বর্তমান অংশের ভাষা অতি সুন্দর, সজীব ও সহজ হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা মূল গ্রন্থের রসাস্বাদনে খুবই সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

'চরিতামৃত' গ্রন্থের মূল আদিলীলা অংশটিও সম্পূর্ণ পৃথক্ভাবে বর্তমান পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহা দ্বারা পাঠকের মূল গ্রন্থপাঠের আগ্রহও পরিতৃপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদ-পরিকল্পনায় সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মুদ্রণ-ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রচ্ছদের ভিতর ভাগে প্রথমে ও শেষদিকে, পুস্তকের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে এবং ইতস্ততঃ এত অধিক-সংখ্যক প্রশংসাপত্র ও অভিমত সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, উহাতে পুস্তকের আঙ্গিক সৌষ্ঠব কিছু লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। একই ব্যক্তির অভিমতকে বা একই প্রশংসা-লিপিকে পুস্তকের একাধিক স্থানে প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ, তাহার পরিচয় করাইবার জন্য এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় সুপারিশের কি আবশ্যক, তাহা বুঝিলাম না।

যাহা হউক, শ্রীভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন, সন্দেহ নাই। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থের এই গদ্য সংস্করণ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। —**অক্ষজানন্দ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুআরি) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৫তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মসূচী সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ বলেন, ঈশ্বরকে লাভ করাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং সকল ধর্মই সত্য, সাধন দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শন হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। মানব-কল্যাণের যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিলে জীবন আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

সকাল হইতে অগণিত নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১১,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়। শেষ রাত্রে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ২৩জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৭জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ৬ই মার্চ মহোৎসব-দিনে বেলুড়মঠ প্রাতঃকাল হইতেই এক অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন এবং সন্ধ্যায় বাজী পোড়ানো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে এক পশলা বৃষ্টি ও সারাদিন দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যার দিকে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পায়। প্রায় দুই লক্ষাধিক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা): গত ২৮শে ফেব্রুআরি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৫তম জন্মতিথি উৎসব বহু ভক্তসমাবেশে মঙ্গলারতি পূজাহোম ভক্তসেবার মাধ্যমে মহা আনন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে সভায় শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েক পৃষ্ঠা 'কথামৃত' পাঠ করেন। ডক্টর দত্ত মজুমদার (Administrator, New Capital) বলেন, ভক্তির ভিত্তিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে. সি. রায় (Secretary, Tribal and Rural Welfare Dept.) শ্রীরামকৃষ্ণকে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ রূপে বর্ণনা করেন।

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

ফরিদপুরঃ বিগত ২১শে জানুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মতিথি এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঙ্গল আরতি, ভজন, মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম এবং সন্ধ্যায় আরতি,

ভজন, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তৎপর স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে ছাত্রগণ প্রবন্ধ পাঠ করে।

২৯শে জানুআরি শুক্রবার অপরাহ্ণে জিলা জজ সাহেবের সভাপতিত্বে জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংক্ষেপে একটি ভাষণ দিলে পর সভাপতি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর জীবনের বহুমুখী প্রতিভার মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

বিদ্যালয়-ভবন উদ্বোধন

সারগাছি : গত ২৩শে জানুআরি স্থানীয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শক মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যালয়টির সাফল্য কামনা করেন। বিদ্যালয়-সংলগ্ন নবনির্মিত ছাত্রাবাসে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর নির্দিষ্ট-সংখ্যক ছাত্র ভরতি করা হইবে।

পুরস্কার-বিতরণোৎসব

বেলুড় বিদ্যামন্দির : গত ২০শে ফেব্রুআরি শনিবার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভামুখ্যের আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় লোকসভার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের বিশিষ্ট সদস্য খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। সভাগৃহে অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্য অতিথি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সাধুব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ১৯৫৯-৬০ খৃঃ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি বলেন যে, এই বিদ্যায়তনের অধ্যয়নানুকূল শান্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষকগণের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতিই এই অপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণ।

তদনন্তর বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র তাহাদের সুনিপুণ আবৃত্তি ও সুললিত সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সভাপতি মহোদয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে 'শিক্ষা-দীক্ষা' কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া বলেন যে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণের কেবল পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ করিলেই চলিবে না। জীবন-তপস্যায় অকৃত্রিম সাধক হইতে গেলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুদার মহামন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত হইতে হইবে। মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের নিকট তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক নিবেদন জানাইয়া তিনি আরও বলেন—তাঁহারা যেন সুকুমারমতি মাণবকগণকে সত্যকার মানবপদবাচ্য করিয়া তোলেন। স্নেহভাজন ছাত্রগণ যাহাতে অহংকার-রহিত অন্তরে কর্মমার্গে বিচরণ করিতে পারে, সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে গীতার সাত্ত্বিক কর্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন; কারণ স্থূল 'আমি'র চেতনাকে পরিহার করিতে না পারিলে জীবনের উন্মুক্ত উদার প্রান্তরে মানুষ কখনও আপনার সত্যরূপে বিকশিত হইতে পারে না। তাই তিনি নিঃশব্দ অনাড়ম্বর এবং আত্মপ্রচারণা হইতে বিমুক্ত কর্মসাধনাকেই মানুষের মহত্তম কৃত্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

পুরস্কার-বিতরণের পর ছাত্রদের সমবেত কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত গীত হইলে বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারী স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

স্বামী বিজয়ানন্দ: দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যস্থ বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দ জানুআরি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা শহরে একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে স্প্যানিস ভাষায় ছয়টি বক্তৃতা দেন। সরকারী বেতারে ভাষণগুলি প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বক্তৃতায় বেদান্তের উদার ভাব ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী স্থানীয় বহু ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরও সমাদর লাভ করে এবং তাঁহারা বক্তাকে অভিনন্দিত করেন। স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগত ধর্মালোচনার জন্যও প্রত্যহ অনেক নরনারী উপস্থিত হইতেন।

গত বৎসরের (১৯৫৯) মধ্যভাগে স্বামী বিজয়ানন্দ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যে আড়াই মাস অবস্থান করিয়া রিও-দে-জেনেরিও এবং সাঁওপাওলো এই প্রধান শহরদ্বয়ে মোট ১৩টি বক্তৃতা এবং অনেকগুলি ছোট ছোট আলোচনা-সভা পরিচালনা করেন। ব্রেজিলে ধীরে ধীরে বেদান্তানুরাগী একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। ব্রেজিলের স্থানীয় পর্তুগীজ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের কয়েকখানি গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে।

বুয়েনেস আইরেস বেদান্ত কেন্দ্রটি শহর হইতে ২০ মাইল দূরে শান্ত পল্লীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। প্রতি রবিবারে এখানে শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে ভক্তেরা সমবেত হন এবং ধর্মালোচনা, পাঠ ও প্রশ্নোত্তর নির্বাহিত হয়। স্বামী বিজয়ানন্দ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন শহরে গিয়া দুইটি বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এই বক্তৃতাগুলিতে গড়ে প্রায় ১০০ জন শ্রোতা হয়। সাক্ষাৎকার ও পত্রের মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের বহু বেদান্তানুরাগী নরনারী স্বামী বিজয়ানন্দের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে ১২ খানি গ্রন্থ স্প্যানিস ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রেজিল ব্যতীত দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সব দেশেই কথ্য ও লেখ্য ভাষা স্প্যানিস।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ডক্টর শ্যামাচরণ দে: বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমান্য ডক্টর শ্যামাচরণ দে মহাশয় গত ২৭শে ফেব্রুআরি ভোর ৫॥টায় পূর্ণ ৯১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শেষ দুই মাস যাবৎ তিনি শয্যাগত ছিলেন। 'দে বাবা' নামে তিনি শিক্ষক ছাত্র ও বন্ধুমহলে এবং সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ঋষিপ্রতিম চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রগণ সহ ৬০০০ নরনারী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণস্থিত তাঁহার বাসভবন হইতে হরিশ্চন্দ্র ঘাট পর্যন্ত শবানুগমন করেন।

ডক্টর অ্যানি বেসান্তের জনহিতকর কার্যে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৩ খৃঃ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থা হইতেই ইঁহার

সর্ববিধ উন্নতির মূলে 'দে বাবা'র অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার স্মৃতি চির উজ্জ্বল থাকিবে। কলেরা ও বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাত্রদের তিনি যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাও আদর্শস্থানীয়।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, সহাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ (Principal), সহ-উপাচার্য (Pro-Vice-Chancellor) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সর্বত্র যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, ছাত্রগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। দীর্ঘকাল গণিতের অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া তিনি কোন দিন বেতন গ্রহণ করেন নাই। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করেন। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ও শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। উভয় আশ্রমেরই তিনি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন: আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ১২ই মার্চ প্রত্যূষে ৮২ বৎসর বয়সে বিশ্বভারতী সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় বর্ধমানে এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মরদেহ আনীত হয়, এবং আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী, অনুরাগী আশ্রমবাসী ও জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বারাণসীধামে জন্মলাভের পর ক্ষিতিমোহনের জীবনের প্রথমাংশ সেখানেই কাটে বহু পণ্ডিত ও সাধুর সংস্পর্শে। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ও ভাষায় শিক্ষিত হইয়া উঠেন এবং সন্ত-মতের সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রেরণাতেই পশ্চিম ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা' (ইংরেজীতেও অনূদিত) গ্রন্থ রচনা করেন।

২৮ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি দেশের ও বঙ্গভাষার সেবা করেন। ১৯৫৩ খৃঃ তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি বিদ্যা-ভবনের (গবেষণা বিভাগের) অধ্যক্ষ ছিলেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্বভারতী তাঁহাকে দেশিকোত্তম (D. Litt.) উপাধিতে ভূষিত করে।

'মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার ধারা' ভিন্ন 'বাউল ধর্মের মর্মকথা', 'কবীর', 'দাদূ' প্রভৃতি তাঁহার চিরস্মরণীয় গ্রন্থ। তাঁহার তিরোভাবে সাহিত্য ও সাধনার জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণীয় নয়। পরলোকগত এই মহান্ আত্মার শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তকর্মী কৈলাসচন্দ্র সেন: পুরী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের পরম হিতৈষী নিরলস কর্মী ও বিশিষ্ট ভক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৪শে জানুআরি ৭৮ বৎসর বয়সে রাত্রি ২৷৷টার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন।

কটক জেলার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে কৈলাসচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুরী কালেক্টরী দপ্তরে যোগদান করেন। কর্মকুশলতায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) রূপে ১৯৪১ খৃঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪০ খৃঃ পুরী রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বিধবা আশ্রম ও গ্রন্থাগারের সম্পাদকরূপে কার্য-ভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৬ খৃঃ হইতে তিনি শুধু গ্রন্থাগারের গুরু দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

সাহিত্যানুরাগী, অধ্যয়নশীল কৈলাসচন্দ্র ওড়িয়া ভাষায় পদ্যছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী 'লীলামৃত' নামে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার 'গীতামৃত' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের ধারা-বাহিক দিনপঞ্জী) এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা', 'ভারত পুণ্যভূমি', 'বেদান্তের বার্তা' প্রভৃতি ভাষণের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এইরূপ একজন কৃতী পুরুষের তিরো-ধানে ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা

বারাসত: গত ২রা মার্চ প্রাতে ৮॥ টায় বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহা-রাজ শিবানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১০৫ বৎসর পূর্বে বারাসত শহরের শেঠপুকুর অঞ্চলের যেস্থানে স্বামী শিবানন্দ ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থানেই স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইবে। এই শুভ অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং কলিকাতা ও বারাসতের বহু ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

যথারীতি অনুষ্ঠানসহ ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনকার্য সমাপ্ত হইবার পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ মর্মস্পর্শী ভাষায় সমবেত সাধু ও ভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, '১৯০৭ খৃঃ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি, কি কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করছিলেন! বাঘ-ছালের উপর শুতেন, সারারাত ধ্যান-ভজন তপস্যায় তন্ময় থাকতেন। অদ্বৈত আশ্রমে তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভোগ নিবেদন হ'ত—স্বামীজীর উদ্দেশে ভোগ নিবেদন এই প্রথম দেখি। মহাপুরুষ মহারাজের কঠোর তপস্যাপূত গম্ভীর ব্যক্তিত্বের কাছে দাঁড়াতে ভয় হ'ত, কিন্তু তিনি যখন ডেকে কথাবার্তা বলতেন, তখন দেখতাম প্রেমে ভরপুর মহাপুরুষ। শেষজীবনে (১৯৩২) দেখেছি কঠোর ভাব চলে গেছে—ঠাকুর-মা-ময় হ'য়ে গেছেন। ঠাকুর ও মা তাঁর মধ্যে যেন বসে কাজ করছেন। বলতেন—ঠাকুরের দরজায় পড়ে আছি তাঁর কুকুর হ'য়ে, দাস হ'য়ে। এই পূর্ণ আত্মসমর্পণ-যোগই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।' স্বামী গম্ভীরানন্দও মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের কথা বলেন।

কৃষ্টিসংবাদ

আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা: সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ-বিধায়ক ভারতীয় সংসদের (Indian Council for Cultural Relation) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়া বিশ্ববিখ্যাত লেখক অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী নয়া দিল্লীতে 'বিশ্ব-ঐক্য' বিষয়বস্তু লইয়া নিম্ন-লিখিত তিনটি বক্তৃতা দিয়াছেন:

(১) Need for World Unity.
(২) Movement towards World Unity.
(৩) India's contribution to World Unity.

তাঁহার বক্তৃতাগুলির সার মর্ম: ধ্বংসোন্মুখ আণবিক যুগে মানবসমাজের আত্মরক্ষার জন্যই আজ বিশ্ব-ঐক্য প্রয়োজন। বর্তমানে মানুষ যতটা বিপন্ন, এতটা বিপন্ন সে কখনও হয় নাই। বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-বলে মানুষ বন্যজন্তু বা রোগজীবাণুকে জয় করিয়াছে; কিন্তু আজ মানুষের পরম শত্রু যুদ্ধোন্মাদ মানুষ নিজে। যুদ্ধ বাতিল করিতে হইলে সারা পৃথিবীতে একটি কল্যাণশাসন প্রয়োজন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ অশোকের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পারিলে তবেই বিশ্ব-ঐক্য সম্ভব। এ বিষয়ে ভার-তের এক মহান্ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব রহিয়াছে।

উদ্বোধন

কোথায় আলো ?

কিং জ্যোতিস্তব ভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে।
চক্ষুস্তস্য নিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে
কিং তত্রাহমতো ভবান্ পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো ! ॥

[শ্রীশঙ্করাচার্য-বিরচিতা একশ্লোকী]

গুরু-শিষ্য-সংবাদ মাধ্যমে (গুরুর প্রশ্ন ও শিষ্যের উত্তরচ্ছলে) আচার্য শংকর একটি মাত্র শ্লোকে চরম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন :

গুরু—বৎস, দিনে তুমি কাহার সাহায্যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ কর ?
রাত্রিতেই বা কে সর্বপ্রকাশক ?

শিষ্য—দিবসে সূর্য, এবং রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি।

গুরু—বেশ, এবার বলো—সূর্য, দীপ প্রভৃতি কাহার সাহায্যে দেখ ?

শিষ্য—চক্ষুর সাহায্যে।

গুরু—যখন চক্ষু মুদ্রিত কর, যখন বহিরিন্দ্রিয় উপরত,
তখন কিসের সাহায্যে অনুভূতি হয় ?

শিষ্য—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির সাহায্যে।

গুরু—বুদ্ধির সাক্ষী কে ? বুদ্ধি যে আছে এবং কাজ করিতেছে—একথা কে বুঝাইয়া দেয় ?

শিষ্য—বুদ্ধি আত্মজ্যোতিতেই প্রকাশিত, উদ্ভাসিত। বুদ্ধিকে অনুভব করিতে আত্মাই সমর্থ !
গুরুদেব, আপনি সেই পরমজ্যোতি আত্মস্বরূপ, শুদ্ধ আমিও সেই পরমজ্যোতিস্বরূপ !

কথাপ্রসঙ্গে

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে

এ বৎসর Indian Council for Cultural Relation (সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিধায়ক ভারতীয় সংসদ)-এর উদ্যোগে দিল্লীতে আজাদ-স্মৃতি-বক্তৃতা দিতে অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবীকে আমন্ত্রণ করা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, বিশ্বপরিস্থিতির এ সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁহার ভারতে আগমন এবং তাঁহার ভাষণটিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ;—রাজনীতির দিক দিয়া না হইলেও কৃষ্টি ও ইতিহাস বুঝিবার দিক দিয়া।

যে দেশ মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৃটেনের পরাধীন ছিল, সেই ভারতের পক্ষে একজন বৃটিশ ঐতিহাসিককে এভাবে আহ্বান করা খুবই মহত্ত্বের পরিচয়, একথা স্বয়ং টয়েনবী স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—ইহা সম্ভব হওয়ার আর একটি কারণ, উভয় দেশ বোঝাপড়া করিয়া সময়ের উপযোগী রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাহাতেই পূর্বের বিদ্বেষভাব অন্তহিত।

ভারত টয়েনবীর মুখে কি শুনিতে চাহিয়াছিল?—বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতের স্থান কোথায়, বিশেষতঃ সমসাময়িক ইতিহাসে। টয়েনবীও তাঁহার তিনটি বক্তৃতায় সুবিস্তৃতভাবে না হইলেও সুবিন্যস্তভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন, বিশ্বপরিস্থিতির পটভূমিকায় বর্তমান ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ও তিনি করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের তৃতীয় নয়ন দিয়া তিনি ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন:

(১) আণবিক যুগে যুদ্ধ অসম্ভব; যুদ্ধ হইলে উহা সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস করিবে।

(২) যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন—জাতীয়তাবোধ নয়, বিশ্ব-ঐক্য—অশোকের ভাবে অনুপ্রাণিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী।

(৩) শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(৪) ভারত আজ আক্রান্ত না হইলেও বিপন্ন, তবু এই বিপন্ন ভারতই স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে শান্তির আদর্শ স্থাপন করিতে পারিবে।

(৫) ভারতেই বিশ্বের সকল সমস্যা পুঞ্জীভূত আছে; এবং সমাধানও এখানে পূর্ব পূর্ব যুগে হইয়াছে, আবার হইবে।

* * *

টয়েনবীর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিবার পূর্বে দেখা যাক—তাঁহার এরূপ বলিবার কিরূপ কি অধিকার আছে। টয়েনবী ইতিহাসের শুধু অধ্যাপকই নন, আজীবন ইতিহাসের ছাত্র। গত ৩৮ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১০টি খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন 'A Study of History' (ইতিহাস অধ্যয়ন)। এ ইতিহাস কোন দেশের নয়, কোন বিশেষ জাতির নয়, এ ইতিহাস মানুষের ইতিহাস—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, তাহার উত্থান-পতনের ইতিহাস—মহাকাব্যের মতো মনোরম, মহাকাব্যেরই মতো ইহা বেদনায় ভরা। সভ্যতার স্তরে স্তরে ৬,০০০ বৎসরের ইতিহাস তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিত হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই বড়, কিন্তু মনীষী হিসাবে আরও বড়। কত সন্দেহ তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, কত পুরাতন বিশ্বাস অস্বীকার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, কত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, কত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বলেন নাই—এই শেষ কথা। অনাসক্ত তন্ময়তা তাঁহার রচনার সৌন্দর্য ও মাধুর্য। তাই আজ টয়েনবীকে বাদ দিয়া ইতিহাস অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ।

টয়েনবী বাহির হইয়াছেন—সত্যের সন্ধানে, তত্ত্বের সন্ধানে; পূর্ববর্তী যুগের ঐতিহাসিকদের মতো কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সন্ধানে নয়। তিনি মনে করেন না—কুম্ভকার মৃত্তিকার ক্রীতদাস, তিনি মনে করেন—কুম্ভকার মৃত্তিকাকে রূপ দিবে। তাঁহার অগ্রগতি অতি ধীরে, কিন্তু ধ্রুব। তাঁহার ইতিহাস-রচনা মানব-কেন্দ্রিক। তাঁহার মতে ইজিপ্ট শুধু নীলনদেরই দান নয়, ইজিপ্ট মানুষেরও দান। মানুষের পরিশ্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল নীলনদের সভ্যতা, শুধু নীলনদের কেন, সকল সভ্যতাই—কি নদী উপত্যকায়, কি পার্বত্য অধিত্যকায়, কি দ্বীপমালায়!

মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বস্তুনির্ভর জড়বিজ্ঞানেরও কত নিয়ম পরিবর্তিত হইতেছে, তখন ব্যক্তি-নির্ভর মানবসমাজের নিয়ম পরিবর্তিত হইবে না কেন? এই পরিবর্তন ও বিবর্তনই তো মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। এক এক যুগে এক এক ভাব প্রবল হইয়াছে, কিছুদিন উহা মানব-মনে রাজত্ব করিয়াছে, মানবসমাজ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; কিছুদিন পরে আর এক প্রকার মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এক সময় মনে করা হইত ক্রীতদাস-প্রথা সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ; আজ মানুষ প্রশ্ন করে—ঐ প্রথা সত্যই কখনও সভ্যসমাজে ছিল কি না, থাকিলেও কি ভাবে ছিল!

বর্তমান পৃথিবীতে দুইটি ভাব রাজত্ব করিতেছে:

(১) শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি,

(২) রাজনীতিক গণতন্ত্র।

আমরা এই দুই ভাবের প্রভাবে বাস করিতেছি।

'শিল্প ইতিহাসকে রূপ দিতেছে'—ইহা এ যুগের ভ্রান্ত ধারণা। শিল্পের কাজ মানুষের সঙ্গে জড় পদার্থের কি সম্বন্ধ তাই স্থির করা। ইতিহাসের কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি—একটা শাশ্বত সত্য নয়।

ভাবের দিক হইতে স্বায়ত্ত শাসন, জাতীয়তা, গণতন্ত্র প্রভৃতি আদিম মানবের গোষ্ঠীভাবের পুরাতন আধারে নূতন সুরা,—'a sour forment of the new wine of democracy in an old bottle of tribalism.'

তাই টয়েনবী বলেন: ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে—রাষ্ট্র ও রাজনীতির নয়, সমাজ ও কৃষ্টির; শুধু তথ্য সংগ্রহ করিয়া নয় একটি ব্যাপক নিয়ম অনুসন্ধান করিয়া। ইতিহাস স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করিবে না, জীবনের পথ আলোকিত করিবে।

কোন দেশের ইতিহাস একটি যুগে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধ্যয়ন করা যায় না,—পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ এবং আগে-পাছে যুগসমূহ আপনা হইতেই আসিয়া যায়। অতএব দেশ ও কালের আয়ত ক্ষেত্রে (extended in time and space) ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে তবেই 'মানুষে'র রূপান্তর চোখে পড়িবে। কি ভাবে আদিম অমানব বা অর্ধমানব মানবে, এবং সামাজিক মানব অতিমানব বা মহামানবে রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার কাহিনীই তো ইতিহাস। সমাজের পটভূমিকায় এই রূপান্তর ঘটিতেছে, তাই মানুষের ইতিহাস মানে সমাজের ইতিহাস, কৃষ্টির ইতিহাস। সমাজ ও কৃষ্টি গড়িতেছে ভাঙিতেছে, ঘাত-প্রতিঘাতে রূপান্তরিত হইতেছে, বহিরাগত শক্তির আঘাতে তাহার গতিও পরিবর্তিত হইতেছে!

সভ্যতা কিভাবে কোথায় কখন আরম্ভ হইল, কেন মানুষ ৩,০০,০০০ বৎসর আদিম অবস্থায় ছিল, কেন গত ৬,০০০ বৎসরেই সভ্যতা এত বিচিত্র রূপে রূপায়িত হইয়াছে—টয়েনবী এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে মানব-মনের জড়তাই তাহার

উন্নতির পথ আটকাইয়া ছিল। কিন্তু কি সেই অজ্ঞাত শক্তি যাহার প্রেরণায় মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে ? সে শক্তি ঈশ্বরের না শয়তানের ? —দেবতার না অসুরের ? সে কি কোন বিশেষ রক্তের (race) শক্তি, না পরিবেশের (environment) প্রভাব ? হয়তো বিভিন্ন শক্তির টানাপোড়েনেই মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাহারও মতে যখন ও যেখানে জীবন সচ্ছল থাকে, তখন ও সেখানে সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠে। টয়েনবী একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'Ease is inimical to civilisation.' আরাম কখনও সভ্যতার প্রেরণা দেয় না, আরাম সভ্যতার শত্রু। শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়িয়া উঠে প্রজ্ঞার আলোকে। সকল সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয় না, অনেক সভ্যতা মধ্য পথেই থামিয়া যায়। কত সভ্যতা ভাঙিয়া যায়, লুপ্ত হয়। পরিবেশ জয় করিয়াই সভ্যতা গড়িয়া উঠে, এই জয়ের মধ্যেই আছে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব। সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা অনুন্নত মানুষদের সহিত ক্রীতদাসের মতো আচরণ। ইহাই বিজেতা ও বিজিত—উভয়ের পতন সূচনা করে।

টয়েনবীর সিদ্ধান্ত : উন্নতির জন্য প্রয়োজন—অন্তর্নিহিত শক্তির মুক্তি, এবং বাহির হইতে ভিতরের দিকে অভিযান—আত্মবিকাশের সাধনা। 'It is human individuals......that make human history'—ব্যক্তি-মানবই মানুষের ইতিহাস রচনা করে। এই ব্যক্তিমানব মহামানব। সভ্যতা তাই সৃজনশীল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কীর্তি।

এই সৃজনশীল ব্যক্তি প্রথমে সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যান, শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিজে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসেন, এবং সমাজকে রূপান্তরিত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি বহুবার হইয়াছে এবং হইবে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ ও গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনে এই সত্য প্রমাণিত।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা একদিন এক শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছে, আবার আর এক শ্রেণীর মানুষকে স্তম্ভিত করিয়াছে, তাঁহারা অপেক্ষায় ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যার ; সে ব্যাখ্যা আজও হয়তো আসে নাই। তবে টয়েনবী ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা বুঝিতে শুরু করিয়াছি—ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা বা যে কোন মতানুযায়ী ব্যাখ্যা আংশিক সত্য, অন্ধের হাতী-দর্শনের ন্যায়। যে কোন মতবাদ অপেক্ষা মানুষ বড়, মানুষই প্রয়োজনের খাতিরে মতবাদের বেড়া বাঁধে। প্রয়োজন ফুরাইলে মানুষই জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া দেয়, যদি না ইতিমধ্যে সে বেড়া নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে।

* * *

ঐতিহাসিকের এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিরন্তন 'মানুষ'কে বুঝিতে হইবে, তবেই আমরা পারিব তাহার বর্তমান সমস্যাগুলির স্বরূপ বুঝিতে ও তাহার সমাধান করিতে। মানুষ যুগে যুগে বিপন্ন হইয়াছে, এবং যুগে যুগে সে নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। মহাবন্যা (deluge) তুষার-বিস্তার (glacial extension) প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই ; বন্যজন্তু এবং রোগ-মহামারীর সহিত সংগ্রামেও মানুষ জয়ী হইয়াছে, কিন্তু আজ মানুষের সর্বনাশা বিপদ উপস্থিত মানুষ হইতেই ! অতীতে বহু বার দেখা গিয়াছে --অনুরূপ বিপদ হইতে মানুষ নিজেকে রক্ষা করিবার শক্তি ও বুদ্ধি লাভ করিয়াছে শেষ মুহূর্তে, এবারও তাহাই হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই যুগের নূতন বিপদ আণবিক শক্তিজাত অস্ত্র-শস্ত্র ! এই দ্বিমুখী সংহার-শক্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভুলিতে

হইবে, মানব-জাতিকে এক ও অখণ্ডভাবে দেখিয়া সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। স্থানীয় সীমাবদ্ধ দেশপ্রেমের পরিবর্তে আজ বিশ্বমৈত্রীর কথা ভাবিতে হইবে, তবেই এক বিশ্ব-শাসন-সংস্থার মাধ্যমে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। উহাকে পারস্পরিক ধ্বংসে ব্যয়িত না করিয়া সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে।

কিন্তু কিভাবে? ইহা কি জোর করিয়া, এবং আর এক ঊর্ধ্বতন শক্তিশালী সামরিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, না যথার্থ কল্যাণবোধের প্রেরণায়? এই কল্যাণবোধ জাগ্রত করিতে হইলে প্রয়োজন রাজর্ষি অশোকের মনোভাব, যিনি যুদ্ধের ব্যর্থতা বুঝিয়া স্বীয় বিপুল রাজশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন মানুষের মন হইতে অনিষ্টসাধনবৃত্তি দূরীভূত করিয়া বিশ্বব্যাপী এক মৈত্রীভাব প্রচার করিতে; সে প্রচারে ছিল না কাহারও প্রতি উষ্মা বা অভিযোগ, সে প্রচারে ছিল শুধু করুণার বার্তা, আর ছিল তাহারই সহায়ে উন্নততর মানুষ হইবার আবেদন। একদিন যে মৈত্রী-করুণার বাণী এশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল, আজ তাহাই ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে আচরিত হইবার দিন আসিয়াছে।

আমরা যদি আজ যুদ্ধকে শেষ না করি, যুদ্ধই আমাদিগকে শেষ করিবে। এই সেদিন যেমন মানুষ ক্রীতদাস-প্রথা দূরীভূত করিয়াছে, এখনও বর্ণ-বিদ্বেষ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই প্রকার উদ্যম ও আদর্শবাদ লইয়া আজ যুদ্ধ দূরীভূত করিতে হইবে। যুদ্ধ ব্যতীত যে সীমান্ত-সমস্যার সমাধান সম্ভব—সে আদর্শ অভিজ্ঞ ভারতবর্ষই দেখাইবে, টয়েনবী এইরূপ আশা পোষণ করেন। ভারত যদি এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতে না পারে, তবে পৃথিবীর দুর্দিন এবং সভ্যতা পিছাইয়া যাইবে। এই আণবিক যুগের পৃথিবীতে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন দেশ বা জাতি এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম।

একদা ছিল প্রতিবেশীর গরু বাগানে প্রবেশ করিলে হত্যাকাণ্ড বাধিয়া যাইত, গ্রামের লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিত। একদিন ছিল উহা বীরত্ব, আজ উহা অপরাধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের ব্যবহার আজ অনুরূপ দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন—কেন্দ্রীয় শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক কোন বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থা, যাহার দরবারে উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রুত হইবে এবং যাহার বিচার উভয়েই মানিতে বাধ্য থাকিবে। এইরূপ প্রচেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আদর্শ হইতে তাহা এখনও অনেক দূরে। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপরই আগামী যুগের শান্তি নির্ভর করিতেছে। লীগ অব নেশনস্ ব্যর্থ হইয়াছে, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ (U.N.O.) টলমল করিতেছে;—ইহাকেই কি বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থায় (World Government) রূপান্তরিত করা সম্ভব? না বিশালতর ভিত্তির উপর—উদারতর নীতির উপর সেই কল্যাণ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে?

জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ভারতবর্ষ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বদ্রষ্টা ভারতীয় মনীষা, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘাত-প্রতিঘাত হইতে সগৌরবে উত্তীর্ণ ভারতীয় জনতা স্বীয় অভিজ্ঞতা দিয়া সাধনা দিয়া আজ পৃথিবীর এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

শুধু ভূগোলের দিক দিয়াই ভারত পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, ভাব-জগতেও ভারত আজ দুই বিরোধী বিবদমান ভাবের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; তাহারই হস্তে ভবিষ্যতের শক্তির তুলাদণ্ড (balance of power) দোদুল্যমান।

চলার পথে

'যাত্রী'

সামনেই ঈষ্টার। ক্রুশে মৃত্যুর পর তিন দিন কবরে থেকে, নবজীবনের দীপ্তি নিয়ে যীশু সেই মৃত্যুময় অন্ধকার কবর থেকে এই সময়েই উঠে এসেছিলেন, পৃথিবীতে আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করতে। যীশু-জীবনের সেই ঘটনাকে ঘিরেই আজ মনে নানান কথার 'ফুট' উঠছে।

প্রতিটি খৃষ্ট-ধর্ম-মন্দিরেই ঐ তিন দিন ধ'রে নানান আনুষ্ঠানিক উৎসবের বান ডাকে। এবং শেষের দিন রাত্রিশেষে, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর চার্চ-বেদীর বামদিকে রক্ষিত প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ মোমবাতিটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই মোমবাতিটি পুনরুত্থিত খৃষ্টের আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতার প্রতীক। মোমবাতিটি প্রজ্বলিত হওয়ার পরেই চার্চের পুরোহিতগণের সমবেত কণ্ঠে যে গীত অনুরণিত হ'য়ে ওঠে তা একদিক থেকে যেমন করুণ, অন্যদিক থেকে তা আবার ভাবব্যঞ্জক ও প্রাণস্পর্শী। গানটির মর্মার্থঃ 'জাগো, ওগো স্বর্গের দূতবৃন্দ! ওঠ, আনন্দ কর। তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত ঐ আধ্যাত্মিক রহস্যময়তাকে আহ্বান জানাও। দেখ, ঐ মহাবিজয়ী রাজা (যীশুখৃষ্ট) এসেছেন। ভেরীনিনাদে তাঁর মুক্তির বার্তা দিকে দিকে প্রচার কর। হে পৃথিবী, তোমার কি সৌভাগ্য! তুমি এখন এক উজ্জ্বল স্বর্গীয় দ্যুতিতে অবগাহন করতে পারছ। এখন তো তোমার আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠার কথা। হে পৃথিবী, দেখ দেখ, ঐ আলোর রাজা তোমাকে কেমন এক ভাস্বর আলোকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। ওগো পৃথিবী, তুমি বিশ্বাস করো—আজ থেকে মানব-মনের সকল অন্ধকারই হবে দূরীভূত।' * * * এর পরেও সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক কার্যাদির পর সকলে যখন চার্চের বাইরে আসেন, তখন দেখতে পান, বসন্তের হাস্যময় সূর্য পৃথিবীর সকল অশুচি মুছিয়ে তাকে জ্যোতির বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারের পর হঠাৎ এই আলোর পরশে প্রত্যেকের মনটিই এক অন্তর্মুখী ভাবব্যঞ্জনায় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

মৃত্যুর পরেও যীশুর এই পুনরুত্থান—অনেক বাস্তববাদীই 'আজগুবি' ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু তা চাওয়ার আগে, এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। অন্ধের মৃগয়া গমনের মতো এক নিছক অলীকত্ব দিয়ে এ তৈরী হয়নি। এর মধ্যে সত্যই লুকিয়ে রয়েছে—জীবনের একটি নিখুঁত ছবি, যা জীবনের সত্যকার রহস্যকে প্রকাশ ক'রে তোলে।

গাছে বীজ হ'ল, পাকল, এক সময়ে তা আবার পৃথিবীর বুকে ঝরেও পড়ল। এবং সেখানে মাটির কবরে প্রবেশ ক'রে মৃত্যুর আবেশ মেখে তা ঘুমিয়ে রইল কিছুদিন। কিন্তু সে কি সত্যই ঘুম? তার মাঝে কি সত্যই সমাপ্তি ধ্বনিত হ'ল? তা তো নয়। সেই বীজের আবার ঘুম ভাঙে। সে আবার উত্থিত হয়। ফুলে ফলে পত্রে সে তার সবুজের ডালি সাজিয়ে দিয়ে, আমাদের চোখের সুমুখেই তার জীবনতরঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিকশিত হয়—সে আবার বাঁচে। চিরকালের এই রূপকটিকেই মানুষ আবহমান কাল ধ'রে নানান প্রতীক দিয়ে সাজিয়েছে—ধর্মের রাজত্বেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

নদীর জীবনেতিহাসও তাই। সে তার পর্বত-কেন্দ্রে জন্ম নিয়ে তার সকল জলভার সাগরের বুকে মিশিয়ে দিতে ছুটে এল। সে তার চলার পথের চারিদিকে, ঊষর মাটিতে সবুজের প্রাণ স্পন্দন দিল জাগিয়ে। তার পরে বহু-ব্যাকুলতায় একদিন সাগরে এসে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দিল। এইখানেই কি তার পরিসমাপ্তি? এইখানেই কি ঘটল মৃত্যু? তা তো নয়। নদীর এই বিলিয়ে-দেওয়া জলভারই একদিন আবার সূক্ষ্মদেহে বাষ্পাকারে হ'ল পুনরুত্থিত এবং তা মেঘের ভেলায় ভেসে এসে নদীর সকল অবদানকেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল নদীর উৎস মুখের সেই পর্বত-পিতাকেই।

প্রজাপতিও তার স্বাধীনতার রঙীন ডানা মেলার পূর্বে, কীটাবস্থায় অনেক দিন ধ'রে জড়ত্বের মৃত্যুময় নিস্পন্দতায় ডুবে থাকে। তার সেই মৃত্যু-ঘুমই একদিন জীবনের প্রাণোচ্ছলতায় উপচে পড়ে। আরও কত প্রাণী তাদের শীত-ঘুমের মাঝে মৃত্যুর নির্জীবতা টেনে আনে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাদের ঘুম ভাঙে—কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাদের ঐ কিছুদিনের নিষ্ক্রিয়তাই প্রাণ-প্রাচুর্যের শক্তি জোগায়। নিস্পন্দ ডিম্ব-কবর থেকেই একদিন জীব তার প্রাণময়তাকে আবিষ্কার করে। এই ভাবে সর্বত্রই শ্রম-বিশ্রামের, জীবন-মরণের তরঙ্গায়িত উত্থানপতনের নয়নাভিরাম লীলা।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বাসেও এই ভাবটি স্থান পেয়েছে। সেখানেও শক্তির দুটো রূপ—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। একই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আপাত মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে তখন তাকে আমরা বলি নিহিত শক্তি (potential energy)। সেইটেই আবার একসময়ে স্পন্দনোন্মাদনায় নেচে ওঠে। তখন আর থাকে না কোন মৃত্যুর ইঙ্গিত, মরণের ছায়া। তখন সে জীবন্ত! কর্মমুখর। দামাল ছেলের ছিটকে পড়া শক্তিতে ভরপুর—সে তখন সক্রিয় শক্তি (kinetic energy)। শক্তির এই আপাত মৃত্যুরূপ এইভাবেই প্রাণের আহ্বানে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

আলোহীন অন্ধকূপেই আমরা চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুতের প্রখর আলোক সৃষ্টি করি। নিষ্প্রাণ কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষেই একদিন প্রাগৈতিহাসিক মানব অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তুলেছিল জাগিয়ে। শুধু তাই নয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আলো-আঁধারের চিরন্তন লীলার পথেই—জীবনমৃত্যুর চিহ্নিত পথেই সৃষ্টি-চক্র চলেছে আগিয়ে। শীতের ঝরাপাতার পরে ঐ পত্রহীন মৃত্যুঘেরা শুষ্ক ডালেই আবার বসন্তের ছোঁয়া লাগে। পাতা গজায়। ফুল ধরে। ফল পাকে। পাখী আসে, গান গায়।—এক কথায় জীবন-সৌন্দর্যের ঝলক লাগে।

এই ভাবেই মৃত্যুর পরেও নবজীবন নিয়ে বেঁচে উঠতে দেখি যীশুকে। তাঁরও আগে ওসিরিসকে (Osiris), র-কে (Ra), তাম্মুজকে (Tammuz), এ্যাডনিসকে (Adonis), তারপর এদেশেও দেখি নচিকেতা ফিরে আসছে যমলোক থেকে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ী। কাব্যে ও সাহিত্যে দেখি ফিনিক্স্ (Phœnix) পাখি মৃত্যু-ভস্ম থেকে দুঃসাহসিক অন্বেষা নিয়ে জেগে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর এই অনন্ত চক্রে আমরা অমরত্বকেই স্বীকার করি। আধ্যাত্মিকতার রাজ্যেও জীবনের জয়গান সর্বাগ্রে। সেখানে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী, সেখানে মৃত্যু নেই—থেমে যাওয়া নেই। আছে কেবল, চলা আর চলা—'চরৈবেতি।'

চল পথিক। আমরাও মৃত্যুর নিস্পন্দতাকে অস্বীকার ক'রে আমাদের মধ্যকার সেই অনন্ত জীবনকে করি জাগ্রত। আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যকে খুঁজে বার করি চল। জড়ত্বের কবর ভেঙে আমরাও চৈতন্যের আলোকে জেগে উঠি চল। চল—সেই জাগরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরাকালের ঋষিদের মতো বলি—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে আমি দেখেছি। অন্ধকারের পরপারে সেই জ্যোতির্ময় মহান আত্মাকে আমি জেনেছি। চল পথিক। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই অমরত্বকে পাবার আগ্রহে এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

গাহি বুদ্ধের জয়

ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য

মানুষের লাগি মানুষের ঘরে
এসেছিলে মহাপ্রাণ!
রাজসুখ তুমি তুচ্ছ করিলে
লভিতে চরম জ্ঞান।

জরা মৃত্যু ও ব্যাধির কবলে
দিন দিন মরে যারা,
শুনালে তাদের নির্বাণ কিসে,
মুক্তি লভিল তারা।

দুঃখ-সুখের কারায় যাদের
জীবন কাটিয়া যায়,
তোমার অভয়-মন্ত্রে তাহারা
নির্বাণ পানে ধায়।

দেশে ও বিদেশে ধ্বনিল তোমার
মৈত্রীপ্রীতির বাণী।
পূজিল তোমারে প্রজাসাধারণ
পূজিল রাজা ও রাণী।

অমৃতত্বের সন্ধান দিলে
মর্ত্য মানবগণে,
দেবতার চেয়ে উচ্চ আসন
পেয়েছ তাদের মনে।

লক্ষ লক্ষ ভক্ত আজিকে
গাহিছে তোমার জয়।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহি বুদ্ধের জয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনিবার্য কারণে 'শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদ' প্রবন্ধের শেষাংশ বর্তমানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। উঃ সঃ।

নববর্ষে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আপ্তপুরুষেরা ডাকে বন্ধু ! মহাপুরুষের মনে,
শ্রেয়কে আশ্রয় করি' সূর্যোদয় হের চিত্তাকাশে।
দূর কোন্ দিগন্তের পার হ'তে দৈবী সুর আসে,
তাহারি ঝঙ্কার ওঠে দিকে দিকে নব জাগরণে।
আবির্ভাব লগ্ন কার ? শুভ বার্তা ল'য়ে শঙ্খ বাজে,
মহত্তম জীবনের সম্ভাবনা-বীজ হের কাছে।

মৃত্যুর তোরণদ্বারে অমৃতের এসেছে আহ্বান,
বর্ষের প্রথম দিনে আনন্দের সমারোহে নব।
প্রাণময় রহস্যের আবরণ খুলে শক্তি লব,
সংসার-তরঙ্গ দোলে, এসো বন্ধু ! করি তীর্থস্নান।
অন্তরের দুর্বলতা হোক নির্বাসিত—মন মুখ
করো এক, ভাগবত সাধনায় পেতে দাও বুক।

আগামী দিনের নীড়ে যে বিহগ বসিবে একদা,
তাহারি কূজনধ্বনি কোথা যেন শুনিয়া সহসা
স্বতন্ত্র হয়েছে মন ! যন্ত্রযুগে পরম ভরসা
অগ্নিযজ্ঞে প্রেমাহুতি, 'কথামৃত' হৃদে রাখি সদা।
জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব—ভস্মাবৃত রণবহ্নি রহে,
তারি মাঝে রামকৃষ্ণ-করুণার ফল্গুস্রোত বহে।

ঔদ্ধত্যের পথে পথে দীন ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু
মাধুকরী করিছে প্রেমের, জীর্ণ কটিবাস পরি';
ঐশ্বর্যেরে করিয়া কাঙাল নিখিলের অধীশ্বরী
লীলাসহচরী গুণ্ঠিতা ব্রাহ্মণীরূপে ! কবি তবু
চেয়ে আছ বিশ্ব পানে নববর্ষে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ?
আনন্দে বন্দনা গাও আজিকার নূতন সৃষ্টিতে।

করুণাঘন অমিতাভ

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

আড়াই হাজার বছরেরও সামান্য কিছু বেশি হ'ল—এই ভারতেরই একটি কোণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ। সেদিন ছিল বৈশাখমাসের পূর্ণিমা। লুম্বিনী বনে পাদচারণা করছিলেন পূর্ণ-গর্ভা মায়াদেবী; সেইখানেই সেই পুণ্যবতী জননীর কোলে নেমে এলেন ভগবান তথাগত। অনন্তকালের বুকে অসীম পুণ্যের এক চিরন্তন স্বাক্ষর।

সেই আবির্ভাবের মধ্যে একটু অলৌকিকতা ছিল। গর্ভধারণ করার পূর্বে শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখেছিলেন মহারাণী। শুভ্রোজ্জ্বল সত্যের বাহক ও প্রচারক হ'য়ে এই জগতে তিনি আসবেন ব'লে হয়তো এই স্বপ্নের প্রয়োজনও ছিল। দীপ্তোজ্জ্বল সূর্যের মহা আবির্ভাবের পূর্বক্ষণে উষার রক্তিম আভাস ফুটে ওঠার প্রয়োজন আছে। সেই মহিমময় উদার অভ্যুদয়কে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে মনের দিক দিয়েও কিছুটা প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হয়; তা না হ'লে পূর্ণজ্যোতির বহু-ব্যাপ্ত বিচ্ছুরণকে সম্যক্‌ভাবে বোঝা যায় না। মহারাণী হয়তো সেই অচিন্তনীয় স্বপ্নের কথা ভেবে স্নিগ্ধনয়নে একবার চেয়েছিলেন পুত্রের মুখের পানে,—কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য! একবার পরম তৃপ্তিতে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সেই যে চোখ বুজেছিলেন, আর তাকাতে পারেননি। জগতের বুকে সিদ্ধার্থকে এনে দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন তিনি। সমগ্র জগৎ চেয়ে রইল তাঁর সেই লোকোত্তর পুত্রের মুখপানে।

সমগ্র জগৎ আজও চেয়ে আছে সেই পুণ্যজ্যোতি মুখের পানে। সেই অনন্ত অভয় হাসিভরা মুখ কেমন ক'রে বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছিল বাণাহত হংসটির দিকে চেয়ে,—হলকর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন সহস্র কীটপতঙ্গের দুর্দশা দেখে কেমন ক'রে পদ্মআঁখিদুটি অশ্রুতে ভ'রে উঠেছিল, নিখিল ধরণী একধ্যানে আজও তা তাকিয়ে দেখছে। আরও বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে দেখছে—দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারী এক রাজবংশীয় তরুণ কেমন ক'রে ফেলে যাচ্ছেন অপরিমিত ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও নবজাত পুত্রকে, কেমন ক'রে মুণ্ডিতমস্তক সেই নবীন সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ফিরছেন। জগতের মনগুলিকে ত্যাগের বাণী দিয়ে ফিরাতে চাইছেন যেন! জগৎ আজও দেখছে, কেমন ক'রে তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিচ্ছেন। দেবতার উপাসনায় নয়, নৈতিক অনুশাসনে শাসিত করছেন জগতের মনগুলিকে। প্রেম-ভালবাসার মধ্যে যে মহাকল্যাণের পথ, সেই পথে এগিয়ে যেতে বলছেন সকলকে। সত্যের দ্বারা জয় করতে বলছেন মিথ্যাকে, চিত্তকে আত্মতুষ্টির দোষ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সার্বিক মঙ্গলব্রতে আত্মনিয়োগ করতে সকলকে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্যেই বিশ্বকবি তাঁকে বলে-ছেন 'করুণাঘন'!

যে শিশুরূপের স্নিগ্ধ জ্যোতিকে একবার মাত্র দেখে মহারাণী চোখ বুজেছিলেন, সেই শিশুরই পরিণত রূপের স্থির প্রসন্নতাকে শত শত ভাস্কর নিজ হৃদয়ের ধ্যান দিয়ে বুদ্ধমূর্তিতে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। সমগ্র জগৎ আজ তা দেখছে—দেখছে করুণাময় রূপের অভয় জ্যোতিঃপ্রবাহকে।

পতিতা আম্রপালিরও কাছে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমি এসেছি'। এই আগমনের যে অভয়বাণী, তা জগতের কানে না এসে কি যায়?

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে একদিকে হৃদয়ের স্বীকৃতি, আর একদিকে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। সূক্ষ্মতম দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে প্রজ্ঞা-নয়নের উন্মেষ তাঁর। ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি। নিখিল নরনারীর মনে শান্তি বর্ষণের কল্যাণ-ব্রত তাঁর জীবনে। আত্মাকে সমুন্নতির পর্যায়ে উন্নীত করার জীবনচর্যার সঙ্গে ত্যাগের গৈরিক বাসকে বেঁধে রেখেছেন তিনি। ক্ষুদ্র সুখ ত্যাগ ক'রে যদি বৃহৎ সুখের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে যাঁরা প্রাজ্ঞ, তাঁরা সেই বৃহৎ সুখের পানে ধাবিত হন। তিনিও সেই বৃহত্তর সুখের পানেই ধাবিত হয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর উপলব্ধি, এইখানেই তাঁর বুদ্ধত্ব।

মানবের ধর্মজীবনকে ঘিরে রেখেছে সুন্দরের ধ্যানচিন্তা ও তার সান্নিধ্যের নিবিড়তা। কারণ যা সত্য, তাই তো সুন্দর! বুদ্ধদেবের ধর্মে 'ঈশ্বর'নামের উচ্চারণ নেই, কিন্তু ঈশ্বর যদি সত্য-শিব-সুন্দর হন, আনন্দস্বরূপ এবং অমৃতের ধ্যানসত্তা হন, তবে তাঁর বাণীতে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। যদিও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব থেকেই বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের জন্ম, তা হলেও তাঁর ধর্মের প্রধান যে ভাব 'জীবে দয়া'—তা তো বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যব্রতী ও সুন্দরের পূজারী বুদ্ধদেবের কথায় এই পুণ্য-বাণীই বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।' উপনিষদে সূক্ষ্মতর ব্রহ্ম ও আত্মার আলোচনা আছে—তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লিপ্ত হয়েছিল কতকগুলি শুষ্ক আচার ও আচরণে। বাহ্য বৈদিক ধর্মাচরণ সত্ত্বেও সে যুগে বেশ কিছু নৈতিক অবনতিও ঘটেছিল। বুদ্ধদেব তাই যে জীবন-বেদ প্রচার করলেন, তাতে নৈতিক অনুশাসনই সবচেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিল। সমস্ত মানবের মধ্যে মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রে 'মৈত্রেয়'-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা তাই তাঁর আত্মিক বাণীতে উজ্জ্বলতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাই বুদ্ধদেবের চরণোপান্তে যখন প্রণত হন ভক্ত, তখন মনে হয় তাঁরা সত্যকে, সুন্দরকে এবং সত্যের নীতিগত অনুশাসনকেই আন্তরিক প্রণতি নিবেদন করছেন।

একবার ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দ মহাস্থবির নাগসেনকে তপশ্চর্যার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। নাগসেন তার উত্তরে বলেছিলেন, তপশ্চর্যায় বর্তমান দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে, আর ভাবীকালে কোন দুঃখের উদ্ভব হয় না। এই জাগতিক দুঃখের অনুভবের বাণীই ভগবান বুদ্ধের পরমতম দান। তিন শত বছর পরে এক রাজসন্ন্যাসী ভারতের বুকে স্তম্ভে স্তম্ভে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিলেন এই পুণ্যবাণী; আর সমগ্র জগতের লোক সেই পুণ্যবাণী হৃদয়ে ধারণ ক'রে অনন্তকালের বুকে প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধমূর্তি—আর বলে, হে অনন্ত পুণ্য! সঙ্গীত বেজে ওঠে আকাশে:

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

বুদ্ধ-বাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

দণ্ডকে ভয় সকলেই করে,
প্রাণ প্রিয় সবাকার,
নিজের বেদনা স্মরি কাহারেও
আঘাত দিও না আর।

বৈরিতা দিয়ে বৈরিতার কি
হয় কভু নিরসন?
অবৈরিতায় শান্ত বৈরী,
—ধর্ম এ সনাতন।

শত্রু তোমারে যদি দেয় ব্যথা
কখনো চিত্ত মাঝে,
ক্রোধ-বশীভূত হও কেন তাহে?
—দুঃখ কেন বা বাজে?

তোমার শীলেরে সমূলে বিনাশে—
পোষিছ কেন সে ক্রোধ?
হৃদয়ে তোমার কেন বা জাগাও
এই মূর্খতা-বোধ?

অন্যে যখন করিবে কর্ম—
গর্হিত নিন্দিত,
তুমি হও যদি তখন ক্রুদ্ধ
কিংবা ব্যথিত-চিত,

তবে কেন কর সে হেন কর্ম?
—নিজেরে দুঃখ দাও?
ক্রোধোন্মত্ত দুঃখে নিজেরে
পীড়িতে কেন বা চাও?

ক্রোধান্ধ তব শত্রুরা যদি
কুপথ বাছিয়া লয়,
তুমি কেন কর সে পথে গমন?
কেন ক্রোধ উপজয়?

*　　*　　*

জননী যেমন নিজ পুত্রের
জীবন করিতে ত্রাণ,
প্রয়োজন হ'লে দেন বিনিময়ে
আপনার প্রিয় প্রাণ,—

সকল প্রাণীর সহিত তেমনি
মৈত্রীর ভাব লহ,
হও অবাধিত বৈর-বিহীন,
হিংসা-শূন্য রহ।

স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-বিরহিত হও
নিখিল জীবের প্রতি,
চলিতে ফিরিতে শুইতে বসিতে
হও কল্যাণ-ব্রতী।

ঊর্দ্ধ্ব ও অধ—চারিদিক ভরি
ব্রহ্ম-বিহার করো,
সারা বিশ্বের কল্যাণ লাগি',
মহান জীবন ধরো।

সাহিত্যের ধর্ম

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শীতের সকালে এক ঝলক সোনার রোদ আঁচল বিছিয়ে দিল বারান্দায়। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রকৃতির মুখে কৌতুকের হাসি। যে মাধবী লতাটি আমার দরজার গা বেয়ে জড়িয়ে গেছে সে যেন তার ভীরু মাথা দুলিয়ে বললে, 'এসেছে, সে এসেছে'।

যাকে পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলাম, সতৃষ্ণ নয়নে আকাশ-সীমায় তাকিয়ে যার উদ্দেশ্যে বার বার আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছিলাম এবং আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অশ্বত্থ-শাখার ঘুঘুপাখীটিও যাকে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, অবশেষে তার আবির্ভাব-বেদনায় পূব-আকাশটা লাল হ'য়ে উঠল। সে এল। ভুবন-মন ভুলিয়ে মনোহরণ বেশে সে এল।

তাকে পেয়ে আমার চোখের দুটি তারা হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আমার মন-ময়ূরী যেন পাখা ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ নাচতে শুরু ক'রে দিল। আনন্দ—আনন্দে আমার হৃদয় মাতাল হ'য়ে গেল। আমি সেই আনন্দকে ধ'রে রাখলাম কালি-কলমের আলপনায়। আমার হৃদয়ে যা ছিল অনন্ত, আমি তাকে সান্তের বেড়ায় আটকে দিলাম। আলপনায় আটক সেই আনন্দকে যে কোন সহৃদয় জনই যে কোন সময় সমানভাবেই উপভোগ করতে পারেন।

কিংবা এও হ'তে পারে, আমার চোখে যা ছিল একদিন আকাশের ফেরারী মেঘ, আমি হয়তো তাকে মনের আনন্দে ঘড়ায় ভরে ঘরে তুলে রেখেছি। এখন কোন তৃষ্ণার্ত পথিক যদি সেই জল পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে চান, তা হ'লে তিনিও সমান ভাবেই আমার আনন্দের অংশীদার হবেন। আমার ভালো লাগার সঙ্গে তখনই তাঁর 'সহিতত্ব' জন্মাবে।

এমনি করেই দু'টি মনের সেতু সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। এই সেতুর নামই সাহিত্য। সাহিত্য হ'ল সহৃদয় হৃদয়-সংবাদ। এ সংবাদ এক মনের সঙ্গে আর এক মনের 'সহিতত্ব' জন্মায়। একের ভাবনা আর একটি সমব্যথী মনে তরঙ্গ তোলে। আবার কেউ কেউ সাহিত্যের অন্য ব্যাখ্যাও করেন। তাঁরা বলেন: সহ হিতেন= সহিত,+ষ্ণ্য প্রত্যয় ক'রে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।—অর্থাৎ যা হিত সাধন করে তা-ই সাহিত্য। এ কার হিত? সমাজের হিত। 'সাহিত্যে'র এ ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে সাহিত্যের পেছনে একটি উদ্দেশ্য আরোপ করতে হয়। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই নয়, শুধু আনন্দ পরিবেশনের জন্যই নয়; এ ছাড়া সাহিত্যের আরও একটি কাজ আছে। সেটি হ'ল সমাজের হিতসাধন।

আমার মনে হয় এই দুই মতের মিলনেই সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক সমাজসংস্কারক নন; মুখ্যতঃ তিনি শিল্পী। তাঁর উদ্দেশ্য সৃষ্টি। তবে এই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি জীবনের কথা বলেন, সমাজের কথা বলেন। কথার সঙ্গে কথা মিশিয়ে তিনি অশ্রু-হাসির অনেক মালা রচনা করেন। সেটা হ'ল সাহিত্যিকের কাছে সমাজের উপরি পাওনা। তিনি সমাজের হিতের কথা বলেন, কিন্তু সে

কথাকে তিনি সুন্দর ক'রে বলেন। এই সুন্দর ক'রে বলাটাই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য।

তবে সাহিত্যকে কখনও শুধু মাত্র স্বপ্ন-বিলাসী মনের অবকাশের ফসলরূপে গণ্য করা যায় না। সাহিত্য জাগ্রত মনের অতন্দ্র স্বাক্ষরে চিহ্নিত। জীবনকে সার্থক ভাবে, সহৃদয় চিত্তে অনুধাবনই সাহিত্যিকের কাজ। এই জীবন-বোধই সাহিত্যের আসল কথা। সাহিত্যিকের তৃতীয় নয়ন যে ভাবে জীবনকে দেখে, সাধারণ মানুষ জীবনের সেই গভীর প্রদেশের সন্ধান রাখে না। আর রাখলেও তা প্রকাশ করবার যোগ্য ভাষার বাহন খুঁজে পায় না। সাহিত্যি-কের হাতে রয়েছে সেই ভাষার জাদু, যা মানব-জীবনের সেই গোপন কথাকে বাঙ্ময় ক'রে তোলে। সাহিত্যিকের এই দৃষ্টি আসে সহানু-ভূতি থেকে। জীবনের জন্য, মানুষের জন্য, সমাজের জন্য এই সহানুভূতির টানে সাহিত্যিক কখনও বা দুঃখে, কখনও বা আনন্দে জীবনের কথাচিত্র রচনা করেন। জীবনের প্রতিটি দেখা জিনিষ, প্রতিটি চেনা ঘটনা সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকষে যাচাই ক'রে, অনুভূতির রঙে রঙীন ক'রে, অভিজ্ঞতার রসে জারিত ক'রে সাহিত্যে রূপায়িত করেন। এই জীবন অন্বেষণ ও সহানুভূতিই সাহিত্যের মূল কথা।

সাহিত্যের জন্মলগ্ন আজও নির্ধারিত হয়নি। আর তা হওয়া সম্ভবও নয়। লিখিত সাহিত্যের আদি আছে। কিন্তু অলিখিত সাহিত্য যে অনাদি। সে সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে রচিত। আমাদের স্মৃতি-শ্রুতি তারই পরিচয় বহন করছে। ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্য হ'ল ঋগ্বেদ। ভারতাত্মার আনন্দ-ঘন কল্যাণবাণীর প্রথম বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছে ঋগ্বেদে। তারপর উপনিষদ্। তারও অনেক পরে মহাকাব্যের যুগ। মানুষের জীবন-সমস্যা নানা ভাবে রূপায়িত হ'য়েছে আমাদের দুই মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথটিও প্রায় এমনি।

এবারে প্রশ্ন হ'ল সাহিত্যের ধর্ম কি? সাহিত্যের ধর্ম হ'ল জীবনকে প্রকাশ করা। এ জীবন কোন খণ্ড জীবন নয়, এ জীবন বিশ্ব-জীবন। এই বিশ্বজীবনকে জানার আগে চাই নিজেকে জানা। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা নিজেকে জানো—এ বাণী পুরানো কালের। বর্তমানে এর সঙ্গে আরও একটি শ্লোগান যোগ হয়েছে,—পরিবেশ ও প্রতিবেশীকে জানো। এই ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বমানবের যোগ যে সাহিত্যে যত গভীর, সে সাহিত্য তত সার্থক। জীবনের অখণ্ড রূপই সাহিত্যের বিষয়বস্তু।

প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির জন্যই চাই গভীর অধ্যবসায়, নীরব প্রস্তুতি। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিন্দুমাত্র খ্যাতির প্রত্যাশা না রেখে মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য এই নেপথ্য প্রস্তুতির সময়েই সাহিত্যিক জীবনকে দেখেন, জীবনকে ভালবাসেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তখন সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সাহিত্য তাই জীবনকে আলিঙ্গন করে, তাকে গ্রহণ ক'রে তাতে নিজের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলে। জীবন সম্পর্কে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীই সাহিত্যকে সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে, তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে চিরকালের বিষয়বস্তু ক'রে তোলে। সাহিত্যে নেতি-বাদ অচল। প্রত্যয়ই সাহিত্যকে জীবনের সহযোগীরূপে বাঁচিয়ে রাখে। কেবল অস্বীকার, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা দ্বারা জীবনকে জানা যায় না, বুঝা যায় না। হুইটম্যানের লেখা ক'টি লাইন মনে পড়ে :

> I am not the poet of goodness only,
> I do not decline to be the poet of
> Wickedness also.

—আমি শুধু সদ্‌ভাবের কবি নই, অসদ্‌ভাবেরও কবি হ'তে আমি নারাজ নই। শুভ এবং অশুভ, সুন্দর ও অসুন্দর উভয়ের মধ্য থেকে এক মহত্তর কল্যাণকে বের ক'রে আনাই শিল্পীর কাজ, এটাই সাহিত্যের দায়িত্ব। সাহিত্যে শুধু মাত্র শুদ্ধাচার কিংবা নীতিবাগীশদের প্রভুত্ব চলতে দিলে তাকে শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রাণ রসহীনতায় পর্যবসিত করা হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার, সাহিত্য 'পর্নোগ্রাফি' বা 'ফটোগ্রাফি' নয়। Art lies in concealment—কোন শিল্পীরই এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি, বেদনারও। জীবনের সপ্তবর্ণ রামধনুর রং লেগেছে সাহিত্যে। তাকে একদেশদর্শী হ'লে চলবে না। সমগ্র জীবন, জীবনের অন্তর্বেদনা, তার আকাশ-চারী মন—সব কিছুই আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। সাহিত্য জীবনের পরিপূরক,—জীবনের দর্পণ। এ দর্পণে সুন্দরের প্রতিফলন যেমন সত্য, অসুন্দরের প্রতিভাসও তেমনি বাস্তব। সেই অসুন্দরের মধ্যে সুন্দর, অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ কামনাই সাহিত্যের ধর্ম।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যে শ্রেণীবাদের কথা বলছেন। তাদের মতে সাহিত্যের কারবার হ'ল ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। তাঁদের কাছে সাহিত্য হ'ল সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার। তাঁরা বলেন, যে যুগে যে শ্রেণী প্রতাপশালী হ'য়ে উঠেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, সে যুগে সে শ্রেণীই সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। সে যুগে তারাই হয়েছে সাহিত্যের কুশীলব। এ যুগে ইতিহাসের গতি যখন মোড় নিয়েছে ও ইতিহাসের পালে যখন নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে, এ যুগে সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমিরও পরিবর্তন ঘটবে। বুর্জোয়া সাহিত্যের পরিবর্তে এ যুগে রচিত হবে গণসাহিত্য। সে সাহিত্যে সর্বহারা কিষান-মজুরেরই প্রাধান্য থাকবে। প্রাধান্য থাকবে বললেই সবখানি বলা হ'ল না, বলতে হবে এ যুগের সাহিত্যিক কিষান-মজুরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য রচনা করবেন।

সবিনয়ে নিবেদন ক'রব, সাহিত্যে এইরূপ শ্রেণীবাদ আমরা স্বীকার করি না। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'ল বিশ্বমানবের সম্পদ, সেখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি সার্বিক ও সর্বজনীন দৃষ্টি না থাকলে সত্যিকারের সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত কোন্ যুগের সৃষ্টি? কিংবা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'? এ দেশের কিষান-মজুররা কি এ সব গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পায় না?

তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে যত সহজে পৃথক্ করা সম্ভব, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা তত সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য ব'লে কোন কথা নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্র হ'ল তীর্থক্ষেত্রের মতো। সেখানে সবার অবাধ প্রবেশাধিকার।

বস্তুতঃ মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, মানুষে মানুষে মিলও বড় একটা কম নেই। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক জায়গায় মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা আশ্চর্য মিল আছে। এই মানবিক আবেদনকে অবলম্বন ক'রে যে সাহিত্য রচিত হবে তা কি চাষী-মজুর, কি শিল্পপতি, কি বুর্জোয়া-গোষ্ঠী—সবার কাছেই সমান সমাদর পাবে। কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গণ-সাহিত্য বা 'সর্বহারা' সংস্কৃতি ব'লে কোন কথা নেই, এর

সকল কিছুর উপরই সকল মনুষ্যের অবাধ অধিকার। ট্রট্স্কীর কথায়:

There is no workers' culture and that there will never be any, and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class culture and to make way to human culture ; we frequently seem to forget it. (*Literature and Revolution*).

—'শ্রমিকের কৃষ্টি' ব'লে কোন কৃষ্টি নেই এবং তা কখন হবেও না; তার জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নেই। শ্রমিক ক্ষমতা লাভ করে শ্রেণীগত কৃষ্টি চিরতরে দূর ক'রে দেবার জন্য। মানব-কৃষ্টির অভিমুখেই তার যাত্রা,—এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

সাহিত্যের হ'ল অখণ্ড স্বরূপ। একে বরং বলা যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। দ্বৈতকে স্বীকার করেও সে অদ্বৈত, সান্তকে মেনে নিয়েও সে অনন্ত। এই সার্বিক অখণ্ড দৃষ্টিই সত্যিকার সাহিত্যের দৃষ্টি। আর এটাই হ'ল সাহিত্যের ধর্ম।

শিল্পীর সন্তান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তুমি এ বিশ্ব সৃজন করেছ
অতি অপরূপ সাজে।
সৃজন-কামনা জাগায়ে তুলেছে
তাহা যে আমার মাঝে।
পিতার বিদ্যা পুত্র কিছু তো পায়।
পিতৃধর্ম কিছু কিছু শুনি
পুত্রেও বর্তায়।

তুচ্ছ হউক ক্ষুদ্র হউক তবু
আমিও সৃষ্টি করিয়াছি কিছু প্রভু।
লোকের সমাজে দেখাতে লজ্জা হয়।
তোমারে দেখাতে লজ্জা তো নাই
তুমি পিতা স্নেহময়।

তোমারি চরণে করিলাম নিবেদন,
জানি তুমি হেলা করিবে না এ যে
তোমারি অনুকরণ।
পুত্র না হ'লে বলিতাম এরে চুরি
তারিফ করিবে করেছি কেমন
চুরিতেও বাহাদুরি।
পিতার বিত্তে পুত্রের অধিকার
কে করে বিশ্বে এ কথা অস্বীকার?

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দশম অধ্যায়]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[গত পৌষসংখ্যায় শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত 'ভাবার্থদীপিকা'র নবম অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে কি অবস্থায় শ্রীভগবান ভক্তকে নিজ বিভূতি বা ঐশ্বর্য দেখান। দশম অধ্যায়ে নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-স্থান বর্ণনা করিতেছেন। অনুবাদের অন্তর্গত সংখ্যাগুলি 'জ্ঞানেশ্বরী'র শ্লোকাঙ্ক। উঃ সঃ।]

হে গুরুরাজ, আপনি নির্মল জ্ঞানদানে চতুর, বিদ্যারূপ-কমল-প্রকাশক, 'পরা'বাণী তত্ত্বরূপ প্রমদার সহিত বিলাসকারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসাররূপ-তমোনাশকারী সূর্য, অপরিমেয় পরমবীর্যবান্, অত্যন্ত পরিণত তুরীয়াবস্থার (সমাধিস্থিতির) পোষণ করাই আপনার লীলা, আপনাকে নমস্কার। হে অখিলজগৎপালন, কল্যাণরূপ মণির খনি, সজ্জনবনের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ, হে আরাধ্যদেবতা, আপনাকে নমস্কার।

আপনি চতুর চকোরের আনন্দদানকারী চন্দ্র, আত্মানুভবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞান-সাগর, মদন-গর্বহারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সদ্ভক্তের ভজনীয়, ভবরূপ হস্তীর গণ্ডস্থল-বিদারণকারী, বিশ্বোৎপত্তির আদিস্থান, হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কার করি।

আপনার কৃপারূপ গণেশের প্রসাদে বালকেও সারস্বত বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

যে গুরুদেবের উদার বাক্য অভয়বাণীরূপ রাজাদেশ প্রদান করিলে নবরসের প্রকাশরূপ পুরস্কার পাওয়া যায়, আপনার প্রেমরূপ সরস্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে মূকও গ্রন্থ-রচনায় বৃহস্পতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

অধিক কি বলিব ? আপনার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিংবা আপনার পদ্মহস্ত যাহার মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও শিবের সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

এমনি যাঁহার মহিমার ঐশ্বর্য, বাক্য দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্তুতি করিব ? সূর্যের অঙ্গ কি গন্ধদ্রব্য দ্বারা মার্জন করা যায় ? ১০

কল্পতরুকে কেমন করিয়া ফুলে সজ্জিত করা যায় ? ক্ষীরসাগরকে কিরূপে আতিথ্য গ্রহণ করানো যায় ? কর্পূরকে কি করিয়া সুবাসিত করিতে ইচ্ছা করিবে ? চন্দনের উপর কিসের প্রলেপ দিবে ? অমৃতকে কিরূপে রন্ধন করিবে ? গগনের উপর কি কোন মণ্ডপ উঠানো যায় ?

তেমনি শ্রীগুরুর মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিবার সাধন কি আছে ? ইহা জানিয়াই আমি নিঃশব্দে নমস্কার করিতেছি। যদি বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুর সামর্থ্য বর্ণনা করিতে যাই, তবে তাহা মুক্তার উপর প্রলেপ (পুট) দিবার ন্যায় হইবে।

এখন এ কথা থাকুক, সাড়ে-পনের-আনা কসের (উত্তম) স্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে হয় না—তাই কিছু না বলিয়া গুরুর চরণে মস্তক রাখাই ভাল।

হে স্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই আমি কৃষ্ণার্জুনসংবাদরূপী প্রয়াগসঙ্গমে অক্ষয়বটস্বরূপ হইয়াছি।

উপমন্যু কৈলাসপতি শঙ্করের কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার সম্মুখে ক্ষীরসাগরের বাটি (ভাণ্ডার) রাখিয়া দিয়াছিলেন, অথবা বৈকুণ্ঠপতি (শ্রীবিষ্ণু) কৌতুকে (প্রেমসহকারে) রুষ্ট ধ্রুবকে ধ্রুবপদ-রূপ মিষ্টান্ন দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তেমনি যে ভগবদ্গীতা ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল, সেই ভগবদ্গীতা আমি 'ওবী' ছন্দে গাহিতেছি, আপনি এমনই কৃপা করিয়াছেন। যে বাণীরূপ বনে ঘুরিয়া একটি অক্ষরেরও সফলতার বার্তা শুনা যায় না, আপনি সেই বাণীকে বিবেকের উপর কল্পলতা করিয়াছেন। ২০

যাহা শুধু দেহবুদ্ধি ছিল, তাহাকে আপনি আনন্দ-ভাণ্ডারের কুঠরী করিয়া দিয়াছেন, মনকে গীতার্থ-সাগরের জলশয্যায় শয়ন করাইয়াছেন।

এখন আপনার কৃপাপ্রসাদে আমি ভগবদ্গীতার পূর্বকাণ্ড কৌতুকে 'ওবী'ছন্দে বর্ণনা করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যমতের (জ্ঞানযোগের) সহিত ভেদ দেখাইয়া (কর্ম)-যোগের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্মের প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, পঞ্চম অধ্যায়ে যোগতত্ত্বের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ যোগতত্ত্বই আসনবিধি হইতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যভাব পর্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট করা হইযাছে। তেমনি যোগস্থিতি ও যোগভ্রষ্টের গতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির 'উপক্রম' (আরম্ভ) ও 'পরিহার' (নিরসন), এবং পুরুষোত্তমকে যে চারিপ্রকার ভক্ত ভজনা করে—তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

তদনন্তর অষ্টম অধ্যায়ে সাতটি প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেহান্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয়, এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে। যাহা কিছু অভিপ্রায় (তত্ত্বজ্ঞান) অপার বেদে প্রকট হইয়াছে, তাহা মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যে অভিপ্রায় গীতার সাত শত শ্লোকে আছে, তাহা এক নবম অধ্যায়েই প্রকট করা হইয়াছে। ৩০

অতএব নবম অধ্যায়ের 'অভিপ্রায়' স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে (আমার) ভয় হয়; বৃথাই শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা! অহো, গুড় ও শর্করার ঢেলা একই রস হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিচার করিয়া দেখিলে মিষ্টত্বেও কোন ভেদ নাই।

কেহ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উহা প্রতিপাদন করে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, কেহ বা জানিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ। পরন্তু নবম অধ্যায় অনির্বচনীয় (অবর্ণনীয়)—তাহাও হে প্রভু, আপনার সামর্থ্যেই আমি বর্ণনা করিয়াছি।

অহো, কাহারও (বশিষ্ঠের) গৈরিক উত্তরীয় (সূর্যের ন্যায়) প্রকাশশীল, কেহ (বিশ্বামিত্র) সৃষ্টির উপরেও সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, কেহ (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রে পাষাণ বাঁধিয়া সৈন্য পার করিয়াছেন। কেহ (মারুতি) আকাশে উঠিয়া সূর্য ধরিতে উদ্যত, কেহ (অগস্ত্য ঋষি) গণ্ডূষে সমুদ্রশোষণে সক্ষম,—আর আপনি আমার দ্বারা গীতার এই ব্যাখ্যা করাইয়াছেন, হে প্রভু অবধান করুন।

পরন্তু এসব কথা এখন থাকুক ; রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ ? না, রাম ও রাবণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন—(অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের তুলনা নাই)।

তেমনি নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ যেমন আছে, তেমনি (তাহার তুলনা নাই); আমি বলিতেছি না—যে গীতার্থ অবগত আছে, সেই তত্ত্বজ্ঞই ইহা নির্ণয় করিতে পারে।

এইভাবে আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছি ; এখন গ্রন্থের উত্তর খণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মুখ্য ও গৌণ বিভূতির কথা বলিতেছেন, সেই সুন্দর সরস কথা আমি বর্ণনা করিব। ৪০

এই দেশী (মারাঠী) ভাষার উৎকর্ষে 'শান্ত'রস 'শৃঙ্গার'রসকেও হার মানাইবে, এবং '৺বী' ছন্দ সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত এই মারাঠী (ভাষ্য) পাঠ করিলে যখন সঠিক অর্থের মর্ম গ্রহণ করা যাইবে, তখন কোন্‌টি মূল গ্রন্থ তাহা বুঝা যাইবে না।

অঙ্গের সৌন্দর্য অলঙ্কারের ভূষণ হইয়া গেলে যেমন কে কাহাকে সুশোভিত করিতেছে, তাহা বলা যায় না, তেমনি সংস্কৃত ও দেশী ভাষা একই ভাবের সুখাসনে কেমন শোভা পাইবে—তাহা উত্তমরূপে শ্রবণ করুন। ভাব রূপ গ্রহণ করিলেই রসবৃত্তির (রসালতার) বর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং চাতুর্য বলে, 'আমার প্রতিষ্ঠা হইল'।

তেমনি দেশী ভাষার লাবণ্য লুণ্ঠন করিয়া রসের তারুণ্য ফুটাইয়া তোলা হইবে এবং গহন গীতা-তত্ত্ব বলা হইবে। তখন চরাচরপরমগুরু চতুরচিত্তে আনন্দবর্ধনকারী যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই শ্রবণ করুন।

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন : 'শ্রীহরি বলিলেন—হে অর্জুন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। শ্রীভগবান উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

আমি ইতিপূর্বে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহা দ্বারা তোমার অবধানের পরীক্ষা করিলাম। উহাতে কোন ন্যূনতা নাই—বরঞ্চ উহা পূর্ণই।

ঘটে অল্প জল ঢালিয়া যদি দেখা যায় উহা চুয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ করিতে হয়, তেমনি (তোমার শুনিবার আগ্রহ) দেখিয়া আরও শুনাইব—এরূপ ইচ্ছা হইতেছে। ৫০

নবাগত লোককে সর্বস্ব দিয়া যদি দেখা যায় সে বিশ্বাসযোগ্য, তবেই তাহাকে ভাণ্ডারী করা যায়, —তেমনি হে কিরীটী, তুমি এখন আমার নিজধাম (বিশ্বাসযোগ্য) হইয়াছ।

এই ভাবে অর্জুনকে দেখিয়া সর্বেশ্বর অত্যন্ত প্রেমসহকারে কহিলেন—মেঘ যেমন পর্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ হইয়া আসে, তেমনি কৃপালুগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহাবাহো, শুন, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই অভিপ্রায় পুনরায় বলিতেছি।

প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া যদি দেখা যায় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সেজন্য যেমন কৃষিকর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নহে ; বারংবার পুট দিলে সোনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িতে থাকে, সুতরাং তাহার খাদ নষ্ট করা উচিত নয় কি ? তেমনি হে পার্থ, তোমার কোন উপকার করিবার জন্য নহে, আমার নিজের স্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি।

বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইলে, সে ঐ শৃঙ্গারের কি বুঝে ? সেই সুখের আনন্দ তাহার মাতাই উপভোগ করে ; তেমনি তোমাকে যাহা বলা হয়, তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার, তখনই আমার প্রেম দ্বিগুণ বর্ধিত হয়।

এখন হে অর্জুন ! এই আলঙ্কারিক পরিভাষা থাকুক। তোমার প্রতি আমার প্রেম গভীর, সেইজন্যই তোমাকে বলিতে আমার তৃপ্তির অন্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা বলিতেছি, এখন মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। ৬০

হে সুমর্মা (মর্মজ্ঞ), আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। অক্ষরের রূপ ধরিয়া যেন স্বয়ং পরব্রহ্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥ ২

পরন্তু হে কিরীটী, তুমি আমাকে সত্যই জান না, আমি যেখানে প্রকট হই, বিশ্ব সেখানে স্বপ্নসদৃশ, সেখানে (আমার স্বরূপ নিরূপণে) বেদও মূক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু পঙ্গু হইয়াছে, রাত্রি বিনাই রবি অস্ত গিয়াছে।

উদরের মধ্যে গর্ভের সন্তান যেমন আপন মাতার বয়স জানে না, তেমনি সমস্ত দেবতাগণ আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। জলচরগণ যেমন সমুদ্রকে মাপিতে পারে না, মশক যেমন আকাশকে উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি মহর্ষিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ জানিতে পায় না।

আমি কে, কত বড় এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ?—এসব নিরূপণ করিতে কত কল্প চলিয়া গেল ! হে পাণ্ডব, ঋষিগণ, দেবগণ ও অন্য সমস্ত ভূতজাত—আমি সকলের আদিকারণ, এইজন্য আমাকে জানা কঠিন।

পর্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি মূলে আসিয়া লাগে, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে পারে ; যদি সূক্ষ্ম অঙ্কুরের মধ্যে সম্পূর্ণ বটবৃক্ষটি আবদ্ধ করা যায়, যদি তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রকে ভরা যায় কিংবা যদি পরমাণুর মধ্যে এই ভূগোলক (পৃথিবী) স্থান পায়, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণের, ঋষি ও দেবগণের আমাকে জানিবার অবকাশ (অবসর) হয়। ৭০

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

এই অবস্থায় (আমাকে জানা কঠিন হইলেও) যদি কদাচিৎ কেহ বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের প্রতি বিমুখ হয়, ইন্দ্রিয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং দেহভাব বিস্মৃত হইয়া মহাভূতের মস্তকের উপর চড়িয়া বসে ; সেখানে স্থির হইয়া থাকিয়া বিবেকবলে ও নির্মল আত্মপ্রকাশে স্বচক্ষেই আমার অজত্ব দেখিতে পায়।

প্রস্তরের মধ্যে যেমন পরশ-পাথর, রসের মধ্যে যেমন অমৃত, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে সে আমার অংশ—জানিবে। সে চলন্ত জ্ঞানের বীজ, তাহার অবয়ব সুখের অঙ্কুর, পরন্ত তাহার মনুষ্যাকার তাহার লৌকিক পরিচয় মাত্র।

অকস্মাৎ বন্যার জলে যদি একটি হীরকখণ্ড পড়িয়া যায়, তবে তাহা কি জলে গলিয়া যায়? তেমনি মনুষ্যলোকের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের মতো ব্যবহার করিলেও প্রকৃতির দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না।

ভয়ে পাপ তাহাকে ছাড়িয়া যায়; জলন্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প যেমন পলায়ন করে, তেমনি যে আমাকে জানিতে পারে, সর্ব সঙ্কল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫

আমাকে কি করিয়া জানা যায়?—এই কল্পনা (প্রশ্ন) যদি তোমার চিত্তে জাগিয়া থাকে, তবে আমার ভাবের (স্বরূপ ধর্ম) কথা শুন: যাহা (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ভূতে তাহা প্রকৃতির সমান হইয়া ত্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। ৮০

উহাদের মধ্যে প্রথম জানিবে বুদ্ধি, তৎপরে নিঃসীম জ্ঞান, অসংমোহ (মোহের অভাব) সহনশীলতা, ক্ষমা, সত্য, শম ও দম (মনোনিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), সংসারের সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু—ইহাদেরও আমার ভাবের মধ্যে ধরিবে।

ভয় ও নির্ভয়তা, অহিংসা ও সমতা, তুষ্টি ও তপ এবং হে পাণ্ডুসুত, দান আর যশ ও অপকীর্তি—এই যে সব ভাব দেখা যায়, তাহা সব আমা হইতেই প্রাণীদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

প্রাণিগণ যেমন বিভিন্ন, ইহারাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জানিবে—কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি অজ্ঞানপ্রসূত, যেমন সূর্য হইতেই প্রকাশ ও অন্ধকার—সূর্য উদিত হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, আর অস্ত গেলেই অন্ধকার।

আমাকে জানা বা না জানা, ইহা জীবগণের কর্মের ফল অনুসারেই হয়, এই জন্য তাহাদের মধ্যে ভাবের প্রকাশ বিষম (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়)।

হে পাণ্ডুকুমার, এইভাবে সমস্ত জীব ও সৃষ্টি আমারই ভাবের সহিত জড়িত হইয়া আছে, জানিবে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

আর যাঁহাদের অধীনে এই সৃষ্টির বৃদ্ধি ও এই লোকব্যবহার চলিতেছে, সেই অপর একাদশ ভাবের কথা বলিতেছি শুন: সমস্ত মহর্ষিগণের মধ্যে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ কশ্যপাদি প্রসিদ্ধ সপ্ত ঋষি। আর চতুর্দশ মনুর মধ্যে স্বয়ম্ভু প্রমুখ চারিটি মনু মুখ্য ও গরিষ্ঠ—প্রথম ও প্রধান।

হে ধনুর্ধর, এই যে একাদশটি ভাব—ইহারা সৃষ্টির ব্যাপারের জন্য আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকসৃষ্টি বা লোকস্থিতি) হয় নাই, যখন মহাভূতের সমষ্টি নিষ্ক্রিয় ও স্তব্ধ হইয়াছিল, তখনই ইহারা (একাদশ ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক রচনা করিয়াছে, এবং সেখানে নিজ জনকে (লোকপাল নিযুক্ত করিয়া) অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। অতএব এই একাদশ ভাব রাজা এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা,—এইভাবে সারা বিশ্ব আমারই

বিস্তার জানিবে। দেখ, আরম্ভে (প্রথমে) একটি বীজই থাকে, তাহাই বাড়িয়া বৃক্ষের গুঁড়ি হয়, গুঁড়ি হইতে অঙ্কুরের উদ্‌গম হইয়া বৃক্ষের ডাল হয়; ডাল হইতে শাখা প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের উদ্‌গম হয়। পল্লব হইতে ফুল ও ফল হয়—এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই।

তেমনি আদিতে এক আমিই ছিলাম, তাহার পর আমার মন বহু হইতে ইচ্ছা করিল, আমার মন হইতে সপ্ত ঋষি ও চার মনুর জন্ম হইল। ইঁহারাই বিবিধ লোক সৃজন করিলেন, লোক ভিন্ন ভিন্ন লোকপাল হইল, এবং লোকপাল হইতেই প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। ১০০

এই ভাবে—বাস্তবিক আমিই এই বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া আছি, এই ভাব সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আমাকে বুঝিতে পারে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয় ॥৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮

এইজন্য হে সুভদ্রাপতি, এই ভাব আমারই বিভূতি—এই ব্যাপ্তি সারা জগৎ ভরিয়া আছে। অতএব আমা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্তই 'আমি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইভাবে যাহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে জ্ঞানের জাগৃতি হইয়াছে, সুতরাং সে উত্তমাধম ভেদের স্বপ্ন দেখে না।

আমি, আমার বিভূতি ও তাহাতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি—এ সমস্তকেই সে যোগানুভব দ্বারা ঈশ্বরভাব বলিয়া মানে, সুতরাং শঙ্কাহীন যোগের প্রভাবে মনোবল দ্বারা সে আমার সহিত সমরস হইয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯

যেমন সূর্যই সূর্যের আরতি করে, কিংবা চন্দ্র চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অথবা সমান দুই প্রবাহ একত্রে মিলিয়া যায়, তেমনি উহারা (ঐ ভক্তগণ) সমরসের প্রয়াগতীর্থ হইয়া যায়। ঐ তীর্থজলের উপর সাত্ত্বিক ভাবের বন্যা বহিয়া যায় এবং তাহার সংবাদ(অধ্যাত্মচর্চা)রূপ চৌরাস্তায় স্থাপিত গণেশের মূর্তি হইয়া যায় (গণেশের ন্যায় উপদেষ্টা হয়)। তখন তাহারা মহাসুখে (ব্রহ্মানন্দে) ভরিয়া আত্মজ্ঞানে (দেহের) বাহিরে চলিয়া আসে, এবং আমাকে প্রাপ্তির সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া উদ্‌গার তুলিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, তাহাই তাহারা ত্রিজগতে মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া কহিতে থাকে।১১০

কমলকলিকা প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত সবারই আনন্দের জন্য তাহা বিলাইয়া দেয়, তেমনি ইহারা বিশ্বে আমারই কথা বর্ণনা করে, কথার আনন্দে কথাই ভুলিয়া যায় (স্তব্ধ হইয়া থাকে) এবং সেই বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের শরীর মন লীন হইয়া যায়। এইভাবে—প্রেমের আতিশয্যে যাহাদের দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না, তাহারা নিজের মধ্যে আমাকে পাওয়ার সুখ অনুভব করিয়াছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০

হে অর্জুন, তাহাদের আমি যাহা কিছু দান করিতে যাই, তাহার সর্বোত্তম অংশ নিজ স্থানেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। হে বীর অর্জুন, তাহারা যে পথে বাহির হয় তাহার তুলনায় স্বর্গ ও মোক্ষ কুটিল পথ বলিয়া মনে হয়।

এইজন্য তাহারা আমার প্রতি যে প্রেম ধরে, আমাকেই তাহার প্রতিদান দিতে হয়; পরন্তু আমি যাহা দিতে যাই, তাহা তাহাদেরই অধীন। এখন এমন হয় যে তাহাদের প্রেম যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়।

হে কিরীটী, প্রেমাস্পদ ক্রীড়ারত বালককে আপন স্নেহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন করিয়া মাতা যেমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে, বালক যে যে খেলার সামগ্রী চায়, মাতা তাহা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করিয়া দেয়, তেমনি আমাকে উপাসনার অধিকারকে পোষণ করিতে হয়। যে মার্গের পোষণে আমার ভক্ত আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়, বিশেষ প্রেম সহকারে আমাকে তাহার পালন করিতে হয়।১২০

ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং ভালবাসে, আমিও তাহার অনন্যগতিই ইচ্ছা করি, কারণ প্রেমিকের সঙ্কট আমারই সঙ্কট। দেখ, স্বর্গ ও মোক্ষ রচনা করিয়া ঐ দুটি মার্গই আমি ভক্তের অধীন করিয়া রাখিয়াছি, অবশেষে লক্ষ্মীর সহিত নিজেকেও তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছি।

পরন্তু সহজ সুন্দর নির্মল (নিত্য নবীন) যে আত্মসুখ, তাহা প্রেমিক ভক্তের জন্য যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। হে কিরীটী, এই সুখের শেষ সীমা শান্তি, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে প্রেম সহকারে আমার কাছে টানিয়া লই—একথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

আমার আত্মার প্রতি 'ভাব' (প্রেম ও ভক্তি) যে জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, এক আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে। হে বীর, তাহার নির্মল তত্ত্বজ্ঞান কর্পূরের মশালের ন্যায় হয়, এবং আমি মশালচি হইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার নাশ করিয়া দূরে সরাইয়া তাহার জন্য এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দিই। প্রেমী ভক্তের প্রিয়তম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ভাবে বলিলেন, তখন অর্জুন কহিলেনঃ আমার মনোবৃত্তি শান্ত হইল। হে প্রভু, শ্রবণ করুন, আপনি সংসারের আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি জননীজঠর (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদোষ আজ আমার নিজের চক্ষেই দেখিলাম, এখন হে প্রভু, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে। ।১৩০

হে দেব, আপনার মুখনিঃসৃত কৃপামৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আজ সুবিদ্যার জন্ম হইল, আমার ভাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনরূপ সূর্যের প্রকাশে অন্তর্বাহ্য অন্ধকার দূর হইল, এই জন্য আপনার যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি। অর্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

হে জগন্নাথ, আপনিই পরব্রহ্ম, যাহা এই মহাভূতের বিশ্রান্তিস্থান তাহাই আপনার গঠিত পরম নিজধাম। আপনি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ—এই) তিন দেবতার পরম দেবতা। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব যে পুরুষ আপনি তাহাই,—মায়াবিকারের অতীত দিব্য স্বরূপ।

হে স্বামিন্, আপনি অনাদিসিদ্ধ, আপনি জন্মকর্মের বশীভূত নহেন। আমি আপনাকে এখন জানিতে পারিয়াছি। আপনিই কালযন্ত্রের সূত্রধার (চালক), আপনি জীবকলার (জীবাত্মার) অধিপতি, আপনি ব্রহ্মকটাহধাত্রী (ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়)—ইহা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

অন্য এক উপায়ে এই মহান অনুভবের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়; পূর্বকালে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও এইভাবে আপনার বর্ণনা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি তাঁহাদের বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতেছি। দেবর্ষি নারদ সর্বদা আমাদের কাছে আসিয়া এইরূপ বাক্যদ্বারা আপনার স্তুতিগান করিতেন, পরন্তু তাহার অর্থ না বুঝিয়া আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ করিতাম। হে প্রভু, অন্ধের গ্রামে যদি রবি স্বতই প্রকট হয়, তবে তাহারা সূর্যের তাপই অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ দেখিতে পায় না। ১৪০

তেমনি দেবর্ষি যখন অধ্যাত্মগান করিতেন, তখন তাহার রাগের খেলাই আমরা শুনিতাম, অন্য কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অসিত ও দেবল ঋষির মুখেও আমি আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু তখন আমার বুদ্ধি বিষয়-বিষে মলিন ছিল। আর অপরের কথা কি বলিব? ব্যাসদেব স্বয়ং আসিয়া সর্বদা সর্বত্র আপনার স্বরূপ বর্ণনা করিতেন।

হে দেব, যেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়া 'ইহা চিন্তামণি নয়' এই বুদ্ধিতে তাহাকে উপেক্ষা করে, পরে সামান্য সূর্যোদয় হইলে তাহা চিনিতে পারিয়া বলে, 'ইহাই চিন্তামণি'—তেমনি ব্যাসাদি মহর্ষিগণের বাক্য আমার পক্ষে (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) রত্নের খনিসদৃশ; পরন্তু হে দেব, আপনার অভাবে আমি তাহা বৃথাই উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

পরশমণি

শ্রীমতী বিভা সরকার

পরশমণির পরশ পেয়েছি
ওগো অন্তর্যামী!
নয়নে আমার একি অপরূপ—
তুমি আসিয়াছ নামি!
মিলন জেনেছি তাই এ বিরহ,
অরূপে হৃদয় খোঁজে অহরহ।

কে বলে তোমার কোন রূপ নাই?
অরূপ রূপের শেষ!
স্রোতে ভাসা ফুল পায় যদি কূল,
প্লাবিয়া উঠিবে প্রাণের দুকূল।
শেষের সে ক্ষণে অশরীরী মায়া
ধরিবে কি নব বেশ?

‘লাগ্ ভেলকি লাগ্’

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বাজিকর ও তাহার প্রদর্শিত ভেলকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রিয় উপমা ছিল—ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির উপমা। একটি খালি ঝুড়িকে ঢাকিয়া দিয়া ঢাকনির উপর কাঠি ঠেকাইয়া যাদুকর বলিতেছে, লাগ্ ভেলকি লাগ্। তাহার পর যেই সে ঢাকনি তুলিয়াছে, অমনি ঝুড়ির ভিতর হইতে এক ঝাঁক পাখী বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। দর্শকগণ চোখকে অবিশ্বাস করিতে পারে না, অথবা কেমন করিয়া শূন্য ঝুড়ি হইতে পাখী বাহির হইল তাহারও হদিশ খুঁজিয়া পায় না। ইহারই নাম ভেলকি। নাই অথচ আছে, দেখা যাইতেছে—কিন্তু কেমন করিয়া যে দেখিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় লাগিয়া আছে। যাহারা ভেলকি দেখে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই প্রকার। কিন্তু ভেলকি যে দেখায়—বাজিকর—তাহার জ্ঞানে কোনও অস্পষ্টতা নাই। সে জানে, যে পাখী সে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্য নয়, সে-ই সত্য। তাহার কাঠি ঘুরানো এবং ‘লাগ্ ভেলকি লাগ্’ বলাটা সত্য—কিন্তু ভেলকি যাহা প্রকাশ পায়, তাহা একেবারেই ভুয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—‘কি জান, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। জীব-জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলে-পিলে, এ সব বাজিকরের ভেলকি। এই আছে, এই নাই।’ (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩।১৭।২)

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারেন না। তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়িতে স্ত্রীপুত্র-কন্যাজামাতা-পৌত্রপৌত্রী-দৌহিত্রদৌহিত্রী-পরিশোভিত মোটা-আয়-পরিপুষ্ট সুখসামঞ্জস্যপূর্ণ সংসারে কখনও শূন্য ঝুড়ি হইতে পাখী উড়িয়া আকাশে মিলাইয়া যায় নাই। বিচিত্র বর্ণের পাখী তিনি অহরহঃ দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা ভেলকি নয়, সত্য পাখী। অবিনাশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ‘আছে’ কখনও ‘নাই’ হয় নাই। তিনি কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন ‘আর সব অনিত্য’?

কিন্তু মালতীর কথা আলাদা—অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী ৺বিনয় মিত্রের বিধবা পত্নী মালতী। বিনয় মিত্র ছিলেন খ্যাতিমান্ অধ্যাপক। কতই আর বয়স হইয়াছিল? মাত্র ত্রিশ। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষুদ্র সংসারটি—বেশী টাকা-কড়ি না থাকিলেও নিবিড় শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল! বিনয় মিত্র কলেজের পথে একদিন লরী চাপা পড়িলেন। মাত্র ৪ ঘণ্টা বাঁচিয়া ছিলেন। মালতী হাস-পাতালে গিয়াছিল, কিন্তু বিনয় মিত্র তখন সংজ্ঞাহীন। স্বামী একটিবার চোখ চাহিয়াও স্ত্রীর নিকট শেষ বিদায় লইতে পারিলেন না। এই পৃথিবীর সকল আলোই মালতীর নিকট নিভিয়া গিয়াছে। মালতী হাসিবে, না কাঁদিবে? অন্ততঃ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শন মালতী বিশ্বাস করিতে পারে না। একদিন মালতী ভগবানকে বিশ্বাস করিত। ভগবানের দয়াতেই তো এমন শিবতুল্য পতি সে পাইয়াছিল, পাঁচটি বৎসর যেন একটা একটানা আনন্দের জোয়ারে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সেই করুণাময় ভগবানের মনে এমন নিষ্ঠুরতা কি করিয়া লুকাইয়া ছিল? এত বড় প্রচণ্ড আঘাত ভগবান কি করিয়া তাহার উপর হানিলেন? না—ভগবান

নাই। এমন বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত ভগবান থাকিতে পারেন না। অথবা ভগবান ঠিক আছেন, কিন্তু তাঁহার কাজের রীতিই এইরূপ—আলোক-আঁধার-মিশানো, হাসি-কান্না দিয়া গাঁথা, অস্তি-নাস্তির দুর্বোধ্য ইন্দ্রজাল? না—মালতী কিছুই বুঝিতে পারে না। ছেলেবেলায় দেখা ভোলা বাজিকরের যাদুখেলার কথা মনে পড়ে। অনেক দর্শক-দর্শিকার মধ্যে উপবিষ্টা পিসিমাকে ডাকিয়া ভোলা বলিয়াছিল, মা ঠাকরুন, এই দেখুন আমার হাতে একগাছি সুতো। মন্তোরের বলে একে সোনার হার ক'রে দিচ্ছি। ভোলা সুতাগাছটি হাতের মুঠায় লইয়া মন্ত্র পড়িয়াছিল—লাগ্ ভেলকি লাগ্। তারপর মুঠা খুলিয়া বাস্তবিকই সরু একগাছি সোনার হার বাহির করিল। পিসি-মা নিজের হাতে উহা ধরিয়াছিলেন। বলিলেন, ঠিকই হার। কিন্তু রাঙা মাসিমা যখন উহা ধরিতে গেলেন তখন উধাও! পিসিমা হতভম্ব। মালতী ভাবিতেছে—তাহার স্বামী কি বাস্তবিকই রক্তমাংসের শরীর লইয়া পাঁচ বৎসর তাহার জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, না তিনি পিসিমার হাতে ভোলা বাজিকরের সৃষ্ট মিথ্যা সোনার হার?

* * *

বিপিন বসুর একটি চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় কুড়িখানি বাড়ির মালিক বিপিন বসু। একমাত্র পুত্র মলয়ের বিবাহের সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। কত আশা, কত আনন্দ, কত তৃপ্তি লইয়া বসু-দম্পতি দিন গণিতে-ছিলেন। কিন্তু ঠিক বিবাহের একুশ দিন আগে হঠাৎ মলয় টাইফয়েডে পড়িল। দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের মধ্যে মাতাপিতার দিন কাটিতে লাগিল। চিকিৎসা ও সেবাযত্নের ত্রুটি নাই, কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলিল। অবশেষে কী নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যেই না বিধাতা ভবিতব্য ঘটাইলেন। মলয় মরিল ঠিক সেই দিনে এবং সেই সময়ে, যে তারিখে ও লগ্নে তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল! সে পিতার একটি চোখ যেন সঙ্গে লইয়া গিয়াছে—যে চোখ দিয়া বিপিন বসু এই পৃথিবীর শোভা-সম্পদ, জীবনের মাধুর্য নিরীক্ষণ করিতেন। বিপিন বসুর একটি চোখ আছে। সেই চোখ তাঁহার কোন্ কাজে লাগিবে? সে চোখ দিয়া অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, বিপিন, ভগবান মঙ্গলময়। বিপিন বসু ধর্মভীরু, গুরুদেবের কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু মঙ্গলের সংজ্ঞা কি, তাহা বিপিন বসু বুঝিতে পারেন না। মঙ্গল কি স্বাভাবিক পথে মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া আসিতে পারে না?

* * *

রাজবল্লভ স্ট্রীটের ঐ মোড়ের বাড়ীটির এক-তালা হইতে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া নিত্য গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যান—তাঁহার কাহিনী শুনিবে? মেয়েটির নাম টিয়া—তাঁহার একমাত্র কন্যার একমাত্র দুহিতার একমাত্র সন্তান। আত্মীয় বলিতে ভদ্রলোকের এই বালিকাটিই এখন সম্বল। স্ত্রী ৺কাশীলাভ করিয়াছেন অনেক বৎসর। ভদ্রলোক কন্যার মুখ চাহিয়া ছিলেন।

কন্যা তো গেল, জামাতাও। দৌহিত্রী রহিল। তাহাকে মানুষ করিলেন, বিবাহ দিলেন। সেও একদিন মৃত্যুশয্যায় 'দাদু টিয়া রইল, দেখো'—এই কাতর মিনতি জানাইয়া চোখ বুজিল। টিয়া মায়ের দাদুকে 'দিয়া' বলিয়া ডাকে, বৃদ্ধ ডাকেন—টিয়া। টিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বড় আদরভরে সাড়া দেয়, দিয়া। দিয়ার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—অবিশ্রান্ত কান্না। কিন্তু এক ফোঁটা জলও চোখে আসে না। অশ্রুর সকল উৎস চিরদিনের মতো তাঁহার শুকাইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে মনে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান তোমার সংসারে এ কি নিয়ম?

ভগবান মুচকি মুচকি হাসেন। সোজা উত্তর দিতে পারেন না।

এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এতই সোজা যে শুনিলে লোকে ভগবানকে লাঠি লইয়া তাড়া করিবে। বলিবে, বেকুফ, ইয়ারকির আর জায়গা পাওনি? ভগবান তাই শাস্ত্র-বাচস্পতিদের উপর ভার দেন ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর তৈরী করিতে। তাঁহারা শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন কবিয়া বিধাতার বিশ্ব-বিধানের কত গালভরা চুলচেরা নিয়ম আবিষ্কার করিয়া যান। ভগবান আবার হাসেন। শাস্ত্রবাচস্পতিরা তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন বটে!

নন্দীর মতো নাছোড়বান্দা ব্যক্তি কিন্তু পণ্ডিতদের পথ না মাড়াইয়া সিধা ভগবানকেই চাপিয়া ধরে, বলিতেই হইবে। শিবঠাকুর বলেন, সোজা উত্তর আর কি বৎস! সঙ্কেত দ্বারা তোমাকে বুঝাইব। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো বুঝিয়া নিও। হঠাৎ একটি ভারী শব্দ হইল। নন্দী চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু ইহা কিসের শব্দ?

শিব। রাবণ জন্মগ্রহণ ক'রল, তাই শব্দ।

একটু পরে অনুরূপ আর একটি তীব্র আওয়াজ। বিস্মিত নন্দী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর এবার কিসের শব্দ?

শিব। (হাসিয়া) এবার রাবণ বধ হ'ল। সিদ্ধি বাটিতে বাটিতে নন্দীর ঘটে বুদ্ধি কিছু জমিয়াছিল বইকি! সে ঠিক বুঝিয়া লইল যে ত্রিলোক-সন্ত্রাসকারী মহাবল রাবণের জন্ম-কর্ম, তথা স্বয়ং নারায়ণের মর্ত্যে অবতরণ, অযোধ্যা-লীলা, বনবাস, রাবণবধ—মানুষের বিচারে এত যে বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা তাহা শিবঠাকুরের দৃষ্টিতে কয়েকটি মুহূর্তের একান্ত তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। আর শিবের দৃষ্টিই তো সত্য দৃষ্টি। সত্যদৃষ্টিতে জগৎসংসারের বিপুলতা, ঘটনারাশির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা—'লাগ্ ভেলকি লাগ্' ছাড়া আর কিছু নয়। কেন হইল, কি করিয়া হইল, কখন হইল, কোথা হইতে হইল—এ সকল প্রশ্ন সত্যদৃষ্টিতে নিরর্থক।

বাল্মীকি মুনি সবে মুনিত্ব লাভ করিয়াছেন, হৃদয়-বৃত্তিগুলি খুবই কোমল, ব্যাধ-শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া এবং শোকনিমগ্ন স্ত্রী-বকটির করুণ কান্না শুনিয়া তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? সহানুভূতি উথলাইয়া উঠিয়াছে। ক্ষোভে নিষ্ঠুর ব্যাধকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন,—'মা নিষাদ' ইত্যাদি। এই নিদারুণ শাপ শুনিয়া ব্যাধ কি করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে লিপিবদ্ধ নাই। ভয় পাইয়াছিল নিশ্চিত, কিন্তু ইহাও ঠিক যে সে হো হো করিয়া হাসিয়াও উঠিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিল, মুনিঠাকুর, একটি ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে যদি এত বিচলিত হন তো সারাজীবন করিবেন কি? এই পৃথিবীর প্রতি হাটে, প্রতি বাটে, অলিতে গলিতে, ঘরে বাইরে প্রত্যহ প্রতি-নিয়ত যে দুঃখদ্বন্দ্ব দ্বেষহিংসা অন্যায়-অবিচারের অবিচ্ছিন্ন স্রোত চলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনিবহের শোক-দুঃখ-সন্তাপের যে মর্মন্তুদ বিলাপ প্রতিক্ষণ আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহা রোধ করিবেন কোন্ কৌশলে? কাহাকে অভিশাপ দিবেন? কত অভিশাপ দিবেন?—এ রোধ করা যায় কি?

না, যায় না। বাল্মীকি এই নগ্ন সত্য পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন রামায়ণ লিখিতে বসিয়া। ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবেন, এই কল্পনা ঋষিকে খুবই উৎসাহিত করিয়াছিল। বড় আশা বড় আনন্দ লইয়া, কালি কলম লইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু লেখা শুরু করিয়া দেখিতে পাইলেন কাজটি আদৌ সুখকর নয়।

আশা এবং নৈরাশ্য, পুণ্য এবং পাপ, আলো এবং আঁধার, হর্ষ এবং বিষাদের এত বিচিত্র ভিড়কে সুষ্ঠুভাবে সাজাইবেন কি করিয়া? রামচরিত তো নয়—দুঃখের বন্যা। বৈকুণ্ঠবিলাসী নারায়ণের কথা বর্ণনা করা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ, অনেক তৃপ্তিকর, কেননা সেখানে মায়ার দ্বন্দ্ব নাই। নারায়ণ অবিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপে বর্তমান। যত পার তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিয়া ভরপুর হইয়া যাও। কিন্তু সেই নারায়ণ যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মানবীয় জীবনরীতি অনুসরণ করেন, তখন ব্যাপারটা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সাধারণ মানুষের চেয়ে বোধ করি এক শত গুণ বেশী তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। তাই চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাল্মীকিকে রামায়ণের সাতকাণ্ড শেষ করিতে হইয়াছিল।—শেষ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন নাই কি, ভগবান, তোমার জন্ম-কর্ম লিপিবদ্ধ তো করিলাম, কিন্তু মর্ম তো নিজে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না? যাহা কিছু করিলে সবটা কি সত্য না ভেলকি? ভগবান! তুমি কি বাজিকর?

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী মহাগ্রন্থ রামায়ণে সংগ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সহস্র সহস্র মানুষেরও তো জীবন আছে, জীবনের ঘটনাবলী আছে। সেই জীবন-কাহিনীও ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে এক একখানি ক্ষুদ্র রামায়ণ হয় না কি? আলোক-আঁধার, উল্লাস-বেদনা, জয়-পরাজয়, গৌরব-অপমান—এইরূপ প্রত্যেক রামায়ণের উপজীব্য নয় কি? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে আমরা যে বিস্ময় অনুভব করি, উহার ঘটনাবলীর কারণ পরম্পরা আবিষ্কার করিতে গিয়া যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, ঐ বিস্ময় ও ব্যর্থতা যে শুধু রামায়ণের ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, প্রত্যেক মানুষের জীবন-প্রবাহে উহা প্রযোজ্য। অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় হয় তো ব্যতিক্রম। তিনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া বাজি ও বাজিকরের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে লাভ করিতে হয় নাই। কিন্তু এই সংসারে অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্তই বিরল। মালতী-বিপিনবসু রাজবল্লভ স্ট্রীটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকরাই এই সংসারে ছড়াইয়া আছে। তাঁহাদের জীবনের তথ্য সংগ্রহ কর। দেখিবে রামায়ণের মতো পদে পদে দুর্বোধ্যতা, অসংলগ্নতা। ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া ঘটিল—তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই, ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না।

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যতিক্রম নন, ঈশানকোণে মেঘ কখন যে দেখা দিবে কে বলিতে পারে? কাহার চাঁদের হাট কোন মুহূর্তে ভাঙিতে আরম্ভ করিবে—কে জানে? অতএব বেশী নাচাকোঁদা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; শোকে মুহ্যমান হইয়া শুইয়া পড়াও মনুষ্যত্ব নয়। অনাসক্ত সত্যসন্ধ দৃষ্টি লইয়া জীবনের সম্মুখীন হও। জীবনে সুখ আছে, দুঃখও আছে; জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে; আশা আছে, নৈরাশ্যও আছে। আলোক আঁধার—দুটারই জন্য প্রস্তুত থাকিও, জয় পরাজয়—দুইটিকেই সমভাবে অভিনন্দিত করিও। এই ভাবেই আমরা সংসারকে জয় করিতে পারি, জয় করিয়া সংসারাতীত অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্যকে লাভ করিতে পারি। সেই সত্যের নাম ভগবান—পরমাত্মা। তাঁহাতে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, আলোছায়া নাই। তিনিই বাজিকর, তাঁহাতে কোনও অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নাই। যত অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা বাজিতেই—তাঁহার সৃষ্টিতেই।

মুণ্ডক উপনিষদ বলিতেছেন, 'পরীক্ষ্য লোকান্—'। সংসারকে যাচাইয়া দেখিতে হইবে,

তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই বিশ্লেষণের দ্বারাই সংসারের মায়িক স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি, শুধু মালতীর স্বামীবিয়োগে নয়, বিপিন বসুর হৃদয়বিদারক শোকে নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ে নয়, সংসারের প্রত্যেকটি ধাপে কুয়াসা ঢাকিয়া রহিয়াছে; বিপদ কুণ্ডলী পাকাইয়া আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, মর্মন্তুদ হাহাকার বুক ভাঙিয়া উপরে প্রকাশ পাইবার জন্য অন্তরদেশে প্রতীক্ষমাণ। তখনই আমাদের হৃদয় বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিতে শিখি, বুঝিতে পারি এই দুর্বোধ্য জীবন-প্রহেলিকার সমাধান শুধু ভগবদ্‌জ্ঞানে, ভগবদ্‌ভক্তিতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—কি দেখছিলাম জান? ভগবতী মূর্তি—পেটের ভিতর ছেলে, তাকে বের ক'রে আবার গিলে ফেলছে। ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হ'য়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে সব শূন্য। যেন বলছে, লাগ্! লাগ্!· লাগ্ ভেলকি লাগ্! (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৪।২৭।২)

প্রকাশ এবং আবরণ, সৃষ্টি এবং সংহার—এই বিরুদ্ধ ক্রিয়া পাশাপাশি তীব্রবেগে প্রতিনিয়ত চলিয়াছে—ইহারই নাম সংসার, ইহারই নাম মায়া। সাধারণ দৃষ্টিতে মায়াকে আমরা বুঝিতে পারি না। সংসারের স্বরূপ আমরা ধরিতে পারি না। মায়া আমাদের শরীর মন বুদ্ধিতে জাঁকিয়া বসিয়া থাকে। আমরা জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলি—হাসি, নাচি, উৎসাহে লাফাই, ছুটাছুটি করি, আবার ঘা খাইয়া বসিয়া পড়ি, কাঁদিয়া বুক ভাসাই। মায়াকে বুঝিবার অজস্র সুযোগ আমাদের চোখের সম্মুখে আসে, কিন্তু কোন সুযোগই আমরা কাজে লাগাইতে পারি না।

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে কচিৎ কখনও আমাদেব ঘুম ভাঙে। তখন আমাদের জিজ্ঞাসার মনোবৃত্তি উপস্থিত হয়। আমরা সংসারের চিরপ্রচলিত ঘটনাপুঞ্জকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করি। জিজ্ঞাসা করি, কী তাজ্জব ব্যাপার—ইহা কি সত্য না স্বপ্ন?

স্বপ্নে যেমন অজস্র বিরুদ্ধতা একসঙ্গে হাজির হয়, জাগ্রৎকালের সংসারেও প্রতি স্তরে আমরা সেইরূপ বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই। একদিন যেখানে সুসমঞ্জস নির্ভুল হিসাব দেখিতাম, সেখানে হাস্যকর গরমিল চোখে পড়ে। সমস্ত সংসার তখন মনে হয় ভেলকি, বাজিকরের সৃষ্টি। এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্মিক পরম সত্যলাভের একটি অপরিহার্য ধাপ। জগতের মায়িকতা বুঝিতে পারিলে মায়াতীত শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং তাঁহার কৃপায় একদিন সে ইচ্ছা সফল হয়। ভগবানকে লাভ করিয়া আমাদের মানব-জীবন ধন্য হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা*

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

'জগদুদ্ধারহেতুস্ত্বম্ অবতীর্ণা যুগে যুগে।'

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান যখন যুগ-প্রয়োজনে ধর্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন, সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তিও তখন ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া লীলার পূর্ণতা সাধন করেন।

এ যুগে ভারতের নবশক্তিপীঠ এই জয়রামবাটীই তাঁহার আবির্ভাব-স্থান। এই গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি জগতের বহু নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদিও তাঁহার স্থূল শরীর অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি সূক্ষ্মবিগ্রহে অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া এখনও তিনি বহু নরনারীর সর্বকল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া তাহাদের ধন্য করিতেছেন।

অশেষ করুণায় একবার শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎকে লিখে আমার এই জন্মস্থানে বাড়ী কর, ছেলেরা এলে কোথায় থাকবে, তোমরা কোথায় থাকবে? রাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, থাম্ রাধু, বাড়ী-ঘর-দোর হ'লে আমরা এখানে থাকবো।

তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান স্বামী সারদানন্দজী তাই মন্দির নির্মাণ করাইয়া ভক্ত-সন্তানদের পূজা অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। অনেক নরনারী ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন ও শান্তি এবং আনন্দলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল সেই কৃপাময়ী এই সন্তানের মাধ্যমেই তাঁহার সেবা করাইয়া লইতেছেন এবং তাঁহার আশ্রিত ভক্ত সন্তানগণেরও সেবা করিবার সুযোগ দিতেছেন। তাঁহার ভক্ত সন্তানগণ অনেকে আমাকে অনুরোধ করেন 'মার সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন'। সেই মহাশক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া বালকত্বের পরিচয়। কোন ছোট সন্তানকে যদি বলা যায়, 'হ্যাঁরে, তোর মা কেমন?' সে কি বলিবে! সে তখন—'মা এই করেন, তাই করেন, মার এই এই শক্তি আছে' প্রভৃতি বলিবে। সে কোন সংবাদই রাখে না—সে জানে, তাহার মা স্নেহময়ী জননী, সর্ব রকমে তাহাকে রক্ষা করেন এবং তাহার একমাত্র আপনার ও আশ্রয়স্থল। মুখের ভাষায় শুধু ব্যক্ত হয়, আমার মা খুব ভাল।

শ্রীমার সম্বন্ধে আমার যাহা স্মরণে আছে, তাহারই যৎসামান্য বলিতেছি:

প্রথম দর্শন—৺প্রসন্নমামার বাড়ীর মধ্যে তাঁহার সেই পুরাতন ঘরের (যে ঘরে তিনি বাস করিতেন) বারান্দায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আসিয়া মাকে প্রথম দর্শন ও প্রণাম করিলাম। পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। প্রণাম করিতেই মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও চিবুকে হাত দিয়া স্নেহ-চুম্বন করিলেন। আমি তাঁহার করুণার অমৃতময় ধারা উপলব্ধি করিলাম। বলিলেন, 'বাবা, কখন এলে—সন্ধ্যা হ'য়ে যাচ্ছে, আজ থাকছ তো?' আমি এত করুণা ও ভালবাসায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আপনার হইতেও আপনার মা। বলিলাম—'না মা, থাকবো না—আমি কোয়ালপাড়ায় যাব।' আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া মায়ের প্রদত্ত কিছু প্রসাদ লইয়া কোয়ালপাড়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন

* শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে জয়রামবাটীতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ হইতে সংকলিত।

করিলাম। তখন হইতেই কেমন একটা করুণার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, কখন আবার মার কাছে যাইব! সুযোগ পাইলেই মার কাছে আসিয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইতাম। তিনিও প্রেরণা দিয়া অপার করুণায় কৃতার্থ করিতেন। দেখিয়াছি—তাঁহার নিকট কোন সন্তান ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি তাহার মনের সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিতেন—স্বচ্ছ কাচের আলমারির মধ্যস্থ সব কিছু যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি তাঁহার নিকট কেহ উপস্থিত হইলেই তাহার অন্তরের বিষয় মা সমস্তই জানিতে পারিতেন। যদি কেহ ভাব গোপন করিয়া কিছু বলিবার জন্য চেষ্টা করিত, ঈষৎ হাস্যবদনে মা সব উত্তর দিতেন, সব বুঝিতেন, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতেন না।

তখন তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁহার সন্তানদিগকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিতেন; তখনকার দিনে প্রবল ব্রাহ্মণসমাজ এইরূপ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দীক্ষাদান এবং সকলের সহিত সন্তানের মতো আচরণ করায় তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও সময়ে সময়ে তাঁহার বিশ্বমাতৃত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মা যুগপ্রয়োজনে আসিয়াছেন। একদিন দেখা গেল—এইখানেই নূতন বাড়ীতে মা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত, প্রায় শয্যাশায়ীই আছেন—শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিলেন—মায়ের শরীর এখন অত্যন্ত খারাপ, দীক্ষা প্রভৃতি এখন বন্ধ করিয়া দাও, কেহই যেন তাঁর কাছে যেয়ে বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।

তাঁহারই আদেশে মায়ের দরজার পাশে আমি বসিয়া থাকিতাম, কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিতাম না, এই সময়ে বরিশালের এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাহারে থাকিয়া মায়ের কাছে দীক্ষা লইবে আবেদন জানাইল। 'এখন দীক্ষা হইবে না' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে আরও উত্তেজিত হইতে লাগিল। কারণ, তাহার মাতৃদর্শনে ব্যাঘাত হইতেছে। সেও বরিশালের লোক, আর আমিও নাছোড়বান্দা। বাগবিতণ্ডা চরম অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। ঘর হইতে জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা সেই দুর্বল অবস্থায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আসতে দিচ্ছ না?' আমি বলিলাম—শরৎ মহারাজ বারণ করেছেন, আপনার শরীর অসুস্থ, তাই কাকেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'শরৎ কি বলবে? আমাদের এই জন্যই তো আসা।' তাঁহারা যে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই এক কথাতেই তাহার আভাস পাওয়া গেল।

কোন ভক্ত-সন্তান মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মা, কেউ আপনাকে কালী বলে, কেউ বলে দুর্গা, কেউ বা জগদ্ধাত্রী, আমরা তো বিশ্বাস করতে পারি না; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তার পূর্ণ বিশ্বাস এনেছিলেন, সেইরূপ আপনি যদি বলেন তবেই বিশ্বাস হয়।'

তদুত্তরে মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, যে যা বলে তাই।' ভাষাটি এত সহজ ও সরল, কিন্তু—এই কথাতেও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস আনা সুদূর পরাহত। যে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে, তাহারই জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার কথা বলিতে গেলে শেষ হয় না। একদিন আমি মাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—'মা, মনের

যে রকম অবস্থা তাহাতে ডুবে যাব ব'লে বোধ হয়।' মা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—'সে কি গো—বল কি গো—ঠাকুরের সন্তান, আমার ছেলে—ডুববে কি, কখনই না।' তাঁর সেই অমোঘ আশীর্বাদই আমার জীবনের সম্বল।

শুভজন্মতিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে তাঁর স্থূল শরীরে যে শেষ তিথিপূজা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিও অতি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার গৃহে তক্তপোষের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন, কোণে রাধুর সেই শিশু ছেলেটি—দেখিয়া মনে হইল আদ্যাশক্তির কোলে যেন শ্রীগোপাল বসিয়া রহিয়াছেন। আমাকে ফুল দেবার জন্য বলিলেন, আমি একটি বড় মালা তাঁহার সেবিকার হাতে দিয়া মায়ের গলায় পরাইয়া দিতে বলিলাম। দীর্ঘ মালাটি জানু পর্যন্ত ঝুলিতে লাগিল। আমি ফুল লইয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্ম পূজা করিলাম এবং মার কাছে প্রার্থনা করিলাম—মা, এই শুভদিনে আপনার অনেক সন্তানের আজ দর্শন ও পূজা করিবার ইচ্ছা থাকলেও সকলের আসা সম্ভব নয়—আমি তাই সকলের হ'য়ে আপনার পাদপদ্ম পূজা করলাম।

মা বলিলেন, আমার ছেলেরা যে যেখানে আছে—ঠাকুর তাদের কল্যাণ করুন—মঙ্গল করুন। আজ ঐ সূক্ষ্মবিগ্রহরূপিণী পাদপদ্মে প্রার্থনা করি—যাহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বা যাহারা আসিতে পারেন নাই—তিনি সকলেরই মঙ্গল করুন, কল্যাণ করুন এবং দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া শান্তি ও আনন্দে রাখুন।

কে তুমি?

শ্রীঅধীর সরকার

কে তুমি? কোথায় থাকো? কখনো কি দেখেছি তোমারে?
তুমি কি আকাশে থাকো - মহামৌনস্তম্ভিত সুনীলে?
পর্বতের শুভ্রতায় দিগন্তের শ্যামল মিছিলে?
নিয়ত তরঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত ক্ষুব্ধ পারাবারে?
কী জানি, কি মনে হয়, তবুওতো বহুদিন জানি
একজন 'তুমি' আছ—যেমন মেঘেতে থাকে জল,
শাখার সবুজ স্বপ্নে—সেইমতো তোমারেও মানি—
রূপে গন্ধে স্বাদুতায় পরিপূর্ণ কত শত ফল।
আবার আশ্চর্য দেখি, কেমনে গোপনে ধীরে ধীরে
মানুষে মানুষে জাগে মধুময় ভালবাসাবাসি;
মায়ের হৃদয় ঘিরে যে মহিমা বারংবার ফিরে
সে কি তুমি আছ বলে? দেখি স্বচ্ছ শিশুদের হাসি!
কি যেন, কে যেন আছে; ভাবি, তবু পাইনাক' সীমা—
অথচ আশ্চর্য দেখি জলে স্থলে তোমারই মহিমা।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

[ফাল্গুন-সংখ্যার পর]

॥ দুই ॥

কোন প্রগতিশীল দেশের উন্নত সংস্কৃতি অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত হয়নি। কর্মের সঙ্গে ধর্ম, দেহের সঙ্গে আত্মা, ঐহিকতার সঙ্গে ভগবন্মুখিতা, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সমন্বয়েই জীবন্ত সংস্কৃতি একটা সর্বাশ্রয়ী রূপ লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ দেখে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হই। ভাবি, বস্তুনির্ভরতাই বুঝি সে সমস্ত দেশের প্রাণবান্ সংস্কৃতির মর্মমূলে। যে বিরাট আত্মিক শক্তি এ সমস্ত দেশের সাধারণ অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় থেকে সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে, সে সম্পর্কে অনেক সময় আমরা অবহিত হই না। বীর্যের সঙ্গে বিপুল ত্যাগ, অনির্বাণ কর্মৈষণার সঙ্গে নীরব আত্মিক সাধনাই হ'ল পাশ্চাত্য প্রগতিশীল জাতিসমূহের সর্বাঙ্গীণ জীবন-বিকাশের প্রধান প্রেরণা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণে এ সত্য আজ তর্কাতীত।

শুধু প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেন, যে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকারের জন্যে আজ আমবা গর্বিত, সে সংস্কৃতির উপাদানও বিমিশ্র। সে উদার সংস্কৃতির একদিকে যেমন বীর্যের সাধনা, ঐহিক ভোগ সম্ভোগের জন্যে তীব্র উত্তেজনা, তেমনি আর একদিকে রয়েছে ইহজীবনোত্তর চিরন্তন জীবনের আদর্শ লাভের জন্য অনন্ত আকূতি। এ মিশ্র জীবনবোধের পরিচয় অনুস্যূত হ'য়ে আছে ভারতীয় পুরাণে, বেদ-বেদান্তে, চার্বাক দর্শনে, ক্লাসিকেল সাহিত্যে, বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে আর শঙ্করভাষ্যে। এক যুগে যখন জাতির জীবনে ভোগের মাত্রা বেড়েছে, পরবর্তী যুগে তার বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিত্তিতে মানব-জীবনের আদর্শ-অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা যখন শুষ্ক জ্ঞান-সাধনার রূপ নিয়েছে, পরবর্তী যুগে সে শুষ্কতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে হৃদয়ভিত্তিক প্রেমসাধনার। একযুগে শুধু বিশ্বাস ভারতীয় হিন্দুকে অনুপ্রাণিত করেছে অগণিত দেবদেবীর পূজায় আর যজ্ঞে বলির নামে নির্মম জীবহত্যায়, আর একযুগে সেই বিশ্বাসের উপর জয়লাভ করেছে যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী উদার জীবনদর্শন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেম, ভোগলোলুপতা ও বৈরাগ্য—এ সমস্ত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ষে জেগে উঠেছিল বিচিত্রধর্মী প্রাচীন প্রাণবন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সে যুগের সংস্কৃতিপ্রসার ও রূপান্তরের মূলে রয়েছে সমকালীন ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ফলে যুগে যুগে মানুষের মুক্ত মনে উদিত হয়েছিল স্বতন্ত্র মতবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও লাভ করেছে নিত্য নতুন রূপ। মধ্যযুগে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাল, আর পরমত-অসহিষ্ণু বিদেশী শাসকের চাপে পড়ে তাদের মনের স্বাধীনতাও

হ'ল অন্তর্হিত। এ মানসিক পরাধীনতার অনিবার্য প্রভাব দেখা দিল সমাজ-জীবনে। সমাজ হ'য়ে উঠল রক্ষণশীল, ব্যক্তিমন হ'য়ে উঠল সঙ্কীর্ণ। ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ-মন গড়ে উঠল তদনুরূপ সংস্কারের আশ্রয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি হ'ল ব্যাহত।

বহুকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগন্তরেখা আবার নতুন আলোয় উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠল ভারতে ইংরেজ অধিকারের ফলে। এবারেও বিজয়ী রাজা বিদেশী, কিন্তু মধ্যযুগের রাজার মতো পরমত-অসহিষ্ণু নয়। সাত-সাগরের পার হ'তে এ বিদেশী শাসকের জাতি বন্ধনভীরু ভারতীয় জীবনের সামনে তুলে ধ'রল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উচ্চ আদর্শ, আর যুক্তিবাদের তীব্র আলোক। সে আলোকে প্রথম আলোকিত হ'ল 'ভারতপথিক' রামমোহনের মন। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিবিচারের বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন এ মহান্ চিন্তানেতা, আর বহু যুগের মুমূর্ষু স্বদেশীয় চিত্তে এক প্রবল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করলেন তাঁর নব-উপলব্ধ জীবনবোধের সাহায্যে। স্বাগত জানালেন তিনি বিদেশীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সচল ও সবল রূপকে।

কিন্তু রামমোহনের সংস্কৃতি-সাধনা প্রধানতঃ বুদ্ধির সাধনা। পরিশীলিত মনের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে। সংস্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রে একই পথের পথিক ছিলেন সমকালীন প্রতিভাবান্ শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর আদর্শানুরাগী শিষ্যসম্প্রদায়। শুধু বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সত্যোপলব্ধি চেষ্টার মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা বা উন্মাদনা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে উন্মাদনায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় যে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে মুক্ত মননের আন্দোলন সমস্ত জাতির চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন। শুধু সেদিন নয়, কোনদিনও পারেনি। বাঙালীর হৃদয় যুগে যুগে জেগেছে হৃদয়ের স্পর্শে, আনন্দের আবেদনে। ষোড়শ শতাব্দীতে—সে তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক ভাবনার যুগে শ্রীচৈতন্যের হৃদয়োত্থিত প্রেমভক্তির আন্দোলন শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকেনি—সে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল ভারতবর্ষের বহু স্থানে, এবং সৃষ্টি করেছিল হৃদয়ভিত্তিক একটি অভিনব ধর্ম। সে সঙ্কীর্ণ মানসিকতার যুগেও চৈতন্যপ্রবর্তিত এ অভিনব মানব-ধর্ম যে সিগ্ধোজ্জ্বল সংস্কৃতি-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, সে ধর্মের প্রভাব আজও পৃথিবীর চিন্তাশীল ও শান্তিবাদী সম্প্রদায়ের উপর সমভাবে বিদ্যমান।

সে হৃদয়ের পথেই আহ্বান করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে একটা নতুন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে। প্রেম, ভক্তি ও মানব-মাহাত্ম্যের উপর গভীরতর প্রত্যয়ই হ'ল সে হৃদয়ের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সে হৃদয় কি জ্ঞানবর্জিত? মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই বলেছেন: 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' তাঁর নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তিভূমি। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কেশবচন্দ্রের জীবনের পথও সেই একই হৃদয়চর্চার পথ। স্রষ্টার প্রতি অসংশয় ভক্তি ও বিশ্বাস, মানুষের শুভ-বুদ্ধির উপর সহজ প্রত্যয়, আর তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থিত সানুরাগ প্রেমের পথে তিনি জাতিকে আহ্বান করেছিলেন একটা নবতর জীবনধর্মের অনুশীলনের জন্য। কেশবচন্দ্রের আপাতবিক্ষুব্ধ অন্তঃশুদ্ধ জীবনের ইতিহাস এ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনেরই ইতিহাস। অতঃপর কেশবচন্দ্রের জীবন, কর্ম ও বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁর বিশিষ্ট

জীবনোপলব্ধি ও সংস্কৃতি-সাধনা কী সবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ তিন ॥

পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনীষী কারলাইল একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন: 'The history of the world is the biography of the great men.' উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবর্ধনের আলোচনা প্রসঙ্গেও এ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ শতাব্দীতে যখনই কোন সংস্কৃতিসংকট উপস্থিত হয়েছে, তখনই দেখি সে যুগে এমন সব মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের মুক্ত জ্ঞান ও প্রেমের আলোকে জাতি দেখতে পেয়েছে সে সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত। গত শতকের ভাববিক্ষুব্ধ বাঙালীর ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের জীবনচেতনা গভীরতর মুক্তির ইঙ্গিতে অর্থপূর্ণ। কী সে যুগ-সংকট, যার থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার-কামনাই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী অতন্দ্র সাধনা?

সে সংকট দেখা দিয়েছিল সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর একপেশে জীবন-সাধনায়। বস্তুধর্মী পাশ্চাত্য সভ্যতার নবালোকে জাতি তখন একটি নবীন জীবনস্বপ্নে বিভোর। ইংরেজ বণিকরাজের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থলাভের উপায়-সন্ধান পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে বাষ্প, বিদ্যুৎ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্তুর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটা সম্ভাবনাময় নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সে জগৎ ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস ও বাহ্য আড়ম্বরের জগৎ। সে ভোগৈশ্বর্যময় স্থূল বস্তুজগতে সার্থকতা লাভ করাই ছিল সে দেশের জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সে আসক্তি ক্রমশঃ আকৃষ্ট ক'রল পাশ্চাত্য ভাবধারায় অভিষিক্ত বাঙালী মনকে। চিত্ত-প্রকর্ষহীন এ আর্থিক ভোগলোলুপতা সে যুগের হঠাৎ-বড়লোকদের জীবনকে কিভাবে ক্লেদাক্ত ক'রে তুলেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন গত শতাব্দীর ও এ-শতাব্দীর বহু সংস্কৃতি-সমালোচক।

শুধুমাত্র অর্ধশিক্ষিত লোকের প্রচুর অর্থাগম-চিন্তা বা ভোগলোলুপতায় নয়, সে যুগের শিক্ষিত-মনের চিন্তা ও ধ্যানধারণা ছিল প্রায় একই বস্তুধর্মী। যে যুক্তিবাদী, হিতবাদী বা মানবতাবাদী পাশ্চাত্য দর্শন সে যুগের শিক্ষিত মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে দার্শনিক আদর্শও মূলতঃ ইহজীবনসর্বস্ব। কেশবচন্দ্র নিজে সে যুগাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে:

'The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosophy positivism.'[১]

কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মার জাগরণ। সেজন্য শুধুমাত্র ঐহিক ভাবনাপূর্ণ পাশ্চাত্য জীবনদর্শন তাঁর কাছে মনে হ'ল—'dull, mechanical· unspiritual and lifeless.'—(যান্ত্রিক, জড় ও নির্জীব)।

ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সে যুগের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে গতানুগতিক বিচারহীন সংস্কারের আনুগত্য, আর নবীনপন্থীদের মধ্যে চিন্তাস্বাধীনতার নামে সংশয়বাদ। এ উভয়শ্রেণীর বাঙালীর অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের গভীরতার অভাব ছিল সে কালের যুগসংকটের অন্যতম প্রধান কারণ।

সে যুগসঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ভাবপ্রবণ কেশবচন্দ্র সবল কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে-

১ K. C. Sen, *Lectures in India, Great men (Sept, 1866), P. 81.*

ছিলেন সমকালীন মানসিক জড়তাগ্রস্ত জাতিকে :

'The people of India must be roused from their lethargy and apathy, and saved from the dangers of smooth but treacherous materialism. The life of spiritual stagnation that we see around us is woeful; this spreading infection of sceptical fancies is apalling. The enslaved spirit of nation must rise and bestir itself freely to the holy activities of the higher life.'[২]

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে পরবর্তীকালে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমরা যে বাণী শুনেছি, তারই পূর্বধ্বনি শুনতে পাই আচার্য কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে। সে ১৮৬৬ খৃঃ-র কথা। কেশবচন্দ্র তখন আটাশ বৎসরের যুবক মাত্র।

আর ১৮৮২ খৃঃ (৪৪ বৎসর বয়সে) মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে কেশবচন্দ্র উচ্চারণ ক'রে গেছেন তাঁর পরিণত জীবনোপলব্ধির কথা সংযত গম্ভীর ভাষায় যে সত্য বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বকালের যুগসংকট হ'তে একটি জাতির মুক্তির ইঙ্গিত :

'সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।...আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা......প্রথমেই বেদ-বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী। বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না'[৩]

প্রার্থনা আর বিচারনির্ভর প্রত্যয়ের পথেই চালনা করতে চেয়েছিলেন তিনি জাতিকে জীবনের শ্রেয়োলাভের জন্য। প্রেয়লাভের পথকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কিন্তু শ্রেয়োবোধহীন প্রেয় বস্তু লাভের পথ ছিল তাঁর কাছে ঘৃণিত। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

জাতীয় জীবনের স্খলন দূর ক'রে জাতিকে মহত্তর জীবন-স্বপ্নে উন্মুখ ক'রে তোলবার জন্যে বহু সংস্কারমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যুগের কোন কোন সংস্কারক। সে যুগের ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সংস্কারকমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোরতর বিপ্লবী। অন্যায় অধর্ম বা পাপ ব'লে যা তাঁর মনে হ'ত, তার সঙ্গে আপস করতে তিনি জানতেন না। সে জন্যে জাতীয় মনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি—জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্যে। জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় মানসের জাগরণের জন্যে যেমন জোর দিয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা ও প্রত্যয়ের উপর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেমন জোর দিয়েছিলেন পাপবোধের উপর। এ পাপবোধের উৎসস্থল ব্যক্তিচিন্তা ও হৃদয়োত্থিত বিবেক। এ বিবেকের পথেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তিনি আত্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীকে :

জীবনগ্রন্থের দ্বিতীয় কথা কি? এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনৈক্য দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, অনেক জীবনে এত প্রবল নয়।......পাপদর্শনে পাপবোধ হইল; পলকের মধ্যে সহজে পাপবোধ করিলাম।......আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।[৪]

পাপ শুধু মানুষের বাইরের দুষ্কৃতির মধ্যে নয়, মনের মধ্যেও যদি মিথ্যাচার থাকে কেশবচন্দ্র তাকেও বলেছেন পাপ। এ পাপবোধের চেতনা কেশবচন্দ্রের চিত্তে সৃষ্টি করেছিল এক উচ্চ নীতিধর্মের (Ethics) প্রেরণা, আর এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক আদর্শ বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি।

২ K. C. Sen, Lectures in India, Great men (1866), P. 89.

৩ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ (১৮৮২) পৃঃ ১—৩

৪ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃঃ ৮

এ উচ্চ জাতিবোধের চেতনা ক্রমশঃ সঞ্চারিত হ'ল 'কেশবচক্রে'র[৫] মধ্যে, আর তাঁরা জাগিয়ে তুললেন দেশের মধ্যে একটা নতুন ভাবান্দোলন—নীতিধর্মের অনুশীলন ছিল যে ভাবান্দোলনের ভিত্তিমূলে। কেশবচন্দ্রের এ নীতিধর্মের আন্দোলন শুধু বাক্যসীমায় আবদ্ধ হ'য়ে রইল না, মহৎ নীতিভিত্তিক একটা আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সে যুগের তরুণ ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'আশালতা দল' (Band of Hope) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে—সুরাপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা ছিল যে নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সে বিদেশী চিন্তা ও ভাবানুকরণের উৎকেন্দ্রিকতার যুগে কেশবচন্দ্রের এ নীতিধর্মীয় আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছিল? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে যুগের বাঙালীর ক্রম অভ্যুদয়ের কারণ হ'ল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও সে জীবন-সংস্কারের প্রভাব। কিন্তু একটু সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত এ উচ্চনীতিধর্মের প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো সে যুগের শিক্ষিত মানসে প্রবাহিত হ'য়ে দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে আর একটা প্রবল ভাবান্দোলন, সর্বযুগের উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা-কামনা যে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। সমকালীন রসবাদী সাহিত্যিক বঙ্কিমের মানস প্রবৃত্তির বিবর্তন-রেখা অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে এ রোমান্টিক কথাশিল্পী জীবনের শেষ স্তরে একান্তভাবে আপনাকে নিয়োগ করেছেন নীতিধর্ম ও অনুশীলন-তত্ত্বের আলোচনায়। শুধু জীবনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায়ও বঙ্কিম সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে নীতিধর্মের প্রেরণাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্র-প্রভাবে তিনি এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর সুবিখ্যাত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে 'সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত' ও 'সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র' ব'লে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। শুধু সমসাময়িক কালে নয়, কেশবচন্দ্রের এ উচ্চ নীতিধর্মের আন্দোলন পরবর্তী কালে জাগিয়ে তুলেছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো সাধুমহাত্মার উদার প্রাণকে। নীতিধর্মী জ্ঞান ও কর্ম এবং ভক্তিপ্রবণ প্রেমের ভিত্তিতে এ মনীষী তাঁর সমকালে পূর্ববঙ্গে যে প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করেন, জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের এ সবল ভাবান্দোলনের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

॥ চার ॥

সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রবল লোকহিতব্রতের উচ্চ আদর্শ যুক্ত হ'য়ে কেশবচন্দ্রের মহিমান্বিত জীবন হ'য়ে উঠেছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। কেশব-চরিত্রের এ উভয় বৈশিষ্ট্য-বিকাশের কারণ অনুসন্ধানে স্বতই মনে আসে প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও সেই মহাত্মার মহান্ জীবনের প্রভাবের কথা। কিন্তু কেশব-জীবনের কর্মধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে—এ দুটি উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল কেশবচন্দ্রের সহজাত। দেবেন্দ্রনাথের প্রখর ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়তো বা তারা বিকাশের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগেই কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন একটা সংযমপূত

[৫] কেশবচক্র—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল. এবং মহেশচন্দ্র দত্তের মতো চিন্তানেতা ও কর্মীদের সম্মেলন।

নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনীয়তা। এ ছাড়া 'কলুটোলা ইভনীং স্কুলে' দরিদ্র ও শ্রমিকশ্রেণীর বালকদের শিক্ষাদান কার্যে এবং সেন-পরিবারের 'গুড্ উইল ফ্র্যাটারনিটি সভা'র কার্যকলাপের মধ্যেই তাঁর লোকহিতব্রত ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৮ খৃঃ কেশবেরই আগ্রহাতিশয্যে উক্ত সভায় মহর্ষির আগমনের পর থেকে কেশবের ধর্মজীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আর এ পরিবর্তিত হৃদয়ভাব একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কেশবচন্দ্রের চলমান জাগ্রত জীবনকে উৎক্ষিপ্ত করেছে নিত্যনতুন জীবনভাবনা ও দেশোন্নয়নমূলক বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রে।

কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা হয়েছে—অগ্নিমন্ত্রের উপাসনাই ছিল সে মহাজীবনের প্রধানতম আকর্ষণ। এ অগ্নিমন্ত্রকে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় অভিহিত করেছেন 'Enthucism' ব'লে। এ Enthucism-এর প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্র সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের। কি মহামারীর সময় সেবাকার্যে (১৮৬১-৬২), কি শিক্ষা সংস্কারে, কি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে, কি জাতীয় জাগরণের জন্যে পত্রিকা-সম্পাদনায়, কি নব-উপলব্ধ ধর্মপ্রচারে—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ Enthucism এর তাড়নায় কেশবচন্দ্র মেতে উঠেছিলেন একটা সেবাময় ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্নে। এ স্বপ্নই পরবর্তীকালে সার্থকতার রূপলাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায়, এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রসারিত করেছে মানবমহিমাবোধের উদারতর প্রাঙ্গণে।

ধর্মই হ'ক, কর্মই হ'ক—কোন কিছুকেই কেশবচন্দ্র অন্ধ অনুরাগের সহিত কোনদিন গ্রহণ করেননি। তাঁর সক্রিয় জীবনের সচলতার প্রেরণা ছিল একটা সুগভীর প্রত্যয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের ফলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে সবলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের নব-উপলব্ধ ধর্মমত, আর নিজের যুক্তি ও বিবেকের উপর সুদৃঢ় প্রত্যয়ের প্রভাবে তিনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গঠন করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে)। স্ব ধর্ম ও স্ব-মতের প্রতি এ গভীর নিষ্ঠা সে যুগের বাঙালী মানসে সৃষ্টি করেছিল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়—আর আত্মপ্রত্যয়ই (self-reliance) হ'ল সব রকমের নতুন সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-বিস্তারের ক্রম অনুসরণে এ সত্যটি আমাদের অনুধাবনযোগ্য।

[ক্রমশঃ]

মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম

শ্রীমতী সুজাতা দেবী

'ধর্ম' শব্দটি একবারও উচ্চারণ করেননি, এমন চিন্তাশীল মানুষ জগতে নেই বললেই চলে, তা তিনি ধর্মের পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই বলুন। পৃথিবীতে আর কোন শব্দেরই বোধহয় এত রকম ব্যাখ্যা হয়নি এবং আর কোন বস্তুই জীবনে এত রকম সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ধর্মের বাহ্য রূপায়ণ দেখেও তার সম্বন্ধে কিছু বোঝার উপায় নেই। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এই ধর্ম একদিকে মানুষের মধ্যে যেমন দুস্তর ভেদ এনেছে, ঠিক অপরদিকে এনেছে ঐকান্তিক একাত্মতা। ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে বহু রক্তপাত ঘটেছে; আবার এই ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষ যখন মানুষকে কাছে টেনেছে, তখন যোগ যেমন সুদৃঢ় ও গাঢ় হয়েছে, অন্য কোন নীতিবাদের ভেতর দিয়ে তেমনটি হয়নি। এতেই বোঝা যায় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তবুও এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা প্রয়োজন, কেননা তার সাহায্যে 'ধর্ম' কি, তা হয়তো বুঝে ফেলা যাবে না, কিন্তু 'ধর্ম' কি নয়—তা কিছুটা বোঝা যাবে। আলাপ-আলোচনার সাহায্যে বস্তুলাভ ঘটবে না বটে, কিন্তু এই বহু-আলোচিত শব্দটি নিয়ে যে বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছুটা অবসান হবে।

প্রথমতঃ ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিচার করা যাক্। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। অর্থাৎ যা জীবনকে ধারণ ক'রে থাকে বা পোষণ ক'রে থাকে। তাকেই আমরা সাধারণভাবে ধর্ম বলিতে পারি। 'ধারণ করা'র অর্থ ধরে থাকা অর্থাৎ যার সাহায্যে বস্তুটি স্থিতি ও পরিপুষ্টি লাভ করে। আগুনের ধর্ম দহন করা, অর্থাৎ এই দহন-ক্রিয়াতেই অগ্নির অগ্নিত্ব, তাতেই অগ্নির স্থিতি। দহন করে না—এমন আগুনকে আমরা আগুন বলতে পারি না। এখন মানুষের ধর্ম বিচার করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে, মানুষের ক্ষেত্রে কে তাকে ধারণ ক'রে আছে। মানুষের মনুষ্যত্ব যার উপর নির্ভর করে, তাকেই আমরা ধর্ম বলতে পারি।

মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। পশুত্ব বা দেবত্বের সঙ্গে তুলনা করলে তার স্বরূপটি বোঝা যাবে। রাস্তায় যে কুকুরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ধর্ম বা স্বভাব কি? তাকে যদি পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব—দিনের পর দিন সে খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং জন্মমৃত্যুর অধীন হ'য়ে তার সারাটা জীবন কেটে যাচ্ছে। তাহলে আহার-নিদ্রা-বংশবৃদ্ধি—এই তার স্বভাব, এ গুলি পশুরই লক্ষণ। অন্য প্রাণীর ভেতর যদি শুধু এই লক্ষণগুলি থাকে, তবে তাকেও আমরা পশুই ব'লব। আবার দেবতা কাকে বলি? দ্যোতনশীল যিনি জ্যোতির্ময়, মালিন্যহীন, তাঁকে আমরা দেবতা বলি। মানুষ নিঃসন্দেহে এর কোনটাই নয়। শুধু আহার নিদ্রা নিয়েই মানুষ থাকতে পারে না; যদি থাকে, তাহলে সে মানুষ মানুষই নয়, পশুই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (২।৩।১৮): বৃক্ষগণ কি বাঁচিয়া থাকে না? হাপর কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামপশুগণ কি আহার মৈথুন করে না? আবার মানুষের জীবন নিয়ত সংগ্রাম; তার দুঃখ, গ্লানি, শোক, মৃত্যু প্রমাণ করছে সে দেবতাও নয়। পশুত্ব ও

দেবত্বের মাঝামাঝি স্তরেই মানুষ বিরাজ করছে। পশু দেহপ্রধান জীব; তাই দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ইত্যাদিই তার জীবন, সেখানে মনের কোন স্থান নেই। কিন্তু মানুষ বলতে তার দেহকেই বুঝি না; তার মন, তার চিন্তাশক্তিকেও বুঝি। এই দেহমনের সমষ্টিই মানুষ। সেজন্য তার যেমন দৈহিক বৃত্তি আছে, তেমনি মানসিক বৃত্তিও আছে। সে একদিকে পশুরই মতো ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়, আবার অন্যদিকে শুধু দৈহিক ভোগ নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দেহকে পরিপোষণের সঙ্গে সঙ্গে সে মনেরও চর্চা করে। তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সে জগতের এপার থেকে ওপার তোলপাড় করছে।

কেন করছে, তা বুঝতে গেলেই আমরা মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ ধরতে পারব। সৃষ্টির সেই আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত জীব-জগতের ধারাবাহিক আলোচনা করলে দেখতে পাব—সেদিন পশুরা যে স্তরে ছিল, আজও তারা ঠিক সেই স্তরেই আছে। তখনও মাংসাশী জন্তু অন্য দুর্বল প্রাণীকে সুযোগমত হত্যা ক'রে কাঁচা মাংস খেয়েছে, আজও খায়; তারা সেই নখদন্তই ব্যবহার করে; অ্যাটম বোমা দূরে থাক, সামান্য একটা অস্ত্রও তারা ব্যবহার করতে শেখেনি। নিরামিষাশী পশু সেই যে ঘাস লতা পাতা খেত, আজও তাই খায়; রান্না ক'রে খাদ্যকে অধিকতর লোভনীয় করার কোন উদ্যম বা সামর্থ্য তাদের আজও জন্মায়নি। পাশাপাশি আমরা যদি মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটি দেখি তবে বুঝব, মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়? হাজার হাজার বছর আগে পশুরা যে স্তরে ছিল, আজও সেই স্তরে আছে। কিন্তু সেই প্রস্তরযুগের মানুষের সঙ্গে আজকের দিনের মানুষের কত তফাৎ! সে যুগে মানুষ পশুদেরই মতো জীবহত্যা ক'রে কাঁচা মাংস খেয়েছে, পর্বতগুহায় বাস করেছে, কিন্তু পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য এই—পশু সেখানে থেমে থাকলেও মানুষ থেমে থাকেনি। ক্রমে ক্রমে সে আগুনের ব্যবহার শিখেছে, গুহার বদলে সে ঘর নির্মাণ করতে শিখেছে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত থেকে উন্নততর হ'য়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এই যে নিয়ত এগিয়ে যাওয়া এবং ক্রমোন্নতির ইচ্ছা ও চেষ্টা—এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি, মানুষ শুধু দেহবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই নয়, সে দেহমন দুই-এরই সমষ্টি। একদিকে তাকে যেমন দেহের ক্ষুধা মেটাতে হয়, অপর দিকে তেমনি তাকে মনের তৃষ্ণাও মেটাতে হবে। আগে সে কাঁচা মাংস খেত, এখন নানাজাতীয় খাদ্য মসলা-সংযোগে রন্ধন ক'রে সুস্বাদু ক'রে নেয়, কিন্তু এই রসনাতৃপ্তির উৎকর্ষই তার উন্নতির লক্ষণ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে জগৎকে আগে উপভোগ করেছে, এখনও যদি তাইই সে করে উন্নততর প্রণালীতে, তবে তাকেই আমরা মনুষ্যত্বের বিকাশ ব'লব না, যদি না পাশাপাশি তার মনের উৎকর্ষ দেখি। কিন্তু আমরা দেখি, একদিকে যেমন তার দৈহিক ভোগ উন্নততর হচ্ছে, অপরদিকে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি উন্নত হচ্ছে; বিজ্ঞান-কাব্য সাহিত্যাদির ভেতর দিয়ে সে পরিচয় আমরা পাচ্ছি। এই ক্রমোন্নতির চরম সীমা কোথায়? আজকের ইওরোপ-আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায় মানুষ তার বৃত্তি এবং শক্তিকে কতদূর কাজে লাগিয়েছে। জগতে কোন কাজই তারা এখন অসম্ভব মনে করে না। প্রকৃতির সাথে অহরহঃ সংগ্রাম ক'রে মানুষই সর্বক্ষেত্রে জয়ী

হয়েছে—দুস্তর সাগর, দুরারোহ পর্বত, উষর মরুভূমি; কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না; কিন্তু তবু আমরা বলতে পারছি না যে সে উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে। ঝড়ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, বন্যা ইত্যাদি সে রোধ করতে পেরেছে; কিন্তু চোখের সামনে থেকে প্রিয়জনকে যে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায়—কই মানুষ তো আজও তার কোন প্রতিবিধান করতে পারল না? আর দুঃখ কি শুধু এইটাই,—মানুষের মনের দ্বেষহিংসা, ক্ষমতাপ্রিয়তা জগতে যত অকল্যাণ ও সর্বনাশ টেনে এনেছে, লক্ষ লক্ষ বন্যা বা ভূমিকম্প তা পারেনি।

মানুষ যদি সত্যি এগিয়ে যেতে চায় কল্যাণের পথে, তবে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করলেই হবে না। সে প্রথমে ছিল প্রাকৃতিক শক্তির শিকার, পরে দীর্ঘ সংগ্রামে তার উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। বাহ্য যে বস্তুগুলি তাকে পীড়ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে—তাকে সবলে সে দূরীভূত করেছে, কিন্তু বাইরের শত্রু জয় করলে কি হবে? অন্তরে তার প্রবলতর শত্রু বিদ্যমান। যে অন্তরায় তাকে দেহের সুখ ভোগ করতে দেয়নি, তাকে দূর করলে দেহের সুখ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের সুখও যদি সে পেতে চায়—যা তাকে পেতেই হবে, কেননা মন বাদ দিলে মানুষ মানুষই থাকবে না—তবে মনের শত্রুর সঙ্গেও তাকে সংগ্রামে নামতে হবে। রৌদ্র বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা সে করতে পেরেছে বটে, কিন্তু লোভ হিংসা দ্বেষ থেকে পেরেছে কি? পারেনি। তাই ইওরোপ ও আমেরিকা সর্বত্র আজ মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জগতের সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা, কিন্তু তারাও তো শান্তির জন্য হাহাকার করছে। তারা যদি পশু হ'ত, তবে যা পেয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারত; কিন্তু তারা মানুষ, তাই তারা সেখানে থেমে থাকতে পারছে না। দেহের দাবি মেটাতে তারা আকাশ পাতাল মন্থন করেছে, মনও তার দাবি ছাড়বে কেন? সেও সম্পদ আহরণ করতে চায়, অন্তরের ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে চায়। মানুষের স্বভাব এই যে, সে আরও পেতে চায়—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'; দেহের সুখ সে অনেক পেয়েছে এবং পাচ্ছেও অনেক, কিন্তু মনের সুখ কই? মনের সুখকে অবহেলা ক'রে এসেছে বলেই সে শান্তি পাচ্ছে না। তাইতো এখন আমাদের মনের দিকে তাকাবার সময় এসেছে।

দেহ পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ চায়, কিন্তু মন কি চায়? বর্তমান বিজ্ঞান কাব্য সাহিত্য তার সন্ধান কম করেনি, কিন্তু ঠিক বস্তুর সন্ধান তারা দিতে পারেনি। তাই বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করুক, সে দেহের সুখকে ছাড়িয়ে মনের নাগাল পায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগের সামগ্রীর সংখ্যা ও প্রকার বাড়ছে। যা গতকাল বিলাস ছিল, আজ তা প্রয়োজনে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু মনের তৃপ্তি একচুলও বাড়েনি। বনের ফলমূল খেয়ে তৃণশয্যায় শুয়ে মানুষ যে তৃপ্তি পেয়েছে, আজকের রাজপ্রাসাদ ও চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় পেয়েও তার তৃপ্তির পরিমাণ কিছু বেড়েছে কি? ঐশ্বর্যের উপর ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত হচ্ছে, কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ও তৃপ্তি এখনও 'দুর অস্ত'। তাই এখন প্রয়োজন বাহ্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর ঐশ্বর্যের সন্ধান করা। এ বিষয়ে প্রধানতম অসুবিধা এই যে বাইরের বিষয় ধরাছোঁয়ার মধ্যে—বাড়ী, গাড়ী, টাকা সবই বেশ স্থূল দৃষ্টিগোচর, কিন্তু আন্তর ঐশ্বর্য তা নয়। প্রেম, ভালবাসা, নিঃস্বার্থপরতা ঠিক দৃষ্টি-গোচর বস্তু নয়, যা দশ জনের বাহবার সম্মুখে

তুলে ধরা যায়। এই দশ জনের সামনে নিজেকে তুলে ধরবার লোভ মানুষকে দিয়ে অনেক সৎ ও অসৎ কাজ করিয়েছে। ঠিক যাতে ঢাক পেটানোর সম্ভাবনা নেই, সে কাজে মানুষের উৎসাহ খুবই কম, তাই মনের দিকে মানুষ তাকায় না, তাকাতে চায় না। কিন্তু যদি যথার্থই শান্তি ও তৃপ্তি তার কাম্য হয়, তবে তাকে এদিকে তাকাতেই হবে; এবং শান্তি পাবার জন্য যা যা অনুশীলনের দরকার তাও করতে হবে।

এই যে পরম শান্তি লাভের উপায় একেই আমরা সাধারণভাবে 'ধর্ম' ব'লে থাকি। কেননা এর মধ্যেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ নিহিত রয়েছে। এই দয়া পরোপকার নিরভিমানতা নিঃস্বার্থপরতা অনুশীলনের সাহায্যেই আমরা সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হব এবং এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলনই মনুষ্য-ধর্ম। জাতিভেদে, পরিবেশভেদে অনুশীলন-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে, কিন্তু মূল বস্তু একই। মতামতের চর্চা ও আচারবিচারই সাধারণভাবে 'ধর্ম' নাম নিয়ে চলে এসেছে, তাই এই নিয়ে এত বিভেদ, এত সমস্যা। কিন্তু ধর্ম যে একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়, ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের মতোই তার অনুশীলন সম্ভব, প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, এ কথা জানলে ধর্ম নিয়ে বহুযুগব্যাপী অনেক হানাহানির অবসান হবে, এবং মানুষ যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারবে। এ শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, জীবনে এ সত্যকে যে সফলভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার পরিচয় ইতিহাসে বহু মেলে। জগতে বহু অশান্তি এসেছে, বহু দুঃখ বহু গ্লানির ভেতর থেকে এক-একটি জীবন সব কিছু থেকে আলাদা হ'য়ে আন্তর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে জগৎকে শান্তির পথ দেখিয়েছে।

বেশী দিনের কথা নয়, এই কিছু দিন আগে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে এক পূজারী তাঁর নতুন জীবন-দর্শনের এক আলেখ্য আমাদের সম্মুখে স্থাপন ক'রে গেছেন। তিনি দরিদ্র সন্তান, বাইরের সাধারণ শিক্ষা তাঁর কিছুই ঘটেনি। কিন্তু আজ জগতের লোক তাঁর মহিমার কাছে মাথা নোয়ায়। রাজ্যসম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর ছিল না; না ছিল তাঁর লোককে আকর্ষণ করার মতো মোহন রূপ বা কোন বিদ্যা। কিন্তু বাইরের এই সাধারণ আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য প্রকাশমান, যার আকর্ষণের ক্ষমতা আরও বেশী! তাঁর সর্বগ্রাসী ভালবাসা, কঠোর বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সর্বোপরি তাঁর চিত্তবিচ্ছুরিত শান্তি ধর্মের সাক্ষাৎ ফলরূপে বিরাজমান। তিনি যে শুধু নিজেই জীবনের উচ্চতম আদর্শ লাভ করেছেন তা নয়, তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছে। তাঁর কাছে এসে লোকের আর্থিক ঐশ্বর্য বা বিদ্যার গৌরব কিছুই বাড়েনি, কিন্তু তারা জীবনের এক উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে, যে পথ অবলম্বন ক'রে যথার্থ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেই পথের নিশানা তারা পেয়েছে। এইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনের উদাহরণের সাহায্যেই বোঝা যায় যে 'ধর্ম' একটা পুঁথিগত শব্দমাত্র নয়, সাধনার সাহায্যে তাকে জীবনে লাভ করা যায়; এবং যতদিন না মানুষ এই সকল মহৎ-চরিত্রের প্রদর্শিত পন্থা অনুশীলন করবে, ততদিন মনুষ্যত্বের স্তরে তারা স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে না। বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলার যে সংগ্রাম তাই মনুষ্য-জীবন। মানুষ যদি যথার্থ মানুষ হ'তে চায়, তাহলে এই মহাজনগত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই;

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাঁর প্রখর বুদ্ধিসমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতার উৎস হৃদয় নয়, বুদ্ধি। হয়তো সেই কারণেই তাঁর কবিতায় নতুন শব্দসৃষ্টি বা মৌলিক চিত্রকল্প বিশেষ চোখে পড়ে না। কিন্তু সমাজ-সংসারের নানা বিচিত্র অসঙ্গতি ব্যঙ্গকৌতুকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি এবং ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক কাব্যধারার প্রথম কবি বলা হয়। কথাটি বিশ্লেষণযোগ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভারতচন্দ্র অবধি মঙ্গলকাব্যের ধারা চলেছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবিহ্বলতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে এসে হাস্যরঙ্গে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতচন্দ্রের দেবভক্তি কাব্যের আঙ্গিকের প্রয়োজনে, তা নইলে শুধু 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই তিনি কাব্য লিখতেন, দেবী কালিকার উপস্থিতির প্রয়োজন হত না। দেবতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফল অসংযত উচ্ছ্বাস, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের যা স্বধর্ম। ভারতচন্দ্র দেববন্দনায় অনুচ্ছ্বসিত। তাঁর পূর্বসূরী মুকুন্দরাম শ্লেষাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি ক'রে, কিন্তু দেবতার বেলায় তিনি ঐতিহ্যানুযায়ী ভক্তি-বিহ্বল। ভারতচন্দ্রের শ্লেষাত্মক মনোভাব দেবতার স্তবের বেলায়ও বাক্যবিন্যাস আর ছন্দ-কৌশলে সচেতন। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে গানগুলি তিনি কালিকামঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলির লিরিক-সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিকতা নেই। আসল কথা, মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম ব্যক্তিসচেতন কবি। বাংলাদেশের নিজস্ব পুরাণ-কল্পনার রহস্যময় অতীতের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের এতদিনের যোগ ছিল। ভারতচন্দ্র সেই অতীতের দেবলোক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে বেশী পরিমাণে আকর্ষণ করলেন মানবলোকের দিকে। তার ফলে মঙ্গলকাব্যেরও রূপান্তর ঘটল। এই রূপান্তরের মধ্যেই নতুন যুগের নিশ্চিত আভাস ছিল। তার ফলে মঙ্গল-কাব্যধারার শেষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রইল ভারতচন্দ্রের রচনায়। বাংলার কবিপ্রতিভা এর পর থেকে নতুন পথের অনুসন্ধানী হ'ল।

ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের মধ্যে কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই একদিকে—আর একদিকে রামপ্রসাদ-পরবর্তী শাক্ত-পদাবলীর ধারা—এরাই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নূতনত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করেছে। কবিগান ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও গণরুচির সমর্থনেই গড়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের পর ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের মাঝখানে এই কবির দলের কথা যদি মনে থাকে, তাহলে বোঝা যায়—ভারতচন্দ্রের ঐশ্বর্য ঈশ্বর গুপ্তে পাই না কেন। আসলে ভারতচন্দ্রী মনোভাব থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদেরই সগোত্র। তবে কবিওয়ালাদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পার্থক্য এই যে তিনি মূলতঃ বস্তুবাদী এবং যুক্তিপ্রধান মনোভঙ্গীর কবি। পারিপার্শ্বিক সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে কবি-হিসাবেও তিনি সচেতন। নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত না হলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে যাতায়াতের ফলে এবং সাংবাদিক জগতের লোক হওয়ার দরুন বহির্বিশ্বের প্রতি তাঁর এই

সচেতনতা আরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের মনোজগতের যে পরিবর্তন ঘটছিল, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার পরিচয় মেলে; কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে কবিমানসের যে গভীর উপলব্ধির সম্পদ পরবর্তী কালের বাংলা কবিতায় আমরা পাই—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তা আশা করা যায় না। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তখন অবধি আমাদের সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রাণের যোগ ঘটেনি। এমন অবস্থায় যে ধরনের কবিতার সৃষ্টি সম্ভব, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তাই হ'য়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক, কিন্তু গঠন-ভঙ্গীতে প্রাচীন; পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী, কিন্তু আপন গভীরে ডুব দিতে নারাজ—এমনি এক বিশেষ ধরনের কবিতা তিনি লিখেছিলেন। সেই সব রচনার অধিকাংশই স্মৃতিচিহ্নমাত্র। কিন্তু কিছু রচনা সমকালীন আসর পেরিয়ে একালের আসরেও পাঠক বা শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। তাই ঈশ্বর গুপ্ত আজও আমাদের স্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের মনোভঙ্গীর পরিচয় হিসাবে প্রথমেই তাঁর ধর্মবিষয়ক কবিতা থেকে দু'চারটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মধ্যযুগের কোন কবি দেববন্দনার কালে যুক্তি বা শাস্ত্র বিচার করতে বসেননি। তাঁদের দেববন্দনায় আত্মনিবেদনই বড় কথা। ঈশ্বরগুপ্তের দেববন্দনায়ও বিতর্কের ছোঁয়া লাগে, ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকেও জাহির করতে কম উৎসুক নন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বঙ্কিমের মতো সমালোচকও মনে করতেন, 'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বর-চন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প'। কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে এ যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, একথা বঙ্কিমেরও মনে হয়নি!

এবার উদাহরণের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই ধরুন গুপ্ত-কবির ঈশ্বর-বন্দনা:

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?

এ ধরনের 'পিতৃপ্রেমে'র সঙ্গে রামপ্রসাদী ভক্তিরসের কোন তুলনাই করা চলে না।

'সংসার-জাঁতা' কবিতায় গুপ্ত-কবি একটি যুক্তি-আশ্রয়ী উপমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও সংসারের স্বরূপ বুঝাতে চেয়েছেন:

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয় পূর্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥

উপমা অবশ্যই সার্থক, কিন্তু এ কবিতার মূল অবলম্বন যুক্তি। মাঝে মাঝে এই যুক্তির সঙ্গে সরল ধর্মবোধের আন্তরিকতা এসে মিলেছে:

লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর পণ্ডিতপ্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রেম নাহি রয়।
যত পড, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥ (শাস্ত্রপাঠ)

ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসী। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিকতা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মচেতনা এদেশে কিছু নতুন নয়। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ধর্মচেতনার এই যুক্তিনির্ভর

প্রকাশভঙ্গীটাই নতুন। একদিক দিয়ে ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মিল আছে। যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতি এই আনুগত্যের দরুন তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে তির্যক দৃষ্টির তীব্রতা সঞ্চারিত। নীতিবিষয়ক কবিতা থেকে তার একটু উদাহরণ দিই :

শিষ্যের সম্পদ ছলে যে করে গ্রহণ,
গুরু ব'লে কিসে তারে করিব বরণ ?
শিষ্যের সন্তাপ যত যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু ব'লে পূজা করি তারে॥ (গুরু)

সাধুত্বের খাঁটি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সাধুনামধারী অসাধুদের প্রতি কটাক্ষ :

সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয়॥ (সাধু)

কিন্তু এই ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও তির্যক দৃষ্টির সমন্বয়ে গুপ্ত-কবি ভারতচন্দ্রের মত নিপুণ কাব্যকলা সৃষ্টি করতে পারেননি; অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকর বাচালতায় মুখর হয়েছেন :

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাঁক,
বাবা সব হায় ফাঁক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক॥
বাবা মিছা কর জাঁক॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক।...ইত্যাদি।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যছন্দ প্রাচীন পয়ার। এই পয়ারের যে দৃঢ় সংবদ্ধ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষময় রূপটি দেখি, সেটি ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পয়ারের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুইই বেশী। ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ একটু একঘেঁয়ে। তবে বিষয়বৈচিত্র্যের দরুন সেই একঘেঁয়েমি কিছুটা কমেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্ঘাত ও সম্মিলনের প্রথম প্রতিক্রিয়াজনিত বিদ্রূপভঙ্গী ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অন্যতম লক্ষণ। তখনও ইংরেজী কবিতার গভীরতর রসধারার সঙ্গে বাঙালীর আত্মিক পরিচয় ঘটেনি, তাই বাইরের অসঙ্গতিগুলি গুপ্ত-কবির শ্লেষপ্রধান মনোবৃত্তিটিকে পরিপুষ্ট করেছে। এই অসঙ্গতি আবিষ্কারের একটি সহজাত প্রবণতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। সেই কারণে ব্যঙ্গরসের কবিতায় আজও তিনি শীর্ষস্থানীয়। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত লক্ষণীয় : '—ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের গালাগালি শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত 'কবির লড়াই'য়ে শিক্ষিত—সে ধরনটা তাঁহার ছিল।' কবির লড়াই সব সময় শত্রুতাশূন্য ছিল কি না সন্দেহ; ঈশ্বর গুপ্তও সব সময় অপক্ষপাতী নন। তবু তাঁর কবিতায় ঈর্ষাদ্বেষ-মুক্ত ব্যঙ্গের রসিকজনোচিত প্রসন্নতা আমাদের মুগ্ধ করে। সমসাময়িক জীবনধারার প্রতি তাঁর অজস্র কটাক্ষের কিছু উদাহরণ দিই :

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে তাঁর বিখ্যাত আবেদন :

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিঙ্ বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস॥
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি খেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

সেকালের 'বাবু'-র বর্ণনা :

কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, কেমন হাতের কোড়া,
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া।
দেখ না কেমন, চিকন বসন, পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন, আর কি কাহারো হবে ?

সমকালীন সমাজের পরিবর্তন :

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিল খায় খানা॥
পিতা দেয় গলে সুত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে 'রাধাকৃষ্ণ', ছেলে বলে 'যিশু'॥

(অনাচার)

ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে সমাজে যে আচারগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার এই সরস বর্ণনাটি আজও সমান উপভোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর গুপ্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে তিনি 'মেকির শত্রু'। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের মুখে এমন সমালোচনা-প্রবণতা যুগলক্ষণ, কিন্তু এই সমালোচনার মধ্যে একটি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষণীয়। ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে জাতির পক্ষে কোন্ আদর্শ বা পন্থা গ্রহণীয় এ সম্বন্ধে কোন ধ্রুব মনোভাব রক্ষা করা কঠিন। তাই দেখতে পাই সিপাহী-বিদ্রোহের সম্বন্ধে তিনি রীতিমত বিরক্ত, অথচ দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি তাঁর কবিতায় উচ্ছ্বসিত। দেশপ্রেমিক হলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। ভারতবর্ষের হিন্দুয়ানির ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তাই বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে তিনি বিক্ষুব্ধ; ওদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাছে রদ হ'য়ে যায়—এজন্যও তিনি চিন্তিত। এই অসঙ্গতি স্বাধীন ভারতের সমালোচকদের কাছে অসহনীয় মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মোগল-সাম্রাজ্যের শেষভাগের শাসনক্ষেত্রে অব্যবস্থার তুলনায় ইংরেজ-শাসনের আপাত সুবন্দোবস্ত ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকেই মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। আর সিপাহী-বিদ্রোহ যে সাধারণ বাঙালীর মনে তেমন কোন সাড়া জাগায়নি, সে কথা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' অথবা শশিশেখর বসুর 'যা দেখেছি, যা শুনেছি' বই-দুটি পড়লেই বুঝা যায়। তাছাড়া সিপাহী-বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার সহায়ক হলেও সামগ্রিক গণচেতনা তাতে অনুপস্থিত ছিল বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা আরও আলোকপাত করতে পারেন।

বঙ্কিমের মতে—"ভারতচন্দ্রী ধরনটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র। কিন্তু আর একটা ধরন ছিল যাহা কখন বঙ্গভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাংলা ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা—এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরী, কাল উমেদারী, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী তাহা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখাইয়াছেন।" এইভাবে বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে কাব্যের যোগসাধন ক'রে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতায় মানবমুখী মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক বস্তুবাদী না হলেও বাস্তবের নিজস্ব সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত অগ্রগণ্য। আধুনিক বাস্তবতাবাদীদের মতো বাস্তবের একমাত্র দারিদ্র্যদীর্ণ রূপটিকেই তিনি সাহিত্যের সম্পদ ব'লে মনে করেননি। বরং জীবনরসরসিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা।'

রসনাব্যাপারে কবির অক্লান্ত উৎসাহ দেখে মনে হয়—আধুনিক বঙ্গসন্তানের আভিজাত্য-

লক্ষণ অজীর্ণরোগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। হেমন্তে বিবিধ খাদ্যের বিস্তারিত বর্ণনায় তাঁর শ্রান্তি নেই। পৌষড়ার গীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাওয়ার অপূর্ণ সাধের মধ্যেও দারিদ্র্যের বেদনা অনুপস্থিত। 'পৌষপার্বণ', 'পাঁটা', 'আনারস', বিশেষতঃ 'তপসে মাছ' চিরপ্রসিদ্ধ কবিতা:

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে;
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে॥

মধ্যযুগের সাহিত্যেও বাস্তবতার দিকে প্রবণতা ছিল; যেমন মুকুন্দরামের কবিতায় দুর্বলাদাসীর হিসাব দেওয়া, ভাঁড়ুদত্তের বাজার করা, ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনা। বিজয়গুপ্ত, দ্বিজমাধব, রূপরাম চক্রবর্তী এদের কবিতায় বাস্তব রসের সন্ধান মেলে। কিন্তু এই বাস্তবতা অনেকটাই ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। প্রথাবদ্ধ সংকীর্ণতার দরুন সেই বাস্তব রস দানা বাঁধতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কোন কবিরই নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব দৃষ্টি ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বুদ্ধিগত প্রেরণা বাস্তবধর্মী। কিন্তু এই বাস্তব প্রেরণাকে মননশীলতার দ্বারা যতটা বিশুদ্ধ ও মহৎ ক'রে তোলা যেত, ঈশ্বর গুপ্তের শিক্ষাগত সাধনার স্বল্পতায় তা সম্ভব হয়নি। একথাও স্মরণীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিছক বস্তুবাদের কোন স্থান নেই। ঈশ্বর গুপ্তের ঋতুবিষয়ক কবিতাবলী—যেগুলিতে তিনি কেবলমাত্র দৈনন্দিন সুখসুবিধার বিচারে ঋতুবর্ণনা করেছেন -- সেগুলি তাই কাব্যালোচনায় বর্জনীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের মানসলোকে উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের যে অরুণরাগ দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী বাংলাকাব্যধারায় তার দূরবিস্তৃত প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। রঙ্গলাল, মনোমোহন বসু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি এই আদর্শে প্রভাবিত। 'স্বদেশ' কবিতায় গুপ্তকবি লিখেছেন:

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমাকে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

অবশ্য বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর কখনই বরণীয় নয়, তবে পরাধীন জাতির কবির এই উগ্র স্বাদেশিকতা মার্জনীয়। সেই সঙ্গে এর আন্তরিকতা আজও শ্রদ্ধেয়।

গুপ্ত-কবির মননভূমিতে স্বদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবল ছিল। 'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ গদ্য কি পদ্য কিছুই লেখেন নাই।'—বঙ্কিমের এই 'খাঁটি বাঙ্গালা'র মতবাদ আজ সর্বাংশে গ্রহণীয় না হলেও দেশের মাটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের নিবিড় যোগের দিক থেকে কথাটি সত্য। ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির আবর্তে তখনকার পাশ্চাত্যমুখী জীবন-রুচির পটভূমিতে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশিয়ানা লক্ষণীয়। অবশ্য ডিরোজিও-শিষ্যেরাও তখন ধীরে ধীরে আত্মস্থ হ'তে শুরু করেছেন। আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাভাবসম্পন্ন একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-

প্রভাকরে' টমাস পেইনের Age of Reason-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (জানুআরি, ১৮৩২); কিন্তু 'নব্যবঙ্গে'র প্রগতিবাদের সঙ্গে গুপ্ত-কবির যেমন সহানুভূতি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দেশীয় সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি আস্থা। এ দুই মনোভাবের টানাপোড়েনে মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সে ত্রুটি মোচন করেছেন ব্যঙ্গরসের আয়োজনে।

উনিশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে যে গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বব্যাপী প্রভাব ছিল, ভারতচন্দ্রেই তার অবসান সূচিত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির শেষ স্বাক্ষর দেখা দিল। এর পর থেকে বাংলা সাহিত্য নাগরিক জীবনবোধের পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে।

বাংলা কবিতার জগতে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান খুব উঁচুতে নয়। জীবনের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের দিকে তাঁর যতটা লক্ষ্য ছিল, অনুভূতির অতলে ডুব দিতে তিনি ততটা দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু যথার্থ সাহিত্যরসিকরূপে তাঁর পরিচয় চিরকাল আমাদের স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। বাংলার প্রাচীন কবিকুলের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টায় তাঁর দান 'কবিজীবনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় মূল্যবান সম্পদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী" এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহস্পর্শে বাংলাসাহিত্যের যে সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানস মুকুলিত হ'য়ে উঠেছিল—সেই রঙ্গলাল, মনোমোহন, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র —এঁদের স্মরণ করেও আমরা এই সাহিত্যগুরুর প্রতি বাঙালী জাতির অপরিশোধনীয় ঋণের কিছুটা পরিমাপ করতে পারি।

সন্ধানী মন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

মন-তরী বেয়ে চলি আমি সারা বিশ্বে,
চঞ্চল বায়ু থির মোর গতি-দৃশ্যে।
বিশ্বের পারাবার করি আমি মন্থ,
খুঁজি সে অতল তল অমৃত পন্থ।

উদ্দাম উত্তাল ঘূর্ণী আবর্তে
ওঠে যদি হলাহল জীবনের পাত্রে,
আকণ্ঠ করি পান অকুণ্ঠ চিত্তে,
হবো নীলকণ্ঠ মৃত্যুরে জিততে।

ওঠে যদি অমৃত জীবনের পাত্রে
মৃত—হবো অমৃত পরশন মাত্রে।
সন্ধানী মনে মোর, আছে দৃঢ় প্রত্যয়—
মরি, বাঁচি, তীরে উঠি, নাহি ভয় সংশয়।

বিশ্বের পারাবার করি' আমি মন্থ
পেয়েছি অতল তল অমৃত পন্থ।
মনের গহনে জ্ঞান জলে অফুরন্ত—
প্রাণের জ্যোতিতে সে যে চির প্রাণবন্ত।

সমালোচনা

The Last Days of Mohenjodaro : স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ৭৩নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। ইহা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি সিরিজের চতুর্থ পুস্তক। ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮৲ টাকা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ এবং আমেরিকাতে পরিব্যাপ্ত চৌত্রিশটি স্থানের ভাষার অক্ষর এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিগণ কোথায় কোথায় বসতি করিয়াছিলেন। মহেনজোদারোর উপরে সিন্ধু-সরস্বতীর বদ্বীপে (Delta) ভারতীয় আর্যগণের আদিনিবাস ছিল, ইহা তিনি প্রমাণসহ আলোচনা করিয়াছেন। এই বদ্বীপ হইতে তাঁহারা একদিকে সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে, অন্যদিকে আফগানিস্থান ও পারস্যে এবং ইউফ্রেটিজ ও নাইল নদীর উপত্যকাতে, ফিনিসিয়া এবং ক্রীটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মহেনজোদারোর অধিবাসিগণ পরে যেখানে গিয়াছিলেন সর্বত্র তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উল্লিখিত দুইটি সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িলে অনেক অভিনব তত্ত্ব ও জ্ঞাতব্য নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। পুস্তকখানি প্রণিধানযোগ্য। —**মৈথিল্যানন্দ**

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব (প্রথম খণ্ড) ঃ শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক —শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাখনলাল ভৌমিক, ৭১।২৫সি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৮৪, মূল্য—টাকা ১·২৫।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 'সাধনসমর' গ্রন্থ লিখিয়া যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব—পূর্বনাম শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থে সত্যদেবের জন্ম ও বাল্য, নবানুরাগ, জীবন-সমস্যা, গুরুলাভ ও সাধনা, সমাধি ও সিদ্ধি, বিশ্বনাথ-দর্শন, জীব-সেবা, অলৌকিক পূজা, ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং গতানুগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা ও ব্যাকুলতা সহায়ে যে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ হয়, শ্রীশ্রীসত্যদেবের জীবন তাহাই প্রমাণ করে।

গ্রন্থের ভাষা সাবলীল ও সুখপাঠ্য, তবে ভক্তির আতিশয্যে কোন কোন স্থলে ভাষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভে যত্নশীল, তাঁহাদের সম্মুখে এইরূপ একটি আদর্শ জীবন রাখা অত্যাবশ্যক।

গুরুবাণী (হিন্দী) ঃ গুরু তেগ বাহাদুরজী প্রণীত, সন্ত করতার সিং অনূদিত। লিভারপুল প্রেস, ১০, শিবচরণ লাল রোড, এলাহাবাদ হইতে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা—৪৮, মূল্যের উল্লেখ নাই।

তেগ বাহাদুরজী নবম শিখগুরুরূপে চির-স্মরণীয়। তাঁহার জীবন বৈরাগ্যোজ্জ্বল ও তপস্যাপূত। দীর্ঘ ২৬ বৎসর তিনি এক গিরি-গুহায় তপস্যা করেন। তাঁহার ছন্দোবদ্ধ বাণী তৎকালীন প্রচলিত হিন্দীতে প্রচারিত হইয়াছিল। এই বাণী শিখদিগের নিকট 'গ্রন্থ-সাহেবে'র মতোই সমাদৃত। প্রত্যেকটি কবিতায় শিখদিগের আদিগুরু নানকের নাম লিপিবদ্ধ।

সন্ত করতার সিং সহজ সরল হিন্দী অনুবাদ সহ এই কবিতাবলী প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—**জীবানন্দ**

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—দ্বিতীয় সংস্করণ : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত ; প্রকাশক : স্বামী অভয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৪২১+৪৪ ; মূল্য টাকা ৫'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের জন্ম ও জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরগণের সান্নিধ্যে তাঁহার সাধনার জীবন এবং সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বিকাশ ও গতি এই গ্রন্থে সময়ানুক্রমিক ভাবে সুখপাঠ্য ভাষায় সুবিন্যস্ত। এই পুস্তক ঠিক জীবনী-গ্রন্থ বা ইতিহাস পর্যায়ভুক্ত নয়, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন ও কর্মের কতকগুলি নির্বাচিত ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৬৩ সালে। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর কিছু কমাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্ট হইতে পূজ্যপাদ মহারাজের রচনাবলীও কিছু কমানো হইয়াছে। এই সংস্করণে মোট ৬ খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের ৩ খানি।

আশ্রম (ত্রয়োদশ বর্ষ—১৩৬৬): সম্পাদক—শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রকাশক—স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা—১১৬।

রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রদের এই পত্রিকাখানি পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা ও রচনাসম্ভারে সুমুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা : প্রাচীন ভারতে শিক্ষা, সোনার তরী ও রবীন্দ্রজীবন-দর্শন, বস্ত্রশিল্পের ইতিকথা, পরমাণুর আত্মকথা, জাতীয় জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা, চরিত্র। 'আশ্রম-সংবাদ', 'সম্পাদকের কথা' পাঠ করিলে সারা বছরের কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি ছবিতে বালকাশ্রমের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

সন্দীপন (প্রথম সংখ্যা—১৯৬০): সম্পাদক—শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—স্বামী বিমুক্তানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—৬৪।

বেলুড়ে অবস্থিত সারদাপীঠের অন্তর্গত এই শিক্ষণ-মন্দিরটি (B. T. College) অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে বিরাট ও মহান্ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযত্ন প্রয়োজন। দেশের বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সন্তানগণ যদি ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন, তবেই দেশের কল্যাণ। ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত ১৪টি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ 'সন্দীপন'-পত্রিকাটি পড়িয়া মনে হইল, উক্তরূপ ছাত্রগণই ক্রমশঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশীর্বাণীপূত পত্রিকাটির দীর্ঘ এবং কল্যাণময় জীবন প্রার্থনা করি। অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 'Foreword'-এ স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ অতি অল্প কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনটি বাংলা কবিতা ও একটি সংস্কৃত রচনা 'শিক্ষায়াম্ ধর্মস্য স্থানম্' শিক্ষক-ছাত্রদের উৎকর্ষেরই ইঙ্গিত দেয়। 'আমাদের কথা'য় প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

মেদিনীপুর: ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৯ই মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জন্মতিথি-দিবসে মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন, চণ্ডী-পাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতাদি হয়। বেলা ৮টা হইতে বিশেষ পূজার পর হোম ও ভোগারতি হয়। দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৬ই মার্চ সাধারণ উৎসব-দিনেও ভোর হইতে উষা-কীর্তন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৪ হাজার নর-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত হয়।

৯ই মার্চ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

টাকী: গত ২০শে মার্চ রবিবার হইতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসত্রয়ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে।

প্রথম দিন প্রভাতে মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, হুগলী মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী দেবানন্দজীর বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন গানের পর ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতালোচনার পর পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক বাউল-সঙ্গীত এবং রাত্রি ১০ ঘটিকায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দ কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শনের পর আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'অভিষেক' নাট্যাভিনয়ের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে পালিত হয়। ঐ দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ৩রা মার্চ হইতে দ্বার-ভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ কথক কীর্তনাচার্য সূর্যনারায়ণ ঠাকুর তিন দিন কথকতা করেন। ৬ই মার্চ সন্ধ্যারতির পর একটি জনসভায় বিহার পাবলিক সারভিস্ কমিশনের সদস্য শ্রীবিশ্বমোহন কুমার সিন্‌হার সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় হিন্দীতে মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত ভাষণ দেন পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিহর প্রসাদ উপাধ্যায়। স্বামী নিরাময়ানন্দের বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেন। উৎসব

সমাপ্ত হয় কাশী হইতে আগত শ্রীমোহনলাল ব্যাসের দুই দিন 'রামচরিতমানস' প্রবচনের পর।

জামসেদপুর : স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ 'সিষ্টার নিবেদিতা উচ্চ বিদ্যালয়' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের' ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে শিক্ষার উচ্চাদর্শ উপস্থাপিত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তিনি বিবেকানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সিদ্‌গোড়া ও বিবেকানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (হরিজন বিদ্যালয়) পারিতোষিক বিতরণ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লেডী ইন্দ্রসিংহ উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ২০শে মার্চ শ্রীসেনের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই সভায় অধ্যাপক এ. মিশ্র এবং শ্রীযুত শিবদাস মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।

সোসাইটি-প্রাঙ্গণে গত ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে অতি সুললিত ভাষায় বিশদ আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বক্তৃতান্তে দুই দিনই শ্রীযুত বিশ্বনাথ মৈত্র মহাশয় (বেতারশিল্পী) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় ভজনগান করিয়া সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করেন।

নারায়ণগঞ্জ : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়।

প্রথম দিন অপরাহ্ণে স্বামী শর্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যহ প্রায় ৩০০০ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-নাটক অভিনীত হয়। পঞ্চসহস্রাধিক দর্শকমণ্ডলী উভয় দিবস অভিনয় দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। তৃতীয় দিন কৃষ্ণলীলা, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়।

১৯শে ফাল্গুন শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক বৈদিক শান্তিবচন পাঠ, উদ্বোধন-সঙ্গীত ও স্বামীজীর লেখা 'অম্বাস্তোত্রম্' এবং 'সখার প্রতি' আবৃত্তির পর ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। ২০শে ফাল্গুন বিকালে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় প্রথমেই স্থানীয় কেন্দ্রের অধ্যক্ষ উক্ত কেন্দ্রের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি সাহেব ইস্‌লাম ধর্ম, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী খৃষ্টধর্ম, শ্রীগগনচন্দ্র আচার্য ব্রাহ্ম ধর্ম এবং শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পঞ্চসহস্রাধিক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। ২১শে মহিলাসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচিত হয়। ২২শে ১০,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গত ৭ই হইতে ১৩ই মার্চ নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত

হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষণীয় জিনিস দেখানো হয়। 'অম্বর চরকা'য় সুতা কাটা দর্শকগণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আনন্দদায়ক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কথকতা, তরজা, বাউলগান, কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার, পুতুলনাচ, গাদিখেলা, বাজিপোড়ানো প্রভৃতি।

উৎসবের শেষ দিনে ছিল পুরস্কার-বিতরণ, ১১০৲ টাকার পুরস্কার কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২০শে হইতে ২৬শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির (B. T College) কর্তৃক শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয় শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দশ হাজার দর্শক এই 'প্রদর্শনী'টি দর্শন করেন। প্রদর্শনীতে প্রাচীরপত্র, মডেল, ছবি, হাতের কাজ প্রভৃতি দেখানো হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচিতিটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে স্বামীজীর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রাখা হয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত স্বামীজীর পুস্তকাবলী এবং তাঁহার হস্তাক্ষর আকর্ষণের বস্তু ছিল। একটি কক্ষে সারদাপীঠের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ও ইহাদের কার্যাবলী দেখানো হয়। ২৩শে জানুআরি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

কাঁথি (মেদিনীপুর): গত ১৮ই চৈত্র শুক্রবার হইতে রবিবার পর্যন্ত নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৫ তম শুভ জন্মোৎসব দিবসত্রয়ব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক ও চণ্ডীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য অনেক আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রা সহযোগে মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্বক বেদীতে দেবতা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়; সবৎসা গাভীর পশ্চাতে নারায়ণ-শিলা ও বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ লইয়া ব্রহ্মচারিগণ বেদপাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ যাইতে থাকেন এবং ছত্র চামর ও ব্যজনী হস্তে সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের অনুসরণ করেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্তন করিতে করিতে আসিতে থাকেন। শুভক্ষণে ৮টা ২২ মিঃ-এ একটি প্রাণস্পর্শী পরিস্থিতির মধ্যে বেদীতে প্রতিকৃতি স্থাপনের পর বেদমন্ত্র আবৃত্তি ও যজ্ঞমণ্ডপে বাস্তুযাগ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নবনির্মিত মন্দিরে বিশেষ পূজা চণ্ডীপাঠাদি আরম্ভ হয়। এইদিন প্রায় ২৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় এক ধর্মসভায় স্বামী জপানন্দের বক্তৃতার পর সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী প্রার্থনা করেন, 'এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বহু ভক্তের কল্যাণ করিবেন।'

পরদিন সকালে সপ্তশতী হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী জপানন্দজীর সুললিত ভাষণের পর শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য কর্তৃক গীত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত সঙ্গীতগুলি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন রচয়িতা স্বয়ং। ডঃ রমা চৌধুরীর মনোজ্ঞ ভাষণের পর ডঃ শ্রীযুত চৌধুরীর ভাষণ ও শ্রীভট্টাচার্যের

গানগুলি ভক্তগণকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখে। পরদিন বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণকে সেবা করা হয়। ভক্তগণ ৩।৪ মাইল দূর হইতে দলে দলে কীর্তন সহকারে আসিয়া আশ্রম প্রাঙ্গণ খোলকরতাল-ধ্বনির সহিত নৃত্যগীতাদির দ্বারা মুখরিত রাখিয়াছিল। কয়েকটি দলে ৭।৮ বৎসরের বালকগণ মূল গায়েনের কাজ করিয়াছে। সন্ধ্যায় হাওড়া সমাজ কর্তৃক 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয়ে সহস্র সহস্র নরনারী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি-উৎসব

সারগাছি : গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা-দিবসে সারাদিনব্যাপী কর্ম-সূচীর মাধ্যমে ১৮৯৭ খৃঃ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবা-কার্যের এবং ১৯২৮ খৃঃ ঐ দিনেই সারগাছি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে মঙ্গলা-রতি, বিশেষ পূজা, হোমের পর সমাগত ভক্ত ও গ্রামবাসিগণ প্রসাদ ধারণ করেন। আশ্রমস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরাট হলে সকালে ভজনগান ও শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত' পাঠের পর একটি ভক্তের ডায়েরি হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা পঠিত হয়। বৈকালে সভায় এই দিনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এবং ভক্তগণ স্বামী অখণ্ডানন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন : সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭ খৃঃ হইতে আর্তসেবারত। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্রগুলির সেবাকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই সেবাশ্রম তাহাদের অন্যতম। ১৯৫৮ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা :

অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল : শয্যা ৫৫, ২,৭৪৯ রোগী ভর্তি হয়, অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৬৪৬টি।

বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয় : রোগী-সংখ্যা —পুরাতন ৭৫,৩৩৬, নূতন ৫০,৯৪৭; অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৬৬৯টি, দৈনিক ৩৪৬টি রোগী চিকিৎসিত হয়।

চক্ষুচিকিৎসালয় : এই বিভাগটি ১৯৪০ খৃঃ খোলা হয়। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের চক্ষুচিকিৎসা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর নিকট ও দূরাঞ্চলের সহস্র সহস্র চক্ষু-রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ : এই বিভাগে নূতন ৯,২৮২ এবং পুরাতন ২১,১৯২ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

৪৫৬টি এক্স-রে পরীক্ষা ও ইলেকট্রো-থেরাপি বিভাগে ১৫০ জনের চিকিৎসা হয়। ক্লিনিক্যাল লেবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্যা ৪,১৪৮।

সাহায্য : ৮জন নিরাশ্রয় বিধবাকে মাসিক ও সাময়িক সাহায্য বাবদ ২৩৯ টাকা দেওয়া হয়।

স্থান-পরিবর্তন : জয়পুর মন্দিরের বিপরীত দিকে মথুরা-বৃন্দাবন রোডের পার্শ্বে প্রায় ২৩ একর পরিমিত জমির উপর সেবাশ্রমের সমুদয় বিভাগ স্থানান্তরিত করার জন্য ভবন-নির্মাণ-কার্য চলিতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্‌কো : প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং প্রতি বুধবার বেলা ৮ টায় তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ অথবা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সোসাইটির নিজস্ব নূতন ভাষণগৃহে বেদান্ত ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

নভেম্বর '৫৯ : শক্তিমান্‌রাই ধন্য; মৌনাভ্যাস; মনঃসমীক্ষণ, ঈশ্বরলাভের জন্যই বাঁচা; শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন নৃত্য; চিন্তার শক্তি;

শাশ্বত শান্তি ও শাশ্বত জ্যোতি; ব্যক্তি-মানস ও বিশ্ব-মানস ; ঈশ্বরের পথ মানুষের সঙ্গেই।

ডিসেম্বর '৫৯ : অহংকার ও আত্মার পার্থক্য; বিবেককে কিরূপে জাগানো যায়, হিন্দুধর্মে মুক্তির অর্থ; ধ্যান কাহাকে বলে? অন্তরের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দাও; ঈশ্বর কি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন? শ্রীমা সারদাদেবী ; দেবমানব খৃষ্ট।

জানুআরি '৬০ : নববর্ষে আমরা কি করিব? বেদান্তের সমাধি ও বুদ্ধের নির্বাণ, কে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ? হিন্দুর দৃষ্টিতে স্বর্গ ও নরক; আত্মিক শক্তি কি? আমরা মানুষের কি করিতে পারি—সাহায্য, না সেবা? স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান মানবের আদর্শ; ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বারাসত : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে জানুআরি ভাব-গাম্ভীর্যের সহিত পালিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ২৮শে ফেব্রুআরি এবং ৪ঠা ও ৫ই মার্চ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর প্রথম দিন চণ্ডী গীতা ও উপনিষদ্‌পাঠ, বিশেষ পূজা হোম আবাত্রিক ও ভোগনিবেদনান্তে বেলা ১২টা হইতে সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও সায়াহ্নে ভজন হয়। পরদিন উদয়াস্ত অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয়। সন্ধ্যারতির পর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কর্তৃপক্ষ আলোকচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। শেষদিন প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পারায়ণ-পাঠ হয়, অপরাহ্ণে একটি জনসভায় শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ভাষণ দিলে পর সভাপতি স্বামী জপানন্দ বলেন। সভান্তে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সঙ্গীত সহযোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাবির্ভাব-লীলা সম্বন্ধে কথকতা করেন।

হাফলং (আসাম) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে উহার উপজাতীয় আবাসিক ছাত্রাবাসে গত ২৮শে ফেব্রুআরি মঙ্গলারতি, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতপাঠ, ভজনসঙ্গীত ও প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে হাফলং-এর সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আধ্যাত্মিক ভাব-গাম্ভীর্যে বহু লোকের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়।

আজমীর : গত ১৫ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, ভজন, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ হয় এবং অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, ভজন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী এক জনসভায় আলোচিত হয়। ২২শে ফাল্গুন আজমীর টাউন হলে আয়োজিত ধর্মসভায় রাজস্থান পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীলক্ষ্মীলাল জোশী সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিত কিষণলাল দ্বিবেদী, কুমারী শান্তিদেবী শর্মা, স্বামী একাত্মানন্দ ও স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও অমৃতময়ী বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সালেপুর (উড়িষ্যা) : রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১লা জানুআরি কল্পতরু, ২৮শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের এবং ২৮শে ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হয়, এই দিবসত্রয় সকাল হইতে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ এবং জনসভা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দিনে অপরাহ্নে জনসভায় উভয়ের মহিমামণ্ডিত জীবন বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

কদমতলা (হাওড়া) : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ-ভবনে সঙ্ঘের ১১শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে ফেব্রুআরি শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী জীবানন্দ। সভার পর শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

২৮শে ফেব্রুআরি রবিবার ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া শোভাযাত্রা ও নগর-প্রদক্ষিণ, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, নরনারায়ণ-সেবা ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' গীতাভিনয় হয়। দিবসদ্বয়ব্যাপী উৎসব বিশেষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সহিত সুসম্পন্ন হয়।

কুমিল্লা : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১লা হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্যন্ত। প্রথম দুইদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও পুঁথিপাঠ হয়। তৃতীয় দিবসে সাধারণ সভায় আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণী ও পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ভাবধারা অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়; সভাপতিত্ব করেন ঢাকার অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার গুহ। চতুর্থ দিবসে সারাদিনব্যাপী উৎসবে সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। চার দিনই সন্ধ্যার পর রামায়ণ গান হয়।

তেজপুর : গত ২৮শে ফেব্রুআরি রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পূর্বাহ্নে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, আরাত্রিক, ভোগ, প্রভৃতির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্মার সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলালহরী (কথিকা) সঙ্গীত সংযোগে বর্ণিত হয়। রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পঞ্চম পায়োনীয়ার : যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় গত ১১ই মার্চ পঞ্চম পায়োনীয়ারকে মহাশূন্যে পাঠানো হইয়াছে।

রকেট-যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত পঞ্চম পায়োনীয়ার উপগ্রহটির চরম গতিবেগ হইয়াছিল ঘণ্টায় ২৭,৮৭৯ মাইল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-সীমানা ছাড়াইয়া যাইবার পর গতিবেগ কমিয়া দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৭,৬৬৯ মাইল। পঞ্চম পায়োনীয়ার এখন পৃথিবী হইতে ৭,১৩৮৯৪ মাইল দূর পথ দিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গোলাকৃতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ব্যাস ২৬ ইঞ্চি। ইহার চারিদিকে চারটি 'প্যাডল' বা পাখনার মতো আছে। ইহার ওজন ৯৪.৮ পাউণ্ড। মহাশূন্য হইতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পঞ্চম পায়োনীয়ার নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছে :

(১) তেজোবিকিরণ সংক্রান্ত, (২) মহাশূন্যের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কিত, (৩) মহাশূন্যে বিচরমাণ প্লাজম-মেঘের গ্যাসময় রূপের ক্রিয়াকলাপ, (৪) মহাশূন্যে ধাবমান অতি ক্ষুদ্র উল্কারাশির কার্যকলাপ এবং (৫) সূর্যমণ্ডলের জলন্ত শিখার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদি সংক্রান্ত বিষয়।

[আমেরিকান রিপোর্টার হইতে সংকলিত]

উদ্বোধন

বৈদিক প্রার্থনা

[বসিষ্ঠ ঋষি রাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎপুনানা যংত্যনিবিশমানাঃ।
ইংদ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ১
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবংতি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ২
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাং।
মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৩
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জং মদংতি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৪

[—ঋগ্বেদ সংহিতা, ৭ম মণ্ডল—৪৯ সূক্ত]

বৈদিক ঋষিগণ আকাশে বাতাসে মেঘে আলোকে জলে দেবতাশক্তির সঞ্চরণ অনুভব করিতেন। সেই সকল শক্তিকে মিত্র বরুণ ইন্দ্র আদিত্য অপ্—কত নামে ডাকিতেন, এবং সরলভাবে তাঁহাদের তুষ্ট করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা তাহাদিগকে জানাইতেন, হৃদয়াবেগপূর্ণ সেই স্তুতিগুলি সূক্ত নামে পরিচিত। বর্তমান সূক্তটির ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা অপ্, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্।

অপ্‌সমূহের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন—হে সমুদ্র, সর্বদা গতিশীল ও পাবনকারী! তোমার অন্তর হইতেই বাষ্পাকারে উঠিয়া জলরাশি মেঘরূপে অন্তরীক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে! বজ্রধারী ইন্দ্র সেই মেঘে বন্দী অপ্‌দেবতাকে মুক্ত করিলেন। তিনি এই স্থানে আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ১

যে অপ্‌দেবতা দ্যুলোকে উৎপন্ন হইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হন, যে জলরাশি পৃথিবীর উপরিভাগে প্রবাহিত অথবা অন্তর্দেশে লুক্কায়িত, যাহাকে খনন করিয়া লাভ করা যায়, যে জলরাশি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে—সেই সুন্দর উজ্জ্বল পবিত্র অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ২

যে অপ্‌সমূহের স্বামী সর্বাবরক বরুণ দেবতা জলমধ্যে সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হইয়া হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে আছেন, মধুর উজ্জ্বল পবিত্র সেই অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৩

যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহা সোমরসের অধিষ্ঠান, যাহার শক্তিতে বিশ্ব দেবগণ অন্নলাভ করিয়া আনন্দিত হন, বৈশ্বানর অগ্নি (প্রাণিদেহস্থিত পাচনশক্তি) যাহাতে প্রবেশ করেন—সেই দ্যুতিমান্ অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৪

কথাপ্রসঙ্গে

বিদেশী সাংবাদিকের চোখে

অতীতে বিদেশী পর্যটকদের চোখে ভারতবর্ষ চিরদিন শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তাহার বহু নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানেও দেশবিদেশের বিশিষ্ট নেতারা ভারতে আসেন—রাজধানীর সমারোহ দেখিয়া, বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রে গিয়া ভারতকে আধুনিকীকরণের বহুমুখী প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। একটি দেশে বেড়াইতে আসিয়া সে দেশের প্রশংসা করিয়া চলিয়া যাওয়াই শিষ্টাচার। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। না, আমরা মিস্ মেয়ো বা তাঁহার মতো ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বই লিখিবার জন্যই কোন দেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, এবং খুঁজিয়া-পাতিয়া সে দেশের শুধু নর্দমা দেখিয়াই তাহার বিবরণী লিখিতে বসেন।

সে যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন ভারতে রাষ্ট্রীয় আহ্বানে আগত বিদেশী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বহু ভ্রমণকারী, বহু বিদেশী সাংবাদিক আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতকে ভালবাসেন।

সম্প্রতি এমন একজনের লেখা পড়িয়া আমরা অপরের চোখে প্রতিফলিত আমাদের প্রকৃত রূপ—কিছুটা দেখিতে পাইলাম। লেখিকা ইঙ্গ ডয়েট্‌স্ক্রন, জার্মান সাংবাদিক। Hindusthan Standard-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধটির নাম 'India Revisited' *। তিনি পূর্বেও ভারতে আসিয়াছেন, চলিয়া গিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে আবার ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বে কিছু লেখেন নাই, কারণ তাঁহার ভয় ছিল—সদ্য সদ্য কিছু লিখিলে বোধ হয় ভাবাবেগই প্রাধান্য লাভ করিবে।

অতি নিকটে থাকিয়া প্রিয় জনকে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তাই বুঝি মাঝে মাঝে দূর হইতে দেখারও প্রয়োজন আছে! অপরের চোখে পরিবর্তন যতটা ধরা পড়ে, নিজের চোখে ততটা পড়ে না; তাই অপরের সমালোচনার বা নিন্দাপ্রশংসার মূল্য শুধু উন্নতি-অবনতির গতিরেখা জানিবার জন্যই নয়,—অপরের দৃষ্টিতে প্রতিভাত নিজের দোষত্রুটি সময়মত জানিতে পারিলে সংশোধনের ব্যবস্থাও সম্ভব।

একথা অবশ্য স্বীকার্য এই মহিলা একজন সাংবাদিক মাত্র; কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নন, বিখ্যাত কোন মনীষীও নন, যাঁহার লেখার উপর এতটা প্রাধান্য দিতে হইবে। লেখিকা বিশ্ব-বিশ্রুত কোন ব্যক্তি নন বলিয়াই আমরা তাঁহার মতামতের অধিকতর মূল্য দিতেছি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি—বিশেষত রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিদের উক্তি দুর্বোধ্য যুক্তিজালে, পরিসংখ্যানের গোলকধাঁধায় বা কূটনৈতিক কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন থাকে; তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করিতে হইলে দুইটি লিখিত পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী আর একটি অলিখিত পঙ্‌ক্তি পড়িতে হয় ও তাহার মর্ম বুঝিবার কৌশলও আয়ত্ত করিতে হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রনেতাগণের গতিবিধি তো ছককাটা, তাঁহাদের মতামতও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা।

* Inge Deutschkron, Bonn Correspondent, Hindusthan Standard.

বর্তমান লেখিকার রচনা এরূপ নয়, ইহাতে আমাদের আত্মসমালোচনার যথেষ্ট খোরাক রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে লেখিকা ভারতে আসিয়াছেন, আশা করিয়াছিলেন—অনেক কিছু পরিবর্তন দেখিবেন। তিনি শুনিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর জাপান কি দ্রুত উন্নতি করিয়াছে; তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর জার্মানিও কি ভাবে পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; বিপ্লবোত্তর চীনের বৈষয়িক উন্নতিও জগৎকে চমকিত করিয়াছে; তাই তিনি আশা করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে ভারতে আসিয়া বিপুল পরিবর্তন দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। ভারতে যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা নয়; কালপ্রভাবে সকল দেশেই পরিবর্তন ঘটিতেছে, এখানেও ঘটিয়াছে। কিন্তু কই?—ভারতের জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব কি দূরীভূত হইয়াছে? তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কি কিছু উন্নতি হইয়াছে? বিশেষ কিছু পরিবর্তন তাঁহার চোখে পড়ে নাই। দরিদ্র জনসাধারণ যেরূপ অসহায়ভাবে শহরে আসিয়া জটলা করিত পাঁচ বৎসর আগে, এখনও তাই করে ক্ষুধার তাড়নায়—কাজের সন্ধানে। তাহাদের দেখিলে তো মনে হয় না যে তাহারা ভাল খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও ভারতের উন্নতি বিষয়ে পূর্বের মতোই সংশয়াকুল, নৈরাশ্যব্যঞ্জক সমালোচনায় মুখর, নিজ নিজ সংসার-পরিবারের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ পরিচালনা-ব্যাপারে সর্বদা উদ্বিগ্ন, তাহারা যে সুখী—একথা একবারও মনে হয় না।

তবে পরিবর্তন কোথায়? বাহির হইতে দেখিলে বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলিলে পরিবর্তনের কথা কানে আসে, প্রাণে বাজে—তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা। পাঁচ বৎসর আগে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর যে গর্ব বোধ ছিল, আজ তাহা দেখা যায় না, অথচ এই প্রকার গৌরববোধ ছাড়া কি করিয়া একটি জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে? আশা আজ অবসাদে পর্যবসিত। একটা আলস্য জাতির বৃহৎ অংশকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্বার্থপরতা সরীসৃপের মতো জাতির দেহমনকে জড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজের প্রায় সর্বস্তরে দুর্নীতি দেখা দিতেছে।

লেখিকার মন্তব্য: ভারতের ধনী সম্প্রদায়—যাহাদের তুলনা ইওরোপে নাই, আমেরিকায় অবশ্য আছে—তাহারা আরও ধনী হইতে চায়, তাহাদের কোন জাতীয়তা-বোধ নাই, জাতির পুনর্গঠনে তাহাদের কোন দায়িত্ববোধ নাই। ধনসঞ্চয়ের ঊর্ধ্বসীমা বাঁধিয়া দিয়া রাষ্ট্রনেতারা ধনীদিগকে হতাশ করিয়া রাষ্ট্রের শত্রু করিতে চান না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: এই ধনীরা কি অপরিমেয় ধন-সঞ্চয়ের দ্বারা এখনই স্বদেশের ও স্বজাতির শত্রুরূপে পরিগণিত হইতেছে না? দরিদ্র দেশবাসীর সহিত তাহাদের যোগাযোগ কোথায়? তাহারা কি সর্বতোভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন করিতেছে? তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে—অদূর ভবিষ্যতে তাহারও কোন আশা নাই।

ভারতের ধনীর তুলনা যেমন ইওরোপে নাই, লেখিকার মতে ভারতের দরিদ্রের মতো এত দরিদ্রও ইওরোপে নাই, ভারতের দরিদ্র যেন আজ হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, সে মনে করে—তাহার আর উন্নতির আশা নাই। আজ সেও শিখিতেছে সরলতা ছাড়িয়া কপটতা,

সেবার ভাব ছাড়িয়া স্বার্থপরতা। বিনা পয়সায় কেহ এখন আর গ্রামরক্ষার বাঁধে এক ঝুড়ি মাটিও দিতে রাজী নয়, নলকূপের সামান্য মেরামতটুকু করিতেও গ্রামবাসীরা নিজেরা সমর্থ নয়। সব কিছু সরকার বা সরকারী কর্মচারীরা করিয়া দিবে—ইহারাই তাহাদের আশা, ইহাই তাহাদের দাবি।

ভারতের মানুষ কেন এত অলস? কেন এত উদাসীন—উৎসাহহীন? জাতীয় উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় কেন এই সহযোগিতার অভাব? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের আস্থা কেন দৃঢ় হইতেছে না? ভাসা-ভাসা দেখিলে কিছুই ধরা পড়ে না, তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায়—এমন কিছু ঘটে নাই, যাহা জনসাধারণের জীবন স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে বা সময়ের প্রয়োজনে ভারতে বড় বড় কল-কারখানা গোটাকতক হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্রভাবে জাতির জীবনধারা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। মানুষের মুখের গ্রাস বাড়ে নাই, বাড়িবার আশাও বাড়ে নাই।

শিল্পযুগ ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইস্পাত কারখানা—একটির পর একটি স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু তাহা দেশবাসীর মনে কোন আশার সঞ্চার করিতেছে না। ইস্পাত-কারখানায় খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না; খাদ্য উৎপন্ন করিবার যন্ত্রপাতি লাঙ্গল-কোদালও নয়,—ক্ষেতখামারে জলসেচ করিবার পাম্পও নয়। সাধারণ মানুষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মহিমা বুঝিতে পারে না। ক্ষুধার্ত মানুষ চোখের সামনে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতে দেখিলে সুখী হইত, নিশ্চিন্ত হইত, জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় বর্ধিত বেগে আগাইয়া আসিত।

দেশে উন্নয়ন-পরিকল্পনার অভাব নাই, ইহার অধিকাংশই উপর হইতে নীচে নামিতেছে, কিন্তু যথার্থ উন্নয়নের গতি নিম্ন হইতে উপরে। গ্রাম-উন্নয়নে গ্রামবাসিগণ দর্শক মাত্র, বড় জোর শ্রোতা। গ্রামে যাঁহারা উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে আসেন, তাঁহারা গ্রামবাসীদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন না; গ্রামবাসীরাও তাঁহাদের ভাষা শুনিয়া ও ভূষা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিদেশীই মনে করে, তাঁহাদের খুব কাছে আসিতে সাহস করে না।

এখানে-সেখানে দুই একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপিত হইলেও সাধারণ গ্রামের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই, গ্রামের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া সেগুলি দূরীভূত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, গ্রামবাসী যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। গ্রামের উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন পথ-ঘাট ও কৃষির উন্নতি, তারপর কুটির শিল্পের,—যাহাতে গ্রামবাসী গ্রামে থাকিয়াই নিজেদের সংসারের উন্নতির সহিত দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারে। ভারী শিল্প অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাহা যেন কৃষি ও কুটির-শিল্পকে ব্যাহত না করে। যদি ব্যাহত করে—তবে দেখা দেয় দেশব্যাপী অভাব ও অসন্তোষ।

বিদেশ হইতে খাদ্য ভিক্ষা করিয়া একটি জাতি দীর্ঘদিন তাহার মেরুদণ্ড সোজা রাখিতে পারে না। অর্থ, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু উন্নয়ন করা যায় তাহাই স্থায়ী হয়, কল্যাণকর হয়; ধার করা উন্নয়ন চমকপ্রদ হইলেও স্থায়ী হয় না, কল্যাণপ্রদ হয় না।

লেখিকা লক্ষ্য করিয়াছেন, নেতারা আজ একটিও নূতন ভাব দেশবাসীকে দিতে পারিতে-

ছেন না। পুরাতন বুলিগুলিই বিভিন্ন ভাবে বলিয়া আসর গরম রাখিতেছেন। ব্যক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতা বাড়িয়াছে। দেশ বা নীতি বড় কথা নয়, ব্যক্তিই বড়; গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা বড়ই বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব জাতির জীবন ক্ষুণ্ণ করে, নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, নূতন ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, নূতন চিন্তার স্রোত চালু হইতে পারে না। এই ভাবেই জাতীয় জীবনে ভাটা পড়ে, জড়তা আসিয়া যায়, জাগরণের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অবশ্য এ কথা ঠিক—ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যখন আবার নূতন ভাবের আত্মপ্রকাশের সময় আসে, তখন কেহই তাহাকে রোধ করিতে পারে না। সে জাগরণের আন্দোলন তাহার নিজস্ব গতিবেগ নিজেই রচনা করিয়া অগ্রসর হইবে। এরূপ সামগ্রিক জাতীয় জাগরণ এখনও কতদূরে—কে বলিতে পারে?

ভারতের উপেক্ষিত কৃষক, তাঁতি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিজেতার নিপীড়ন এবং স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও স্মরণাতীত কাল হইতে নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে, এবং ইহার জন্য কোন দিনই তাহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় নাই। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা চাষী, মুচি, ঝাড়ুদার প্রভৃতির কর্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা অনেক বেশী। তাহাদেরই নীরব অকুণ্ঠ পরিশ্রম যুগ যুগ ধরিয়া দেশের যাবতীয় ধন সম্পদ উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

ভারতের এই সব কৃষক ও শ্রমিকবৃন্দ যদি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মত দুচারখানা কেতাব না পড়িয়া থাকে, বা তাহাদের মত পোষাকী সভ্যতা বরণ না করিয়া থাকে, তাহাতে কী আসে যায়? এগুলির মূল্য কতটুকু? মনে রাখিও—সব দেশে ইহারাই জাতির মেরুদণ্ড। ইহারা যদি কাজ বন্ধ করে, তোমাদের অন্নবস্ত্র আসিবে কোথা হইতে?

* * *

বহুলোকের উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কাপুরুষও অনায়াসে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির অগোচরে সামান্য কাজেও যে ব্যক্তি ঐ প্রকার স্বার্থশূন্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে, সেই যথার্থ ধন্য। হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমিকবৃন্দ, তোমাদের কর্ম বাস্তবিকই এই পর্যায়ের। তোমাদের অভিবাদন করি।

* * *

মনে রাখিও দরিদ্রের কুটিরেই ভারতীয় জাতির বসতি। কিন্তু হায়, তাহাদের জন্য কেহ কখনও কিছু করে নাই। —বিবেকানন্দ

চলার পথে

'যাত্রী'

ধর্মের ইতিহাস যাদুঘরের ইতিহাস নয়। পুরাতত্ত্ব এর মধ্যে থাকলেও যদি তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তাকে আমরা আর যাই কিছু বলি না কেন, তা যে যথার্থ অধ্যাত্ম-রাজ্যের বিষয়ীভূত নয়, এ কথা বলতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি: বুদ্ধের জীবন ২৫০০ বছর আগেকার ইতিহাস বলেই তা ধর্ম নয়, সেই ইতিহাস বা সেই সময় আজও কোন-না-কোন আনন্দময় ভাবরূপে বিভিন্ন মানব-মনে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাকে সুন্দর, পবিত্র ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে উদ্বুদ্ধ করছে বলেই বুদ্ধের জীবনীকে ধর্মের জীবনী ব'লে মানবো। ধর্মের ইতিহাসে তাই অতীত ঘটনার বিষয়-বিচিত্রার কোন দাম নেই, যদি না তা আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সৌন্দর্য, তার পবিত্রতাটুকুকে আমরা আমাদের বর্তমান জীবনে আবার গভীরভাবে ধরতে না পারি। তাই পুরাতত্ত্বের শিলাখণ্ড বা প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সন্ধান করা ধর্মের কাজ নয়; ধর্মের কাজ—জীবন্ত বস্তুকে নিয়ে, আজকের জিনিসকে নিয়ে, বাস্তবকে নিয়ে। আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়, ধর্মের কাজ—জীবনকে নিয়ে, প্রাণবন্ত দেহকে নিয়ে, মনকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে—নব সৃষ্টির প্রেরণায় 'আমাকে' নিয়ে। এই 'আমার' সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু ও পৃথিবীর সম্বন্ধ কি এবং এই জগৎ থেকে আমি চলে গেলেই বা তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ দাঁড়াবে—এই সব জড়িয়েই ধর্মের জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

এ কথা ঠিক, ধর্মের প্রচণ্ড চলার গতি তার দেশের ভাস্কর্যে, শিল্পে, কাব্যে, কলায় দাগ রেখে গেছে; কিন্তু সেই দাগ বা আঁকের সমগ্র সূচীপত্রই কিছু ধর্ম নয়। তাছাড়া এই বাংলাদেশেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষ্যাপা বা রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন বলেই আমাদের ধর্মের উত্তরাধিকার-সূত্র থেকে গেল--এ কথা ভাবাও ভুল। কারণ অন্যের কি হ'ল বা কি হয়েছিল, তা নিয়ে ধর্ম নয়। নিজের কি হ'ল, বা কতখানির জন্য চেষ্টা চলছে, তার ঐকান্তিকতা নিয়েই ধর্মের বিচার। ধর্ম তাই 'হওয়ার' জিনিষ। অতীতের নিশ্চিন্ত রোমন্থন বা ভবিষ্যতের উদ্যমহীন স্বপ্নালু আশ্বাস নিয়ে আর যাই কিছু হোক্, ধর্মের ইমারত নিজ জীবনে গড়ে তোলা যায় না,—এ শুধু জলের ওপর দাগ কেটে তাকে চিরস্থায়ী করবার অসম্ভাবনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

তা ব'লে কি ধর্মের দিকপালদের জীবনী নিয়ে আলোচনা ক'রব না, তাঁদের মধ্যে আমার অনুভূতির উৎস খুঁজব না?—খুঁজব ততখানিই, যতখানি আমার জীবনকে ধর্মময় ক'রে তোলার প্রয়োজনে লাগে। যীশুর জীবন যদি একদিন মরণ থেকে বেঁচে উঠে থাকে, তাহলে আমিও একদিন ঐ ভাবে বেঁচে উঠতে পারবো; শ্রীরামকৃষ্ণ যদি জীবনে 'মা, মা' ক'রে আকুল ক্রন্দনে ভাসিয়ে 'মা'কে সত্যসত্যই পেয়ে থাকেন, তাহলে আমিও আশ্বাস পাবো এই ভেবে যে আমার জীবনেও ঐ ভাবে ঐ ঘটনা একদিন ঘটতে পারে। আরও সহজ কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়: সমুদ্রের দুর্গম পথে চলতে চলতে কোন এক নাবিক 'উত্তমাশা অন্তরীপে' পৌঁছেছিলেন; আমিও সেইদিকে আমার জাহাজ চালিয়ে, আমার পথিকৃৎ ঐ নাবিককে অনুসরণ করেই একদিন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো,—ধর্মের পথে পূর্বাচার্য সাধকদের বাণীর ও জীবনের সার্থকতা এইরূপই। আমি যদি কোনরূপ প্রচেষ্টার জাহাজ না চালিয়েই ভাগ্যের দোলায় দুলি

এবং একজন জাহাজ চালিয়ে 'উত্তমাশা'য় পৌঁছেছিল—শুধু এইটুকু জেনেই এবং সেই রক্তরাঙা পায়ের ছাপ স্মরণ করেই স্বপ্নের জাল বুনি, তাহলে কি 'উত্তমাশা'য় পৌঁছতে পারবো?—পারবো না। কারণ ধর্ম উপলব্ধ বস্তু নিয়ে বেসাতি করে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার চালায়। পরের মুখে ঝাল খেয়ে আর যাই কিছু হোক, নিজের জীবনে কোন সত্য বা সান্ত্বনা লাভের সম্ভাবনা ধর্মপথে অন্ততঃ নেই।

উচ্চতম সাধকজীবনের দর্শন-স্পর্শনেই যে মানব-মনে ধর্মের প্রেরণা জেগে ওঠে, তাও নয়। হীরকের উজ্জ্বল দ্যুতি, নীলাকাশের স্বচ্ছতা, সূর্যাস্তের বর্ণালী লীলা, চাঁদের হাসির উচ্ছলতা, নদীর নিরন্তর প্রবাহ, রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকি, বনানীর অতন্দ্র জাগরণ, পাখীর কাকলি, শিশুর হাসি, জননীর স্নেহ, পরার্থে জীবনাহুতি—এমন কত কি কখন কোন ফাঁকে এসে যে আমাদের সুপ্ত মহত্বের উৎসমুখের পাথরকে সরিয়ে জলোচ্ছ্বাস জাগায় তা কে জানে! কিন্তু একবার যদি ঐ মুখ খুলে যায়, তাহলে সেই অবারিত জলপ্রবাহ যে স্বাধীনতার ব্যাপ্তিতে উন্মাদ হ'য়ে—অন্ততঃ কিছুটাও ছুটে চলবেই এটা ঠিক। আধ্যাত্মিক প্রবাহের এই উৎসমুখ খোলাটাকেই সুধীজন 'বৈরাগ্য' আখ্যা দিয়াছেন, যা এলে ধর্মের পথে চলার সঠিক প্রেরণা এল।

ঐ প্রাথমিক প্রেরণাটিকে—ঐ বৈরাগ্যকে কিন্তু সদাই উদ্দেশ্যমুখী রাখা চাই। নদী যদি একবার পর্বত-কন্দর ভেদ ক'রে নেমে আসে, তাহলে তাকে সমুদ্রে পৌঁছবার 'নিষ্ঠা' রেখে চলতে হবে। তা না হ'লে মাঝপথেই তার প্রবাহ শুকিয়ে যাবে! আমাদের 'বৈরাগ্যপ্রবাহ'ও যাতে ঈশ্বর-সমুদ্রে মিশতে পারে, তার জন্য চাই ব্যাকুলতা।

মোটকথা ধর্ম মানবজীবনের একটি ক্ষণিক বেগের প্রচণ্ড আলোড়ন নয়, বরং ঐ বেগের প্রবহমানতাকে অব্যাহত রেখে পরমার্থকে লাভ করাতেই তার সার্থকতা। আর এই সার্থকতা লাভের পথে কোন আপোষ নেই, কোন থেমে যাওয়া নেই, নেই কোন তটের সীমায়িত বন্ধনকে স্বীকার করা, নেই কোন বনানীর সবুজতার মোহে আটকে পড়ার ইঙ্গিত, কিংবা নিজেকে পথিমধ্যে বিলিয়ে দেবার মোহময় উন্মত্ততা।

ধর্মের পথের এই 'নিষ্ঠা' ও 'বৈরাগ্য' আনন্দ নিয়ে গড়া। স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় তাদের বাস—এতে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, নেই কোন আনন্দহীন জীবন-বিপাক। তাই তো জীবনের যে কোন মুহূর্তে বীতরাগ সাধু পারে তার ক্ষণিকের সুখ-নীড়কে নির্মোহ অবসানের মধ্যে টেনে আনতে, পারে তার এগিয়ে চলার প্রয়োজনে আবার দুরন্ত দুঃখের ঘূর্ণিপাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ধর্মের এই অবাধ সামগ্রিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেই বোধ হয় কবি বলেছেন—আমি ভগবানকে ভালবাসি, কেননা তিনিই আবার আমাকে তাঁকে অস্বীকার করার অধিকারও দিয়েছেন।

তাই চল পথিক, আর্তির কঙ্কাল ছেড়ে জীবন্ত স্বাধীনতার পথে চল। আনন্দের পথে প্রবাহিত কর তোমার মানসিক গতিকে, দৈহিক স্থিতিকেও। মনে রেখো, মুক্তির ঐ মহান্ আনন্দকে লাভ করার জন্য সকলকেই একদিন না একদিন এই পৃথিবীতে মানুষ হয়েই আসতে হবে—কারণ স্বর্গের দেবতাদেরও অধিকার নেই এই আনন্দে। তাই বলি, মানুষ-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কি অবহেলায় বিলিয়ে দেবে? মহান্ আনন্দের উত্তরাধিকারী হয়েও এই জীবনের সুন্দর সম্ভাবনাকে বিফলতায় দেবে লুটিয়ে? না, তা হয় না। তুমি যে অমৃতের সন্তান। চল চল, এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে!

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মেঘের লাগিয়া নদী উর্ধ্বপানে চেয়ে চেয়ে থাকে,
সূর্যতরে সূর্যমুখী চির অপেক্ষিতা।
নদীরে লভিতে বক্ষে সিন্ধু ডাকে কত অনুরাগে,
মায়ামৃগ কেন ভীতা?
কাল-ব্যাধ অন্তরালে লক্ষ্য করে তার গতিপথ
কে জানে কখন তারে তীর হানি' ক'রে যাবে বধ?

উদয়-অস্তের পারে আঁখি মোর আবেশ-বিহ্বল,
সীমা মাঝে অসীমের রূপ-সমাবেশে
জীবন-উৎসব শেষে
কাল স্রোতে মিশে যায় অশ্রু-শতদল।
আজ আমি রহি একা, কোন কাজে লাগে নাক' মন,
দুদিনের আয়ুনীড়ে থেমে গেল কাকলী-কূজন।

সংশয়-দ্বিধায় ভরা এ সংসারে রহস্যের বুকে
সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে!
বিরহ-মিলন মিছে
আশা ভয় ভালবাসা সাথে নিয়ে আসে সুখে দুখে।
অন্তরের বাসনারে দেখেছি যে মেরু-জ্যোতি সম,
আলোক-মেঘের খেলা ভুলায়েছে উগ্র চিত্ত মম।

বৈদিক মন্ত্রের মতো কথা যত চির কাল ধরি'
শব্দ তরঙ্গের সনে করে কানাকানি;
তারা কি ভূমারে বরি'
জ্ঞানঘন-রসানন্দে শুনাবে না দেবতার বাণী!
নৃত্য করে গ্রহ তারা, জগন্ময় প্রভু যে আমার,
তবুও আকাশ ডাকে, সমুদ্রের আর্ত হাহাকার।

অগ্নিগর্ভ বাণী

[নব পর্যায়]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।' —শ্রীরামকৃষ্ণ

'চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। —বিবেকানন্দ

কোথায় আমাদের চরিত্রের সব চেয়ে বেশী গলদ, তার ফলে কি হীন অবস্থা আমাদের ঘটেছে, এবং এ দূরীভূত না হ'লে আমাদের কি পরিণাম, তা যেন এই বাক্যগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের জীবনে, আমাদের আচরণে ও কাজকর্মে চালাকির মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গোড়াতে হিন্দুজাতির মধ্যে পৌরুষ ও সরলতারই প্রাধান্য ছিল—চালাকির স্থান ছিল না। কি ক'রে এই বিষ সমাজ-দেহে সংক্রামিত হ'ল—তা তলিয়ে দেখা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

হিন্দুজাতির চরিত্র যুগে যুগে কিরূপ ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ আচার্য ম্যাক্সমূলর আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।[১] তা থেকে কিছু সংকলন ক'রে এখানে দিচ্ছি। তৎপূর্বে ব'লে রাখা দরকার যে ম্যাক্সমূলর নিজেই পাঠকদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে—সকল সমাজেই ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক বরাবর ছিল এবং থাকবে। সুতরাং সকল ভারতবাসীকে এক তুলিতে রং করা যায় না। যদি বলি ভারতবাসী মাত্রই সত্যবাদী এবং ধার্মিক, কিংবা তার বিপরীত, তবে তা কখনই বাস্তব হ'তে পারে না। তথাপি একটা জাতি অথবা সমাজের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণদোষের প্রাধান্য তা একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ ম্যাক্সমূলর খুব সঙ্গত কারণেই ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক সীমারেখা টেনেছেন। তিনি লিখেছেন যে ভারতবর্ষ চিরকাল গ্রাম-পঞ্চায়েতের দেশ। বিদেশী প্রভাবে প্রভাবিত শহর ও শহরবাসীদের দেখে এবং শুধু সেই পর্যবেক্ষণের বলে সত্যিকারের ভারতীয় সমাজকে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। কালের দিক্ থেকে ম্যাক্সমূলর ১০০০ খৃষ্টাব্দকে একটি ছেদরেখা ব'লে গণ্য করেছেন। তখন থেকেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের এবং পরাধীনতার ফলে হিন্দুদের চরিত্রের গভীর পরিবর্তন শুরু হয়। এগুলি খুবই ভাববার কথা।

এবারে আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত কালানুক্রমিক বিবরণে আসা যাক্। গ্রীক লেখকদের মধ্যে হিন্দুদের সম্পর্কে প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া যায় ক্তেসিয়াসের (Ktesias) রচনায়। ইনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান ছিলেন। পারস্যের রাজসভায় হিন্দুদের ন্যায়পরায়ণতার প্রভৃত গুণকীর্তন তিনি শুনেছিলেন এবং তা লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন।

তৎপরে পাওয়া যায় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা। তিনি লিখেছেন : ভারতবর্ষে চুরি প্রায় অজ্ঞাত,

১ দ্রষ্টব্য—India, What Can It Teach Us? গ্রন্থের দ্বিতীয় বক্তৃতা—Character of the Hindus.

এবং জনসাধারণ সত্য ও ধর্মকে অতিশয় মান্য করে।

আরিয়ান (Arrian—দ্বিতীয় শতাব্দী) লিখে গিয়েছেন যে গুপ্তচরেরা রাজার কিংবা শাসনকর্তাদের নিকট প্রজাবর্গের আচরণ সম্পর্কে সর্বদাই খবর সংগ্রহ ক'রে আনত। তাদের বিবরণে অন্য দশ রকম অসদাচরণের কথা থাকলেও মিথ্যাভাষণের দৃষ্টান্ত কিংবা অভিযোগ একটাও পাওয়া যায় না।

গ্রীকদের পরেই চীনা পর্যটকদের বিবরণ। ভারতবাসীদের সততা ও সত্যকথন সম্পর্কে তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন। হিউয়েন্থ সাং বলেছেন, 'ভারতীয়েরা আমোদপ্রিয় হলেও তাদের চরিত্রের লক্ষণীয় গুণ সরলতা ও সততা। অন্যায়ভাবে তারা কখনও অপরের ধন গ্রহণ করে না; পাছে অন্যায় হয়, এই ভয়ে তারা নিজেদের দাবি সর্বদাই সংকুচিত করে।...... শাসনকার্যেও দেখা যায়, সর্বত্র বেশ সোজাসুজি ব্যবহার, কোথাও প্যাঁচোয়া ভাব নেই।'

তার পরে পাওয়া যায় মুসলমান বিজেতাদের বিবরণ। বিজিতদের সম্পর্কে তারা যে অযথা প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করেছেন, এরূপ মনে করবার কোনই হেতু নেই। একাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিসি তৎপ্রণীত ইতিহাসে লিখেছেন, 'ন্যায়পরায়ণতা ভারতবাসীদের স্বাভাবিক গুণ; ন্যায়পথ থেকে তারা কখনও বিচলিত হয় না। তাদের সততা, সত্যপরায়ণতা এবং একবার কথা দিলে সেই কথা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা—এত সুবিদিত যে এর ফলে চারদিক থেকেই লোক ভারতবর্ষে এসে ভিড় করে।'

ত্রয়োদশ শতকে বেদি এজ্‌র্ জেনান (Bedi ezr zenan) নামক লেখকের উক্তি আর একজন মুসলমান লেখক (শামসুদ্দীন আবু আবদাল্লা) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে, 'ভারতীয়েরা বালুকণার ন্যায় সংখ্যায় অগুনতি; কিন্তু তাদের মধ্যে কোন রকম প্রতারণার অথবা জোর জুলুমের ভাব নেই। তারা জীবনকেও ডরায় না, মৃত্যুকেও না।'

চতুর্দশ শতকে খৃষ্টান পাদ্রী জর্ডানাস (Friar Jordanus) দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা সত্যবাক্ এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ।

পঞ্চদশ শতকে কামালেদ্দীন আবদের্ রাজাক্ সমরখন্দী খাকানের রাজদূত হ'য়ে প্রথমে কালিকটে এবং তৎপরে বিজয়নগরে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঐ দুই রাজ্যে সওদাগরেরা টাকাকড়ি ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা ক'রত।

ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল-ফজল সুবিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন, 'হিন্দুরা ধর্মপরায়ণ, অমায়িক, প্রফুল্লচিত্ত, ন্যায়বান্, নির্জনতাপ্রিয়, কার্যকুশল, সত্যসন্ধ, হিতকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিরতিশয় বিশ্বাসভাজন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কাকে বলে, তা তাদের সৈন্যেরা জানে না।'

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও অনেক মুসলমান লেখকই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করে, তার তুলনায় হিন্দুদের পরস্পরের ব্যবহার অনেক বেশী সরল এবং উদার। এ বিষয়ে মীর সালামত আলী নামক একজন বৃদ্ধ এবং অতিশয় ধর্মপরায়ণ মুস্লিমের উক্তি কর্নেল শ্লীম্যান উদ্ধৃত করেছেন; যথা—'কচিৎ কোন হিন্দু হয়তো মনে করতে পারে যে মুসলমানকে ঠকালে দোষ নেই, বরঞ্চ পুণ্য কাজ; কিন্তু স্বজাতীয়কে ঠকানো পুণ্য কাজ ব'লে কিছুতেই মনে করবে না। মুসলমানদের ব্যবহার ঠিক

তার বিপরীত। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৭২টি সম্প্রদায় আছে; আর এদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর শুধু অপর ধর্মাবলম্বীদের নয়, পরন্তু স্বধর্মান্তর্গত অপর ৭১টি সম্প্রদায়ের লোকদের নিঃসঙ্কোচে ঠকিয়ে থাকে, এবং প্রতারিত ব্যক্তি যত নিকটতর সমাজের লোক হয়, ততই অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় হ'ল ব'লে মনে করে।'

ম্যাক্সমূলর বলেছেন: এইরূপে আমি বইয়ের পর বই থেকে বিদেশীয়দের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে যেতে পারি এবং সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, যে সমস্ত বিদেশীয়েরা ঘনিষ্ঠভাবে ভারতবাসীদের জেনেছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকটেই একটা জিনিস বিশেষভাবে চোখে লেগেছে, সেটি হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। কেউ তাদের প্রতি মিথ্যাভাষণ কিংবা মিথ্যাচারের অভিযোগ আরোপ করেননি। এর একটা হেতু নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বর্তমান যুগেও পর্যটকেরা এরূপ মন্তব্য বড় একটা করেন না যে অমুক দেশের লোকেরা সর্বাবস্থায়ই সত্য কথা বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের সম্পর্কে ইংরেজ পর্যটকদের বৃত্তান্ত পড়ুন, তার মধ্যে ফরাসীদের সততা কিংবা সত্যনিষ্ঠার কোন উল্লেখ পাবেন না। আর ইংলণ্ড সম্পর্কে ফরাসী পর্যটকদের বর্ণনায় ইংরেজ-চরিত্রের সম্পর্কে একটি বক্রোক্তি প্রায়শঃ চোখে পড়বে, সেটি হচ্ছে 'বিশ্বাসঘাতক' —(Perfide Albion).

ইংরেজেরা এদেশে এসে প্রথমাবস্থায় ভারতীয়দের যেমন দেখেছিলেন, তারও কতক বর্ণনা ম্যাক্সমূলর উদ্ধৃত করেছেন। হিন্দুদের সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসের উক্তি: তারা বিনম্র এবং উদার, সামান্যতম উপকারের জন্যও কৃতজ্ঞ থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য এই যে অনিষ্টকারীর প্রতিও তারা কোনরূপ হিংসার ভাব সাধারণতঃ হৃদয়ে পোষণ করে না। হিন্দুরা বিশ্বাসী, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ এবং সর্বদা আইন মেনে চলতে প্রস্তুত।

বিশপ হিবার বলেছেন, 'হিন্দুরা সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানলাভের এবং আত্মোন্নতির জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত,—ধীরস্বভাব, পরিশ্রমী, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল। সদয় ব্যবহারের দ্বারা তাদের হৃদয় এত সহজে জয় করা যায় যে, এর তুলনা অপর কোন জাতি অথবা সমাজের মধ্যে আমি দেখিনি।'

এলফিনষ্টোন লিখছেন: আমাদের (ইংলণ্ডের) বড় বড় শহরের নিম্নস্তরের লোকেরা যেরূপ হীনচরিত্র, হিন্দুদের কোন শ্রেণীর লোকই সেরূপ অধম নয়। ভারতের সর্বত্র গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত অমায়িক,—পরিবারের ভিতরে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ এবং সদয়। শুধু সরকার ব্যতীত অপর সকলের প্রতিই তাদের আচরণ অতিশয় সরল এবং অকপট। 'ঠগ' এবং 'ডাকাত'দের যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায়, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে দণ্ডনীয় অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক কম। 'ঠগ'দিগকে ভারতবাসী না ব'লে একটা আলাদা জাত বললেই গণ্য করা উচিত, আর 'ডাকাত'রা হচ্ছে বেপরোয়া, গুণ্ডাশ্রেণীর লোক। হিন্দুদের স্বভাব অতিশয় নম্র এবং শান্ত। এমনকি বন্দীদের প্রতিও এশিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় তারা খুবই সদয় ব্যবহার ক'রে থাকে। ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে,—এবং এখানেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সব চেয়ে চোখে পড়ে। তাদের আচার-ব্যবহারের শুচিতা দেখলে আমাদের নিজেদের আত্মশ্লাঘায় আঘাত না পড়ে যায় না।

এই সাধুবাদের মূল্য খুবই বেশী, যেহেতু এলফিনষ্টোনই অন্যত্র অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ভারতীয় চরিত্রের সত্যিকার দোষত্রুটির নিন্দা করেছেন! তিনি লিখেছেন যে, এখনকার দিনে অর্থাৎ এলফিনষ্টোনের সময়ে সত্যের অপলাপই ভারতীয়দের একটি প্রধান দোষ; আবার সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কিন্তু এই মিথ্যাপরায়ণতা অথবা শঠতা তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী দেখা যায়, যারা সরকারের সঙ্গে জড়িত,—আর এই শ্রেণী সংখ্যায় অনেক, যেহেতু ভূমিরাজস্ব-আদায়ের বেড়াজাল এমন দেশব্যাপী, এবং রাজস্ব আদায় এমনই একটা ব্যাপার যে নিতান্ত গরীব গ্রামবাসীও অনেক সময়ে অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।'

স্যার টমাস মনরো লিখেছেন, 'উত্তম কৃষি-ব্যবস্থা, হাতের কাজে অতুলনীয় দক্ষতা, নিত্য-প্রয়োজনীয় এবং বিলাসের দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ক্ষমতা—সাধারণ লেখাপড়া ও হিসাবপত্র শেখাবার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় —পরস্পরের মধ্যে প্রচুর দয়াদাক্ষিণ্য ও আতি-থেয়তা—সর্বোপরি স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার,—এগুলি যদি সভ্যজাতির লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুরা কিছুতেই ইওরোপীয় জাতিদের তুলনায় সভ্যতায় ন্যূন নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 'সভ্যতা' যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রী হয়, তবে ইংলণ্ড এই জিনিসটি ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করতে পারে এবং করলে লাভবান হবে।'

যে সকল ভারতবাসীর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ঘটেছিল, তাদের কথা উল্লেখ ক'রে ম্যাক্সমূলর নিজের ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতার বলেও ভারতীয় চরিত্রের খুব সুখ্যাতি করেছেন। পরিশেষে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে হিন্দুদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হ'তে সত্যের প্রতি একটা অপরিসীম শ্রদ্ধার ভাব বরাবর রয়েছে।

* * *

এই সমস্ত বিবরণ পড়বার পর একটা দারুণ জিজ্ঞাসা আমাদের মনে স্বভাবতই জাগে যে, যদি হিন্দুজাতির চরিত্র এতই উন্নত ছিল, তবে বর্তমানের অধঃপতন ঘ'টল কেমন ক'রে? ৺শিব-নাথ শাস্ত্রী মহাশয় অল্প কয়টি কথায় এর কারণ সুষ্ঠু ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বহুমূল্য কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করছি:

'বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্বে, হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাবকালে প্রাচীন গ্রীক পর্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দুজাতিকে সাহসী, সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদারনিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়া-ছিল।[২] স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজসভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা। যদিও বহুবিবাহ

২ হিন্দুদের চরিত্রে এমন কোন গুরুতর দোষত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল যার ফলে এত সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও তারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এখানে সেই বিচারে আমরা যাচ্ছি না।

হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলিন্যপ্রথা-নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা যেন এক প্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দু ধনীদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য হইত, সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত। এইটি মুসলমান অধিকারের সর্বপ্রধান কলঙ্ক। ইহা জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কারণে দেখিতে পাই, মুসলমান অধিকার-কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি এই অধিকার-কালে যে সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতেও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্মের নাম ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে।

মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা-পরতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্ম-গোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না। তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরেজদিগের রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইয়া তাহাও অন্তর্হিত হইল। লোকে দেখিল, সত্য নির্ধারণ করা ইংরেজের আইন বা আদালতের লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না—তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকে জানিল যে, যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারই জয়াশা তত অধিক। এইরূপে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল।[৩] লোকে জালজুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য হইয়া স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজ মধ্যে গৌরবলাভ করিতে লাগিল। দেশের এরূপ দুর্দশা না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালী জাতির প্রতি যেরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না।'

ইংরেজ শাসনের উল্লিখিত দোষত্রুটি সত্ত্বেও একথা অবিসম্বাদিত যে পাশ্চাত্য জ্ঞান আমদানির ফলে এবং অনেক উন্নতচরিত্র ইংরেজের দৃষ্টান্তের প্রভাবে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই একদল ইংরেজীশিক্ষিত শহরবাসী হিন্দু—চরিত্রগঠন, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কার্যে অসীম উৎসাহ সহকারে আত্ম নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে বহু দিক্‌পাল-সদৃশ ব্যক্তির নাম সহজেই আমাদের মনে আসে। আর মনে পড়ে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনের ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অসীম প্রভাব। এ সমস্তই জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে পুনর্গঠিত করেছে—তাতে সন্দেহ নেই। আবার স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন জাতির চরিত্রকে এক অগ্নিশুদ্ধির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সব দিক্ বিচার করলে সম্ভবতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে

৩ তুলনীয়—(১) 'Litigation is the first lesson we taught the people and now we blame them for learning the lesson so well'
— Justice C. D. Field.

(২) 'বৃটিশের বিচারালয় বারাঙ্গনার মন্দির।'—বঙ্কিমচন্দ্র

পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমাদের জাতীয় চরিত্র মোটের উপর এক-টানাভাবে উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজী শুরু করেন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। একটা নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসাবে এর তুলনা হয় না; এবং ঘোষণা অনু-যায়ী এ যে শুধু ইংরেজ-বিতাড়নের সংগ্রাম ছিল, তা নয়—এ ছিল সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন। কিন্তু আজ পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল বহুল পরিমাণে ধোঁয়াটে চিন্তা, এবং ভাবের ঘরে অনেক চুরি। তাই এই আন্দোলনের পরিণাম জাতির পক্ষে এবং দেশের পক্ষে খুব কল্যাণকর হয়নি। উপরন্তু দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতির প্লাবন। আর দেশবিভাগের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছে বিকৃত গণতন্ত্রের, এবং ক্ষমতালোভীদের তাণ্ডব। শহরবাসী ও পল্লীবাসীদের ধর্মবুদ্ধিতে ও আচরণে যে পার্থক্য চিরকাল বিদ্যমান ছিল,—নানা কারণে তাও প্রায় ঘুচে গিয়েছে। বহু চেষ্টা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে জাতীয় চরিত্রের যে বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তা আজ চারদিক থেকেই আক্রান্ত এবং বিপন্ন। দলীয় রাজনীতি, ব্যবসাদার সংবাদপত্র, আত্মপ্রশংসার ও অপ-প্রচারের সাড়ম্বর আয়োজন—ইত্যাদির প্রাবল্যে দেশময় মিথ্যাচার ও কপটতার দারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে তুলনায় বাঙালীর আলস্যপরায়ণতা তাকে আরও বিশেষ ক'রে চালাকির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরি-শ্রম বাঁচিয়ে নিছক ফাঁকিবাজী দ্বারা কিরূপে সাফল্য লাভ করা যায়—আমাদের উচ্চনীচ ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যেন এই এক চিন্তা। ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করা, ফাঁকি দিয়ে রোজগার করা—এ সমস্তই বাহাদুরির সামিল।

কিন্তু হায়! চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ তো হয়ই না, জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকাও যে যায় না। বিশেষ ক'রে, যন্ত্রযুগে চালাকি অত্যন্ত মারাত্মক। যে শিল্পায়ন ব্যবস্থায় প্রত্যেক কাজে বহু লোকের সমবেত চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানে সততার অভাবে সব কিছু পণ্ড হ'য়ে যেতে বাধ্য। একটি সামান্য স্ক্রু যদি ঠিকভাবে তৈরি না হয় বা ঠিকভাবে লাগানো না হয়, যদি কোথাও চালাকি কিংবা গোঁজামিল থাকে, তবে সমগ্র যন্ত্রপাতি বিকল হ'য়ে যায়। শুধু বেঁচে থাকার জন্যেও আজ আমাদের বিশেষ ক'রে প্রয়োজন—অসত্যের এবং চালাকির সর্বথা বর্জন।

বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

জন্মোৎসব পালন করা একটা সামাজিক রীতি। সংসারে ও সমাজে যাঁহারা লোকহিতের জন্য কাজ করেন তাঁহাদের জন্মোৎসব জনসাধারণের উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের একটা বিশেষত্ব আছে। স্বামীজীর আবির্ভাব সাধারণ ভাবে শুধু লোকহিতের জন্য নয়। স্বামীজীর আবির্ভাব মানুষের আত্মার মুক্তিসাধনের জন্য, মানুষকে তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রার স্তর হইতে উর্ধ্বতর আধ্যাত্মিক স্তরে উঠাইবার জন্য। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন সেই বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করিতে হইলে তাহার অনুরূপ পরিবেশ চাই, যে পরিবেশে মানুষের মন নম্র হয়, শান্ত হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়; প্রথম সুবিধাবাদী ও দ্বিতীয় আদর্শবাদী। সংসারে প্রথম শ্রেণীর মানুষের আধিক্য বেশী, কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তবু প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ সুবিধাবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও পৃথিবী চিরকাল মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদীর জীবনশক্তিতে পরিচালিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীরাই যুগে যুগে সমাজ ও মানুষের সংস্কৃতিকে অবক্ষয় ও অবলুপ্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আদর্শবাদীদের জীবনের বনিয়াদ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ়। যাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক স্তর যত দৃঢ়, তাঁহার জীবন তত সার্থক—তত অনুকরণীয়।

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিব। স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতে গেলে সুভাষচন্দ্রের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। সকলেই জানেন—স্বামীজীর আদর্শেই সুভাষচন্দ্র কৈশোর হইতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিলেও উভয়েই মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা, উভয়ের মূল প্রকৃতি এক। সুভাষচন্দ্রকে আমরা রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে নায়করূপে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বাহিরের সমস্ত কর্মপ্রয়াসের অন্তস্তলে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ফল্গুধারার মতো সর্বক্ষণ প্রবাহিত ছিল। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই জানেন—ইহা কতখানি গভীর। নেতাজীরূপে যখন তিনি বহির্বিশ্বের ঘটনার নায়ক, তখনও এই আধ্যাত্মিক প্রেরণা সমানভাবে কাজ করিয়াছে। তৎকালীন জীবনে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছি।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় যান, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশও নয়। চিকাগোয় বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে (১৮৯৩) দেশবিদেশ হইতে বিশিষ্ট ও বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তানায়কেরা সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সম্মেলন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ত্রিশ বৎসরের যুবকের মধ্যে এমন কি দেখিয়াছিল, যাহাতে মুহুর্মুহু অভিনন্দনধ্বনি উচ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য জগৎ স্বামীজীর মধ্যে এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দর্শন করিয়া অভিভূত হইয়াছিল। তিনি যখন

ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'তুমিই সেই'—মানুষ তাহার পার্থিব অস্তিত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম আত্মা, তখন সকলে বিস্ময়ে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে তিনি তাহার বৃহত্তর এবং সত্যকার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই আবেদন সেখানকার মানুষের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা সেই আবেদনের মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিল এবং এই বাণীর প্রচারককে অভূতপূর্ব মর্যাদা দিয়াছিল।

স্বামীজী মানবসমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন; সে সমাজের ভিত্তি হইবে বেদান্তের তত্ত্ব। এইজন্য সকলকে তিনি বেদান্তের বাণী উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান জানান। শঙ্করাচার্য বেদান্তকে দার্শনিক মতরূপে প্রচার করিয়াছিলেন; স্বামীজী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 'প্রাক্‌টিক্যাল বেদান্ত', বেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। শঙ্করাচার্য 'নির্বাণষট্‌কে' বলিতেছেন, 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্'। 'নির্বাণদশকে' বলিয়াছেন, 'শিবঃ কেবলোঽহম্'—আমি শিবই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যত্র জীব তত্র শিব।' স্বামীজী—ইহাই জীবনে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন এবং ইহার অনুসারে সমাজে কাজ করিতে বলিয়াছেন—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। প্রত্যেক মানুষই শিবাংশ—এই উপলব্ধি যদি আসে, তাহা হইলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সহজ হইয়া যায়, সমাজের গঠন ও লক্ষ্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। সমস্যা এই, আদর্শের কথাটা মুখে আসিলেও উপলব্ধিটা মনে আসে না। মন মুখ এক হয় না। আদর্শ প্রচার করিলেও আচরণে তাহা ফুটিয়া উঠে না।

বাধাটা কোথায়, স্বামীজী নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন। বাধা ভয়। সেইজন্য তিনি প্রচার করিয়াছিলেন 'অভীঃ'-মন্ত্র—'অভীরভী-হুঙ্কারনাদিত-দিঙ্‌মুখ-প্রচণ্ডতাণ্ডব-নৃত্যম্' —এই-ভাবে স্বামীজীর ভক্তশিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। 'অভীঃ'-মন্ত্র প্রচার করিয়া মানুষের মনকে মুক্তিসাধনার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দেশের মনকে মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। যে ভূমিকায় ভারতের মুক্তিসংগ্রামের উদ্ভব ও অগ্রগতি, সে ভূমিকা স্বামীজীর রচনা। এই অভয়মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে:

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এই 'অভীঃ' মন্ত্রেরই প্রকাশ দেখিতে পাই গান্ধীজী ও নেতাজীর জীবন-সাধনায়। পুলিশের নাগপাশ এড়াইয়া নেতাজী যখন ইওরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কি দুঃসাহসিক প্রয়াস! পুনরায় ইওরোপ হইতে জাপানে যে বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা কি অধিকতর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নয়? নেতাজী ভয়ের উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। গান্ধীজীর মহা-জীবনেও এই 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধনারই চরম পরীক্ষা। বাংলার বিপ্লবীরা যে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইয়াছিল, স্বামীজীর নিকট হইতে এই মন্ত্র তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া। এই 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধনাই আমরা স্বামীজীর নিকট হইতে উত্তরাধিকার-রূপে পাইয়াছি।

স্বামীজী যে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন বেদান্তের বাণী হইতে। সে বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিলে, নিজের জীবনকে সকলের জীবনের মধ্যে প্রসারিত করিতে পারিলে সেবা তখন স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইয়া ওঠে; তখন মানুষ নিজের জন্য যেমন চেষ্টা করে, অপরের জন্যও ঠিক তেমনি করিয়া থাকে; অপরের জন্য যাহা করা যায়, তখন তাহা নিজের জন্যই করা হইল বলিয়া বোধ আসে। সেবার এই মহৎ আদর্শ লইয়াই স্বামীজী প্রত্যেক মানুষকে বড় করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইভাবেই সকলকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সমাজের বিধানে যাহারা ছোট বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহাদের ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ মহিমায় তোমরা জাগিয়া ওঠ।' সমাজকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই নিগৃহীত জনমণ্ডলীর মধ্যে যে মানব-মহিমা আছে তাহাকে স্বীকার করিয়া লও—তাহাই কল্যাণের পথ।'

স্বামীজীর সাধনা, আদর্শ ও প্রচার—সব কিছুর মূলে হইল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্তিকতা। বিশ্বাস থাকা চাই। স্বামীজী যে সম্পূর্ণ সম্বলহীনভাবে আমেরিকা যাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীগুরুর উপরে বিশ্বাস এবং নিজের উপরে বিশ্বাস। চিকাগোর বিশ্বসভায় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রথমেই তিনি স্মরণ করিয়াছিলেন—ভারতের চিরকালের আরাধ্যা দেবী সরস্বতীকে, 'হে নিত্যকালের জননি, আজ এই পরমক্ষণে জিহ্বাগ্রে আবির্ভূতা হও।' আমি বিশ্বাস করি যে বাগ্‌দেবী তাঁহার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন—স্বামীজীর বাগ্‌বিভূতি জগৎকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল।

শক্তি সকল মানুষের মধ্যেই আছে—কাহারও প্রকাশ হয়, কাহারও হয় না; কখনও প্রকাশ হয়, কখনও হয় না। মানুষের এই শরীরটাই তাহার সব কিছু নয়। মানুষ মহাশক্তির অংশ; যে শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহা কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে, আবার সৃষ্টি করে। দেবী ভবতারিণীর কৃপায় এই শক্তির সঞ্চার হয় পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে; তিনি উহা সঞ্চারিত করেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনে এই মহাশক্তির বিকাশ নানাভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই মহাশক্তির অনুগ্রহ চাই। তাহা ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায় না। আর তাঁহার প্রসাদের কণামাত্রও যদি কাহারও উপরে বর্ষিত হয়, তখন সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে যখন স্মরণ করি, তখন একই সঙ্গে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আর দেবী ভবতারিণীকেও প্রণাম জানাই। শিষ্য, গুরু এবং ইষ্ট—এই তিন একত্র না হইলে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।*

* গত ২৪শে জানুআরি শ্রীরামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় টাউনহলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের সাম্য বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় দর্শনে যে একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে, এবং পাশ্চাত্য দর্শনে অন্য আর একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে, তাহা নহে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উভয় দর্শনেই একাধিক চিন্তাধারা প্রবহমান এবং একটিতে যে-সব চিন্তাধারা আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই অপরটিতে বিদ্যমান। তথাপি এ কথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান চিন্তাধারার মূলগত এবং প্রায় সর্বগত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য দর্শনেরও প্রধান এবং বহুমত চিন্তাধারায় অন্য প্রকার বিশেষ লক্ষণ আছে। এই বিশেষ লক্ষণগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারাকে এক এক প্রকার বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। উহাদের উৎপত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতি, প্রমাণপদ্ধতি ও চরম লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

দর্শনের উৎপত্তি

ইতর প্রাণী হইতে মানুষের মূলগত ভেদ এই যে ইতর প্রাণীরা তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটি প্রবল পিপাসা আছে; এ পিপাসা মানুষের চিরসাথী। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। ইহাতে মানুষ—জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের মূল প্রেরণা—
বিস্ময়ানুভূতি ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা

যদিও মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিতেই দার্শনিক চিন্তাধারার সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে তাহার প্রেরণা ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা প্রাচীন গ্রীকদের বিস্ময়ানুভূতি ও প্রাকৃত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে গভীর বিস্ময় বোধ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনানিচয়ের কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দর্শনে বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর আলোচনাও করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনের

মূল ও প্রবল চিন্তাধারার মধ্যে বহির্জগৎ এবং মানুষের বাহ্যপ্রকৃতি ও তাহার কল্যাণ সাধনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের মূল প্রেরণা—দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম জ্ঞানানুসন্ধিৎসা

পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রেরণার উৎস হইয়েছে প্রাচীন আর্য ঋষিদের দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে মানুষ জীবনে যে সকল সুখ ভোগ করে, তাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে সকল মানুষকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ অনিবার্যভাবে ভোগ করিতে হয়। অন্য সকল প্রকার দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা কোন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নাই। জীবনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব দেখিয়া প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে জীব ও জগতের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইলেও, তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা—সকল শোক, দুঃখ ও ও মোহের অতীত, চিরশান্তি ও আনন্দের অধিকারী। মানুষ তাহার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য ভারতীয় দর্শনে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে এবং দর্শনকে আত্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও উহাতে প্রসঙ্গক্রমে জড়প্রকৃতি ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণাস্থল।

ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নহে

দুঃখানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ এবং জীবনে দুঃখের অনিবার্য প্রভাব স্বীকার করায় কোন কোন সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণের সম্ভাব্যতা ও অমোঘ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে মানুষ সুখদুঃখের অতীত, পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতির অবস্থাও লাভ করিতে পারে; এবং এই অবস্থা লাভের উপায় নির্ধারণ করাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শনশাখার মূল উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিত্য আনন্দানুভূতি যে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাকে দুঃখবাদ বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত নহে।

ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জড়বাদী চার্বাক দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের মতে মানুষ দেহমাত্র নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বা মনমাত্রও নহে। মানুষ দেহমনবিশিষ্ট, কিন্তু তদতিরিক্ত চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যময় আত্মা; তাহার দেহমন জন্মমরণের অধীন হইলেও আত্মা অজর অমর

নিত্য শুদ্ধ ও বুদ্ধ। সেইরূপ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এক আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ও উহা হইতে উদ্ভূত; ইহা জড়প্রকৃতি হইতে যদৃচ্ছ-ভাবে উৎপন্ন নহে। ঐহিক ভোগবিলাস মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং অমরত্ব-লাভই তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সমগ্র জীব-জগৎ এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মের বশবর্তী ও তাহার দ্বারা পরিচালিত। এই নৈতিক অনুশাসনের বলেই জীবনে আমাদের সুখদুঃখ ভোগ হয় এবং এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন জীবই চিরকাল এই জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া থাকিবে না। সকল জীবেরই চরম গতি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। আধ্যাত্মিক অনুশাসনের বশে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবের এই চরম উৎকর্ষ লাভ হইবে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাহার সহিত ধর্মের নিকটতম সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ধর্মের সহিত দর্শনের কোন বিরোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনেক স্থলে দর্শন ধর্মানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং ধর্মানুভূতিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ও ব্যাপক। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনেও কোন কোন স্থলে এক প্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু তাহা ঠিক ভারতীয় দর্শনের মত নহে এবং সেরূপ প্রবল ও ব্যাপক নহে। বরং পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাকৃতিক (naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়-প্রকৃতিকে অথবা প্রাণ বা মনের শক্তিকে মূল তত্ত্ব ধরিয়া তাহা হইতেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাখ্যা এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলিরও সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে ধর্মের সহিত দর্শনের বিরোধ এবং অপরদিকে জড়বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের অবিরোধ ও ঐক্যভাব প্রায়শঃ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রগতি প্রধানতঃ বিজ্ঞানমূলক, উহা বৈজ্ঞানিক সত্যনিচয়ের আলোকে ও সাহায্যে পরিচালিত ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ না হইলে অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন না পাইলে দার্শনিক মতের কোন মূল্য থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকস্থলে দর্শনকে বিজ্ঞানের সহিত একীভূত বা এক প্রকার বিজ্ঞানে পর্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে দর্শন বিজ্ঞানেরই এক প্রকার উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্র।

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি ও শাস্ত্র প্রামাণ্য

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা শব্দ ও আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে তাহারই ভিত্তিতে দর্শন-শাখাগুলির প্রগতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। অবশ্য জড়বাদী চার্বাক-দর্শনে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চার্বাকমতে বেদ বা শ্রুতির কোন প্রামাণ্য নাই এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণই গ্রাহ্য নহে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাখায় শ্রুতি বা আপ্তবাক্যকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং বেদানুগ। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ দর্শনগুলি স্বতন্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; বরং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সহিত যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির সম্বাদ-প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও শব্দ বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার উপরই উহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী নিহিত আছে, তাহাই বৌদ্ধদর্শনের মূল গ্রন্থ এবং পরবর্তী কালের বৌদ্ধদর্শনশাখাগুলির মতবাদ রচনার প্রধান উপাদান ও তাহাদের বিচারের মানদণ্ড। সেইরূপ জৈনদর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি মহাবীর ও তাঁহার পরবর্তী তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় দর্শনের শাখা ও দার্শনিক সম্প্রদায়

এ স্থানে সবিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা আপ্তবাক্যমূলে যে সব দার্শনিক মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের এক একটিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় (School of Philosophy) গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক দার্শনিকসম্প্রদায়গত দার্শনিকগণ তাহাদের মূল শাস্ত্র বা গ্রন্থগুলির ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া নিজ নিজ দর্শনশাখার প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই নিজেকে নূতন দর্শনের প্রণেতা বলেন নাই। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের দর্শনের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে এরূপ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থে এক প্রকার নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে শ্রীশংকরাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামানুজাচার্যকৃত শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্থাপনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পাশ্চাত্য দর্শনে শাস্ত্রের প্রামাণ্য গৌণ, এবং দার্শনিক সম্প্রদায় বিরল

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে, অথবা উহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মমতের কিছু প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাহার ভিত্তিতে এক প্রকার দর্শনমত গড়িয়া উঠে, উহাকে ধর্মযাজকদের দর্শন (Patristic philosophy) বলা হয়। কিন্তু ইহা অতি অল্পকালস্থায়ী হয়, এবং কখনও উহা সর্বজনস্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু উহাকে সব সময়েই প্রবল বাধা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক স্বতন্ত্র যুক্তিবলেই নিজ নিজ দার্শনিক মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতবাদের পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার ফলে উহার প্রগতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থলে কোন দার্শনিকের মতবাদকে অবলম্বন করিয়া কোন দর্শনশাখারও উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার অনুগামী দার্শনিকদের ঐ-শাখীয় দার্শনিক বলা হয়। কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদকে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের সম্মান দেওয়া হয় নাই। কেবল তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুকূলে যুক্তিতর্ক দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রমাণ-পদ্ধতির প্রভেদ

দার্শনিক প্রমাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ আছে।

ভারতীয় দর্শনে সাধারণ লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনারূপে একাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল জড়বাদী চার্বাক-দর্শনেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সব প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনশাখার মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকে, কোথাও প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে, এবং কোথাও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিটিকে, স্বতন্ত্র ও যথার্থ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে তাহাদের সঙ্গে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক আরও দুইটি প্রমাণ যুক্ত হইয়াছে, এবং সেখানে এই ছয়টিকেই অপরিহার্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন দর্শন-শাখায় এতদ্ব্যতীত অন্য প্রমাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন দর্শনশাখায় বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন-সংখ্যক প্রমাণের উল্লেখ থাকিলেও পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বা উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনশাখার মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। তাহাদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ অপরোক্ষানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (intuition)। অতীন্দ্রিয় সত্য বা পারমার্থিক সত্যের জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ বা মানুষের বিচারবুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। এজন্য আমাদিগকে যৌগিক সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে যম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে; পরে পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে অনুক্ষণ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার হইবে। এই জন্যই চার্বাক-দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই তত্ত্বদর্শনের জন্য যোগ বা তদনুরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য যোগোপদিষ্ট সাধন-মার্গের নির্দেশ আছে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের ইহাই একমাত্র উপায়; বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের সৌকর্যার্থে এবং উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির জন্য বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপর দিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে লৌকিক জ্ঞানের সাধনরূপে কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানকেই (inductive and deductive inference) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আধুনিক কালে শব্দ বা আপ্ত-বাক্যকেও (testimony) কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক আর একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে উপমান অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি নামক প্রমাণগুলির কোন স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যও পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (sense-experience and reason) উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ প্রজ্ঞাই (reason) সব বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-বৃত্তি (thought and reasoning) ব্যতীত অন্য প্রকার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ

স্বীকার করা হয় নাই। অবশ্য কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (intuition) আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মনন বা বিচার-বুদ্ধিরই একরূপ প্রকর্ষ বা একরূপ বৌদ্ধিক সহানুভূতি (intellectual sympathy)। উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনসম্মত তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি নহে। উহাতে চিত্তশুদ্ধি ও যোগজ প্রত্যক্ষের কোন আভাস নাই।

দর্শনের উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে উভয় দর্শনের পার্থক্য

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে যে পার্থক্য আছে, উপসংহারে তাহার আলোচনা করা হইতেছে। জড়বাদী চার্বাক-দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবাত্মার বা মানবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। এ দর্শনের মতে মানুষ দেহেন্দ্রিয়মন-বিশিষ্ট আত্মা। তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন নশ্বর ও অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় না। পরন্তু জীবাত্মা কর্মানুসারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে এবং তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আত্মার কোন দেহের সহিত সংযোগের নাম জন্ম, এবং দেহ-বিয়োগের নাম মৃত্যু। জীবাত্মা অজ্ঞানবশে এবং কর্মানুসারে জীবনে নানাপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করে এবং শেষে মৃত্যুরূপ মহাকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। সুখ-দুঃখবিজড়িত জন্মমরণের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতেছে অজ্ঞাননিরোধক তত্ত্বজ্ঞান। এরূপ তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে দুঃখনিবৃত্তি বা পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করাই জীবাত্মার মুক্তি। ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুক্তি বা মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ হইলেও ভারতীয় দর্শনে কাম অর্থ এবং ধর্মকেও পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং জীবনে সেগুলি লাভ করিবার উপদেশও দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এসব পুরুষার্থ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং উহাদের সন্ধান ও ভোগ এরূপভাবে করিতে হইবে যে উহারা মোক্ষমার্গের পরিপন্থী না হইয়া তাহারই সহায়ক হয়। অতএব ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য মানুষের মুক্তি হইলেও উহাতে মানব-জীবনের অন্যান্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অস্বীকৃত বা অবহেলিত হয় নাই।

মানবের মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া ভারতবর্ষে দর্শনের সহিত জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ দেখা যায়। জীবমাত্রেই দুঃখ পরিহার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং অবিমিশ্র ও অপরিচ্ছিন্ন সুখ, মানুষের অধিগম্য অন্য কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় ও অপরিহার্য সাধন। অতএব মানুষের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভের চেষ্টা যেমন অপরিহার্য, তেমনি দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাও অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান মানবের মুক্তির সাধন, তাহা মাত্র বৌদ্ধিক বোধ (intellectual understanding) বা যুক্তি-তর্কলভ্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র নহে। উহা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎকার। মানুষ তাহার বদ্ধাবস্থায় যেরূপ জড়জগৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করে, জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ

করিতে হইবে। আবার ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন যেমন পরিচালিত হয়, সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। দর্শনে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়াই তাহাকে ভারতীয় সাহিত্যে 'দর্শন' বলা হয়। এই দার্শনিক জ্ঞান শুধু বিচারের বস্তু নহে, উহা জীবনে অনুভূতির বিষয়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

পাশ্চাত্য দর্শনের চরম লক্ষ্য কিন্তু জীবাত্মার বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ নহে। ইহাতে জীবাত্মা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার জন্মমরণ-নিবৃত্তিরূপ বা অন্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন শাখায় জীবাত্মার আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলেও তাহার দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা এবং দেহবিনাশের পর ঊর্ধ্বদৈহিক অস্তিত্ব ও দেহান্তর প্রাপ্তির কথা মহামতি প্লেটোর দর্শন ব্যতীত অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য এই সব দর্শনশাখায় এই দেহে এবং এই জীবনে জীবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের চরম উদ্দেশ্য দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং উহা জীবাত্মার ঐহিক কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। তারপর জীবজগৎ সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য, উহা বিচারবুদ্ধি বা তর্কলভ্য একরূপ পরোক্ষ জ্ঞান, উহাতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বা তাহার অপরোক্ষানুভূতির কথা বিশেষভাবে দেখা যায় না। ফলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জীবনে সম্যক্ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের জীবন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সম্যক্‌রূপে প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে তাঁহাদের দর্শন জীবজগতের আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং অনেক প্রকার দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা যেন বিচারবুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের বা সত্যের প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান নহেন।

অতএব আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার মুক্তি, আর পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা মানবের ঐহিক জীবনের উন্নতি। ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক, আর পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ জীবজগতের বিচারসঙ্গত জ্ঞানপ্রদায়ক। অন্যভাবে আমরা একথাও বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য দর্শন প্রবৃত্তিমার্গের সহায়ক, আর ভারতীয় দর্শন নিবৃত্তিমার্গের নির্দেশক; পাশ্চাত্য দর্শন প্রেয়োভিমুখী, ভারতীয় দর্শন শ্রেয়োভিমুখী।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দশম অধ্যায়—পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

এখন আপনার বাক্যরূপ সূর্যকিরণের বিকাশে ঋষিগণ যে মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। ইঁহাদের বাক্যরূপ জীবনের বীজ আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উপর আপনার কৃপা বর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফল লাভ হইল।

অহো, নারদাদি সাধুগণের বচন নদীস্বরূপ, আমি তাহা দ্বারা সংবাদসুখের অপার মহোদধি হইয়াছি। হে প্রভু, আমি জন্ম জন্মান্তরে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম করিয়াছি, আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু থাকায় তাহা উপযোগী হইল না (নিষ্প্রয়োজন হইল)। ১৫০

নতুবা আমি বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শুনিয়াছি, পরন্তু আপনি কৃপা না করা পর্যন্ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং ভাগ্য যখন অনুকূল হয়, তখনই যেমন উদ্যম সফল হয়, তেমনি গুরু-কৃপা পাইলেই শাস্ত্রাদি সফল হয়। মালী সারা জন্ম বৃক্ষের জন্য পরিশ্রম করে, পরন্তু বসন্ত আসিলেই ফুলফল লাভ হয়।

অহো, বিষয়াসক্তির নিবৃত্তি হইলে মাধুর্যের আস্বাদন পাওয়া যায়; রোগের প্রশমন হইলেই ঔষধের মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্ ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, যখন চৈতন্য আসিয়া তাহাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে। তেমনি শাস্ত্রের আলোচনা অথবা যোগাদির অভ্যাস তখনই উপযোগী হয়, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞা পাওয়া যায়। এইভাবে আত্মানুভবে মত্ত হইয়া অর্জুন নিঃশঙ্ক-চিত্তে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—হে দেব, আপনার বাক্য আমি মানিয়া লইলাম। সত্যই আমার প্রতীতি হইয়াছে যে আপনি দেব ও মানবের বুদ্ধির অগম্য। আপনার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ না করিয়া যে নিজ বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে, সে কখনই আপনাকে জানিতে পারে না—এই বিশ্বাস আমার নিশ্চিতভাবে হইয়াছে।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পৃথ্বীর ঘনত্ব কতখানি তাহা যেমন পৃথিবী জানে; তেমনি হে লক্ষ্মীপতি, আপনার সর্বশক্তি কেবল আপনিই জানেন, এ সম্বন্ধে বেদাদির বুদ্ধি বৃথাই প্রজ্ঞার বড়াই করে।

মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে? পবনকে কে ধরিয়া রাখিবে? অনাদি মায়াসমুদ্র পার হইয়া যাইবে—এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও ঐরূপ কঠিন, এইজন্য কেহই আপনাকে জানিতে পারে না,—আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই যোগ্য (অর্থাৎ শুধু আপনার দ্বারাই সাধ্য)। আপনাকে আপনিই জানেন, এবং অপরকে এ সম্বন্ধে উপদেশ করিতে আপনিই

সমর্থ, যদি আপনার মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহি, পরন্তু ইহা মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি করিতে ভয় পাই, তবে আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাতকের পক্ষে উহা নিরর্থক, কারণ মেঘ হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে। তেমনি শ্রীগুরু আছেন, পরন্তু আপনিই আমার গতি, এখন ইহা থাকুক। আপনি আমাকে আপনার বিভূতির কথা বলুন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

হে প্রভু, আপনার দিব্য বিভূতি—যাহা নানা আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। হে অনন্ত, যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মনামাঙ্কিত বিভূতিগুলি প্রকট করুন। ১৭০

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

হে প্রভু, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব? কিভাবে আপনাকে ধ্যান করিব? যদি আপনার সমস্ত রূপই চিন্তা করিতে হয়, তবে তো ধ্যান করা হয় না। তবে আপনি পূর্বে যেমন আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিয়া বলুন। যে যে ভাবে আপনাকে চিন্তা করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভুতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

আর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আপনার যে বিভূতি, তাহা বর্ণনা করুন; যদি বলেন—'আমি বারবার কি বলিব?' হে জনার্দন, এভাব মনে আসিতে দিবেন না; অমৃত সেবন করিতে করিতে কেহ বলে না 'যথেষ্ট হইয়াছে'। যাহা কালকূটের সহোদর, যাহা দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে অমর হইবার জন্য পান করিয়াছিলেন, যাহা পান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়; আপনার বচনামৃত লাভের জন্য মন্দরাচলকে মন্থন-দণ্ড করিয়া ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে হয় নাই। ইহা অনাদি, স্বভাবতই স্বয়ংসিদ্ধ; ইহা দ্রব হয় না, ইহা ঘনীভূতও নহে, ইহাতে রসভেদ নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহার মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই সমস্ত সংসার মিথ্যা হইয়া যায়, এবং নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০

জন্মমৃত্যুর বার্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অন্তরে ও বাহিরে মহাসুখ বাড়িতে থাকে, দৈবযোগে যদি কেহ ইহা সেবন করে, তবে তদ্রূপ হইয়া যায়; সেই পরমামৃত আপনি আমাকে দিতেছেন, আমার চিত্ত কখনও 'যথেষ্ট হইল' বলিতে পারে না।

আপনার নামই তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আপনার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। সর্বশেষে আপনি আনন্দের সহিত সুখ-সংবাদ বলিতেছেন। এই সুখ কিসের সমান, তাহা বলা যায় না—পরন্তু ইহাই জানি যে এ সুখের তুলনা নাই। সূর্য কি কখনও পুরানো হয়? (চন্দ্রের কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্র কি একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়? গঙ্গার জল কি পর্যুসিত হয়? আপনি

যাহা বলিলেন তাহাতে শব্দব্রহ্মের রূপ দেখিলাম; আজ চন্দন-বৃক্ষের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলাম। পার্থের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন—'পার্থ, তুমি ভক্তি ও জ্ঞানের আধার হইয়াছ।'

এইভাবে প্রেমাস্পদের সন্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া উঠিল,—তাহা সযত্নে সংবরণ করিয়া বলিলেন : শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি (আমার) যে বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা এত অসংখ্য (অপার) যে, আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, এইজন্য আমার প্রধান বিভূতিগুলি, যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই শ্রবণ কর। হে কিরীটী, যাহা জানিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হইবে—যেমন বীজ হাতে আসিলেই বৃক্ষও করতলগত হইল, বলা যায়; কিংবা উদ্যান হস্তগত হইলে ফুল আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি বিভূতিগুলি দেখিলে সকল বিশ্বই দেখা হইয়া যায়। হে ধনুর্ধর, যথার্থই আমার বিস্তারের অন্ত নাই,—দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাও আমারই মধ্যে অবস্থিত।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

হে গুড়াকেশ, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী অর্জুন, শুন : আমি প্রাণিমাত্রের মধ্যে আত্মা হইয়া আছি। ভিতরেও আমি ইহাদের অন্তঃকরণে আছি, বাহিরেও আমি ইহাদেব আচ্ছাদন করিয়া আছি, আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত। যেমন মেঘের তলে ও উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই আছে; আর মেঘ আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে; পরে যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশই হইয়া থাকে, তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত—সৃষ্টি, স্থিতি ও শেষগতি। এইভাবে, আমার বিভূতিযোগের দ্বারা আমার বিস্তার ও, ব্যাপকতা বুঝিয়া লও, হৃদয়কে শ্রবণ (কর্ণ) করিয়া সমস্তই শ্রবণ কর।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ইহা বলিয়া কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, (দ্বাদশ) আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রভাবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে আমি কিরণসংযুক্ত রবি। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি, আকাশের অঙ্গনে তারাগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২২

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমিই মদনারি শঙ্কর, ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না। যক্ষরক্ষগণের মধ্যে শম্ভুর সখা ধনবান্ কুবেরও আমি। অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক (অগ্নি), সমস্ত শিখরবান্ পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুমেরু আমিই।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২৩

বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একাদশ যে মন, তাহাও আমি জানিবে, ভূতগণের মধ্যে স্বাভাবিক চেতনাও আমি।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহায় সর্বজ্ঞ পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিও আমি। সেনানায়কের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়—হরবীর্যে যাহার জন্ম, কৃত্তিকাগণ যাহার মাতা।২১০

বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে বৃহত্তম জলরাশি সমুদ্র আমি, মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। সমস্ত বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীড়াস্থল যে একাক্ষর ওঁ, তাহাও আমি। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, যাহা ইহলোকে কর্মাদির মধ্যে কর্মত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। স্থাবর গিরির মধ্যে পুণ্যরাশি যে হিমালয়, তাহাও আমি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭

কল্পবৃক্ষ, পারিজাত চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। হে পাণ্ডব, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ। হে প্রবুদ্ধ জ্ঞানী অর্জুন, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি আমি কপিলাচার্য, প্রসিদ্ধ তুরঙ্গমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা। হে অর্জুন রাজ্যের ভূষণস্বরূপ গজগণের মধ্যে আমি ঐরাবত,—ক্ষীরসাগর মন্থনকালে যাহা উঠিয়াছিল। সর্বলোক প্রজা হইয়া যাহাকে সেবা করে, নরগণের মধ্যে যে রাজা, সেও আমারই বিশেষ বিভূতি।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯

হে ধনুর্ধর, নানাবিধ শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের হস্তে শোভা পায়।২২০

ধেনুর মধ্যে আমি কামধেনু, আমিই জন্মকারণ মদন জানিবে। হে কুন্তীসুত, সর্পকুলের নায়ক বাসুকি আমিই, নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত। জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমদিক্‌পতি বরুণও আমি। আর হে পাণ্ডুকুমার, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যে অর্যমা সেও তত্ত্বতঃ আমিই। যাঁহারা জগতের শুভাশুভের নিয়ন্তা (প্রাণিগণের) মনের অনুসন্ধানকারী, যাঁহারা কর্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন, সেই নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে আমি যম, যিনি কর্মসাক্ষী ধর্ম।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০

দৈত্যকুলের মধ্যে ভক্ত প্রহ্লাদও আমি, সেইজন্যই সে দ্বেষভাবাদি দোষে লিপ্ত হয় নাই। গ্রাসকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল, শ্বাপদের মধ্যে সিংহ আমারই রূপ। পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় আমারই বিভূতি, তাই সে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১

হে ধনুর্ধর, পৃথিবীর বিস্তারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া যে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজন করিতে পারে, সেই গতিশীল পদার্থের মধ্যে যে পবন সেও আমি,—হে পাণ্ডুসুত, সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমিই শ্রীরাম, যিনি ত্রেতাযুগে সঙ্কটে পতিত ধর্মের পক্ষ লইয়া কেবল আপনার শরাসনের সাহায্যে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বাভিমুখিনী করিয়াছিলেন; অনন্তর সুবেল পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রতাপে আকাশে জয়ঘোষণাকারী ভূতগণকে লঙ্কেশ্বরের মস্তকপঙ্‌ক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সূর্যবংশে সূর্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন, সেই শস্ত্রধারিগণের মধ্যে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র আমিই। আর জলচরগণের মধ্যে আমিই মূর্তিমান্ মকর। সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা, যাহাকে জহ্নু মুনি পান করিয়াছিলেন, পরে আপন জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। হে পাণ্ডুসুত, সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিলোকে প্রবহমানা যে জাহ্নবী তাহাও আমিই জানিবে।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিভূতির বর্ণনা করিতে গেলে, সহস্র জন্মেও অর্ধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত নক্ষত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্তঃকরণে এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হইলে যেমন গোটা আকাশকেই গ্রহণ করিতে হয়, পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে যেমন ভূমণ্ডলকেই গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি হে পাণ্ডব, আমার বিস্তার জানিতে হইলে আমাকেই জানিতে হয়। ২৪০

শাখা, ফুল, ফল—এ সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন সমগ্র বৃক্ষকে ধরিতে হয়, তেমনি আমার বিশেষ বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, নতুবা পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? সুতরাং হে মহামতি, একেবারেই জানিয়া লও যে সবই আমি। হে কিরীটী, আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত, তন্তু যেমন বস্ত্রে ওতপ্রোতভাবে আছে, আমাকে এইরূপ ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেদ কেন করিবে? এক একটি বিভূতি পৃথকভাবে জানিবার কি প্রয়োজন? পরন্তু ব্যাপকভাবে জানিবার যোগ্যতা তোমার নাই, সুতরাং এ কথা থাকুক। তুমি আমার বিভূতির কথা জানিতে চাও, সুতরাং তাহাই শুন:

বিদ্যার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্যা, তাহা আমিই। আমিই তার্কিকগণের তত্ত্বনির্ণায়ক বাদ, যাহার জন্য শ্রবণকারীর তর্কের বল বৃদ্ধি পায় এবং বক্তারও বাক্যের মাধুর্য হয়। এইভাবে প্রতিপাদনের মধ্যে যে 'বাদ' তাহা আমিই, অক্ষরের মধ্যে বিশুদ্ধ অ-কারও আমি। সমাসের মধ্যে আমি 'দ্বন্দ্ব' জানিবে, যে কাল—মশক হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলকে গ্রাস করে, সে কালও আমি। ২৫০

হে কিরীটী, যাহা প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সারা পবনকে গিলিয়া খায়, আকাশ যাহার উপরের মধ্যে স্থান পায়, এমনি যে অনন্ত 'কাল'—তাহা আমিই—লক্ষ্মীর সহিত লীলাবিলাসকারী ভগবান কহিলেন, সৃষ্টিসমূহের সৃষ্টিকর্তাও আমি।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

আর, সৃষ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন) করি, আমিই সকলের জীবন, আর অন্তে যখন ভূতগণকে সংহার করি, তখনও মৃত্যুরূপে আমিই। স্ত্রীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি, শুন। হে অর্জুন, নিত্য নূতন যে কীর্তি তাহা আমারই মূর্তি, ঔদার্যযুক্ত যে সম্পত্তি তাহাও আমি—জানিবে। স্ত্রীলোকের মধ্যে যে দৈনন্দিন (অখণ্ড) স্থৈর্য ও মেধা, তাহাও আমি, ধৃতি এবং ক্ষমাও আমি। নারীগণের মধ্যে এই সাতটি শক্তি আমারই বিভূতি জানিবে।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

রমাপতি বলিলেন, হে প্রিয়োত্তম, বেদত্রয়ের সামবেদের মধ্যে যে 'বৃহৎসাম ; তাহা আমিই। সকল ছন্দের মধ্যে যাহাকে গায়ত্রীছন্দ বলে, তাহা আমারই স্বরূপ—ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে আমি কুসুমাকর বসন্ত। ২৬০

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

হে বিচক্ষণ অর্জুন, কৌশলপূর্ণ খেলার মধ্যে যে দ্যূতক্রীড়া, তাহাও আমি, এজন্য প্রকাশ্য চৌরাস্তার উপর খেলিলেও ইহা নিবারণ করা যায় না। সমস্ত তেজস্বী পদার্থের মধ্যে যে তেজ, তাহা আমিই—নিশ্চয় জানিও, সকল কার্যের যে উদ্দেশ্য তাহাও আমি। ব্যবসায়ের মধ্যে নীতিপূর্ণ উদ্যমই আমার বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের মধ্যে আমি সত্ত্ব,—যাদবকুলের মধ্যে যে শ্রীমন্ত (ঐশ্বর্যশালী) সেও আমি, জানিবে। দেবকী-বসুদেব হইতে উৎপন্ন আমি যশোদার কন্যার বদলে গোকুলে গিয়াছিলাম ও (স্তনপান করিয়া) পূতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্বেই সৃষ্টিকে দানবশূন্য করিয়াছিলাম—হস্তে গিরিবর গোবর্ধনকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছিলাম।

কালিন্দীর হৃদয়শল্য (কালীয়নাগকে দমন করিয়া) দূর করিয়াছিলাম। জলন্ত গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং গোবৎসের বিষয়ে বিরিঞ্চিকেও পাগল করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থার প্রথমেই

কংসের ন্যায় ঘোরবিক্রমী দৈত্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক একটি করিয়া কত আর বলিব? তুমিও এ সমস্ত দেখিয়াছ অথবা শুনিয়াছ,—যাদবগণের মধ্যে ইহাই আমার স্বরূপ জানিবে। আর চন্দ্রবংশের পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমিই আমার বিভূতি জানিবে—এইজন্যই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত প্রেমভাব। ২৭০

মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্যের আধার উশনা কবিও আমি।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে—যাহা পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহা সারাসার নির্ণয় করে, ধর্মজ্ঞের পক্ষ অবলম্বন করে—সকল শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে নীতিশাস্ত্র, তাহা আমিই। হে সখা অর্জুন, সমস্ত গূঢ় বিষয়ের মধ্যে আমি 'মৌন'—এইজন্য রহস্য বক্তার সম্মুখে স্বয়ং ব্রহ্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান। জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান; এখন এই বিভূতি বর্ণনা আর কত করা যায়? ইহার কোন পার দেখা যায় না।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

হে ধনুর্ধর, দেখ, বর্ষার বারিবিন্দু গণনা করা কিংবা তৃণাঙ্কুরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করা যায় না, আমার বিভূতির কোন হিসাব নাই। কয়েকটি প্রধান বিভূতির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাও মনে হইতেছে, ভাসা ভাসা বর্ণনা করা হইয়াছে।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

বিভূতিবিস্তারের কোন হিসাব করা যায় না; তুমিই বা কত শুনিবে, আর আমিই বা কত বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে একেবারে আমার রহস্য বুঝাইয়া বলিতেছি,—সমস্ত ভূতাঙ্কুরের যে বীজ বিস্তার লাভ করে, তাহাই আমি। ২৮০

অতএব ছোটবড় ভেদ করিবে না, উচ্চনীচ ভাব পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তুজাত আমারই বিভূতি জানিবে। এখন হে অর্জুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি সাধারণ চিহ্নের কথা বলিতেছি শুন—উহা দ্বারা তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়, যে যে স্থানে ঐশ্বর্য ও দয়া, এ দুটি গুণই আসিয়া একত্র বাস করে, সেই সেই স্থানেই আমার অংশ জানিবে। গগনে সূর্যবিম্ব একটিই, পরন্তু তাহার প্রভা যেমন ত্রিভুবনে প্রসারিত হয়, তেমনই সকল লোক এক আমারই আজ্ঞা পালন করে। কামধেনুর নিকট যে যখন যে বস্তু প্রার্থনা করে, সে ঐ সব বস্তু একসঙ্গেই উৎপন্ন করিতে থাকে, সমস্ত বৈভব তাহার অঙ্গে ভরিয়া আছে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

আর ইনি সামান্য, উনি অসাধারণ—এই প্রকারভেদ করাও দোষের, কারণ এক আমিই সমগ্র বিশ্বরূপে আছি। ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা করা যায়? দৃষ্টিতে ভেদের কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে? ঘৃতকে কেন মন্থন করিবে? অমৃতকে কি ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে? বৃষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে?

সূর্যবিম্বের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দেখিতে গেলে চক্ষুর দৃষ্টিই নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে 'সামান্য' 'বিশেষ'ও তেমনি। আর বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে, আমার অপার বিকাশের আর কত মাপ করিবে? সুতরাং উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দেখ, আমার এক অংশ এই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এইজন্য ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধিতে ভজনা কর।

জ্ঞানী পুরুষের সাধনা-উপবনের বসন্ত, বৈরাগ্যশীল পুরুষের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে অর্জুন বলিলেন, হে স্বামিন্, আপনি তো এইরূপ এক রহস্যের কথা বলিলেন—যে ভেদ এক বস্তু, আর আমি তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া ভেদভাব পরিত্যাগ করিব। অহো, সূর্য কি জগৎকে বলে—এই অন্ধকারকে দূরে তাড়াইয়া দাও। তেমনি আপনি অনুচিত কথা বলিতেছেন, ইহা বলাও আমার পক্ষে অধিক বলা হইবে। আপনার নাম যদি কোন এক সময়ে কেহ মুখে উচ্চারণ করে, কিংবা কর্ণে শ্রবণ করে, তবে ভেদভাব তাহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পরও কি আলোকের উষ্ণতা থাকিবে?

তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার কথায় ক্রোধ করিও না। ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির কাহিনী বর্ণনা করিলাম, তাহা অভেদ বুদ্ধিতে নিজের অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কি না? ইহা দেখিবার জন্যই আমি বাহ্যভঙ্গীতে (বহিরঙ্গভাবে) কিছু বলিতেছিলাম—এখন দেখিতেছি বিভূতি সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। তখন অর্জুন বলিলেন—হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, আমি দেখিতেছি সমস্তই আপনি আরম্ভ করিয়াছেন।

'হে রাজন্, পাণ্ডুসুত অর্জুন এইরূপ অনুভবের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'—সঞ্জয়ের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, ইনি যে (নিজের) সৌভাগ্য ফেলিয়া দিতেছেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই,—আমি ভাবিয়াছিলাম ইহার অন্তঃকরণ সুস্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অন্ধ।

পরন্তু এ কথা থাক, অর্জুন এইভাবে অদ্বৈতভাবের মান বাড়াইতেছিলেন,—কারণ ইহার পর অন্য এক বিষয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল, বলিলেন: অন্তরের অন্তরে (আত্মানুভবের) যে প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হউক—চিত্তের এই মার্গে আমার বুদ্ধি চালিত হইতেছে। আমার এই দুটি চক্ষু দ্বারাই সমগ্র বিশ্বরূপ আলিঙ্গন করিব। এত বড় ইচ্ছা তিনি ভাগ্যবান্ বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলেন।

আজ তিনি কল্পতরুর শাখাই হইয়াছেন, সুতরাং তাহাতে বন্ধ্যাত্ব-দোষ দেখা যায় না, তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সত্য করিয়া দিতেছেন। যিনি প্রহ্লাদের কথায় স্বয়ং সকল বস্তু হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই আজ অর্জুন সদ্গুরুরূপে পাইয়াছেন।

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য পার্থ কিভাবে উদ্যোগ করিলেন, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে। ৩১০

'নূতন তীর্থে'—নূতন পথে

[কামারপুকুর জয়রামবাটী দর্শন]

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার বসু

বহুদিনের সাধ—কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন ক'রব। ভক্তমুখে শুনি, চুপ ক'রে থাকি। দুস্ ক'রে জলে ওঠে আকাঙ্ক্ষার শিখা, আবার তখনই নিভে যায়—কখনও শারীরিক অপটুতা, কখনও প্রকৃষ্ট সুযোগের অভাব। কত ভক্ত যায় ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ায়, কেহ বা যায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে, আবার কেউ যায় অক্ষয় তৃতীয়ায়; বছরের সব সময়েই ভক্তেরা যায়, যখন যার সুযোগ মেলে; ফিরে এসে বলে কত কথা, চুপ ক'রে শুনি।

জনৈক ভক্ত-বন্ধুর সাথে অনেক তীর্থে গিয়েছি; তিনি একদিন এসে বললেন, 'চলুন, আসছে ২৩শে জানুআরির ছুটিতে কামারপুকুর জয়রামবাটী যাওয়া যাক। বেলুড় মঠ থেকে অনুমতি নেওয়া হ'ল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় সব গোছগাছ করছি, এমন সময় খবর এল—যাওয়া হবে না। কেন?—মঠ থেকে ফোন ক'রে জানিয়েছেন: এখন ওখানে খুব ভিড়।

কি আর করা যাবে? যাওয়া হ'ল না। মনতো খারাপ হবেই। ভাবলাম, ঠাকুর নিশ্চয়ই সময় ও সুযোগ ক'রে দেবেন।

দিন কেটে যায়, বন্ধুর আর সুবিধা হ'য়ে ওঠে না। একদিন আর এক বন্ধু আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে কথায় কথায় বললেন যে তাঁর মা কলকাতা থেকে চলে যাবার পূর্বে একদিন তাঁকে নিয়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যাবেন। আমাদের যাওয়া হয়নি শুনে তিনি বললেন, 'চলুন না আমাদের সাথে। রবিবার—সকালে বের হ'য়ে সন্ধ্যার পর ফিরে আসব।'

রবিবার এল। সকাল ছটায় আমরা সকলে যাদবপুর (ওখানেই আমাদের সবার বাড়ী) হ'তে রওনা হই। পথের সম্বন্ধে আরও অনেক খোঁজখবর নিলাম, শুনলাম—৩ ঘণ্টা ৩॥০ ঘণ্টা লাগবে; গবর্ণমেণ্ট হাউস থেকে ৬৫ মাইল। পথতো অজানা, জেনে জেনে যেতে হবে। তবে এটা ঠিক বুঝেছিলাম যে তারকেশ্বরের পথে যেতে হবে। মানচিত্র থেকে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলাম: তারকেশ্বর ডাইনে রেখে সোজা পথে চাঁপাডাঙ্গা হ'য়ে আরামবাগ, সেখান থেকে কামারপুকুর—পরে জয়রামবাটী। আমাদের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর দিয়ে গঙ্গা পার হ'য়ে চলল। গাড়ীর পিছনে নতুন রিং পরানো হয়েছে। ড্রাইভারের পাশে বসে বন্ধু গাড়ীর গতিবেগ কিছুতেই ২৫ মাইলের উর্ধ্বে উঠতে দিচ্ছিলেন না। তারকেশ্বর যখন ছাড়িয়ে যাই, তখনই দেখি ৯টা বেজে গেছে। একবার ট্যাক্সিতে তারকেশ্বর এসেছিলাম—সময় লেগেছিল দু ঘণ্টা। তাই ভাবলাম—কামারপুকুর কখন পৌঁছব তার ঠিক কি? কিছু বাদে চাঁপাডাঙ্গার পরেই দামোদর, বন্যার তাণ্ডবলীলায় দামোদরের খেলা দেখেছি; এই নির্জীব শান্ত শীর্ণ জলধারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একটা কাঠের পুল এপার ওপার যোগ ক'রে রেখে দিয়েছে। পার হবার সময় দেখলাম ডাইনে কংক্রিটের একটা ভাল পুল নির্মাণের চেষ্টা চলেছে। সেখান থেকে হরিণখোলা ৪ মাইল। এখানে আবার মুণ্ডেশ্বরী নদী। লৌহতরীতে (Steel Boat)

মোটর পার করতে হ'ল। নদী প্রায় দু ফার্লং চওড়া। কিন্তু জলস্রোত বর্তমানে মাত্র শ-খানেক ফুট জুড়ে ওপার ঘেঁসে চলেছে। বাদবাকীটা বালুর চর। এই চড়ার উপর দিয়ে সমান্তরাল ভাবে দুই সারি লোহার পাত পেতে মোটর যাবার রাস্তা করা হয়েছে সোজা জলের ধার পর্যন্ত। সেখানে লৌহতরী ভিড়বার ঘাট। জলের ধারে গিয়েও নিস্তার নেই। ঘাটে নৌকা নেই। খরস্রোতা ক্ষীণকায়া নদী কখন বা প্রচুর জল বহন ক'রে স্ফীতা, তখন পারাপারের লৌহতরী সহজেই তার নির্দিষ্ট ঘাট খুঁজে পায়। আবার অন্য সময়ে দেখা যায় নদীবক্ষে চড়া জেগে উঠেছে। তরী খুঁজে পায় না তার ভিড়-বার ঘাট। ভিড়তে হয় যত্র তত্র, তখন জল ঘেঁসে নদীর কোল বেয়ে যেতে হয় লৌহতরীর কাছে। হয়তো বা এক চাকা জলে, এক চাকা ডাঙায়। সিক্ত বালুকায় চাকা না চালালে গাড়ী যাবে অচল হ'য়ে—শুষ্ক বালুকা গ্রাস করবে রথ-চক্র। অবশ্য জীপ গাড়ী হ'লে কতটা নিরাপদ।

অনেক সময় লাগল এই নদী-অতিক্রম-পর্বে, ওপারে ঢালু রাস্তায় উঠতে হয়। পাড়ের উপরে উঠে দেখলাম যাত্রীবাহী কয়েকখানা মোটরবাস দাঁড়িয়ে আছে। তারকেশ্বর হ'তে নদী পর্যন্ত এক সার্ভিস, আবার নদী পার হ'য়ে অন্য সার্ভিস। তারকেশ্বর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেনে অথবা বাসে এসে শুধু বাসে-বাসেই কামারপুকুর যাওয়া যায়। একখানা ব্যক্তিগত গাড়ীর (private car) আরোহীসহ দামোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদী পার হ'তে প্রতি ক্ষেত্রে ১৸৹ টাকা ক'রে ট্যাক্স লাগে। আমরা গাড়ীতে উঠে আবার চলতে লাগলাম। কিছু বাদেই আরামবাগ ও কালীপুরের মধ্যে দ্বার-কেশ্বর নদে কাঠের পুল—বর্ষার সময় সাময়িক-ভাবে খাড়া করা হয়। এই পুল পার হ'য়ে প্রায় মাইল খানেক পথ ভাল নয়। কালীপুর থেকে কামারপুকুর ৮মাইল।

বেলা প্রায় ১১৷৷৹ টায় বহু আকাঙ্ক্ষার কামারপুকুর গ্রাম দেখা গেল; উদ্দেশে প্রণাম করলাম। গ্রাম আরম্ভ হ'ল—বসতির মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে গাড়ী চলতে লাগল। সব বাড়ীরই মাটির দেয়াল; কিছু খড়ের ছাউনি, কিছু টিনের ছাদ। গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে ইটের প্রাচীরঘেরা শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণের প্রবেশ-দ্বারে গাড়ী দাঁড়াল,—মিটারে ৭৮ মাইল যাদবপুর থেকে।

আমাদের বড় দেরি হ'য়ে গেছে। সময়-মতো চিঠি লিখে সংবাদ দিতে পারিনি। তার ওপর এই অসময়ে এসে আশ্রমবাসী দের বিরক্ত করতে কেমন লাগে! কিন্তু উপায় কি? আমি একাই গাড়ী থেকে নেমে ছুটলাম। মন্দিরে প্রণাম ক'রে অধ্যক্ষ মহা-রাজকে খুঁজে নিয়ে কথা ব'লে দেখব। প্রথমেই মন্দিরে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। একে বেলা হয়েছে, ক্ষুধায় কাতর, তার উপর ৺ঠাকুরের দর্শনও পেলাম না। মন বেশ খারাপ হ'য়ে গেল। কি করি? উপায় নেই—রুদ্ধ মন্দির-দ্বারেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নাট-মন্দির ঘুরে দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হই। নাটমন্দিরে কয়েকজন তীর্থযাত্রী স্নান সেরে জামা-কাপড় পরছে। আর বলাবলি করছে—'মহারাজরা কোথায়? কাউকেই তো দেখছি না।' পশ্চিম দিকে লতাপাতার বেড়া-ঘেরা অংশের কাছে গিয়ে দেখি—প্রবেশ-দ্বারে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখাটি ঝুলে আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে এদিক ওদিক তাকাই, কাউকে ঘর থেকে বাইরে আসতে দেখি না। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে ডাকি—'কে আছেন? মহারাজ— ?' একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে

এলেন। আমি তাঁকে নোটিশটি দেখিয়ে বললাম, 'ভিতরে আসতে পারি?' তিনি বললেন, 'আসুন।' প্রণাম ক'রে বললাম, 'শুনেছি এখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বেলুড় গেছেন। এখন কে তত্ত্বাবধান করছেন?' তিনি বললেন, 'আমিই অধ্যক্ষ।'

কি আর বলি? সংবাদ না দিয়ে অসময়ে এসে পড়েছি, প্রসাদ পাব কিনা—ক্ষুধায় কাতর; শুধু নিজের হ'লে এক কথা—আরও ২।৩ জন রয়েছেন। ৺ঠাকুর দর্শনও হ'ল না। মনে হয়, দর্শন তো আর বিকাল ৪টার পূর্বে হবে না। এই অসময়ে ওঁদের অসুবিধায় ফেলে প্রসাদের কথাই বা বলি কি ক'রে? জয়রাম-বাটী গিয়েও লাভ নেই; সেখানেও সেই একই সমস্যা। মহারাজ নিজের থেকেও তো কিছু বলছেন না! কি করি? শেষে আমৃতা আমৃতা ক'রে নিজেদের পরিচয় দিলাম। বেলুড় মঠের অনুমতির কথা—সব কিছুই বিস্তারিতভাবে বললাম। আলাপ-পরিচয়ের পর অধ্যক্ষ মহারাজ একজন আশ্রমকর্মীকে ডেকে অতিথিশালায় একটি কামরা খুলে দিতে বললেন। মাদুর, সতরঞ্চ প্রভৃতি দিতে ব'লে তাকে স্নান-ঘরে জল দিতেও ব'লে দিলেন। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ঠাকুর দর্শন তো হয়নি। ভোগ নিবেদনের পর এখনই পাঁচ মিনিটের জন্য মন্দির খুলবে। যান, ঠাকুর দর্শন ক'রে স্নান ক'রে প্রস্তুত হোন। শীঘ্রই প্রসাদের ঘণ্টা পড়বে। দেরি করবেন না।'

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহারাজের নিকট হ'তে আমরা মন্দির অভিমুখে চলি। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে পূজোর জন্য আনীত সন্দেশের বাক্স নিয়ে আবার মহারাজের কাছে যাই। 'পূজো ও ঠাকুর-সেবার জন্য' ব'লে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি গ্রহণ ক'রে বললেন, 'শীঘ্র যান, মন্দির খুলেছে, এখনই আবার বন্ধ হ'য়ে যাবে।' ছুটে এসে দেখি মন্দিরদ্বার খোলা। কি আনন্দ! আমরা এক নয়নে চেয়ে আছি শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তির পানে। এক ঝলক মাত্র দেখে নিয়েই প্রণাম করলাম। সময় যে নেই! প্রণাম শেষ হ'তে না হতেই শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মাথা তুলে দেখি সত্যই দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। ভাবলাম, যতটুকু প্রাপ্য আছে, তাই তো পাব? অতৃপ্ত মন নিয়েই আমরা শ্রীমন্দিরের আশেপাশে কি আছে, দেখতে লাগলাম। বন্ধু তাঁর মাকে নিয়ে অতিথিশালায় গেলেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাখা পাত্রটি থেকে চরণামৃত গ্রহণ ক'রে পশ্চিমের ছোট উঠানটি পার হ'য়ে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের বারান্দায় উঠি। শুনলাম—ঐ ঘরই এখন ঠাকুরের শয়ন-ঘর।

আশ্রমের ফটক দিয়ে ঢুকতেই ডাইনে লতা-পাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা মন্দিরসংলগ্ন অঙ্গনে ঠাকুরের বাল্যলীলার স্মৃতি বহন ক'রে রয়েছে তাঁরই স্বহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ। ঠাকুর আম খেয়ে আঁটিটি পুঁতে দিয়েছিলেন এই উঠানের উত্তরে। দেখলাম, গাছে কচি আম অনেক রয়েছে। গাছটির পশ্চিমে এক সারিতে তিনখানা সুন্দর চালাঘর। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মাটির দেওয়াল। সদর রাস্তার উপর আশ্রমের উত্তর সীমানায় প্রাচীর-গাত্রের অনতিদূরেই অবস্থিত। ঘর সব কয়খানাই দক্ষিণমুখী। প্রথমখানা বাড়ীর বৈঠকখানা। মাঝের খানা মাঠকোঠা দোতলা—ঠাকুরের ভাইদের ছিল। শেষের খানা ঠাকুরের নিজের ঘর। ঘর কখানা খুব কাছাকাছি। ঘরগুলি বর্তমানে সযত্নে রক্ষিত। ঠাকুরের ঘরে—খাটে ঠাকুরের পট, আর দেয়ালে শ্রীশ্রীমায়ের

ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের পট টাঙানো। অতি নিপুণ হস্তে ঘরটি সাজানো। ঠাকুরের ঘরের সামনেই দক্ষিণে ৺রঘুবীরের সুন্দর মন্দির —পূব-মুখো, পাকাবাড়ী—তবে ছোট। পূজো ভোগ শেষ ক'রে উঠেছেন এক যুবক পুরোহিত —কানাই ঘোষাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, রঘুবীরের বর্তমান পূজারী—অতি যত্নসহকারে গৃহদেবতা শীতলা, রঘুবীর শিলা ও ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামেশ্বর হ'তে আনীত শিবলিঙ্গ দেখালেন।

৺রঘুবীরের মন্দিরের পূবে ছোট উঠানটির অপরদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির—জন্মস্থান ঢেঁকিশালের উপরেই নির্মিত। যে শ্বেত-প্রস্তরের বেদীতে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদীগাত্রে সম্মুখেই ছোট একটি ঢেঁকি, উনান ও একটি প্রদীপ খোদাই করা হয়েছে—ভক্তদের জানিয়ে দিতে যে এখানেই ছিল সেই ঢেঁকিশাল। ধূসর চুণার প্রস্তরে নির্মিত দক্ষিণমুখো মন্দিরটি দেখতে খুব সুন্দর। বেশী বড় নয়। মন্দির-শীর্ষ ৩০ ফুটের বেশী উঁচু ব'লে মনে হ'ল না। দক্ষিণে ১০।১২ ফুট পাথর-বাঁধানো খোলা জায়গা, পরে নাট-মন্দির—'মোজেক' করা ঝক্‌ঝকে মেঝে। নাটমন্দিরের তিন দিকেই তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। ৺রঘুবীরের মন্দিরের পিছনে পশ্চিম ধারে ভোগ রান্নার ঘর ও আশ্রমবাসীদের আবাস-স্থল।

আমরা আশ্রম-আঙিনা হ'তে বাইরে এসে সদর রাস্তা পার হ'য়ে উত্তরে অতিথি-শালায় যেতে প্রথমেই পাই বাঁ-হাতে মিশন-কর্তৃক সংস্কৃত যুগীদের পূর্বমুখী শিবমন্দির। দেখলাম, দ্বার রুদ্ধ। দুচার পা এগিয়ে যেতেই ঘন পাতায় আচ্ছাদিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একটি আম্রবৃক্ষ। তারই শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে আমাদের গাড়ীটি। আর একটু এগিয়ে গেলেই ডাইনে বাঁয়ে দুটি পাকাবাড়ী—একটি অতিথিশালা, অপরটি দাতব্য চিকিৎসালয়। রাস্তার উত্তরে হালদারপুকুরের দক্ষিণে বিস্তৃত খোলা জায়গায় পূর্বদিক ঘেঁসে এই দুইটি বাড়ী—পাশাপাশি একতলা দক্ষিণমুখো পাকা বাড়ী—উত্তরও খোলা। চমৎকার বাড়ী দুটি। অতিথিশালায় দুটি স্যানিটারি প্রিভি ও দুটি স্নানাগার সহ তিনখানা শয়নঘর—মাঝের ঘরখানা বেশ বড়। দেখলাম—আর একখানা বাড়ী উঠছে, বোধ হয় অতিথিদের জন্যই, পশ্চিমে একসারিতেই পুকুর ঘাটে যাবার রাস্তার ওপরে। হালদারপুকুরে জন-সাধারণের ব্যবহারের ইষ্টকনির্মিত দুইটি বড় ঘাট তৈরী হয়েছে—মেয়েদের জন্য পূর্বপারের মাঝখানে, আর পুরুষদের জন্য দক্ষিণ পারের মাঝামাঝি। আমরা হাতমুখ ধুতেই প্রসাদের ঘণ্টা পড়ে গেল। আমরা ও অন্যান্য অতিথিরা —সবাই মিলে ৭।৮ জন আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঢুকলাম। একজন ব্রহ্মচারী আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন। মেয়েদের পাশের ঘরে বসতে বললেন। আরও ৮।১০জনকে দেখলাম বারান্দায় বসেছেন প্রসাদ পেতে। আমরা সাধুদের সাথেই বসে প্রসাদ পেলাম। সুন্দর সুগন্ধ প্রসাদ, প্রচুর খেয়ে ফেললাম।

আহারান্তে আমরা অতিথিশালায় ফিরে যাই। কি রোদ! উত্তর দক্ষিণ খোলা থাকাতে আমাদের বিশ্রামকক্ষটিতে বেশ হাওয়া। সবাই শুয়ে পড়লাম; আমার কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করি, আর মাথায় কত রকমের চিন্তা—একের পর এক উদয় হ'য়ে আবার লয় পাচ্ছে। বিশেষ কোন কর্মসূচী তৈরী ক'রে নিয়েতো আসিনি।

আসার পূর্বে এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হ'য়ে জেগেছিল—কামারপুকুর জয়রামবাটী যাব, ঠাকুর আর মাকে দেখব। আর কিছু দেখার আছে কিনা, দেখতে হয় কিনা—দেখতে হ'লে কি ক'রে দেখা যায়, কিছুই ভাবিনি।

যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টির প্রতিটি স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত, যিনি জগৎব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক, তিনিই অহেতুকী কৃপায় অলক্ষ্য হস্তে আমাদের জন্য যে এক অপূর্ব কার্যসূচী রচনা ক'রে রেখেছেন, তা কে জানত?

ঘুম আসে না। হঠাৎ মনে হ'ল কি শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি সময়? যাই না, একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি আশ্রমের কাছাকাছি আশেপাশের জায়গাগুলি।—মনে উঠতেই উঠে পড়লাম। সহধর্মিণীও সাথে সাথে উঠে পড়ে বললেন, 'আমিও যাব।' আমরা ঘর থেকে বের হ'য়ে খোলা জায়গায় পড়ে ডাইনে ঘুরে হালদারপুকুরে পুরুষদের ঘাটের দিকে গেলাম। দেখি ঘাটের মাথায় এক বিজ্ঞাপন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের নির্দেশ—শিক্ষাকেন্দ্র (Training Centre). ঘাট দেখে আমরা সদর রাস্তায় উঠে পশ্চিমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। ভীষণ রোদ। একটু এগোতেই দেখি, আশ্রম-সীমানার মধ্যেই আর একটি অতি সাধারণ প্রবেশদ্বার। ঢুকলাম—সম্মুখে অদূরে দক্ষিণে গোশালা। প্রবেশদ্বারের বাঁপাশে প্রায় সীমানার প্রাচীর-ঘেঁসা একখানা বড় চালাঘর। একজন লোক বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম যে সে এখানে কাজ করে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম—গোশালায় চাষের বলদ ও দুগ্ধবতী গাভী আছে; জমি আছে আশ্রমের,—চাষ হয়। লোকটি গেট দিয়ে বাইরে গেল। আমরাও তার পিছন পিছন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লোকটি বললে, কাছেই ভূতির খাল। কথা বলতে বলতে আমরা পশ্চিমে একটু এগিয়ে পড়েছি, সামনেই দেখি রাস্তার বাঁ-ধারে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছায়া ছড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে একটি প্রসারিত শাখা থেকে ঝুরি নেমে মাটিতে প্রবেশ করেছে। বৃক্ষের মূল-গুঁড়ি, তার প্রসারিত শাখা আর এই ঝুরির গুঁড়ি দিয়ে চমৎকার একটি প্রবেশদ্বারের মতো শোভা পাচ্ছে। এই প্রবেশপথের ফাঁকে ভেসে ওঠে আলেখ্য—অদূরে এক শান্ত সরোবর, নাম লাহাপুকুর, আর তার ওপারে সাঁওতালদের শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটীর। কি সুন্দর দৃশ্য! কত তীর্থ-যাত্রী—কত দেখে-বেড়ানোর দল এখানে আসে, তুলে নেয় কত আলোকচিত্র! প্রকৃতির খেয়ালে রচিত এই মনোরম প্রবেশপথে বাঁধিয়ে রাখা এই ছবিটি কি কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? যাক্—একটি স্ত্রীলোক ঐ জলাশয়ের দিক থেকে এই প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমাদের কথাবার্তায় ও বেশভূষায় সে ধ'রে নিয়েছে যে আমরা তীর্থযাত্রী। তাই অযাচিত উপদেশ দিল সে আমার স্ত্রীকে, 'মা, যাও—ধাইমার বাড়ী দেখে এস গিয়ে—ঐখানে।' আঙুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে দেখাল পূবের দিকে। আরও ব'লল—'ছেলেরা যদি জেগে থাকতো তবে তোমাদের সব দেখিয়ে আনতো।'

ভাবলাম সত্যি তো দেখবার অনেক কিছুই তো আছে। কিন্তু কে দেখাবে? ক্ষণিক দাঁড়িয়ে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এগিয়ে যাই পশ্চিমে বটগাছের দিকে। সোজাসুজি যেতে উঠে পড়ি রাস্তার ডাইনে উঁচু জমিতে। প্রায় পার হয়েছি, দূরে দেখি একদল লোক ফিরছে সে দিক থেকে—অন্য পথ দিয়ে। তাদের মধ্যে একজন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'ও দিক দিয়ে যাবেন না, ওদিক দিয়ে যাবেন না, এদিক দিয়ে আসুন।' আমরা প্রায় সেই উঁচুজমিটা পার হয়েছি, সামনে

চেয়ে দেখি শ্মশান। এক সারিতে একটার পর একটা ক'রে ৬।৭টা চুল্লীর জায়গা। ডাইনে দূরে শেষ চুল্লীটির কাছে দেখি কয়েকজন লোক একটি শব নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার শুনে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।—কেন ডাকছে? ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ঐ ভদ্রলোকের কথা মেনে নিয়ে একটু এগিয়ে দেখি সেই ঘোষাল! তিনি বললেন, 'ওদিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিলেন, শ্মশানের মধ্য দিয়ে? আর ওদিকে এগোবেন কি? ঐতো বটগাছ, আর ঐ যে ভূতির খাল।' শহরতলীর জল নিকাশের বড় পয়ঃপ্রণালীর মতো এঁকে-বেঁকে-যাওয়া একটা নালা। আরও বললেন, 'আপনারা ঘুমিয়েছেন ভেবে আর ডাকিনি। এঁরা বললেন তাই এঁদের নিয়ে বেরিয়েছি। আসুন, আপনাদেরও সব দেখিয়ে দি।' এই কথা ব'লে ভদ্রলোকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; তাদের সব দেখা হ'য়ে গেছে। আমরা তাঁর সাথে সাথে চললাম। খুব রোদ—ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিশাল প্রান্তরের পর আমোদর, তার ওপারে দূরে একটা টিনের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেরে গ্রাম। ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস্তুভিটা ত্যাগ ক'রে এখানে এসে বাড়ী করেছিলেন।'

ঘোষাল মশাইকে নিশ্চয়ই ঠাকুর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন আমাদের জন্য। নইলে কে আসে যেচে দেখাতে? ঠাকুরের জন্মভূমি, বাল্য ও কৈশোর লীলার পটভূমি এই কামারপুকুর, ভক্তের শ্রেষ্ঠ তীর্থ—এ যুগের মথুরা-বৃন্দাবন! এই গ্রামের প্রতি গৃহ, প্রতি বন, প্রতি মাঠ ঘাট পথ, প্রতি ধূলিকণা ঠাকুরের চরণ-স্পর্শে পবিত্র।

ফেরার পথে চলতে চলতে আমরা আশ্রম ছাড়িয়ে গেলাম। পথিপার্শ্বে বাঁয়ে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে ঘোষাল বললেন, 'শিব-মন্দির, এখানেই গোপেশ্বরের কাছে ঠাকুরের মা ৺চন্দ্রাদেবী পূজা দিয়েছিলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন খবর এল যে তাঁর ছেলে পাগল হ'য়ে গেছে।' ঘোষাল সব কিছুই খুব যত্নসহকারে দেখিয়ে চলেছেন। তাঁর ব'লে যাওয়া কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে আমরা তাঁর সাথে এগিয়ে চলেছি। একটু এগিয়েই দেখা গেল পাঠশালা। লাহাবাবুদের পূজা-মণ্ডপের সামনেই নাটমন্দিরে এই পাঠশালা—টিনের ঘর। এখানেই আসতেন গদাধর, বাল্যে সাথীদের সঙ্গে বই আর তালপাতা বগলে ক'রে দোয়াত-কলম হাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য। লাহাবাবুদের পূজোর দালানে দেখলাম ভাসানের পর তুলে আনা দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো। তারপর ঘোষাল আমাদের নিয়ে গেলেন একটি ছোট বাড়ীতে। বাইরের দিকে একটি ছোট মন্দিরে দরজার শিকল খুলে দেখালেন ভিতরটা। বেদীতে ঠাকুরের বড় পট, আর তার পেছনে উপরে টাঙানো আর একটি পট—ধনী কামারনী সদ্যোজাত শিশু গদাধরকে কোলে নিয়ে আসন ক'রে উপবিষ্টা। শুনলাম এটি শিল্পী এন্. সি. দাসের কল্পনার সৃষ্টি।

ঐ বাড়ীটি বাঁয়ে রেখে পড়লাম গিয়ে পিছনের রাস্তায়। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে আশ্রমের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঐ রাস্তা থেকে পশ্চিমে একটি রাস্তা গেছে। তার উপর ৺দুর্গাদাস পাইনের বাড়ী—যে বাড়ীতে গদাধর তন্তুবায় রমণীবেশে অন্দরে প্রবেশ ক'রে পাইন মহাশয়ের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। আর ৺সীতানাথ পাইনের বাড়ী তারই পাশে—গদাধর যেখানে যাত্রায় শিব সেজে অভিনয় করতে গিয়ে সমাধিস্থ হন। ফিরবার পথে বাঁ-ধারে দেখলাম লাহাবাবুদের ধানের মরাই আর ডাইনে লাহাবাবুদের ঠাকুর বাড়ী। স্বয়ং মা লক্ষ্মী চন্দ্রাদেবীকে দর্শন দিয়ে

সান্ত্বনার কথা ব'লে এই ধানের মরাইয়ে অন্তর্হিতা হয়েছিলেন।

শুনলাম কিছু দূরে চিনু শাঁখারির বাড়ী। এত অল্প সময়ে সব কিছু দেখে পূর্ণ আনন্দ লাভ সম্ভব নয়। মনে হয় এই জন্যই তীর্থে ত্রিরাত্রি বাসের ব্যবস্থা আছে। তা হ'লে ধীরে-সুস্থে সবটুকু প্রাণের ভাব নিয়ে ভগবানের লীলাখেলার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি উপভোগ করা যায় না। যা হ'ক এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আমাদের এতগুলি লীলাস্থল দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে—এ শুধু তীর্থদেবতার কৃপা, শ্রীগুরুর আশীর্বাদ। ঘোষালকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমরা ফিরে এসে অতিথিশালায় একটু বিশ্রাম করলাম। আবার বেলা তিনটায় বেরুতে হবে; সাড়ে তিনটায় জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-দ্বার খোলা হয়। আমরা প্রায় ৩টা ১০ মিনিটে গাড়ীতে উঠি। পথে ভূতির খাল পার হ'য়ে একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি আনুড়ের রাস্তা সোজা চলে গেছে ৺বিশালাক্ষীর মন্দির লক্ষ্য ক'রে। বাঁয়ে জয়রামবাটী যাবার পথ। ঐ পথে পড়বার পূর্বেই ভূতির খালের এপারে বাঁধারে খোলা মাঠে বেসিক ট্রেনিং স্কুলের পাকাবাড়ী—জুনিয়র, সিনিয়র দুই বিভাগই খোলা হয়েছে। লাহাদের ছেলেরা এসেছিল অতিথিশালায়, তাদের কাছে শুনলাম। তাদের মধ্যে একটি ছেলে সিনিয়রে পড়ে, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি হাতের কাজ কি শিখেছ?' সে উত্তর দেয়, 'ছোট ছোট কাঠের কাজ করতে শিখেছি।' যাক্, জয়রামবাটীর রাস্তায় পড়েই দেখলাম বাঁদিকে (তিন বৎসর ডিগ্রি কোর্সের) কলেজের বাড়ী উঠছে। ভিত পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। শুনলাম ঐ অঞ্চলে গ্রামের লোকেদের উদ্যোগে সরকারী সাহায্যে বাড়ীগুলি তৈরী হচ্ছে।

এরপরেই বাঁ-ধারে প'ড়ল মাণিকরাজার আমবাগান। বাগান আর নেই। এখন শুধু ৩।৪টি গাছ সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে স্থানটি নির্দেশ ক'রে দিতে। এই জায়গায় আসতেই মনে গানের সুর বেজে উঠল—'বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।' রাখাল বালকদের সাথে কতই না লীলা করেছেন গদাধর এই বনে!

আমরা সাড়ে তিনটার আগেই জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হই। আমোদর নদের পুলের কাজ তখনও শেষ হয়নি, প্রায় জলশূন্য নদের বক্ষে গাড়ী চালিয়ে পার হ'তে হয়েছে। কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ বলেছেন, মেপে দেখা হয়েছে কামারপুকুর মন্দির হ'তে জয়রামবাটীর মন্দির ঠিক সাড়ে তিন মাইল।

বন্ধু ও তাঁর মা গাড়ীতেই রইলেন, মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হবার অপেক্ষায়। আমরা দুজন মন্দির-বারান্দায় উঠে প্রণাম ক'রে তিন দিক ঘুরে দেখতে থাকি। মন্দির পূর্বমুখী দক্ষিণের বারান্দায় ক্রমে ক্রমে এগিয়ে মন্দিরের পিছন ভাগে গিয়ে পড়ি। একজন সন্ন্যাসীকে সম্মুখে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, মন্দির-দ্বার কখন খোলা হবে। তিনি বললেন, 'এখনই খোলা হবে।' অধ্যক্ষের খোঁজ করলে তিনি একজন লোককে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। মন্দিরের পিছনে সংলগ্ন বাড়ীটি ডাইনে রেখে আমরা আরও ভিতরের দিকে চললাম।

এখানেই একখানা ঘরে অধ্যক্ষ থাকেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে পূজোর মিষ্টি ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য কিছু দিয়ে তাঁর সাথে একটু আলাপ ক'রে আমরা মন্দিরে ফিরে আসি। মহারাজদের মিষ্টি ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হই। মন্দিরে ফিরে এসে দেখি মন্দির খোলা হয়েছে। বহুকালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হ'ল—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে তাঁর মর্মর-মূর্তি দর্শন হ'ল। এতক্ষণে সত্যই বলতে পারি কামারপুকুর-জয়রামবাটী দেখেছি, ঠাকুর আর মায়ের জন্মভূমির স্পর্শ পেয়েছি! আনন্দে মন ভরপুর। ভগবান্ যে এত শীঘ্র এত সুন্দর ও সহজ ভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, তা কি ভাবতে পেরেছি? সন্ন্যাসী আশ্রমের পাচককে সঙ্গে দিয়ে দর্শনীয় সব কিছু দেখিয়ে দিতে বললেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ঠাকুরের মন্দির অপেক্ষা বড় ও উঁচু। ১৯২৩ খৃঃ স্বামী সারদানন্দজী এই মন্দির শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর নির্মাণ করেন। পরে তা বর্তমান বর্ধিত আকারে রূপায়িত হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকেই বারান্দা তবে বর্তমানে উত্তর দিকের বারান্দার কতক অংশ টিনের বেড়ায় আবদ্ধ থাকায় ভক্তগণের প্রদক্ষিণের সুযোগ নেই। আমরা চার জন—পাচকের সাথে চলতে লাগলাম। দক্ষিণদিকে ২।৪ পা হেঁটেই রাস্তার বাঁ-ধারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌঁছানো গেল। ভক্ত-যাতায়াত বাড়লে থাকার অসুবিধা হওয়ায় ১৯১৬ খৃঃ স্বামী সারদানন্দ এখানেই শ্রীশ্রীমায়ের থাকার বাড়ী তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। দেখলাম, খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বেদীতে শ্রীশ্রীমায়ের বড় একখানা পট। ঘর দক্ষিণমুখী। একটি বর্ষীয়সী সধবা পটের বাঁপাশে বসে জপ করছিলেন। ঐ ঘরের পূবে রান্নাঘর। ছোট্ট উঠানের অপর পারে মায়ের ঘরের মুখোমুখী আর একখানা ঘর। শুনলাম, বর্তমানে স্ত্রীভক্ত-যাত্রীরা এলে ঐ ঘরে শুতে দেওয়া হয়। জয়রামবাটীতে এখনও ভাল যাত্রী-নিবাস গড়ে ওঠেনি, তবে শীঘ্রই উঠবে—শুনলাম। আমরা আবার রাস্তা পার হ'য়ে ঘনকুটীর-সন্নিবেশিত এক পল্লীর এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে একটি কুটীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম, শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটী আসতেন, তখন এই ঘরেই থাকতেন। ঘরে ঠাকুরের পট ও শ্রীশ্রীমায়ের পটও আছে। খুব যত্ন সহকারে সব কিছু রক্ষিত। আর বিশেষ কিছু দেখবার বোধ হয় নেই। এক আছে পুণ্যিপুকুর, শুনলাম—সেটা রাস্তার ওপারে যে পুকুর দেখলাম, যার পাড়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী সেটিই।

আর একটি আছে আমোদর নদের ঘাট, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী এই সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটু দূরে ব'লে আর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি—সময়ের অভাব। বাকী রইল সিংহবাহিনীর মন্দির। আমরা সব দর্শন ক'রে মন্দিরে ফিরে এসে মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক সন্দেশ প্রসাদ দিলেন। আমরা চাওয়াতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণামৃত একটি অগুরুর শিশিতে যত্ন ক'রে ভরে দিলেন। আমরা চারটা বেজে পাঁচ মিনিটে জয়রামবাটী হ'তে রওনা হই। গ্রামের শেষে বাঁ-ধারে একটা কাঁচা রাস্তায় ২।১ মিনিট হাঁটাপথে সিংহবাহিনীর মন্দির। গাড়ী বড় রাস্তাতেই দাঁড়াল। বন্ধু আর এবারে নামলেন না। আমরা তিনজন খালিপায়ে হেঁটে চললাম। কাঁকরের পথ—অনভ্যস্ত লোকের হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। একটা বড় আঙিনা—চারপাশে লোকের বসতি—সব সদ্গোপ, আর তারাই নাকি এখন মন্দিরের সেবাইৎ, আঙিনার পশ্চিম পাশে একটি পোড়ো ভিটে বিদ্যমান—সেটাই নাকি আদি মন্দিরের স্থান। প্রতিমা পূর্বমুখো ছিল। এখন উঠানের পূর্ব ধারে ইট বাঁধানো মেঝে, টিনের ছাউনির ঘরে প্রতিমাকে পশ্চিমমুখো ক'রে সাময়িক ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। শুনলাম একটি মামলা চলছে, মামলা মিটলে আদি ভিটেতে পাকা মন্দির নির্মাণ করা হবে। উঠানে আগেকার ও বর্তমান মন্দিরের মাঝে টিনের ছাউনি ছোট নাটমন্দির।

সিংহবেদীর উপর 'মা' উপবিষ্টা; পাশাপাশি ৩টি মূর্তি। শুনলাম—চণ্ডী, সিংহবাহিনী, মহামায়া। মূর্তির ডাইনে ৺মা মনসার মূর্তি—সর্প-বেদীতে আসীনা।

দেখা হ'য়ে গেলে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠি। রাস্তার দক্ষিণ দিকে তালপুকুর, শুনলাম শ্রীশ্রীমা এখানে স্নান করতেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই মুণ্ডেশ্বরী পার হ'তে হবে; কামারপুকুরেও একটু দেরি হবে, ভাল ক'রে ঠাকুর দর্শন হয়নি। অধ্যক্ষ এত আদর যত্ন করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

কয়েক মিনিটেই কামারপুকুর এসে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। এবার মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। প্রাণভরে দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে ভাল ক'রে দেখে নিলাম—আবার কবে আসা হয়! দর্শনান্তে আমরা অধ্যক্ষের নিকট বিদায় ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ফটকের কাছ পর্যন্ত আসেন। আসতে আসতে বললেন, 'এবার তো শুধু পথ চিনে গেলেন। আবার আসবেন, ২।৪ দিন থাকবেন।' বললাম, 'নিশ্চয়ই আসব। আশীর্বাদ করুন যেন শীঘ্র আসা হয়। এবারে দেখা ক্ষণিকের।' তবে বলতে পারব: 'কামারপুকুর দেখেছি, জয়রামবাটী দেখেছি।'

অধ্যক্ষের পদধূলি নিয়ে গাড়ীতে উঠি। যে পথে যাওয়া, সেই পথেই ফিরে আসা। রাত ১০॥০ টায় বাড়ী পৌঁছাই।

*　　*　　*

পায়ে হেঁটে তীর্থ করার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, কিন্তু সবাই সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, সময়ের এবং সামর্থ্যেরও অভাব।

মূক বন্ধু

'অনিরুদ্ধ'

কথা তার কোনো দিন শুনি নাই কানে
তবু বাণীহীন ভাষা ধ্বনিছে পরাণে।
নয়ন দেখেনি কভু কেমন মূরতি
অন্তর আঁখিতে তবু ধরা পঁড়ে গতি।
যদিও ইন্দ্রিয়-দ্বারে স্পর্শ নাহি পাই
দেহের প্রত্যেক স্পন্দে নাচে সে সদাই।
মনের অসংখ্য চিন্তা সন্ধান না পায়
তবু যত জানাজানি তাহারি বিভায়।
কাছে তবু, দূরে কেন সে রহস্যময়—
লুকোচুরি খেলি' কেন জাগায় সংশয়?
হাসিয়া কহিছে, যদি হ'ত ঠিক চেনা
তবে মোরে জনতার ভিড়ে ডাকিতে না।
অন্তরালে থাকাই যে আমার গৌরব
আমি কায়াহীন সঙ্গী মূক বন্ধু তব।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

॥ ৫ ॥

উদার মানসিকতা উচ্চতর সংস্কৃতির একটা অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে না হ'ক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজও ভারতে বিভিন্ন জাতির কাছে শ্রদ্ধেয়, তার কারণ বাঙালী একদিন নিজ জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিল। বৃহত্তর ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙালী মনীষী রামমোহন; সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'ভারতপথিক' ব'লে। রামমোহনের পরে ভারতচেতনার পরিচয় দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে যাঁরা সহায়তা করেছেন, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত-পরিক্রমা কেশবচন্দ্রের ভারতচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সন্দেহ নেই। এ ভারত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যও ছিল সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ, ধর্মভিত্তিক একটা বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠনের অভিপ্রায়। কেশবচন্দ্রের সমষ্টিগত চেতনা সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন :

> আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভারত পরিক্রমায়ও তাঁহারা লিপ্ত হন। বর্তমান কালে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইহার পথ দেখান।[১]

উত্তরভারত পরিক্রমায় যাবার আগেই ধর্মকেন্দ্রিক একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন কামনায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বা The Brahmo Samaj of India. ধর্মের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত ভারতীয় জাতির ঐক্য বিধানই ছিল এ 'সমাজে'র উদ্দেশ্য। এ ঐক্যবোধের আদর্শ শুধু যে সমসাময়িক ধর্মবৃত্তের মধ্যে সীমায়িত ছিল তা নয়, সে যুগের কোন কোন কবির হৃদয়কেও এ উদার আদর্শ জাগ্রত করেছিল। আচার্য মোহিতলাল মনে করেন—সমসাময়িক মহাকবি নবীনচন্দ্র 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান'-ভিত্তিক যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রেক্ষাপটে ছিল কেশবচন্দ্রের ঐক্যবোধের আদর্শ প্রেরণা।[২] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' পরিকল্পনায়ও দেখি এ উদার ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা।

কেশবচন্দ্রের মনে ভারতচেতনা আরও তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান—বিশেষ ক'রে পাঞ্জাব—পরিক্রমার ফলে। সে বছর বেথুন সোসাইটিতে তিনি এ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি নিজ দেশবাসীকে শিখ-সমাজের

১ কেশবচন্দ্র সেন—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—পৃঃ ৩৩

২ বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার—পৃঃ ২৯৭

গণতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান জানান। বেথুন সোসাইটির এ স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমবায়ে একটি সংঘ গঠনের উপরও জোর দেন। সমগ্র ভারতের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতিদের নিয়ে এ মিলনক্ষেত্র রচনার পরিকল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও কুড়ি বছর আগের কথা। কেশবচন্দ্রের এ ভারত-চেতনা জাতীয়তার ক্ষেত্রে বাঙালীর দৃষ্টি-সীমাকে প্রসারিত করতে সহায়তা ক'রল সর্বভারতীয় জীবনের বিস্তৃত পরিবেশে। ক্রমে ক্রমে বাঙালী সংস্কৃতি রূপান্তরিত হ'তে লাগল এ উদার ভারতচেতনার স্পর্শে।

সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। এ সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম ছিল সারাজীবন অবিরত। এ মনোভাবের ফলে 'মন্থরগতি' ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ছেদ ক'রে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', আর প্রধান আচার্যের পদ উন্মুক্ত ক'রে দিলেন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতীয় লোকদের জন্যে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যে নতুন ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সে মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হ'ল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট। হিন্দুর বহুযুগ-প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে সকল জাতির মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কেশবচন্দ্র বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ-বিষয়ক '৩ আইন'কে বৃটীশ রাজদরবারে বিধিবদ্ধ করিয়ে। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ আমূল সংস্কার-কামনা দেখে সেদিন যে শুধু প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তা নয়, নরমপন্থী ব্রাহ্মেরা পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে তীব্র সমালোচনা না ক'রে ছাড়েনি। ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারে তাঁর এ বৈপ্লবিক কর্মধারার প্রতিবাদ করেন সে যুগের ব্রাহ্মধর্মের প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত ক'রে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। এ প্রবন্ধে প্রধান ব্রাহ্মনেতা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলনের দ্বারা একটা সাম্যের সমাজ গঠনের স্বপ্নে রইলেন একনিষ্ঠ।

একটা জাগরণোন্মুখ জাতির সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্যে একমাত্র পুরুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য চাই নারীরও সক্রিয় সহযোগিতা। নারীশক্তির জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মিকা সমাজ।' সেই বছরই ভারতহিতৈষী মিস্ মেরী কার্পেন-টারের কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সকল রকম নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায়। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের ইতিহাসে ধর্মবীর কেশবচন্দ্রের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মহামতি বেথুনের পাশে। এ নারীশিক্ষাই সৃষ্টি করেছে বাঙালী নারীর মনে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ, আর এ নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালী সমাজ নতুন রূপ লাভ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও। বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ-প্রসঙ্গে এ সত্যটি ভুলবার নয়।

॥ ৬ ॥

'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইওরোপ-যাত্রাকে তুলনা করেছিলেন তীর্থ-যাত্রার সঙ্গে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের

ইওরোপ-যাত্রাকেও বলা চলে, সে যুগের মুক্তিসন্ধানী একজন বাঙালী সত্যসন্ধ যাত্রীর সংস্কৃতি-সঙ্গমে তীর্থযাত্রা। এ বিদেশযাত্রার ফলে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি হ'ল আরও বহুদূর প্রসারিত, চিত্তে এল নব বল, জাতীয় সর্বাঙ্গীণ সংস্কারমূলক কাজে জাগ্রত হ'ল নিত্যনতুন এষণা—এক কথায় কেশবচন্দ্রের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতিও নতুন অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে গেল।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশে ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ, এবং ইংরেজ জাতির প্রগতিশীলতার কারণগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সে অভিজ্ঞতা নিজের দেশোন্নয়ন কার্যে ব্যবহার। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমন সম্পর্কে একটা কথা স্মরণযোগ্য, সে যুগের দেশহিতব্রতী বাঙালী মনীষীরা তখনও এ দেশ শাসনে ইংরেজের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠেনি। পূর্বযুগের মুসলমান-শাসনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরে তাঁরা ভারতে ইংরেজের আগমনকে গ্রহণ করেছিলেন বিধাতার আশীর্বাদ-রূপে; আর পরমতসহিষ্ণু, জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রচণ্ড শক্তিমান্ সুসংস্কৃত ইংরেজ জাতির সংস্পর্শ ভারতের জাতীয় জাগরণে কল্যাণপ্রসূ হবে—এই ছিল সে যুগের বাঙালী মনীষীমাত্রেরই সুচিন্তিত ধারণা। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, সে যুগের 'জাতীয় জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি' বঙ্কিমও ভারতে ইংরেজ আগমনকে মনে করতেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা ব'লে, আর ভারতের নিজস্ব স্বার্থে ইংরেজ অধিকার এ দেশে আরও কিছুকাল স্থায়ী হ'ক—এই ছিল তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়।

অতএব বিলেতে কেশবচন্দ্রের তেজোগর্ভ বক্তৃতা সে দেশবাসীর নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল সহৃদয় ইংরেজের নিকট ভারতের উন্নতি-কামনায় আবেদন নিবেদনের সীমায় আবদ্ধ। ইংরেজ যখন বিধাতার রহস্যময় করুণায় ভারত শাসনের জন্যে প্রেরিত হয়েছে, তখন শাসকজাতির কর্তব্য ভারতবাসীকে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, তারপর শিক্ষিত ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত করা। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে প্রদত্ত 'England's duty towards India' নামক বিখ্যাত বক্তৃতার (১৮৭০) প্রধান বক্তব্য ছিল এই। 'Female Education in India' নামক বক্তৃতায়ও তিনি আবেদন জানান সে দেশীয় সমাজসেবী মহিলাদের নিকট—ভারতীয় নারীর অজ্ঞানতা দূর ক'রে তাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করবার জন্যে।

কোন কোন বক্তৃতায় তিনি তদানীন্তন সরকারের সমালোচনা যে করেননি, এমন কথা বলা যায় না। 'Liquor traffic in India' নামক বক্তৃতা সরকারের রাজস্ব-নীতির তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ভরা। আবেগকম্পিত কণ্ঠে এ বক্তৃতায় তিনি বলেন:

And here I would ask, is not this liquor traffic carried on in India simply, solely, and exclusively for the sake of revenue? (Hear). Is there any other motive that actuates the British Government? (Cries of 'No'). It is simply a question of money.........If revenues increase in this way from the sufferings, wickedness, and demoralisation of the people, better that we should have no revenue at all. (*Cheers*).

সুরাপান-রূপ জাতীয় দুর্নীতির মূল কারণ অপসারণের জন্যে কেশবচন্দ্রের এ আবেগধর্মী বক্তৃতা সমকালীন এক শ্রেণীর ইংরেজের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করলেও ভারতবর্ষের

জাতীয় জীবনে বিলাতী সভ্যতাস্পৃষ্ট এ পাপ দূর করবার জন্যে ইংরেজ সরকার যে সচেষ্ট হয়নি, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তবে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের আবেগময় বর্ণনা শুনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের মন যে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে, এবং মিস্ মেরী কার্পেনটার, মিস্ এনেট একরয়েড্ (পরে মিসেস বিভারিজ)-এর মত মহীয়সী কোন কোন সমাজসেবী ইংরেজ মহিলা শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতীয় নারীজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ দেশের নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটাবার জন্যে ভারতের পক্ষ থেকে এত বড় দৌত্যকার্য রামমোহনের পরেই কেশবচন্দ্র করেছেন।

জাতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারে স্বেচ্ছাবৃত দূতের কর্তব্য গ্রহণ ক'রে কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্যকে সমকালীন বাঙালী জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী ক'রে তুললেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তীর্থযাত্রায় কেশবচন্দ্রের সব চাইতে বড় সঞ্চয় হ'ল—ইংরেজ জাতির জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। পারিবারিক জীবনে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ইংরেজ সমাজ-জীবনকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দান করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'য়ে প্রায় সাত মাস পরে তিনি স্বদেশে ফিরলেন নিজের দেশকে নতুন ক'রে গড়বার স্বপ্ন নিয়ে।

॥ ৭ ॥

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ ক'রল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একটা বিরাট গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন 'The Indian Reform Association' বা 'ভারত সংস্কার সভা'। এ সংস্কার পঞ্চমুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে (স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্য প্রচার, সুরাপান ও মাদক নিবারণ, আর দাতব্য) তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন একটা বলিষ্ঠ জীবনবোধে। বাংলাদেশ তাঁর কর্মের কেন্দ্রস্থল হলেও সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি কামনায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তিনি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বভারতীয়ের জন্যে। যে কেশবচন্দ্রকে আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি আত্মিক সাধনার ভিত্তিতে *দেশের অভ্যুদয়-কামনায় তন্ময়,* সে কেশবচন্দ্রকে আমরা এখন দেখি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্যে তৎপর। দেহ ছাড়া আত্মার সাধনা অর্থহীন—এ বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করলেন একটা সর্বাত্মক উন্নয়ন-পরিকল্পনা। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় কেশবচন্দ্রের তিনটি কার্যক্রম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে: শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্য প্রচার, আর দাতব্য। এ তিনটি কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়েছিল দেশের অগণিত সহায়হীন শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্যে। কেশবচন্দ্রকে এতদিন যাঁরা বাংলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের নায়ক ব'লে ভেবেছিলেন, তাঁরা তাঁর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্যে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের জ্ঞানোন্নয়নের জন্যে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকা প্রকাশ, দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ বধির বিধবা ও দুঃস্থদের জন্যে অর্থ সাহায্য, ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি সেবাকার্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হলেন। এ সেবাধর্মের প্রেরণা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের

জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এনে দিয়েছিল বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে এক বিরাট জাগরণ, আর সৃষ্টি করেছিল লোকহিতব্রতের ভিত্তিতে এক উদার সংস্কৃতির।

ভারত-সংস্কার-সভার সংস্কারের লক্ষ্য ছিল, 'to promote the social and moral re-*formation of India.*' সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তব। স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কোন বাঙালী মনীষী ইতিপূর্বেও আন্দোলন করেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টিরও প্রয়াস—ইতিপূর্বে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারকার্যে কেশবচন্দ্রের পরিকল্পনার মৌলিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যাপক ও কার্যকরী ভিত্তিতে স্থাপন করবার অভিপ্রায়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়', এবং এ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের নিয়ে স্থাপন করলেন তিনি 'বামাবোধিনী সভা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। এ সভা ও পত্রিকা বাংলার নারীজাগরণে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সে সভার কার্যবিবরণী পাঠে জানা যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রেরই প্রদীপ্ত উৎসাহে 'ব্রহ্মবন্ধু সভা'র সভ্যেরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বব্যাপী করবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন। এ প্রচেষ্টায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মনীষী।

সরকারী সাহায্যের অভাবে 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' বন্ধ হ'য়ে গেলে কেশবচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল' ১৮৭৯ খৃঃ। এ বিদ্যালয়েও নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা এবং নারীদের উপযোগী। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এ বিদ্যালয়টি পরিবর্তিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে, যার বর্তমান নাম হ'ল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন। বাঙালী নারীকে ভারতীয় নারীজীবনের ঐতিহ্যে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'আর্য নারী সমাজ'; আর 'পরিচারিকা' নামক মাসিক পত্রিকাখানি হ'ল সে সমাজের মুখপত্র। এক কথায় বাংলা দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেথুন, মিস্ মেরী কার্পেনটার, প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পার্শ্বে।

কেশবচন্দ্রের নারী-হিতৈষণা শুধু সামাজিক নারীদের উন্নতি-কল্পেই নিয়োজিত হয়নি, পতিতা নারীদের সৎ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েও তাঁর নারীজাতির প্রতি দরদের গভীরতা স্পষ্ট দেখা যায়। এ দিক দিয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে।

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্যে এত সহজ ভাষায় ও নামমাত্র মূল্যে 'সুলভ সমাচারের' মতো পত্রিকা প্রকাশ ছিল সে যুগে অকল্পনীয়। পত্রিকাখানি সে যুগের জনসাধারণের কাছে কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল তা বোঝা যায় পত্রিকার ব্যাপক প্রচার দেখে। প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ মাসের মধ্যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়, ২,৮১,১৪৯ সংখ্যা। বাংলা সংবাদপত্র-সাহিত্যে শারদীয়া

সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজও সৃষ্টি করে এই স্বল্পমূল্যের 'সুলভ সমাচার'।

দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে সুরাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টির জন্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'মদ না গরল' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেই কেশবচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার যাতে সরকারী আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ হয়, সেজন্যে জনমত সংগ্রহ ক'রে ভারত-সরকারের নিকট তিনি আবেদনও করেছিলেন। এ আবেদনের ফলে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রয় আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল।[৩]

এ সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দ্বারা জাতীয় সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করবার চেষ্টার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে।

জাতিগঠনের অতন্দ্র স্বপ্নে কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যম আরও বেগ প্রাপ্ত হ'ল ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা ও ভারত-বর্ষীয় বিজ্ঞানসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমাজ-বিজ্ঞানসভার শিক্ষা-শাখার সভাপতিরূপে এ সময় 'ভারতের নারীজাতির উন্নতি' ও 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' (Reconstruction of Native Society) নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ভারতের নারীজাতির শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষাকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেবার জন্য কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের নিকট 'Indo-Philus' (ভারতবন্ধু) ছদ্মনামে লিখিত ও 'Indian Mirror'-এ প্রকাশিত কেশবচন্দ্রের নয়খানি পত্র ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দলিল ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য। কেশবচন্দ্রের এ শিক্ষা-আন্দোলন সদ্য সদ্য কোন ফল প্রসব না করলেও তা সে যুগের শিক্ষাব্রতী ও সুধী মনীষী এবং সরকারের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতিগঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা'র অন্যতম পরিচালকরূপে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে এ অধ্যাত্মবাদী গৃহী-সন্ন্যাসীর অক্লান্ত কর্মোদ্যমও আমাদের কম বিস্মিত করে না। জাগ-রণোন্মুখ ভারতীয় দৃষ্টিকে বিজ্ঞানমুখী করার প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সমকালীন চিন্তানেতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। বিজ্ঞানচর্চার ফলে বাঙালী—তথা ভারত-বাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই সৃষ্টি করছে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির আন্তরিক যোগ বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এ সত্যটিও স্মরণযোগ্য।

সংস্কৃতি-রচনায় কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের সাধক। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজ শাসনের সদভিপ্রায় সম্পর্কে এক শ্রেণীর রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তির ইংরেজ-প্রীতির ভিত্তি টলে উঠেছে; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ উঠেছে প্রবল হ'য়ে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির জন্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী মতবাদ ও মনোভাব। স্থিতধী কেশবচন্দ্র অনুভব করলেন, সংস্কৃতি-আন্দোলনের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে জাতির আত্মহত্যারই সামিল। সে জন্যে

৩ দ্রষ্টব্য—বাংলার নব্যসংস্কৃতি, যোগেশচন্দ্র বাগল: পৃঃ ৮২—৮৯

সমসাময়িক ইংরেজ-বিদ্রোহী জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন ভারতের সর্বজাতির মিলনের ভিত্তিতে একটি উদার সংস্কৃতি-সংস্থার (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে), যার নাম দিলেন 'এলবার্ট ইনষ্টিটিউট। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সংস্কৃতি-সংস্থা পরে ভারতের সর্বজাতি ও সর্বমতবাদী বাঙালীর মিলন-সভারূপে বিখ্যাত হয় 'এলবার্ট হল' নামে। 'হলে'র পরিচালক-সভায় গ্রহণ করেন তিনি—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশীয় খৃষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে। এ 'হল' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন :

In the midst of jarring and conflicting interests and the numerous growing political and religious divisions in native society, consequent on a state of excitement which a liberal education has produced, it was thought desirable to provide a place for kindling social intercourse, when men of all classes and creeds at least for the time being might forget their differences and enter into social fellowship and friendly communion. The Hall will not belong to any exclusive political or religious party, but will be the common property of all classes of native society. [৪]

[৪] উদ্ধৃতি—The Indian Daily News, April 28, 1876 থেকে, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কৃত ; দ্রষ্টব্য কেশবচন্দ্র সেন, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬১

সমকালীন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলন হ'তে দূরে থেকে এ সংস্কৃতি-আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকা আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের পরিচায়ক বলেই মনে হয় ; কিন্তু মতবাদের স্বাতন্ত্র্যে স্পর্ধাশীল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বারে বারে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষী। বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা পরস্পরকে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই জাতীয় ঐক্য সম্ভব, এবং জাতীয় ঐক্যবোধহীন মুক্তি-আন্দোলন যে অর্থহীন—রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ দূরদৃষ্টি সে যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আলোচনা ও মত-প্রকাশের কেন্দ্রস্থলরূপে পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতবর্ষে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত-গঠনে সহায়তা করেছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জনমত গঠন ছাড়া কোন আন্দোলনই কোনদিন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। এ দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের জাতীয় জীবনে কেশবচন্দ্রের দান উপেক্ষণীয় নয়। (ক্রমশঃ)

সাক্ষী

শ্রীমতী যমুনা দেবী

জড়ত্বের শুষ্ক আবরণে,
প্রচ্ছন্ন রয়েছে সদাশিব!
সমাধিস্থ নিশীথ শয়নে
অতল সে শান্তির অধিপ।
জীবনের কোন চিহ্ন নাই,
তবু তার নাম চিরঞ্জীব!

সৃষ্টির প্রথম হ'তে তাই
সাক্ষীরূপে বিনিষ্কম্প দীপ!
আনন্দের অনুভূতি-পীঠে,
যুগান্তের স্থির নিস্তব্ধতা,
অনন্তের অব্যক্ত সঙ্গীতে,
বিরাটের চির তন্ময়তা।

মহাবট

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শান্তি-ব্যাপ্ত জীবন আমার, স্তব্ধ বিপুল গম্ভীর,
বনসম্রাট যুগ যুগ ধরি বাঁচি ;
লক্ষ লক্ষ সুদৃঢ় শাখার বাহু মেলি আমি মহাবীর,
বসুধারে যেন রক্ষা করিতে আছি।

স্তম্ভ শতেক চারিদিকে রচি' উন্নত আমি ন্যগ্রোধ—
শিল্পীর মতো রেখেছি কত না ভঙ্গে ;
রৌদ্র-দাহেরে শীতল করিয়া পুষ্ট পাতার সম্পদ
সঘন হইয়া রয়েছে আমার অঙ্গে।

লম্বিত ঝুরি তুলিছে অথবা মৃত্তিকা 'পরে লুণ্ঠিত,
জটা ধ'রে আছে কটা বরণের কেশ ;
রুদ্রাক্ষের মতো ফলে-ভরা ভাগ্যেও নহি কুণ্ঠিত,
বিস্তর সেই মালাতে সেজেছি বেশ।

ভগ্ন কখন করিতে পারেনি ঝঞ্ঝার ভীম তাণ্ডব,
জীবন-যুদ্ধে পরাজিত কভু নহি ;
বজ্রাঘাতের দাগ আছে, তবু ধ্বংস হয়নি সম্ভব,
গ্রীষ্মে শীতল, শীতেও উষ্ণ রহি।

সিন্ধুর সনে সঙ্গম তরে বন্যা আসে কি রঙ্গিণী!
লয়ে যায় বেগে, যাহা কিছু পায় পথে ;
গ্রাহ্য করিনে শিকড়ের মাটি বন্যার হ'লে সঙ্গিনী,
নির্মূল কভু হই না কোনও মতে।

পার্শ্বে শ্মশানে অগ্নিশিখায় মৃত্যু নাচিছে উল্লাসে
সম্মুখে মোর নিঃশেষ করি' শব ;
স্পর্শ তাহার অঙ্গে পেতেছি তপ্ত বায়ুর নিঃশ্বাসে,
বিকারবিহীন—উঁচু হ'তে দেখি সব।

শান্ত আমার শ্রান্তিবিহীন অন্তবিহীন উদ্যম,
যত্ন বিনাই বাড়িতেছে অবিরত ;
স্বতন্ত্র আমি, অশেষ শোভার কুঞ্জ গড়িতে সক্ষম,
নির্মোহ, তবু আশ্রিত রাখি কত।

বৃদ্ধ কেবল বয়সে হয়েছি, সরস জীবন অক্ষয়,
যৌবন ধীরে বাড়িয়া যেতেছে যেন;
অদম্য আর সহজ সতেজ, দুর্জ্জেয় মহা বিস্ময়,
ভক্তিভীতির পাত্র ভবেশ হেন।

খাদ্য লভিছে কত বিহঙ্গ রহিয়া মুক্ত আশ্রয়ে,
শাখামৃগ আর পিপীলিকা পায় গেহ;
রন্ধ্রে রেখেছি সুপ্ত করিয়া সর্পেও আমি নির্ভয়ে;
বিশাল আলয়ে সকলেই পায় স্নেহ।

নিম্ন শাখাতে দোদুল ঝুরিতে দীর্ঘ দোলনে ঝম্পনে
পাঠশালা ছাড়ি' দস্যি ছেলেরা মাতে;
ব্রহ্মদৈত্য নিভৃতে রয়েছে,—বক্ষে সে-ভীতি কম্পনে,
সদলে তাহারা সদা রহে এক সাথে।

সূর্য যখন পৃথ্বী পোড়ায়, দীপ্ত যখন অম্বর,
ক্লিষ্ট পথিকে দিয়েছি স্নিগ্ধ ছায়া;
ব্যর্থ প্রেমিক—তপ্ত জীবন—বক্ষ লইয়া দুর্ভর,
হেথায় আসিয়া ভুলেছে মোহের মায়া।

মহেশ্বরের মন্দির আছে লক্ষ্মীর ঘটা বর্জিত,
শ্যামল শীতল সঘন আচ্ছাদনে;
সন্ন্যাসী সেথা যোগাসনে বসি—চিত্ত গভীরে মজ্জিত,
দীপ্তি তাহার ব্যাপ্ত আমার বনে।

মহাবীর্যের বিরাটত্বের তৃপ্তিতে ভরা অন্তর—
আসক্তিহীন স্নেহেই পিতার সুখ;
শক্তের মাঝে গুপ্ত অঝোর স্নিগ্ধ রসের নির্ঝর,
আত্মপ্রসাদে পূর্ণ রয়েছে বুক।

আর্ত জীবের দুঃখ দেখিয়া অন্তরে আমি উন্মাদ,
নিষ্কাম সেবা সাধ হয় শুধু দিতে;
পূর্ণানন্দে অনন্ত কাল বর্ষিয়া প্রেম নির্বাধ,
নিজের মুক্তি ভুলি' রবো ধরণীতে।

সম্পদ আর সঙ্গ আমার সজ্জনে আর দুর্জনে,
সমভাবে পারে পরাণ ভরিয়া নিতে;
শুদ্ধ সুচির সমাহিত সুখ সঞ্চারি' হেথা নির্জনে,
শান্তি ঢালিব মুক্তি-ব্যাকুল চিতে।

সমালোচনা

উত্তরস্যাং দিশি : স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা--১৩; পৃঃ ৯২, সচিত্র। মূল্য—তিন টাকা।

ভারতবাসীর চিরদিনের ভক্তিতীর্থ দুটি—কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ—প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন 'উত্তরস্যাং দিশি'—উত্তর দিকে দেবতাত্মা হিমালয়ের বুকে। দুর্গম পথের সব দুঃখ কষ্ট ধন্য হ'য়ে ওঠে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসায়। তাই যুগে যুগে ভক্ত, সাধক, সন্ন্যাসীরা এই তীর্থপথে চলেছেন দেবদর্শনে। স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দও একদা এই পথে গিয়েছিলেন; তীর্থদর্শনের পুণ্য প্রশান্তি হৃদয়ে বহন ক'রে এনেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্মৃতি ও অনুভবের বাঙ্ময় প্রকাশ 'উত্তরস্যাং দিশি' পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছে হিমালয়ের বার্তা। সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটির ভাষায় যেমন স্বচ্ছতা, অনুভূতিতে তেমনি তন্ময়তা। বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও মানসভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'য়ে যায়।

আধুনিক ভ্রমণসাহিত্যে না ভ্রমণ না-উপন্যাস জাতীয় যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়, তার পাশা-পাশি এই ভ্রমণ-কাহিনীটির আশ্চর্য সরলতা ও বস্তুনিষ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। —**প্রণব ঘোষ**

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব : স্বামী সারদেশানন্দ প্রণীত। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শিলং। পৃষ্ঠা ৪০১, ডিমাই। মূল্য—৮৲।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন লইয়া নানাদিক হইতে গবেষণা শুরু হইয়াছে, ইহা খুবই আশার কথা, আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে আত্মসচেতন করিতে ইহা অনেকখানি সহায়তা করিবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি সাধারণ গবেষণা-গ্রন্থ নহে, ইহা প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ (বিশেষতঃ সর্বজনমান্য 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত') অবলম্বনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অনুধ্যান; প্রয়োজনীয় সমালোচনা সহ আধুনিক ভাবে ও ভাষায় গ্রন্থখানিকে লেখক এ-যুগের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক সন্ন্যাসী, তাই শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের দিকটিতে স্বভাবতই একটু জোর দিয়াছেন। লেখক সাধক, তাই জীবনালেখ্যের স্তরে স্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনার অবস্থাগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখক সমালোচক, তাই শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল ভ্রমাত্মক ধারণা প্রচলিত, যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ সমালোচনা সহায়ে তিনি সেগুলি দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রস্তাবনায় সেগুলির প্রারম্ভিক আলোচনা পাঠককে পুস্তকটি পড়িতে আকৃষ্ট করিবে। পুস্তকের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি-চয়ন গ্রন্থকারের চিন্তাসূত্রে গ্রথিত হইয়া মাল্যের আকার ধারণ করিয়াছে। গরুড়স্তম্ভের নিকট শ্রীচৈতন্য ও ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ—এই দুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্র পুস্তক-খানির অলংকার। এরূপ পুস্তকের প্রুফ সংশোধন আরও যত্নসহকারে করা উচিত ছিল। ৩৬৭ পৃঃ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতিতে তিনটি ছাপার ভুল চোখে পড়িল।

The Message of Vivekananda—Published by Advaita Ashrama, 4, Wellington Lane Cal 13. Pp. 26. (Pocket size), Price 25 n.P.

ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, আত্মবিশ্বাস, কর্ম, জ্ঞান, সেবা, হিন্দুধর্ম, ভারত, গীতা, বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বাছা বাছা কয়েকটি উদ্দীপনাময়ী উক্তি সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকাটি গ্রথিত হইয়াছে। পকেট সাইজ হওয়ায় এবং প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর একটি সুন্দর ছবি থাকায় পুস্তকখানি আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে ১৪ই হইতে ২২শে ফাল্গুন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই কয়দিবস বিশেষ পূজা, ভজন-সঙ্গীত, রামায়ণ-গান, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত পাঠ ও আলোচনা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় বিচারপতি এস্, মোর্শেদের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিও একটি মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল ভাষণ দেন। সভার প্রারম্ভে মিসেস্ মোর্শেদ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন, তৎপূর্বে মিশনের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হয়।

তমলুক: রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়, সন্ধ্যায় ঠাকুরের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যকুমার সেন ও শ্রীহরিদাস মজুমদার।

পরে ১৯শে মার্চ হইতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত উৎসব উপলক্ষে বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, হোম, পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কথকতা করেন। ৩০০০ নরনারীকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়। এতদ্ব্যতীত ভজন, কীর্তন, 'শ্রীশ্রীকথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ প্রভৃতি হইয়াছিল। উৎসবের কয়দিন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা করেন।

এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী অন্নদানন্দের প্রারম্ভিক ভাষণের পর কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বলেন। সুরশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁহার সম্প্রদায় ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দ দেন।

আসানসোল: গত ১৩ই হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণের সহিত বিভিন্ন দিনে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, অধ্যাপক গোপিকানাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হরিহর উপাধ্যায়, অধ্যাপক ভবরঞ্জন দে, স্বামী জপানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী প্রত্যয়ানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বেতারকথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথকতা, বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্রের সঙ্গীত, কলিকাতার পাঁচালী-ভারতী-সংঘের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মলীলা এবং স্থানীয় গৌরাঙ্গ-নাম প্রচার-সমিতির কীর্তন, ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভৃত আনন্দ দান করে। উৎসবের পঞ্চম দিনে তিনসহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, শেষদিবসে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বার্নপুরের ইস্পাতকারখানার জেনারেল ম্যানেজার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। বিভিন্ন বক্তা এই দিন স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির প্রচারকার্য

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড শহরে এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র। গত ২৮শে ফেব্রুআরি কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। সমিতির মন্দিরে ঐদিন বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান এবং সমবেত সভ্য ও বন্ধুগণকে হিন্দুমতে মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয়। স্বামী ঋতজানন্দ ফেব্রুআরি মাসে এই কেন্দ্রে 'মনের প্রকৃতি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং প্রতি মঙ্গলবারে নারদভক্তিসূত্রের ক্লাস করেন। বাকী দুইটি রবিবারে বক্তা ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দ। বিষয়ঃ 'যোগপন্থা' ও 'দৈবী করুণা'। এই মাসের তিনটি বৃহস্পতিবার স্বামী বন্দনানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্লাস লইয়াছিলেন।

মার্চমাসের রবিবাসরীয় বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ 'ভক্তের জীবন-ধারা,' 'নিজের চেষ্টা ও দৈবী কৃপা' 'ঈশ্বরানুসন্ধান,' 'কর্মজীবনে বেদান্ত'। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতা দেন স্বামী প্রভবানন্দ। প্রথমটির বক্তা ছিলেন স্বামী ঋতজানন্দ এবং তৃতীয়টির স্বামী বন্দনানন্দ। এই মাসেও 'নারদভক্তিসূত্র' ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্লাস তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হলিউড হইতে প্রায় আশি মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে এবং পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত স্যাণ্টা বারবারা শহরে বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও প্রতি রবিবারে ধর্মবিষয়ক ভাষণ এবং প্রতি সোম বা মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা করেন স্বামী প্রভবানন্দ। ফেব্রুআরি মাসে স্বামী প্রভবানন্দজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল--'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী'; স্বামী ঋতজানন্দ—'কর্মতৎপরতা বনাম ধ্যান-নিষ্ঠা' ও 'ধর্মমতসমূহের মিলনভূমি' এবং স্বামী বন্দনানন্দ 'যোগ এবং উহার প্রণালীসমূহ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মার্চ মাসে বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ স্বামী প্রভাবনন্দ—'পুরুষকার ও কৃপা', স্বামী বন্দনানন্দ—'কর্ম ও মুক্তি' এবং 'ইচ্ছা ও জ্ঞান', স্বামী ঋতজানন্দ—'ধ্যানের প্রণালী'। উভয় মাসেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা করেন স্বামী প্রভবানন্দ।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৫৪,১৭৫ ('৫৮ খৃঃ ১,৪২,৫৮৬); এক্স-রে, চক্ষু, দন্ত, E. N. T. বিভাগে রোগীর সংখ্যা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮,২৮৩ রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশু স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ১,০৭,১৭৮ জনকে দুধ দেওয়া হয়। রোগনির্ণায়ক লেবরেটরিতে ৮১৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা করেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির ক্রমবিস্তারে সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ-মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান বিভাগ: কলিজিয়েট, টেকনিক্যাল ও মাধ্যমিক। আলোচ্য বর্ষের শেষে তিনটি বিভাগে যথাক্রমে ৩৭, ৯৬ ও ১৭০ জন ছাত্র ছিল। সব বিভাগেরই ছাত্রগণ বৃত্তি বা সাহায্য লাভ করে। পরীক্ষা-ফল প্রশংসনীয়। আলোচ্য

বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা-কোর্স শিক্ষাদানে ভারত সরকারের অনুমোদন-লাভ।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি শনিবার নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
১৯৫৯—নভেম্বর:	
কঠোপনিষৎ	স্বামী জীবানন্দ
ডিসেম্বর:	
কঠোপনিষৎ	স্বামী জীবানন্দ
উপনিষদের মাধুর্য (শুক্রবার)	„ রঙ্গনাথানন্দ
ভগবদ্গীতা	„ দেবানন্দ
কঠোপনিষৎ	„ জীবানন্দ
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী শিবানন্দ	„ জ্ঞানাত্মানন্দ
১৯৬০—জানুআরি:	
স্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ	স্বামী সুন্দরানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা	„ ঈশানানন্দ
ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ	স্বামী মহানন্দ
ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ফেব্রুআরি:	
ভাগবত	স্বামী বোধাত্মানন্দ
গীতায় কর্মযোগ	„ জ্ঞানাত্মানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ	„ ধ্যানাত্মানন্দ
রামায়ণ	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী
ধর্ম ও সংস্কৃতি	অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ব্রহ্মচারী তারক: আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ১৬ই এপ্রিল বেলা ১২-৪৮ মিঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্মী ব্রহ্মচারী তারক ইষ্ট-লোকে গমন করিয়াছেন, কিছুকাল ধরিয়া তিনি হাঁপানি ও হৃদ্রোগে ভুগিতেছিলেন। কাশীমিত্র ঘাটে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১৯০১ খৃঃ ২৪ পরগনার অন্তর্গত গড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই পিতৃবিয়োগের পর তারক কলিকাতায় মাতুলালয়ে পালিত হন। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে পাঠকালে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২০ খৃঃ মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি সোসাইটির কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দীর্ঘ ৪০ বৎসর কলিকাতা নগরীতে ও তাহার উপকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) মন্ত্রশিষ্য তারক মঠের প্রবীণ সাধুদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সোসাইটি পরিচালন-ব্যাপারে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী আত্ম-বোধানন্দজী সর্বদা তাঁহাকে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই একনিষ্ঠ সেবকের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীমৎ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে মার্চ ৮৬ বৎসর বয়সে পাঞ্জাবে ফাগোয়ারায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস-ভবনে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত দুই মাস যাবৎ তিনি শোথ ও হৃদ্রোগে

ভুগিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায় সকল সন্ন্যাসী শিষ্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কার্যোপলক্ষে এলাহাবাদে অবস্থান-কালে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সহিত পরিচিত হন ও কতিপয় বন্ধু মিলিয়া সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর বি. ডি. বসু ও তাঁহার সুপণ্ডিত ভ্রাতা উক্ত ক্লাবের সভ্য ছিলেন।

কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিতও তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন ও সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আর্ত নারায়ণের সেবা করিয়া ছিলেন।

শেষজীবন তিনি ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুগণ তাঁহার নিকট মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার স্মৃতি-কথা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে শান্তি লাভ করুক—ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

ডক্টর রাজশেখর বসুঃ আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি, গত ২৭শে এপ্রিল বুধবার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডক্টর রাজশেখর বসু ('পরশুরাম') ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বকুলবাগান রোডে তাহার বাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

'পরশুরাম' ছদ্মনামেই পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত এই তীক্ষ্ণধী বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক স্যাটায়ার রচনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আবার গুরুগম্ভীর রচনাতেও তাঁহার সমান কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার 'কজ্জলী', 'গড্ডালিকা', 'হনুমানের স্বপ্ন' ও 'আনন্দীবাই' একদিকে হাসির সহিত চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে; আবার তাঁহার 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র সারানুবাদের সহিত 'চলন্তিকা' ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

১৯৫৫ খৃঃ রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৫৮ খৃঃ সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার স্বীকৃতি, এতদ্ব্যতীত ১৯৫৬ খৃঃ তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ (১ম বিভাগে ১ম) পাস করিয়া তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমি-ক্যালের কার্যে যোগদান করেন; বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্মনিষ্ঠার বলে ক্রমশঃ তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করিয়া সসম্মানে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত ইহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন (member of the Board of Directors)। অবসর গ্রহণের পর বৈজ্ঞানিকের অন্তঃস্থিত সাহিত্যের ফল্গুধারা নিয়মিত ভাবে বহিতে থাকে। সাহিত্যিক ও আভিধানিক রূপে বাঙালী তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখিবে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা): গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এক বিশেষ ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি): গত ২০শে চৈত্র স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম, মধ্যাহ্নে সমবেত ২৫০০ নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে জনসভায় স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সেবাধর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

সিন্দ্রি ঃ গত ২৬শে হইতে ২৮শে মার্চ স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আয়োজিত ধর্ম-সভায় স্বামী যুক্তানন্দ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন।

আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) ঃ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়, এতদুপলক্ষে স্বামী যুক্তানন্দ প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ শ্রোতার সমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন।

কোচবিহার : গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই বৈশাখ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিন দিনই স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার নর-নারীর উপস্থিতিতে যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। সভান্তে প্রতিদিনই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন-জনসাধারণকে আনন্দ দান করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন প্রায় ৩ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হায়দ্রাবাদ : ১৯শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ মহবুব কলেজে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ইংরেজীতে স্বামীজীর সম্বন্ধে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দেন। স্বামী তপস্যানন্দ তেলুগুতে 'স্বামীজীর জীবনে ভক্তির সাধনা' সম্বন্ধে বলেন। স্বামী কৈলাসানন্দজী 'স্বামীজীর অতিমানবিক শক্তি' বিষয়ে বলেন।

২০শে মার্চ (রবিবার) হায়দ্রাবাদ বেগম-পেটে বিশেষ পূজা হোমের পর ১৫০০ দরিদ্র-নারায়ণকে ভোজন করানো হয়, শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রীর 'কৃষ্ণপ্রেম' ব্যাখ্যানের পর শ্রীনটেশ আয়ার 'গোটুবাদ্যম্' শোনান। স্বামী কৈলাসা-নন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বেগম পেট রামকৃষ্ণ মঠের কার্যবিবরণী পঠিত হইলে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী তপস্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন। অন্ধ্রের মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রমৌলি 'শক্তিপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

২১শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ মহবুব কলেজে শিক্ষকসমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় কলেজের অধ্যক্ষ সকলকে জানান, গত শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন এই হলে বক্তৃতা দিয়া-ছেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ত্যাগ ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষকগণকে শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী হইতে বলেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংবাদ

ম্যালেরিয়া : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) দ্বাদশবার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে ঘোষণা করিয়া-ছেন : পৃথিবীর ২৮০ কোটি লোকের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার ভয়ে জীবন ধারণ করে। ১৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। ১৯৫৫ খৃঃ ৩০% কমে, ১৯৫৭ খৃঃ আরও ২০% কমে। এই সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইতে কমিয়া ১০ লক্ষে দাঁড়ায়।

১৯৬১ খৃঃ পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থায় ৮০ লক্ষ ডলার প্রয়োজন। কয়েকটি দেশের হিসাব :

দেশ	রোগভয়ে ভীত বা রোগাক্রান্ত (১৯৫৯)	প্রতিরোধের জন্য ব্যয় (১৯৪৯-৫৯)	ম্যালেরিয়ার জন্য বার্ষিক আয়ের ক্ষতি
আফ-গানিস্থান	১০ লক্ষ	৭'৫ লক্ষ ডলার	২ কোটি ডলার
সিংহল	০ (দূরীভূত)	৫০ " "	৩ " "
ভারত	৫ কোটি	১৯ কোটি "	৫০ " "
		(দূরীকরণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়)	

উদ্বোধন

বৈরাগ্যশতকম্

[শ্রীভর্তৃহরি বিরচিত : স্বামী ধীরেশানন্দ অনূদিত]

পরিচিতি : 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থখানি মুমুক্ষু সমাজে পরম সমাদৃত। ইহাতে সর্বশুদ্ধ এক শতটি শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে লিখিত। সংসারের অসারতা, আপাতরমণীয় ভোগসুখের তুচ্ছতা, তথাকথিত নাম, যশ প্রতিষ্ঠাদির অন্তঃসারশূন্যতা এই গ্রন্থে মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্তা ভর্তৃহরি জনশ্রুতি-মতে—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিক্রমাদিত্য, যাঁহার নামে বিক্রমাব্দ প্রচলিত। কথিত আছে যে যৌবনে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াও বিলাসভোগের নিমিত্ত রাজকার্য পরিচালনার ভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমের উপর অর্পণ করিয়া তিনি আকণ্ঠ বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হন।

কিন্তু অচিরকাল মধ্যে বিলাসের নগ্নমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করত তিনি পরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার তপস্যা জীবন উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে অতিবাহিত হয়। অদ্যাবধি উজ্জয়িনীর 'ভর্তৃহরিকি গুফা' নামক গুহা তাঁহার তপস্যা-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থখানি তাঁহার এই তপস্বী জীবনেই লিখিত।

তৃষ্ণা-দূষণম্

চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভারমুচ্চাটয়ং
শ্চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ ॥১

শিরোপরি অলঙ্কাররূপে শোভিত মনোহর চন্দ্রকলার স্নিগ্ধচপল কিরণে যাঁহার কলেবর সমুদ্ভাসিত, লীলাচ্ছলে যিনি কামকে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছেন, সর্বলোকের কল্যাণবিধানে যিনি প্রকট, যিনি জীবের অন্তরের মোহরূপ অজ্ঞানের গুরুভার সমূলে নাশ করিয়া থাকেন, যিনি বিমল জ্ঞানের প্রকাশক, সর্বপাপহারী সেই ভগবান্ শিব যোগিগণের মনোগৃহে সদা আপন মহিমায় বিরাজিত থাকুন।১

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশংকয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥২

ধনলোভে আমি অনেক দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। জাতি ও কুলের উপযুক্ত মর্যাদা বিসর্জন দিয়া ধনাঢ্যগণের বহু পরিচর্যা করিয়াছি, তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে (তাহাদের নিকট হইতেও কিছুই পাই নাই)। ভয়চকিতচিত্তে উচ্ছিষ্টভোজী বায়সের ন্যায় পরগৃহে অপমানের সহিত প্রদত্ত অন্নপিণ্ডদ্বারা উদর পূরণ করিয়াছি; তথাপি হে তৃষ্ণে! পাপকর্মপ্রবৃত্তিকারিণী তুমি আজও তৃপ্ত হইলে না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছ ?২

উৎখাতং নিধিশংকয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্॥৩

গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় আমি কত ভূমিতল খনন করিয়াছি, স্বর্ণপ্রাপ্তির লোভে পর্বতের অনেক ধাতু ঔষধিযোগে উত্তপ্ত করিয়াছি, ধনসম্পদের ইচ্ছায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে কত কষ্টে সাগর উল্লঙ্ঘন করত দেশান্তরে গমন করিয়াছি। অনুবর্তনাদি (অনুগমনাদি) প্রযত্ন দ্বারা নৃপতিদিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছি এবং মন্ত্রসিদ্ধিবাসনাবশে মন্ত্রজপাদিতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া কত রাত্রি প্রেতালয় শ্মশানভূমিতে অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু হায়! এত কষ্ট করিয়াও আমার একটি কানা কড়িও লাভ হয় নাই। হে বিষয়তৃষ্ণা! এখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।৩

খলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতো বিত্তস্তম্ভ-প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমপরমতো নর্তয়সি মাম্॥৪

হায়! স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্জনসেবাতৎপর হইয়া তাহাদের কত নীচ ভাষণ অতিকষ্টে আমি সহ্য করিয়াছি ও তাহাদের কটুভাষণ জনিত অন্তরের অশ্রু সযত্নে নিরোধ করিয়া উদাসমনে বাহিরে তাহাদের নিকট কপট উৎফুল্লভাব দেখাইয়াছি, ধনমদে অন্ধ পুরুষদিগের নিকট করজোড়ে বিনয়, শ্রদ্ধা, নমস্কারাদিও প্রদর্শন করিয়াছি (কিন্তু লাভ কিছুই হয় নাই)। হে ব্যর্থ তৃষ্ণা ইহার পরও কি তুমি আমাকে আরও নাচাইতে চাও?।৪

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসজ্ঞমনসাং
কৃতং মানব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি॥ ৫

কমলপত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল, নশ্বর এই প্রাণরক্ষার জন্য সদসৎ-বিচারবিহীন হইয়া কোন্ দুষ্কর্ম করি নাই? (—অর্থাৎ সকলই করিয়াছি)। হায়! ঐশ্বর্যমদে মত্ত ধনীদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের সম্মুখে নির্লজ্জভাবে স্বগুণকথনরূপ মহাপাতকও করিয়াছি (কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র লাভ হয় নাই)।৫

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপন-ক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিতপ্রাণৈর্ন শম্ভোঃ পদং
তত্তৎ কর্ম কৃতং যদেব মুনিভি স্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতাঃ॥ ৬

অপমানিত হইলে অপরকে ক্ষমা করিয়াছি বটে, কিন্তু উহা চিত্তের অনুদ্বেগবশে করি নাই; (প্রতিকারের অক্ষমতা বশতই করিয়াছি)। গৃহসুখ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু (উহা তুচ্ছত্ববুদ্ধিসহায়ে) স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে করি নাই। (দেশান্তরভ্রমণকালে) কত দুঃসহ বায়ু, শীতাতপজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্লেশভয়ে চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্যা করি নাই। অহর্নিশি বিত্তচিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু প্রাণনিয়মন করত শ্রীশম্ভুপদ চিন্তন করি নাই। বিবেকী মুনিগণ যাহা যাহা

অর্থাৎ যে দুঃখ সহন ও তপশ্চর্যাদি করিয়া থাকেন, (বাস্তবতঃ) সে সমস্ত করা সত্ত্বেও (অযথাচরণহেতু) যথার্থ ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি (—ফললাভ কিছুই হয় নাই)। ৬

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥ ৭

আমরা বিষয়ভোগ করি নাই, বিষয়ই আমাদিগকে ভোগ করিয়াছে অর্থাৎ দুরন্ত বিষয়চিন্তা আমাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া (আমাদিগকে তাহার দাস করিয়া ফেলিয়াছে)। ব্রত, উপবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্যা আমরা কখনও করি নাই, বরং তাপত্রয় দ্বারা সতত-সন্তাপিত হইয়া আমরাই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি। কাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—কারণ উহা অনন্ত, নিত্যবর্তমান, আমরাই আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে গতপ্রায় হইয়াছি। বিষয়বাসনা আমাদের একটুও শিথিল হয় নাই, বিপরীতক্রমে বরং আমরাই তৃষ্ণা দ্বারা জর্জরিত হইয়া শিথিলাঙ্গ হইয়াছি। ৭

বলীর্ভিমুখমাক্রান্তং পলিতেনাংকিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥ ৮

জরাবশতঃ আমার মুখচর্ম কুঞ্চিত হইয়াছে, মস্তকের কেশরাশি ধবলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, করচরণাদি সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হায়! বিষয়তৃষ্ণাই কেবল নিত্য নবীন শক্তিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ৮

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো মূঢ়ঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥ ৯

আমার বিষয়ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে। পরাক্রম, উদ্যম প্রভৃতি আর নাই বলিয়া আমার পুরুষত্বাভিমানও বিনষ্ট হইয়াছে, (অথবা পূর্ববৎ লোকের সম্মানও আর পাই না), প্রাণপ্রিয় সমবয়সী বন্ধুগণ (অথবা প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ সসম্মানে জরাপ্রাপ্তিরূপ দুর্দশার পূর্বেই) স্বর্গ গমন করিয়াছেন, বৃদ্ধাবস্থায় কম্পিত পদে এখন আমি কেবল যষ্টির সাহায্যে আসন হইতে উত্থান করিতে সমর্থ, আমার নেত্রদ্বয়ও ঘনতিমিররোগে (ছানিতে)দৃষ্টিশক্তিবিহীন, তথাপি অহো! আমার এই মূঢ় শরীর মৃত্যুভয়ে শিহরিয়া উঠে, ইহাই আশ্চর্য। ৯

আশানাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥ ১০

আশা-নাম্নী যে নদী, মনোরথরূপ তাহার সলিল তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিষয়প্রীতিরূপ কুম্ভীরাদি রহিয়াছে, নানা বিতর্করূপ পাখী সেখানে উড়িতেছে ও তরঙ্গাঘাতে তটস্থিত ধৈর্যরূপ মহাবৃক্ষ উৎপাটিত হইতেছে মহাবর্তসঙ্কুলা সুদুস্তরা, অতিগভীর ও বিশাল দুশ্চিন্তারূপ তটবিশিষ্টা এই নদীর পরপারে (জ্ঞানরূপ তরণী সহায়ে) গমন করত শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ১০

[ক্রমশঃ]

কথাপ্রসঙ্গে

'বাঙালীর কর্মসংস্থান'

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটনাবহুল কলিকাতা নগরীতে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার একদিকে আশঙ্কা এবং অপরদিকে আশা—আর মধ্য স্থলে আছে সংগ্রাম ও সাধনা।

কলিকাতায় সভাসমিতি শোভাযাত্রা তো লাগিয়াই আছে। ইহার অধিকাংশই কোন না কোন দলের আয়োজিত। কিন্তু বাংলাদেশে বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থানের দাবী লইয়া এই যে সভা, ইহা কোন দলীয় বা রাজনীতিক সভা নহে; ইহাকে প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি জাতির জীবন-মরণের সমস্যা।

বাঙালীর সমাজ ও সংসার অনেক দিন হইতেই ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রসাদপুষ্ট বাঙালীর বিরাট একান্নবর্তী পরিবার আজ ইতিহাসের পাতায়, যৌথ পরিবারও লুপ্তপ্রায়। এখন এর্কক পরিবারের সীমিত সংসার; তাহাও চালানো কঠিন। একটির উপর আর একটি সন্তানকে মানুষ করিবার জন্য স্বামী স্ত্রী—উভয়কে চাকরির সন্ধানে বাহির হইতে হয়! সদুপায়ে বারো ঘণ্টা খাটিয়া কেহ বা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। তাহারই পাশে দেখা যায়, আর একজন বাড়ীর পর বাড়ী তুলিতেছে, গাড়ীর পর গাড়ী কিনিতেছে। অসম সুযোগসুবিধাপূর্ণ এই অবস্থায় বাঙালী কি করিয়া বাঁচিবে? চারিদিকে যেরূপ দেখিতেছে শুনিতেছে, সে-ও যদি নিজেকে তাহার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে তাহাকে নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে। কেহ তাহাকে রক্ষা করিবে না।

সকলে বলে, বাঙালী ভাবুক জাতি। এতদিন বাঙালী সেটাকে সুনাম বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু আর তাহা করিতে পারিতেছে না। তাহার উদার ভাবের মোহ কাটিতেছে।

যথাসম্ভব নিজ নিজ রাজ্যে অধিবাসিগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জন করিয়া জীবন যাপন করিবে—ইহাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ। প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসীর এই অধিকার আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ (রাজ্য) গুলি এ বিষয়ে সচেতন। যে বাঙালী ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তদুদ্দেশ্যে প্রায় প্রতি পরিবার অন্ততঃ একটি সন্তান বিসর্জন দিয়াছিল, সে কিন্তু নিজের ঘর দেখিতে শিখে নাই।

আজ ভাবুকের ভুল ভাঙিয়াছে। স্বপ্ন টুটিয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া সে দেখিতেছে ছিন্নভিন্ন নিজের ঘরে তাহার মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকুও নাই, দুবেলা দুমুঠা খাইবার সংস্থানও আজ তাহার নাই।

আজিকার নবজাগ্রত বাঙালী জনতার আন্দোলন বৈদেশিক শাসনযন্ত্র বিকল করিবার জন্য নয়, স্বদেশী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যথার্থ কল্যাণ-চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। বেকার-সমস্যা আজ বাঙালী জাতির জীবনীশক্তি শুষিয়া লইতেছে, তাহার জাতীয় জীবন ধ্বংস করিয়া দিতেছে। বেকার-সমস্যার জন্যই বাংলাদেশ আজ 'সমস্যার প্রদেশ'! এই জন্যই যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল, প্রৌঢ়গণ হতাশায় পূর্ণ, বালকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! ইহাকে কখনই একটি স্বাস্থ্যকর

অবস্থা বলা চলে না। যাঁহারা সমগ্র দেশের কল্যাণকামী, তাঁহারা কখনও কোন একটি প্রদেশের অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারেন না। ব্যষ্টির কল্যাণের উপরই সমষ্টির কল্যাণ নির্ভর করে। সমগ্র শরীরের যত্ন লওয়ার অর্থ হাত-পায়েরও যত্ন লওয়া; বিস্ফোটকযুক্ত আঙুলটিকে অবহেলা করিয়া, অপরিচ্ছন্ন রাখিয়া হাত-পা বা শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায় না।

* * *

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অবশ্যই খাদ্য চাই, খাদ্যের জন্য চাই কাজ। ক্রমবর্ধমান লোক-সংখ্যার উপযোগী কর্মসংস্থান করাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের কৃতিত্ব। হয় সরকারীভাবে, নয় অথবা সরকারীভাবে কর্মসংস্থান করা আধুনিক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান যুগে বেকার একটি বিশ্বসমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং উত্তরোত্তর যন্ত্রের ব্যবহার ইহার প্রধান কারণ। সেদিক দিয়া প্রথম হইতে সমস্যাটিকে অন্ততঃ জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া পরিকল্পনা-অনুযায়ী প্রাদেশিক ভিত্তিতে সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সমস্যা এত জটিল হইয়া উঠে না।

সপ্তাহব্যাপী 'বাঙালীর কর্মসংস্থান' আন্দোলনের শেষদিনের জন-সভায় অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদনুযায়ী আত্মরক্ষা-মূলক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:

(১) বাংলা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৩০ হইতে ৪০ (!); এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে আগামী ২০ বৎসর ঐ সকল প্রতি-ষ্ঠানে শতকরা অন্ততঃ ৮০জন বাঙালী লওয়া হউক। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল কাজই বাঙালীর জন্য সংরক্ষিত থাকুক।

সভায় আরও দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে: (১) কর্মহীন বাঙালী যুবককে কাজ দিতে হইবে, নতুবা ৬০৲ বেকার ভাতা! (২) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে—উচ্চশ্রেণীর চাকুরীতে যোগ্য বাঙা-লীকে সংখ্যানুপাতে নিযুক্ত করা হউক, এবং তাঁহারা সহানুভূতিশীল হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নশ্রেণীর চাকুরীতেও বিভিন্ন স্থানে বেকার বাঙালী কিছু কাজ পাইতে পারে।

এই দাবিকে প্রাদেশিকতা বলা চলে না। ইহা যে কোন প্রদেশের ন্যায্য দাবী।

* * *

প্রশ্ন উঠিতে পারে—সহসা বাঙালীর মধ্যে এত বেকার দেখা দিল কেন? চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—বাঙালী অলসপ্রকৃতি, বাঙালী শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে না। এই সমস্যা লইয়া আজকাল অনেকে চিন্তা করিতেছেন। পরিসংখ্যানমূলক গবেষণাও চলি-তেছে, যদিও উহা এখনও অসম্পূর্ণ। যাঁহারা বলেন বাঙালী অলস, তাঁহারা বাঙালী চাষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, রৌদ্রে বৃষ্টিতে, বাংলার মাটি চাষ করা কি শ্রম-সাধ্য কাজ নহে? কলিকাতার বাহিরে—হাটে বাজারে গঞ্জে মোট বহন করে, নৌকা চালায়, কাঠ কাটে এই চাষীরাই—চাষের অবকাশে।

কলিকাতায় ও বৃহত্তর কলিকাতার কার-খানায়, হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে, খিদিরপুরের ডকে উদ্বাস্তু বাঙালীও যে কাজ পায় না—তাহার কারণ শুধু মাত্র শ্রমবিমুখতা নয়, তাহার কারণ আরও জটিল। সম্প্রতি হলদির বন্দরের এবং বার্নপুর বা দুর্গাপুরের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন—এসব ব্যাপারে 'সর্দার' ও 'ঠিকাদারে'র ক্ষমতা কতখানি, স্থানীয় লোকের দাবি কিভাবে অগ্রাহ্য হয়।

বাঙালীর শক্তি সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচির উপযোগী কর্ম ও পরিবেশ যদি বাংলাদেশে না

থাকে, তবে তাহা সৃষ্টি করা তাঁহাদেরই কর্তব্য, যাঁহারা দেশের আইন প্রণয়ন করেন এবং সেই আইন কার্যে পরিণত করেন।

* * *

বাংলা দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্তমান বেকার-সমস্যার যে সকল কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেগুলি জানিলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(১) জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালীকে মাটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যবিত্তগণ জমির আয় ঠিক রাখিয়া শহরে কিছু উপার্জন করিত। দরিদ্র কৃষক কখনও শহরে মজুর খাটিতে আসিত না। চাষের পাশেই বাস—ইহাই ছিল বাঙালী জীবনের মূল সূত্র।

(২) 'ঘরমুখো' বাঙালী—ইহা তাহার গুণ না দোষ, তাহাও আজ বিচার্য। গৃহমুখীনতাই সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রধান উপাদান। 'কৃষ্টি' ও 'কৃষি' শব্দ সমধাতুক, শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়—পাশ্চাত্য ভাষাতেও (তুলনীয়: culture and agriculture)। ক্ষেত খামারের পাশেই সভ্যতা চিরদিন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং কারখানা বা কয়লাখনির পাশে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

(৩) বাঙালী বহুদিন চেষ্টা করিয়াছে মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে। ভূমি-সংস্কার আইন ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বাঙালীকে শহরে টানিয়া আনিয়া একান্তভাবে চাকুরীনির্ভর করিতেছে। তাহার ভূমি গিয়াছে, পরিবর্তে ব্যবসার মূলধনও সে পায় নাই, তাই কর্মসংস্থানের দাবি এত তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) দেশ-বিভাগের দরুন যে পরিমাণ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, সে পরিমাণ লোক ওদিকে যায় নাই। উপরন্তু বহু বিদেশীও এদেশে কাজ করিয়া এদেশের অধিবাসীদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতেছে।

(৫) পরিশেষে বাংলাদেশে অবাঙালী (ভারতীয় এবং অভারতীয়) ব্যবসায়ীরা কল্পিত বাস্তব নানা কারণে ক্রমশ বাঙালী কর্মী ছাঁটাই করিতেছেন। ইহাও বর্তমানে সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে।

রাজনীতি ও প্রাদেশিকতা বাদ দিয়া সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে আর্থনীতিক ও মানবিক ভাবে দেখিতে হইবে। দেশের সন্তান যদি দেশে খাইতে না পায়, কাজ চাহিলে কাজ না পায়, তখন তাহাকে গালি দিলে চলিবে না, তাহাকে কাজ দিতে হইবে; কুটির শিল্পের প্রসার দ্বারা গ্রামেই বহুলোকের কর্মসংস্থান করিতে হইবে। গান্ধীজীর স্বরাজের অর্থ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ্য'—এই কথাই এক সময় প্রচারিত হইত,—তাহার অর্থ প্রত্যেক গ্রামই নিজ নিজ অন্ন বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিবে।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে সে আদর্শ হয়তো অচল। তবে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রদেশের নিজস্ব এলাকায় সুস্থ সবল কর্মপ্রার্থী যুবকের কর্মসংস্থান করা কল্যাণ রাষ্ট্রেরই একটি প্রধান কর্তব্য—একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

অন্যান্য প্রদেশে এই দাবি যতটা সরব, বাংলাদেশে সে তুলনায় কিছুই ছিল না বলিয়া এই দাবি আজ বেসুরা শুনাইতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য বাঙালীকেও যুগান্তের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। তাহার বহু দোষ-ত্রুটিই আজ তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির বৃথা গর্ব ছিল, আজ তাহা ধূলিসাৎ হইতেছে। তাহার চোখের সামনে অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিলেও বাঙালী শিখিবে উন্নতির প্রথম সোপান একতা, উন্নতির প্রশস্ত পথ পরিশ্রম। ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও পরনির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, এখনও একতাবদ্ধ হইয়া সহযোগিতামূলক পরিশ্রম করিতে পারিলে সমবায়-ভিত্তিক কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের পথে অচিরেই তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চলার পথে

'যাত্রী'

কলিকাতা মহানগরীর এই আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় নানা কথা ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেখানকার সেই সুগভীর বনানীর মধ্যকার আশ্রমের কথা—যেখানে উত্তরদিকে তাকালেই 'নন্দাদেবী', 'আপি', 'পঞ্চচুল্লী', 'কামাথ', 'ত্রিশূল', 'কৈলাস' প্রভৃতি উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গ শুভ্রতার সৌন্দর্য নিয়ে চোখের সুমুখে ভেসে উঠত। যেখানকার গাছ কলকাতার হাত-পা-কাটা কোন-রকমে মুখশ্রী বাঁচিয়ে রাখা ফুটপাতের সঙ্কুচিত গাছ নয়; শিবপুর বৃক্ষোত্থানের সাজিয়ে রাখা, তকমা-আঁটা গাছের কুণ্ঠিত বাহারও সেখানে নেই। সেখানে যারা আছে, তারা আদিমতায় বন্য, শ্যামলতায় সুশ্রী, স্থান-সংকুলনের প্রতিযোগিতার মাঝেও দুর্বার, দামাল, অকুণ্ঠ-প্রসারী। এদের নিটোল সৌন্দর্য স্তরে স্তরে সাজানো নয়; কেমন একটা উচ্ছল বেদুইন-স্বাধীনতার মাঝে উদ্দেশ্যহীন সৌষ্ঠবের মনোমুগ্ধকর রূপায়ণে উতরোল। এই আকাশস্পর্শী 'দেওদারের' পাশেই হয়তো আর একদল দেওদার দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই 'সুঁই', তার পাশেই 'ওক্' কিংবা 'চির্' মাথা তুলেছে। দ্বন্দ্বহীন সমাজের নিবিড় বন্ধনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লতাগুল্মকেও এরা হাত ধরে নিয়েছে তুলে—আলোকের আহ্বানে এরা সকলকেই ঊর্ধ্বে তুলে নিতে চায়!

এই হিমালয়-আশ্রমে সন্ধ্যা নামছে। তরল অন্ধকারে একে একে সব কিছু ডুবে গেল। আর সেখানে 'আপি' নেই, 'নন্দাদেবী' নেই—সূর্যের শেষ রশ্মি তাদের মাথা ছুঁয়ে নেমে গেল। এখন সব কিছু মহামৌনতায় একাকার হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। এখানকার এই অন্ধকার গভীর গূঢ়, অথচ ভাবৈশ্বর্যে বাঙ্ময়। দূরের কোন এক বৃক্ষপত্রের সামান্য অঙ্গুলি-সঞ্চালনেও মনে হয়, ঐ অন্ধকারের ঘুম ভেঙে যাবে। তাই এর মাঝে সামান্য কোন শব্দও কানে এলে মনে হয়, এক অদ্ভুত তপস্যাপূত কারুণ্যের আর্তনাদে তা ভরা—কাকে যেন না-পাওয়ার নিরুপায় নৈরাশ্যে ক্রন্দনাতুর।

এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে 'নাইটিঙ্গিলের' লীলায়িত মধুছন্দা গানের সঙ্গে যখন হিমালয়ের নিঃসীম স্তব্ধতা কানাকানি করে, তখন মানবের অনাদিকালের মন এই পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় তার 'বাস্তব' বর্তমানকেও। কেবল এক দেহাতীত সত্তাকে সে তখন আলিঙ্গন করে—এমনকি আস্বাদনও করে। তাই আমাদের নিঃসঙ্কুচিত মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এ জীবন? কেন মৃত্যু? কেন যাওয়া আসা? সত্যই, এই অপূর্ব অন্ধকার-মহলে ব'সে এ ছাড়া অন্য কোন ছোট কথা মনকে নাড়া দিতে পারে না। মনে হয়, মহাবিশ্বের সঙ্গে মনটি তখন একই কারুণ্যে ও দাক্ষিণ্যে গাঁথা। রূপের সঙ্গে রসের যথার্থ মিলন এই সময়েই ঘনিয়ে ওঠে। তাই 'রসো বৈ সঃ' শুধু রসের আয়োজনে নয়, রূপের ব্যাখ্যানেও যথার্থ সত্য-সন্ধানের নিরিখ জোগায়। ভারতীয় সৌন্দর্যবোধের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-দৃষ্টি যে রসোপলব্ধির চরম কথা, এ কথা এই পরিবেশেই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

হিমালয়ের বুকে এই সময়ে নিবিড়তার এক ঐশ্বর্যময়তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে। এই ঐশ্বর্যময়তা একান্তভাবে এই সন্ধ্যার দান। আর এই সন্ধ্যাকে ডাকতেই গোধূলির রক্তিম সূর্য আপনার সর্বোত্তম রঙের আল্পনা সাজায়। এদিক দিয়ে উষার সঙ্গে সন্ধ্যার প্রভেদ অনেক। উষার মাঝে আছে আলোকের ইঙ্গিত, সন্ধ্যার মাঝে রয়েছে আঁধারের আবাহন। প্রথমটায় আমাদের চর্মচক্ষে দেখার সীমায়িত উন্মেষ; শেষেরটিতে মনশ্চক্ষুর মহাজাগতিক দৃষ্টিপাত। উষা মানুষের সুমুখে ভূমির ভৌগোলিক সত্তাকে খুলে ধরে; সন্ধ্যা ভূমার রসতীর্থের মহাদিগন্তকে করে অবারিত। এক কথায়—উষায় চোখ দিয়ে দেখি, সন্ধ্যায় মন মেলে খুঁজি। তাই উষায় জাগে জীবনের আকৃতি, আর সন্ধ্যায় ভাসে অন্তরঙ্গ প্রেরণার সীমাহীন মুক্তি। প্রথমটায় নিজেকে আঁকড়ে ধরি, শেষেরটায় নিজেকে বিলিয়ে দিই। একটায় 'আমি' থাকে, আর একটায় 'আমি' যায় মুছে।

উষা বলে: ওঠো, জাগো, পৃথিবীর নিত্যকার খেলার মধ্যে আবার ফিরে চল। দেখছ না, এই পৃথিবী অন্ধকার থেকে আবার আলোকে জন্ম নিল যে—এখন কি আর অপার্থিব চিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা চলে? আর সন্ধ্যা বলে: সমস্ত দিবাভাগে নিজের দৈহিক আঁখি মেলে মায়ার অনেক খেলাই তো দেখলে, আর কেন? এখন এস, আমার এই বিজন তমিস্রায়। এর মাঝে তোমার গর্বের চোখ, দম্ভের বিচার, তোমার চোখে-দেখার অহমিকাকে আর টেনে এনো না, ওগুলি দূরে সরিয়ে রেখে তোমার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিকে মেলে ধর দেখি। তাহলেই দেখতে পাবে তোমার স্বরূপটিকে আমার এই অন্ধকারের আয়নায়। মনে রেখো, এই অতন্দ্র অন্ধকারে তুমি জেগে রয়েছ সদা জাগ্রত মহাবিশ্বের সঙ্গে—একেবারে এক হ'য়ে, একাকার হ'য়ে! আমার মাঝে এসেও কি তুমি অনুভব করছ তোমার দেহের খাঁচাটার স্বাতন্ত্র্য, তোমার মাংসের স্থূলবন্ধনের জড়িমা বা তোমার মধ্যকার হৃৎছন্দের ইতিকথাকে? এখন তোমার সবখানিই তো বিশ্বময়, আবার বিশ্বময়ের সবটুকুই তো তুমি-ময়। মহাজাগৃতির এক নিবিড় স্পর্শ এখন তোমাকে তার আপন হৃদয়ের গভীরতায় জড়িয়ে ধরেছে। তার অরূপ বাঁধনে অতনুসত্তা তার জৈবিক স্পন্দনকে ফেলেছে হারিয়ে। এখনো কি অনুভূত হচ্ছে তোমার বাহ্য সত্তা? দিবাভাগে তুমি যে দেবতা, যে মন্ত্র, যে গুরু, যে ইষ্টকে বাইরে খুঁজে ফিরছিলে—এই অবাধ অন্ধকারে তোমার অন্তর পূর্ণ করে তাঁরাই তো এখন তোমার মাঝে গেছেন মিশিয়ে। এখন বাইরে দেখার আর কিছু নেই। অন্তরের আপনতায় তোমার ইষ্ট আর তুমি—এক সত্তায় ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, একই পরমস্পর্শে বিলীন।

তাই বলি, চল পথিক, এই ধূলিময় পৃথিবীর আলোক ছেড়ে সন্ধ্যার নির্মোহ মুক্তির মধ্যে বিচরণ করি। মনে নেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—'ঈশ্বরদর্শন কেন হয় না? তা বল্লুম যে লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে ছেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। কোলে তুলে নেয়।' তাই এস পথিক মোহের চুসী ফেলে সন্ধ্যার সঞ্জীবিত অন্ধকারে তন্ময় হ'য়ে মাকে ডাকি, চল। আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীশ্রীমায়ের কথা*

স্বামী ঈশানানন্দ

যেখানে ভগবান লীলা করেছেন আর যেখানে তাঁর নাম-গুণ-গান হয়, সেই সব স্থান পুণ্যস্থান—তীর্থ। তীর্থ দু'রকম; ভূমিতীর্থ আর মানস তীর্থ। ভূমিতীর্থ যথা—অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, বৃন্দাবন। আর মানসতীর্থ হ'ল ভক্তের হৃদয়, যাকে ঠাকুর বলেছেন 'ভগবানের বৈঠকখানা'। তাহলে এ যুগের ঠাকুর যাঁকে পূজা করেছেন—যেখানে তাঁর বিষয়ে কিছু বলা হয় ও শোনা হয়, সেও এক তীর্থ।

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা সংবরণের পর একবার কাশীতে প্রাচীন সাধুরা স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন, 'আপনি মায়ের বিষয় লিখে রাখলে পরবর্তী কালের মানুষ জানতে পারবে মা কি ছিলেন। আপনি ঠাকুরের কথা লিখে জগতের মহা উপকার করেছেন। মায়ের কথা আপনি লিখলেই ভাল হয়। আপনিই লিখুন।' উত্তরে বিশেষ কিছু না বলে সারদানন্দ মহারাজ এই গানটি গেয়েছিলেন :

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক্ হয়েছি
হাসিব কি কাঁদিব, তাই বসে ভাবছি।
এত কাল রইলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে
কিছু বুঝতে না পেরে হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা
ঠিক যেন ছেলে খেলা বুঝতে পেরেছি॥

স্বামী সারদানন্দজীর ভাব জানলে তবেই মাকে বোঝা সম্ভব। তবু আমরা তাঁর কথা বলার সাহস করছি, এই জন্য যে মধুরতম স্মৃতিগুলি মনে এলে আনন্দ হয়, তাই বলবারও লোভ হয়।

মাকে আমার এগার বৎসর বয়সে প্রথম দর্শন। ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, আর এগার বৎসর তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল—অর্থাৎ প্রায় ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা করবার সময় তখন হয়নি, বা তাঁকে কোন প্রশ্ন করবারও সময় ছিল না—মন সর্বদা আনন্দে ভরপুর হ'য়ে থাকত। সেই প্রথম দিনের দর্শনে সামান্য দু-চারটি কথায় ও স্নেহ-ভালবাসায় মনে হ'ল জগতে তিনিই আমার অতি আপনার। সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে থাকবার আকাঙ্ক্ষা হ'ল। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ভালভাবে পড়লাম। 'লীলাপ্রসঙ্গে' মায়ের বিষয়ে যে ক-টি কথা লিপিবদ্ধ আছে, মনে হয় তাতেই মায়ের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে।

* * *

একই বস্তুকে আমরা সকলে একই দৃষ্টিতে দেখি না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় মায়ের কাছে আসেন। মা তাঁদের কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, তারপর বেলুড় মঠ দেখার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁরা ফিরে এলেন। সন্ধ্যারতি শেষ ক'রে মা তাঁদের বললেন, 'হ্যাঁ গো, তোমরা বেলুড় মঠে গিয়ে কি রকম কি দেখে এলে বল।' একটি মহিলা বললেন—'আহা মা কি বলব, বেলুড় মঠে কি বড় বড় গরু, ও রকম গরু আমাদের দেশে

* গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে ভক্ত-সমাবেশে কথিত প্রসঙ্গ হইতে সংগৃহীত।

নেই।' সে কেবল গরুই দেখেছে—যার যে রকম দৃষ্টিভঙ্গী। মা বৃদ্ধাকে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ঠাকুর ঘরে যাওনি? আর ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষপত্র কি পরিপাটি ক'রে সাধুরা সব সাজিয়ে যত্ন ক'রে রেখেছেন—দেখনি?'

মহিলা—হ্যাঁ দেখেছি।

মা—ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দর্শন করেছ? প্রণাম করেছ?

মহিলা—করেছি। কত যত্ন করলেন তাঁরা; কারণ আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি।

মা—আর সেই ফুলের মত পবিত্র ব্রহ্মচারী-গুলিকে দেখনি?

মহিলা—হ্যাঁ, কত যত্ন করলেন তাঁরা, কি শ্রদ্ধা তাঁদের! তাঁরা আমাদের পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন।

মা—তারা কিভাবে কত কাজ করছে; তা দেখেছ, আহা তাদের দেখলেও কত পুণ্য! গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দেখেছ?

মহিলা—সবই দেখেছি, কিন্তু ও রকম গরু দেখিনি।

যার যে রকম দৃষ্টি! তাই বলছিলাম মায়ের কথা বলা বড় শক্ত। শরৎ মহারাজের কথাতেই মায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

ঠাকুর যখন সমস্ত সাধনার পর দেশে গিয়েছেন, তখন মায়ের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। বিবাহ হয়েছে ছ-বছরে। ইতিমধ্যে দু-চার বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন,—ঠাকুর তখন কামার-পুকুরে ছিলেন না। ১৪ বৎসর বয়সে বাল্য অতিক্রম ক'রে কৈশোর বা যৌবনভাব আসে। মা এসেছেন ঠাকুরের কাছে। তিনি মাকে সাংসারিক সামাজিক আধ্যাত্মিক—সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলেন; বললেন, 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন।' পান সাজা, প্রদীপের সলতে পাকানো, গুরু অতিথি সাধু ভক্তদের সেবা, অর্থের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিলেন। মা তাঁর জীবনভোর আচরণের দ্বারা সেইগুলি পালন ক'রে গেছেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'ভগবানের চরণে সব সমর্পণ ক'রে নিজে স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকবে।' তারপর ঠাকুর চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। মা যেন অপার্থিব সম্পদের অধি-কারিণী হ'য়ে পিত্রালয়ে ফিরে এলেন।

সেই থেকে তিনি সর্বদা বোধ করতেন তাঁর ভেতরে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে। মায়ের এত আনন্দ, কিন্তু প্রগল্‌ভতা নেই। ঠাকুরের সঙ্গ তাঁকে "শান্তস্বভাবা" ও "চিন্তাশীলা" করেছিল. "স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা" না ক'রে তাঁর মনে "সর্বপ্রকার অভাববোধ"-রাহিত্য এনেছিল। নিজের ব'লে কোন কিছু চাওয়া ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের অনাদর কখনও তাঁকে পীড়া দিত না। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তিনি কি দেখেছিলেন, কি শুনেছিলেন—সম্পদ, সমৃদ্ধি, স্বামীর সুখ্যাতি? না, বরং লোকে তাঁকে 'পাগলের বউ' বলত। তার ফলে কি হ'ল—না, জগতের মানুষের অশেষ দুঃখকষ্টে "অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না" হ'য়ে তিনি একটি "করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায়" পরিণত হলেন। মানুষের কত রকম দুঃখ! ত্রিবিধ দুঃখ তো আছেই, তা ছাড়াও আছে পঞ্চক্লেশ। সর্ব-রকমে অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন মাতৃত্বের বিকাশ তাঁতে ছিল। তিনি উপদেশ খুব বেশী দেননি, কিন্তু তাঁর চালচলন আচার-ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেকটিতে যে উপদেশ ফুটে উঠত, তা ভাষার দ্বারা বলা বড় শক্ত—তাঁর দৈনন্দিন জীবনই তাঁর বাণী।

কত রকম লোক যে আসত, কত রকম পরিবেশের যে সৃষ্টি হ'ত, তা বলে বোঝানো যায় না। আমরা তো সেই পাশের গ্রামের লোক, আমাদের সব সংসারেও মায়ের সংসারের মতো এত অশান্তি দেখিনি। মায়ের সঙ্গিনীরা—আত্মীয়েরা সব বিচিত্র! মাকে কেন্দ্র ক'রে তাদের পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষ, অথচ তিনি যেন এই জগতেরই নন, আবার দরদ দিয়ে সবই করছেন, অথচ তাঁরা যে মাকে কিছুই বোঝেননি, তাও নয়,—সময় সময় তাঁদের ব্যবহারে দেবীবুদ্ধিও দেখা যেত।

এ ছাড়া ভক্ত-সন্তান যাঁরা, তাঁরাও এসেছেন, এক এক জনের আচরণ দেখে রাগ হ'ত, হাসি পেত, আবার কারো কারো আচরণ দেখে মুগ্ধ হতাম। যখন চটে গেছি বা হেসে ফেলেছি এক-একদিন, মা বলেছেন—মানুষ যে কত বেদনা নিয়ে আসে, তা তোমরা বুঝবে না। বড় হ'লে হয়তো কিছু কিছু বুঝবে। আর তুমি তো মা নও।

কেউ বা বকর বকর বকছে, মনে হয় সবই যেন উজাড় ক'রে দিতে চায়। কেহ বা সামান্য সময়েই সব কিছু আদায় ক'রে নিতে চায়। কেউ বা কিছুই না ব'লে প্রণাম ক'রে চলে গেল। কারো বা মুখের কথায় যেন মধু ঢালছে। কেউ বা এমন মাথা ঠুকে প্রণাম করলে যে তার কপালও ফুলে উঠল, মায়ের পাও ফুলে উঠল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—এমন করলেন কেন? উত্তর এল—মায়ের পায়ে ব্যথা রেখে গেলাম। মায়ের মনে পড়বে অমুক ব্যথা দিয়েছে প্রণাম করবার সময়। কিন্তু মা আমার নির্বিকার। কেউ বা কত জটিল প্রশ্ন করেছে, অশান্তি দূর করবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে, এই রকম কত বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু যাবার সময় সবাই দেখেছি একটি নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে গিয়েছে। তাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। জানিয়ে যাচ্ছে তারা—মা আমাকে যেমন আদর করেছেন, আপনার ক'রে দেখেছেন, আর কাউকে অতটা করেননি। ভক্তের অন্তরের অপূর্ণতা ভরে যেত মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও মায়ের কি অন্তর্দৃষ্টি! একটি ভক্ত ছেলে সন্ধ্যাবেলায় এসেছেন মায়ের কাছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, যুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল কেন?'

ভক্ত—মা, ওদের সন্ধি হ'ল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ১৪ দফা চুক্তিতে সই দিলেন, তাই সন্ধি হ'ল।

মা—কি রকম চুক্তি?

ভক্ত—পরস্পর প্রীতি, পররাজ্য অনাক্রমণ ইত্যাদি।

মা—ওটা কি অন্তঃস্থ না মুখস্থ?

—এটা মনের না মুখের? মা বুঝেছিলেন, এদের এ শান্তি-প্রীতি মনের নয়, মুখের।

* * *

•তিনি তাঁর সব সন্তানের কল্যাণচিন্তাই করতেন। যার যে রকম চাহিদা, মা তাকে সেই রকম বিধান দিতেন। সংসারীকে বলছেন, 'সংসার-ধর্ম সকল ধর্মের মূল, তা পালন করবে। সবই তো তুটি তুটি গো। ভগবানে মতি রেখে সৎ-পথে চলবে।' ত্যাগীকে বলছেন ত্যাগের কথা, 'এর চেয়ে শান্তি কি আর আছে বাবা! আর কিছু না হ'ক সুখে নিদ্রা যাবে।' যে ছেলের যে রকমটি হ'লে সুখ আনন্দ, তাই তাঁর চিন্তা। এই তো সমবেদনা। তিনি এ সবের উর্ধ্বে। শোক তাপ জগতে থাকবেই, কিন্তু মুক্ত পুরুষদের তা বিচলিত করে না।

মায়ের কাছে অনেকে অনেক কিছু কামনা নিয়ে এসেছেন। নফরচন্দ্র কোলে—কোয়াল-পাড়ায় বাড়ী, ছোট বেলা কাকার কাছে মানুষ, কলকাতায় এসে মাথায় ক'রে কেরো-সিন তেল ফেরি করতেন, শুনেছি; পরে লাখপতি হয়েছেন। ১৯১৮ খৃঃ ভীষণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী। তাঁর ১০।১২টি নাতনি, ২টি নাতি। নাতনি কয়েকটি মারা গেল, নাতিও গেল একটি। একটি নাতি ভুগছে। ডাক্তারেরা তাকেও জবাব দিয়ে গেলেন। বাড়ীর মেয়েরা বুড়োকে (নফর কোলেকে) মায়ের বাড়ী পাঠিয়েছেন। ভাবনা এই নাতি মরে গেলে বিপুল বিত্তের মালিক কে হবে, কে ভোগ করবে ধনসম্পদ, বংশ যে লোপ পাবে! রাত দশটায় বৃদ্ধ 'উদ্বোধনে' এসে হাজির। শরৎ মহারাজ ডাকলেন 'বরদা, শীগ্‌গির এস।' আমি নীচে এসে দেখি নফর বাবু বসে। মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে পড়ল। দুটি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাতর হ'য়ে কাঁদছেন।

মা—এত রাতে কেন এসেছেন?

বৃদ্ধ—আমার বংশরক্ষা হবে কি না বলুন? আমার সংশয় এসেছে, বোধ হয় নাতি থাকবে না। আমার এত ধনদৌলত কে ভোগ করবে?

মা কত বোঝাচ্ছেন। বলছেন—চিন্তা কেন উঠুন। আপনি লক্ষ্মীমন্ত লোক।

বৃদ্ধ—যে জন্যে এসেছি, তা সমাধান না ক'রে যাব না।

মা—আচ্ছা ঠাকুরকে জানাব।

বৃদ্ধ—দেখুন, আমি তো ঠাকুরের কাছে আসিনি, আপনার কাছে এসেছি। ঠাকুরকে আমি জানি না।

বৃদ্ধ কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন—আমায় যেন বংশলোপ দেখে যেতে না হয়। মা তখন স্থির হ'য়ে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলছেন—সে আশঙ্কা নেই আপনার, উঠুন। যাবার সময় বৃদ্ধ দুটি সন্দেশ প্রসাদ বেঁধে নিয়ে গেলেন; একেবারে নিঃশঙ্ক ভাব।

* * *

একদিন মা তাঁর একটি ভক্ত-ছেলের সঙ্গে কথা কইছেন। ভক্তটি ব্রাহ্মণ—তার খালি গায়ে সাদা পৈতে ধবধব করছে। এমন সময় এক বাগ্দী যুবক এসে মায়ের কাছে দীক্ষার কথা বলেছে। মায়ের একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব, পল্লীগ্রামে তিনি স্থানীয় রীতিনীতি মেনেই চলতেন, কলকাতায় অন্যরকম।

বাগ্দী ছেলেটি মায়ের অনিচ্ছা বুঝে চটে গেছে—বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠেছে, 'ও, সেই মাঠের মাঝে ভর-সন্ধ্যায় ভয়ের চোটে বাগ্দীর 'মেয়ে' হ'তে তোমার বাধেনি, এখন বাগ্দীর 'মা' হ'তেই তোমার যত আপত্তি, বুঝেছি।'

মা হেসে উঠলেন, ছেলেটির আগ্রহ দেখে অচিরে তার শুভ বাসনা পূর্ণ করতে রাজী হলেন।

* * *

মাঝি-বৌ অনেকদিন আসেনি; মা জিজ্ঞেস করলেন—আসনি কেন এতদিন? মাঝি-বৌ কেঁদে উঠল। তার পুত্রশোকের কথা শুনে মা এমন কাঁদতে লাগলেন যে বোঝা শক্ত কার পুত্রশোক—মাঝি-বৌয়ের না মায়ের। সহানুভূতির দরদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, অর্থ দিয়ে নয়। অর্থসাহায্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়? সমবেদনা চিরস্থায়ী। পাঁচটি টাকা দিলে পাঁচ দিনেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু মায়ের এই সহানুভূতি তাকে নতুন জীবনের শক্তি দিল।

* * *

তারপর শিবুদার ঘটনাটি (মায়ের জীবনীতে প্রকাশিত) মায়ের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে। শিবুদা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। কামারপুকুরে রঘুবীর ও

মা শীতলার সেবা পূজা করছেন। মা তাঁর খুড়ী। একদিন অনেক বেলায় শিবুদা মাকে দর্শন করতে এলেন জয়রামবাটীতে। এসেই জানালেন,—আজ আর যাবো না। তোমার কাছে থাকবো খুড়ীমা।

মা—সে কি ক'রে হবে, সন্ধ্যায় রঘুবীর-শীতলার সন্ধ্যাবতি শীতল দিবি না?

শিবুদা—না, ওসব শেষ ক'রে এসেছি।

মা—সে কি রে? জানিস তো আমার শ্বশুর কত নিষ্ঠা ক'রে রঘুবীর-শীতলার পূজা অর্চা ক'রে গেছেন, আর তোরা এখন থেকে যদি এই রকম করিস, তাহলে পরে কি হবে? যা, এখন যা. আবার ঠাকুরদের উঠিয়ে শীতল দিবি, সন্ধ্যাবতি করবি।

মা বার বার বলাতে অগত্যা শিবুদা রাজী হলেন। হাতে তাঁর সেই লাঠিটি।

মা বললেন, রঘুবীরের জন্য ফলমিষ্টির পোঁটলা নিয়ে বরদা তোকে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

আমি পুঁটলিটি নিযে চলেছি। শিবুদা কোন কথা বলছেন না। আমি তাঁকে নদী পার ক'রে দিয়ে প্রণাম ক'রে ফিরে এলাম।

একটু পরেই দেখি, কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ শিবুদা ফিরে এলেন। তাঁর মুখ চোখের ভাব অন্য রকম—যেন থম্ থম্ করছে, বেঁটে মানুষটি। মা—তাঁর অবস্থা দেখে বঁটি সরিয়ে দাঁড়ালেন। তখন মা কুটনো কুটছিলেন। শিবুদা আবার মার কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে মায়ের পা-দুটি ধরে বলছেন,—বল, তুমি আমার ভার নিলে কি না।

মা শিবুদাকে ঐ ভাবে দেখে কিছু বিচলিত। একেবারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলছেন, শিবু তোর মনে সংশয় কেন? তুই তো জীবন্মুক্ত। ঠাকুরের অত সেবা করলি। তাঁর কত ভালবাসা পেয়েছিস, তোর ভয় কি?

শিবুদা বললেন—না, তুমি বল আমার সব ভার নিয়েছ? আর সেই যা বলেছিলে তাই কিনা?*

তখন মা একবার ঠাকুরের দিকে একবার শিবুদার দিকে চেয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, ধীরভাবে বললেন—'হ্যাঁ তাই'; এবার শিবুদা প্রণাম ও স্তব ক'রে প্রফুল্ল মনে উঠলেন। মায়ের আদেশে আমি আবার এগিয়ে দিতে চললাম। পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে চলেছি। এবার শিবুদা কথা বললেন, বললেন—দেখ ভাই বুঝলে মা-ই কপালমোচন। কপালের লেখা মুছে দেবার শক্তি আর কারও নেই। একমাত্র মহামায়াই কপালমোচন করতে পারেন।

মাতৃশক্তি সন্তানের কল্যাণকামী। স্নেহ এবং করুণা ব্যতীত মায়ের আর কিছু নেই। সর্বদা সন্তানের কল্যাণচিন্তা, প্রতিদান চায় না।

মা সব সময়েই ঠাকুরের ওপর নির্ভরশীলা।

তাঁর একটি উপদেশ, 'বাবা, সহ্যের সমান গুণ নেই—সন্তোষের সমান ধন নেই।"

মায়ের কি সন্তোষ-ভাব! এমনটি কোথাও দেখিনি। দুঃখ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐশ্বর্য সহ্য করা যায় না। টাকাকড়ি সম্মান পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান হয়।

* * *

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। স্বামী সারদানন্দ পুরী থেকে তার করুণ বর্ণনা দিয়ে মায়ের কাছে চিঠি দিয়েছেন। মা কাঁদছেন, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন; আবার বলছেন, 'যেখানে জল পড়ে শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে।'

* এটি একটি পূর্বের ঘটনা: কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসবার পথে শিবুদা পথিমধ্যে বসে পড়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' অনেক পীড়াপীড়ির পর মা স্বীকার করেছিলেন, 'লোকে যাকে কালী বলে।'

*   *   *

মায়ের অন্তর্ধানের পর একজন সাধু আমায় বললেন, 'আচ্ছা ভাই বলতো মায়ের কাছে থেকে মায়ের এমন কি মহৎ গুণ তুমি দেখলে? এক কথায় বল।'

আমি একটু চিন্তা ক'রে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ভাই, মা তো চলে গেছেন। জগতে অনেককে তো দেখলুম, কিন্তু ভাই যে কিছু চায় না, এমন লোক তো চোখে ঠেকে না। ঐ একটি লোক দেখেছি, যে জীবনে নিজের বলতে কিছু চায় নি—মান, ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য সেবা ইহজগতের কিছুই চান না। ৬৬।৬৭ বৎসরের বৃদ্ধা ম্যালেরিয়া রোগী নিজের শুকনো কাপড় নিজেই তুলে আনছেন। কত সম্মান তিনি পেয়েছেন, মানুষ কি পারে তা সহ্য করতে? সবই ঠাকুরের উপর সমর্পণ।'

কিছু না চাওয়ার প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি ছোট মেয়ের কথা। মেয়েটি ভারী দুরন্ত। বাড়ীতে খুব দুষ্টুমি উৎপাত করত, 'এটা চাই ওটা চাই' করত, কেউ তাকে শোধরাতে পারেনি। সে তার মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসা যাওয়া করত, এসেই মাকে জড়িয়ে ধরত। মাও তার দুহাত ভরে সন্দেশ-মিষ্টি প্রসাদ দিতেন। কিছুদিন পর মা যখন দেশে যাবেন, এমন সময় একদিন মা তাকে বললেন, 'খুকু, তুমি যে এখানে আস, আমাকে খুব ভালবাস?'

—হ্যাঁ আমি তোমাকে খুব ভালবাসি!

—কতখানি ভালবাস?

খুকু দুখানি হাত প্রসারিত ক'রে বললে—এতখানি!

—আমি দেশে চলে গেলে কি আমার ওপর তোমার ঐ ভালবাসা থাকবে?

—হ্যাঁ সেই রকম ভালবাসব, ভুলে যাব না।

—তা বুঝব কি ক'রে?

—কি করলে বুঝবে বলো।

—বাড়ীর সকলকে যদি ঐ রকম ভালবাসে, তবেই বুঝব।

—হ্যাঁ তাই বাসব, আর কোন দুষ্টুমি ক'রব না।

—তা তো ঠিক, কিন্তু সকলকে যে সমান ভালবাসবে, কমবেশী করবে না, সেটি কি ক'রে বুঝব?

—সেটি কি রকম করলে হয় বল, তাই করব।

—সেটি কি করলে হয় জানো? যাদের ভালবাসবে, তাদের কাছে কিছু চাইবে না। যদি কিছু চাও তো কেউ বেশী দেবে, কেউ কম দেবে। ভালবাসাও তখন কম বেশী হ'য়ে যাবে, আর সকলকে তাহলে সমানভাবে ভালবাসতে পারবে না।

খুকু রাজী হ'য়ে গেল, সে সকলকে সমান ভালবাসবে—কারো কাছে কিছু চাইবে না।

*   *   *

নলিনী একদিন বললেন—পিসিমা, লোকে তোমায় বলে তুমি নাকি অন্তর্যামী।

মা—চুপ কর্। লোকে ভক্তিতে বলে। আমি কিছু নয়।

নলিনী—না, তুমি বল, আমার মনে কি চিন্তা এখন।

মা—না নলিনী ও সব নয়, আমার আমিত্ব যেন না জাগে, তুইও ঠাকুরের কাছে বল আর আমিও বলি। এই বলে জোড় হাতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

স্বামীজীর স্মৃতি

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় *

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীর দ্বিতলে, রাস্তার দিকে বড় হলে একদিন সকালে গিয়া বসিলাম। শুনিলাম স্বামীজী হলঘরের পাশের একটি কক্ষে আছেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম মিস্ নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) একটি দরজা দিয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল হালকা হলদে রঙের পুরা-হাতা আলখাল্লা, পা পর্যন্ত লম্বা। তাঁহার গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। মনে হইল যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি।

স্বামীজী যে ঘরে ছিলেন তাহার চৌকাঠের কাছে গিয়া সিস্টার হলঘরের মধ্যেই নতজানু হইয়া বসিলেন, দুই হস্ত যুক্ত করিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া রহিলেন। স্বামীজী নিজ কক্ষ হইতেই তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। তাহার পর স্বামীজীকে পুনর্বার প্রণাম করিয়া সিস্টার চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট খোল ও করতাল ছিল। হলের একটি পাশে তাঁহারা সকলে বসিলেন। গোঁসাইজী আসিয়া বসিতেই স্বামীজী নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং গোঁসাইজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই এককালে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোঁসাইজী স্বামীজীকে প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামীজী সরিয়া গিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন। কেহই কাহাকেও প্রণাম করিতে পারিলেন না।

অবশেষে স্বামীজী গোঁসাইজীর হাত ধরিয়া সতরঞ্চির উপর বসাইলেন। গোঁসাইজী সে সময় ভাবমগ্ন, একেবারে বিভোর অবস্থা! কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে রহিলেন, পরে স্বামীজী গোঁসাইজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।' গোঁসাইজী সেইরূপ বিভোর থাকিয়াই অতি ধীরে শুধু বলিলেন, 'ঠাকুর!—আমাকে কৃপা করেছিলেন।' ইহার অধিক তিনি বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু এবং গদগদ-বাণী সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইল। তখন গোঁসাইজীর সঙ্গিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সংকীর্তন আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কীর্তন হইলে পর তাঁহারা গোঁসাইজীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমি স্বামীজীকে দূর হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

একদিন বেলুড় মঠে গিয়াছি। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। স্বামীজী রান্নাবাড়ীর সম্মুখে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিলেন—মাথায় গেরুয়া রঙের উলের টুপী এবং পরনে ড্রেসিং গাউন। তাঁহার গায়ের রঙ খুব সুন্দর—ফর্সা। চক্ষু খুবই বড়, এত সুন্দর চোখ আর কখনও দেখি নাই। নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। নিকটেই একটি তাঁবু ছিল। তাহার মধ্যে একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার পাতা ছিল। স্বামীজী একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন চা আনিতে।

* জ্যৈষ্ঠের 'উদ্বোধনে' লেখকের দেহত্যাগ সংবাদ দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ২৭৮।

তাঁবুর মধ্যে আমাকে চা ও ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হইল।

ইহার পর স্বামীজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথায় থাকি, কি করি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন এবং আমি জানাইলাম এলাহাবাদে থাকি। মঠে ইহার পূর্বেও আমি যাইতাম এবং সম্ভবতঃ কাহারও নিকট আমার নাম শুনিয়াছিলেন। এলাহাবাদে আমার কয়েকটি বন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রাখিয়া পূজা করিতেন। আমরা যেখানে পূজা করিতাম, সেইখানেই জপ ধ্যান ও ধর্মগ্রন্থাদির পাঠ ও আলোচনা হইত। ইহার নাম ছিল 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব'। স্বামীজীর সহিত সেই সময় এই বিষয় কিছু আলোচনা হয় নাই, তবে ভাবে মনে হইল এই কথা তিনি শুনিয়াছেন। ইহার পর স্বামীজী মঠের ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং আমি অন্যান্য ভক্তদের নিকট বসিয়া রহিলাম।

ইহার কিছুক্ষণ পর—তখন বেলা আন্দাজ দশটা—মঠের ভিতরকার বারান্দায় একটি চেয়ারে স্বামীজী বসিয়াছিলেন ও তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট টেবিল ছিল। বারান্দার তিন পাশে তিনখানি বেঞ্চ পাতা ছিল। মহাপুরুষ মহারাজ, রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ একটি বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন। অদূরে অন্য একটিতে আমি বসিলাম। স্বামীজী সম্মুখে আসীন গুরুভ্রাতাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন এবং আমি নীরবে শ্রোতারূপেই বসিয়া রহিলাম, কারণ স্বামীজীকে খুব ভাল লাগিলেও তাঁহাকে ভয় ও সমীহ করিতাম এত বেশী যে উপযাচক হইয়া কথা বলার মতো সাহস ছিল না।

স্বামীজী বলিতেছিলেন, 'শিকাগোতে যখন হিন্দুধর্মই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণিত হ'ল, তখন পাদ্রীদের ভীষণ গাত্রদাহ। তারা স্থির করলে ফ্রান্সে আর একটা Parliament of Religion (ধর্মসভার আয়োজন করা) হবে। তারা ভেবেছিল এ (স্বামীজী) তো আর ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে না, অতএব এইবার তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।'

প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামীজী অধিক কাল ভারতে থাকেন নাই। দ্বিতীয়বার হরি মহারাজকে সঙ্গে করিয়া আমেরিকা লইয়া গেলেন। তাহার পর ইওরোপ যাত্রার সময় ফ্রান্সে যান ও অল্পকাল মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখিয়া বক্তৃতা দিলেন। তাঁহাকে ঐ ভাষায় এত সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে দেখিয়া ইওরোপবাসীরা আশ্চর্য হইল। তখন তাহারা বুঝিল তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার আর কোন আশা নাই।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, সে সময়কার নানা ঘটনা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরের বাহিরে একটি লেটার-বক্স্ থাকিত। পোষ্ট-পিওন আসিয়া তাঁহার সকল পত্রাদি তাহাতে ফেলিয়া যাইত। স্বামীজী তাহা চাবি বন্ধ রাখিতেন। মাঝে মাঝে চাবি খুলিয়া পত্রাদি বাহির করিতেন। অন্যান্য পত্রের সহিত সময় সময় উচ্চ শিক্ষিতা ও ধনী (মার্কিন) কন্যারা তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিতেন। স্বামীজী সে সকল পত্রের উত্তর দিতেন না, পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।

অবশেষে কেহ কেহ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাতে ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের বলিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী। ভারতে সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না। সকল স্ত্রীলোকই আমার মা বা ভগিনীর সমান। অতএব বিবাহ করিবার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।' তাঁহারা এই ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না এবং আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া যাইতেন।

সেদিন আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমেরিকার নানা শহরে অনেক বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজীর মনে হইল 'আর কি ব'লব! বলার যা সবই তো বলেছি।' সে সময় একস্থানে যে বিষয়ের অবতারণা করিতেন, অন্যত্র আর সেই কথা উত্থাপন করিতেন না। একটি বড় শহরে বক্তৃতা দিবেন এবং ঠিক কি বিষয় বলিবেন, তাহা যেন ভাবিয়া পাইলেন না। গভীর রাত্রে একটি আরাম-কেদারায় বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের বাণী শুনিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। কেবল তাঁহার অশরীরী বাণী বেশ উচ্চৈঃস্বরে অনর্গল উচ্চারিত হইতেছিল। সেই সকল কথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে শুনিতেছিলেন; বক্তৃতায় কি কি বলিতে হইবে তাহা বেশ কিছু সময় ধরিয়া ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঙলায় যেমন কথা কহিতেন সেইরূপই বলিয়াছিলেন। পরদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী সেই বিষয় অবতারণা করিয়া মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ঐদিন প্রভাতে স্বামীজীর পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল রাত্রে আপনার ঘরে কে আসিয়াছিলেন?' কি ভাষায় কথা হইয়াছিল বা কি কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া স্বামীজী নিজেই অবাক হইয়া রহিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে আমেরিকায় একবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত ত্যাগের বিষয় বলিতেছিলেন।—ঠাকুর টাকা পয়সা ছুঁইতে পারিতেন না। যদি স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে আঙুল বাঁকিয়া যাইত এবং অব্যক্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেন। একদিন তিনি রাত্রে ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় একটি টাকা ঠাকুরের অঙ্গে (পায়ে) স্পর্শ করাইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘুম তো ভাঙিলই এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে এই ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন, 'নিদ্রিত অবস্থায়ও ঠাকুরের কাঞ্চন-স্পর্শে কেন এমন হইত, তা দার্শনিকরা গবেষণা ক'রে আবিষ্কার করুন।'

ইহার কিছুক্ষণ পরেই রাখাল মহারাজ স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন—ঠাকুরের জীবনী লিখিতে। তাহা শুনিয়া স্বামীজী চমকাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'ও আমার দ্বারা হবে না। আমি কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব!' তাহা শুনিয়া 'মহারাজ' বলিলেন, 'তুমি যদি না পার তো ঠাকুরের জীবনী আর লেখা হবে না।' উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় তো অন্য কাকেও দিয়ে লিখিয়ে নেবেন।'

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

॥ ৮ ॥

কেশব-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে একটা সুগভীর প্রত্যয় ও সক্রিয় ধর্ম-চেতনা ছিল কেশবচন্দ্রের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে। কর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবোধের সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। জীবনবোধের প্রতি এ গভীর-তর প্রেরণা কখনও করেছে তাঁকে ধর্মোন্মাদ, আবার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ধর্ম ও কর্ম—এ উভয়ই ছিল তাঁর গতিশীল জীবনের যুগল-অশ্ব। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের শেষ ক'টি বৎসর নিয়োজিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কর্মময় একটি উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার অক্লান্ত প্রয়াসে।

এ স্তরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সুরে অনুরণিত। তাঁর এ বক্তৃতাগুলি সমকালীন যুব-মনকে যে শুধু স্পর্শ করেছিল তা নয়, দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণীর চিত্তকেও উদ্বোধিত করেছিল একটা গভীর ধর্মচেতনায়। এ ধর্মোপদেশ জনচিত্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে দেখে কেশবচন্দ্র গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করলেন, কোন ধর্ম-সংস্কার মাধ্যমে সে আদর্শগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম না হ'লে সে আদর্শ দেশের মধ্যে স্থায়ী মূল্য লাভ করতে পারবে না। এ দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন 'ভারত আশ্রম' (বেলঘরিয়ায়)—যে আশ্রমে গোষ্ঠীগত জীবনভিত্তিতে তিনি তাঁর পরিকল্পিত সব রকম সংস্কারমূলক কাজের বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। এর পর প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি সুবিখ্যাত 'সাধন-কানন' (কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী স্থানে), যে প্রতিষ্ঠান হ'য়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ম সাধনার পীঠভূমি। এ 'সাধন কাননে'র অন্যতম কর্মসূচী ছিল গ্রামোদ্যোগ, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর সেবাগ্রামকে। গ্রামকে আত্মসম্পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নবীন ভারত জন্মলাভ করবে, এ সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে।

১৮৭৩-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিজের পরিকল্পিত ভারতধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র অন্ততঃ তিনবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। কেশব-চন্দ্রের উদার ধর্মমতের কথা শুনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এ ঐক্যচেতনাই পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রে এনে দিয়েছিল ভারতের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি—এ সত্যও স্মরণযোগ্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে একটা উল্লেখযোগ্য দিক্‌পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ধর্মনেতা হ'য়ে উঠলেন ভক্তিরহস্য-সচেতন মরমী অধ্যাত্ম সাধক। যে হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাহ্য প্রকাশ ও ভগবানের নাম-স্মরণে সাড়ম্বর কীর্তন ছিল ব্রাহ্মসমাজের বিধিবহির্ভূত, অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ

সেই গীতবাদ্যনির্ভর কীর্তনকেই অবলম্বন করলেন তিনি ধর্মসাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে। ধর্মানুশীলনে কেশবচন্দ্রের এই সাড়ম্বর হৃদয়োচ্ছ্বাস শুধুমাত্র গৃহসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল না; তাঁর এই নবজাগ্রত ধর্মোন্মাদনা মুখরিত ক'রে তুলল নগরীর রাজপথ পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচরণ-বিধিতে এ যে কত বড় ব্যতিক্রম, সেদিন তা বুঝতে বাকী রইল না কারও। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই রীতিবিগর্হিত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠ আত্মপ্রকাশ ক'রল কখনও মৃদু গুঞ্জনে, কখনও সরবে। কিন্তু কেশবের হৃদয়োত্থিত ধর্মবিবেক প্রচণ্ড বেগ ও বলিষ্ঠতা নিয়ে তখন জেগে উঠেছে আত্মপ্রকাশের আন্তরিক অভিপ্রায়ে। এই জাগ্রত বিবেকের প্রভাবে সকল প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি সবলে প্রবেশ করলেন সহজ ভক্তি ও বিশ্বাসের উন্মুক্ত রাজ্যে।

পরব্রহ্মের নাম স্মরণ ও কীর্তন, স্রষ্টার বিভূতি-অনুভবের প্রয়াস ও ধ্যানতন্ময়তা ছিল এই সময় কেশবচন্দ্রের ভগবদ্মুখিতার অন্যতম নিদর্শন। তাঁর বহির্মুখী কর্মপ্রয়াস ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হ'ল অন্তর্মুখী ভগবৎপ্রেমানুশীলনে। এই ধ্যানতন্ময়তা ভক্ত কেশবের মনে এনে দিল পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে 'মিষ্টিক' চেতনা। দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠল মরমী কেশবের ভাবধর্মী জীবন। ধর্মগুরু কেশব বাস করছেন তখন বেলঘরিয়ায় 'ভারত-আশ্রমে'।

*　　*　　*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মতো (কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের কাল) কেশবচন্দ্রের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁর প্রবল ধর্মানুরক্তির কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরের দিব্যোন্মাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন ভক্ত কেশব-সন্দর্শনে। তখন থেকে আরও দশ বৎসর পূর্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশব যখন তত্ত্বান্বেষী যুবক মাত্র, তখনই আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দেখে ঠাকুর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে আকর্ষণ তীব্রতর হ'ল, যখন লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন—লোকহিতব্রতী কেশব সংস্কারকের কর্মতৎপর জীবন অতিক্রম ক'রে প্রবেশ করেছেন ধ্যানতন্ময় জীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর উদার ধর্মবোধ, বিশ্ববোধ এবং বিশ্বমৈত্রীর ক্রমবর্ধমান দিগন্তসীমায় শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাপূত ধ্যানগম্ভীর জীবন যেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, এই জ্যোতিষ্কের ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে শতাব্দীশেষে বহু ধর্মনেতার অন্তর, আর সেই আলোকিত অন্তরের দীপ্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বাত্মা, বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের পরম ঐক্য। কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনেও এই ধর্মগুরুর প্রবল প্রভাব সর্বপ্রথম অনুভূত হ'ল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এই বছরই বেলঘরিয়ায় কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণরেখায় অঙ্কিত করেছেন পাশ্চাত্য মনীষী রম্যাঁ রলাঁ তাঁর বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থে।[১] কেশবচন্দ্র তখন দেশে ও বিদেশে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্ম- ও কর্মনেতা বলে স্বীকৃত, আর দক্ষিণেশ্বরের 'ভগবদ্‌ভাবে উন্মাদ' ('Madman of God') শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে তখনও প্রায় অজ্ঞাত। এই অবস্থায় স্বীয় আশ্রমে এই 'অদ্ভুত উন্মাদে'র সমাধি-অবস্থা এবং সমাধিভঙ্গে তাঁর মুখে এক

১ Romain Rolland, The Life of Ramakrishna, Ed. by Advaita Asrama, Mayavati, Almora, Himalayas, Pp, 168—169.

ও অনন্ত ভগবানের ('One and Infinite God') স্বরূপ বিশ্লেষণ শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন ভক্ত ও ব্রহ্মতত্ত্বপিপাসু কেশবচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবোন্মাদ, গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও কেশবচন্দ্রের মনের উপর তাঁর অনতিক্রমণীয় প্রভাব সম্পর্কে মঃ রলাঁ লিখছেন:

Thereupon he (Ramakrishna) began to sing a famous hymn to Kali, and in the midst of it he fell into an ecstasy. Even for Hindus enlightened by reason this was an ordinary sight; and Keshab, who, as we have seen, was sufficiently suspicious of such other morbid manifestations of devotion, would hardly have been struck by it, if, on coming out of Samadhi at the instance of his nephew, Ramakrishna had not forthwith launched into a flood of magnificent words regarding the One and Infinite God. His ironic good sense appeared even in his inspired outpouring, *and it struck Keshab very forcibly*. He charged his disciples to observe it. After a short time he had no doubt that he was dealing with an exceptional personality, and in his turn went to seek it out. They became friends.

অন্তরে তিনি এক গভীর পরিবর্তন অনুভব করলেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্ত কেশব আরও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিমান্ হ'য়ে উঠলেন এই অসাধারণ ব্যক্তিটির প্রতি।

ক্রমশঃ আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ল এই দুই ভগবৎ-প্রেমিকের মধ্যে। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলেন কেশব এই আত্মভোলা দিব্যোন্মাদের প্রতি। সে তীব্র আকর্ষণে ছুটে যেতেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে, আর এই আত্মার আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষে নৌকায় স্টীমারে চলত তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান। শ্রীরামকৃষ্ণের মনও ভক্ত কেশবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব ক'রত। তিনিও তাঁর স্নিগ্ধ উপস্থিতিতে সজীব ও ভাবগম্ভীর ক'রে তুলতেন ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানগুলিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলেও ব্রাহ্মসমাজ এবং তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কেশবের সংযোগ তখনও অব্যাহত। বাঙালীর ধর্মজীবনে তাঁর তখন অপ্রতিহত প্রভাব। সেই প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করলেন তিনি তাঁর মহান্ অধ্যাত্মসঙ্গীর অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গকে শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আনবার জন্য। এই প্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ লিখছেন:

'...and since his generous soul was obliged to share his discoveries with others, he spoke everywhere of Ramakrishna, in his sermons, and in his writings for journals and reviews, both in English and in his native languages His own fame was put at Ramakrishna's disposal, and it was through Keshab that his reputation, which until then had, with a few more exceptions, not reached the popular religious masses, came to be known in a short time within the intellectual middle class of Bengal and beyond.'

ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও এই পুঁথিগত-বিদ্যাবিহীন মৌলিক ধর্মদ্রষ্টার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ধর্মাদর্শ প্রচারের মধ্যে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে শ্রদ্ধা সূচিত হয়েছিল, সে শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে গভীরতর হ'ল তাঁর সাহচর্যের ফলে। অচিরেই কেশবচন্দ্রের মনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব মুদ্রিত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের যে দিক্‌টি কেশবচন্দ্রের সদাজাগ্রত মনকে অভিভূত করেছিল, সে হ'ল ঐহিক পারত্রিক সব কিছুর প্রতি এই ভগবৎপ্রেমিকের অন্তর্ভেদী ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টির সম্মুখে ভক্ত কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শিষ্যের মত শ্রদ্ধাবনত হলেন, যেমন হয়েছিলেন পাশ্চাত্য

ভাবে শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ। কেশবচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের অনতিক্রমণীয় প্রভাব-বর্ণনাপ্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ বলছেন:

> 'The modesty shown by noble Keshab, the illustrious chief of the Brahmo Samaj, rich in learning and prestige, in bowing down before this unknown man, ignorant of book-learning and Sanskrit, who could hardly read and who wrote with difficulty, is truly admirable. But Ramakrishna's penetration confounded him and he sat at *his feet as a disciple.*'

কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দিক্‌পরিবর্তন আলোচনায় এইখানেই প্রশ্ন ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রভাবে এই মহান্ ধর্মনেতা বাস্তবিকপক্ষে ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা। এই বিতর্কে নতুন ক'রে প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয় না, কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাবেন রমাঁ রলাঁর সুবিখ্যাত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (Note II, pp. 310-319)। উত্তরকালে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় প্রভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য বন্ধু মনীষী ম্যাক্স মূলর এবং তাঁর শিষ্য জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন আর না করুন, অন্ততঃ দুটি বিষয়ে তাঁর পরিণত ধর্মোপলব্ধির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ভগবৎ-স্বরূপের ধারণা 'পিতৃভাবকে' অতিক্রম ক'রে কেশব কর্তৃক ভগবানকে 'মাতৃভাবে' অনুভব। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় এই অনুভব অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সাধনার এ দিকটি আংশিকভাবে স্বীকার করলেও ধর্মানুশীলনে প্রাধান্য অর্পণ করেছিলেন ভগবানের ঐশ্বর্যময় পিতৃভাবের উপর। ভগবানকে সর্বশক্তিমান্ এবং দণ্ডদাতা পিতারূপে ধারণার মধ্যে কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে, মাতৃভাবে উপাসনায় মাধুর্য বর্তমান। হিন্দু-সাধনার ঐতিহ্যে মাতৃরূপিণী ঐশীশক্তি শুধু মাধুর্যে কোমলা নন, প্রয়োজনবোধে তিনি শক্তিময়ী, রুদ্রাণী। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপরূপ সম্মেলন ঘটেছে এই মাতৃভাবসাধনায়। কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এই ধর্মবোধের আবেদন তাই শুধু নীরস তত্ত্বচিন্তায় নয়, সরস প্রেমের জগতেও। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা এই কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত সাধনা। এই সাধনায় অদ্বৈতবাদের যেমন স্থান আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ মাতৃভাবের অনুভূতিতেও এই সাধনা প্রাণবন্ত। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনা সামঞ্জস্যপূর্ণ, শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সংস্কারমুক্তিতে নয়, সুগভীর প্রাণধর্মের মুক্তিতেই এর পূর্ণ বিকাশ। ১৮৭৫ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শুভ মিলনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন মুখ্যতঃ এই হৃদয়ধর্মী মাতৃভাবপ্রধান ধর্মসাধনার দিকে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনাবহির্ভূত এই নবতর ভগবৎ-অনুভূতিকে প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য শুধুমাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট নয়, স্বীয় অন্তরঙ্গ অনুবর্তীদের নিকটও তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু হৃদয়োত্থিত বিবেক অনুসরণে কেশবচন্দ্র রইলেন অটল।

দ্বিতীয়তঃ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খৃঃ 'নববিধান' (New Dispensation) নামক যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, তার উপরও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মবোধের প্রভাব গভীর বলেই মনে হয়। পৃথিবীর সকল ধর্মমতের ভিতর যে শাশ্বত সত্য আছে, সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ব-জীবনে গ্রহণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শ অনুপ্রাণিত

ক'রল কেশবকে 'নববিধান'-পরিকল্পনায় ও তার প্রচারে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র এই নতুন ধর্মমত প্রচার করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই এই সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মাদর্শের দিকে কেশবচন্দ্রের চিত্ত প্রসারিত হয়, এটা খুবই সম্ভব। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে উদার ভাব পূর্ব থেকেই ছিল, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই তাঁর এই ভাব দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত হয়, এবং 'নববিধানে'র মাধ্যমে তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে ব্রতী হন।

শতাব্দীর শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় দিব্যজীবনের প্রভাবে সংস্কারকামী ধর্মমতগুলি কিভাবে সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হবার পথ খুঁজছিল, তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'।

কেশবচন্দ্রের উদার ধর্মভাবনা দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হ'ল বিশ্বমানবধর্মের উদার প্রাঙ্গণে। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এ উদার ধর্মচেতনাও একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্যপ্রমুখ জগতের যে সমস্ত ধর্মনেতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হ'য়ে ত্যাগ, প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সাধনায় মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির প্রতি কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয়। কেশবচন্দ্র শেষ বয়সে এ সকল মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্মের সার সংকলন ক'রে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যবিধানে সযত্ন হলেন। তাঁর অনুবর্তী কয়েকজন কর্মীর ওপর তিনি ভার দিলেন এ মহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্য। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল যথাক্রমে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্‌লাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা-গবেষণায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন, তা বর্তমান গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা দেশে ধারণা করা অনেকটা দুঃসাধ্য।

* * *

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র বৃহত্তর ভারতীয় জাতিগঠনের কাজে একদিকে ব্যস্ত, আর একদিকে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ব্যক্তিগত কাজকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ উত্থিত হ'ল, যাতে কেশবচন্দ্রের এতদিনকার স্বপ্ন ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। এ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কুচবিহার বিবাহ'কে কেন্দ্র ক'রে। তাঁর অনুবর্তীরা অভিযোগ করলেন, কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, আর কেশবচন্দ্রের কথা হ'ল—তাঁকে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এতবড় একজন ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারক নেতার পক্ষে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'কুচবিহার বিবাহে' সম্মতি দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে একটি অন্যায় কাজ বলেই মনে হয়। কোন কোন সহানুভূতিশীল কেশব-সমালোচক বলেন, কেশবচন্দ্রের এ কাজ পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতা-প্রসূত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহযোগী ও চরিতকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'আচার্য কেশবচন্দ্রে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, দু'টো প্রধান কারণে কেশবচন্দ্র কুচবিহার-রাজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। প্রথমত, এ বৈবাহিক সম্পর্ক কুচবিহার-বাসীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে, এ সম্বন্ধে ভগবানের প্রত্যাদেশ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ব্রাহ্মপ্রণালীতে অনুষ্ঠিত হবে—

এ বিষয়ে কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার ডাল্টনের (Dalton) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য কিছুই নেই, কারণ এরূপ প্রত্যয় একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু ব্রাহ্মমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র যে প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।*

এ মতান্তরের ফলে কেশব-বিরোধীরা তাঁর ভারতধর্ম-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়ভূমি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে); আর বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন আদর্শের ভিত্তিতে 'নব-বিধান' ব্রাহ্মসমাজ। এ 'নববিধান'-প্রতিষ্ঠাই হ'ল কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ কীর্তি। বস্তুতঃ অসুস্থ শরীরে এ গুরুতর শ্রমসাধ্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলেই তাঁর দেহাবসান ঘটে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে।

আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কেশবচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন, জগতের প্রধান ধর্মমতগুলি একটি শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ উদার ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি তাঁর 'নববিধান'। কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত 'নববিধান' শুধু অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রমাত্র নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জড়রাজ্যের রহস্যভেদও এ নতুন বিধানের অন্যতম লক্ষ্য। 'নববিধানে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলেছেন:

> 'নববিধানে' বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদয় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। ...জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, সমুদয় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম,—ইহার মধ্যে কোন ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবেন।

কেশবচন্দ্র আশা করেছিলেন ঐহিক ও আধ্যাত্মিক—এ উভয় জীবনের ভিত্তিতে রচিত এ উদার ধর্ম ভারতবাসীর পক্ষে হবে পরম কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী নিজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম ক'রে ব্যাপকভাবে এ উদার ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেনি; কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মনোভাব বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত ক'রে পরবর্তী-কালে জগৎ-সচেতন এক মহৎ সংস্কৃতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

*   *   *

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে সহায়তা করেছে পঞ্চম-দশকোত্তর সজীব প্রাণধর্মী সাহিত্য। সাহিত্য পাঠের প্রতি কেশবচন্দ্রের সহজাত অনুরাগ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ-ভাবে তিনি কোন সাহিত্য রচনা করেননি। তবে নীতি ও ধর্মব্যাখ্যা সম্পর্কে কেশবচন্দ্র জাতিকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধি। এমন জীবনধর্মী আন্তরিক ভঙ্গীতে রচনা সে যুগে ছিল দুর্লভ। স্পষ্ট ঋজুরেখায় অঙ্কিত হয়েছে সে সত্য-উপলব্ধি তাঁর গদ্য-রচনায়। ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা যদি গদ্য-রচনার অন্যতম প্রধান গুণ হয়, তবে কেশবচন্দ্র সে যুগের আড়ম্বরপূর্ণ রচনার ক্ষেত্রে একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী। গভীর জীবন-সত্যকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধগম্য অথচ প্রত্যয়শীল সবল ভাষার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্র ও

* 'কুচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কৃত আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিবেকানন্দ ছাড়া খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের এ শক্তিশালী অথচ সহজ গদ্যরীতি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে আর বেশী অনুসৃত হয়নি। স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর স্থলে এসেছে অলংকারপ্রিয়তা। ফলে সে গদ্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়লেও জনচিত্তে আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে তার দুর্বলতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্রের স্বচ্ছ অথচ অন্তঃস্পর্শী দৃপ্ত গদ্য-রচনাভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে আরও বেশী অনুসৃত হ'লে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত যে আরও প্রসারিত হ'ত, তাতে সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা', 'সুলভ সমাচারে'র রচনা ও পত্রাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রচনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের তরঙ্গমুখর বাঙালী জীবনকে বেগ ও বলিষ্ঠতা দান করেছে কেশবচন্দ্রের ক্লান্তিহীন সংস্কৃতিসাধনা। এ সাধনার আশ্রয়স্থল ছিল ধর্ম ও সমাজসংস্কার। এ দুই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের জাগরণের মন্ত্র বাঙালী দৃষ্টিকে করেছিল মোহমুক্ত, এবং সে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিই সৃষ্টি করেছিল গত শতাব্দীর সব চাইতে ফলপ্রসূ জাগরণের আন্দোলন। রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমের মতোই গঠনশীল। সেজন্য উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন জাতির ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠনের উপর। তাঁর জাতীয়তাবোধের গভীরতা সন্দেহাতীত; সে যুগের পক্ষে পরম লোভনীয় কে. সি. এস. আই. খেতাব প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু যুগসুলভ ভাবোদ্বেলতা তাঁর প্রশান্ত ও সুগভীর জাতীয় চেতনাকে কখনও অতিক্রম ক'রে তটপ্লাবী হ'য়ে ওঠেনি। একবার তিনি সমসাময়িক ভারত-বরেণ্য রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যেন তার রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের আগে কেশবচন্দ্রকে সুযোগ দেন ভারতীয় জনগণের সমাজ- ও নীতিবোধকে উন্নত করবার। তা না হ'লে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না।*

বর্তমান স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তাঁর এ গভীর অর্থপূর্ণ উক্তি হতেই তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

* A. C. Bannerjee, Brahmananda Keshab Chandra Sen—Studies in the Bengal Renaissance, pp. 90.

অভিনয়

শ্রীনারায়ণ পাত্র

দু' দণ্ডের অভিনয়—এইতো নটের পরিচয়!
কখনো জয়ের হাসি, কখনো বিষণ্ণ পরাজয়।
কখনো সম্রাট সে, কখন বা পথের ফকির—
এইতো জীবন তার; এই তার সুষ্ঠু অভিনয়!
কখনো দয়াল আর, কখন সে নির্মম বধির!
নাটকের অঙ্কে অঙ্কে যাওয়া-আসা-মাঝে,
দর্শকের বুকে নট তোলে আলোড়ন;
কখন দর্পিত রোষে—কখন সে একান্ত সলাজে
রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে, বন্ধ করে সকল স্পন্দন!
তারপর শেষ অঙ্কে যবনিকা চোখের উপরে
নেমে আসে ধীরে ধীরে, ফেরে সবে নিজ নিজ গেহে,
নাটক-শেষেতে নটে কারো জানি মনে নাহি পড়ে,
একান্তে হেলায় ফেরে একা একা অবসন্ন দেহে।
জীবনের শেষে তবে বোঝা গেল দামী অভিনয়!!

নিরভিমান মাষ্টার মহাশয়

শ্রীফণিভূষণ সান্ন্যাল

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহেন্দ্রনাথ—ঠাকুর যাঁহাকে 'মাষ্টার' বলিয়া ডাকিতেন এবং শ্রীগুরুর এই স্নেহ-সম্বোধনেই যিনি ভক্তজনের নিকট পরিচিত—রামকৃষ্ণলীলার একটি অনবদ্য চরিত্র। যুগাবতারের বার্তা যিনি ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছেন, ভক্তি ও নিরভিমানতার প্রতিমূর্তি সেই মহেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। ভক্তসঙ্গে পরমসুন্দরের লীলাস্মরণে দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে ঠাকুর ছোট তক্তপোশটির উপর বসিয়া এবং মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পদতলে মেঝের উপর উপবিষ্ট—এই চিত্রটিই মনশ্চক্ষে প্রথম ভাসিয়া ওঠে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুলে পাঠসমাপনান্তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতেই ১৮৭৪ খৃঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন ও এণ্ট্রান্স, এফ.এ. এবং বি.এ. প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সমগ্র উত্তর ভারত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। মহেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয় স্থান, এফ.এ-তে অঙ্কের একটি পত্র পরীক্ষা না দিয়াও পঞ্চম স্থান এবং বি.এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'শিক্ষাব্রতী' কথাটি বহুল প্রয়োগে ম্লান না হইলে মুষ্টিমেয় মহাজনদেরই এই উচ্চ পদবীতে ভূষিত করিতে হইত। আজীবন গভীর নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া এবং বহু ছাত্রের প্রেরণাদাতা হইয়া (যে প্রেরণায় তাহারা জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছিল) এই মাষ্টার মহাশয়টি বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্রতী-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। যদি ঐ শিক্ষার ইতিহাসে বহু নামের ভিড়ে মহেন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত দেখিতে না পাই, তবে দুঃখের কথা। অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকার মানুষ গড়ার কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহারা নীরব কর্মীই হইবেন; আন্দোলনের বাহিরে থাকিলেও তাঁহারাই শিক্ষাব্রতী।

কলিকাতার বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করা ছাড়াও রিপন, সিটি, মেট্রোপলিটান কলেজে মহেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন। 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে রিপন কলেজে অধ্যাপনারত মহেন্দ্রনাথের বেশ সুন্দর একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই শান্ত-স্বভাব গম্ভীর প্রকৃতির অধ্যাপকটিকে ছাত্রেরা বিশেষ সমীহ করিত। কেবল একটি বিষয় তাহাদের কৌতূহল উদ্রেক করিত। টিফিনের সময় অধ্যাপক মহাশয়কে সহকর্মীদের সঙ্গে তো দেখা যায় না। তিনি কোথায় অন্তর্হিত হন? আবিষ্কৃত হইল—এই সময় তাহাদের প্রিয় মাষ্টার মহাশয় কলেজ ভবনের নির্জন চিলেকোঠায় একান্তে বসিয়া একটি ছোট খাতা মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন! এই খাতা মহেন্দ্রনাথের ডায়েরীর কোন একটি,—বহু পরে প্রকাশিত 'কথামৃতে'র পাণ্ডুলিপি। মাষ্টার মহাশয়ের বিশেষ অধ্যাপনানৈপুণ্য ছিল, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য হইলেও করিতে হইল।

* * *

১৮৮২ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুআরির অপরাহ্ণে মহেন্দ্রনাথের জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গের বন্ধুটি প্রস্তাব করিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে যাওয়া যাউক। সেখানে একজন সাধু থাকেন। হাঁ, ইঁহার কথাই তো মহেন্দ্রনাথ কেশববাবুর কাগজে সম্প্রতি পড়িয়াছেন। আকর্ষণ অনুভব করিলেন, উপস্থিত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে। প্রথম দর্শনেই মন মুগ্ধ হইল এবং পরিপূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন করিতেও বিলম্ব হইল না। রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে তাঁহার মনোমধুপ মধুপানের জন্য সদাই আকুল। রবিবার বা ছুটির দিন পাইলেই প্রাণপ্রিয়ের কাছে যাওয়া চাই; সমস্ত দিন তো অতিবাহিত হইতই, এমন কি ঠাকুর কলি-কাতায় কোন ভক্তগৃহে শুভাগমন করিয়াছেন—সংবাদ পাইলে টিফিনের ছুটিতেও সেখানে গিয়া প্রিয়তমকে দর্শন করিয়া আসিতেন। তবু মন তৃপ্ত নয়। গুরু-পদাশ্রয়ে বাস করিবার অভিলাষ চরিতার্থ করিতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের জানুআরি মাস পড়া অবধি এক পক্ষকাল মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাপন করিলেন। কত অনুরাগের সহিত মাষ্টার মহাশয় 'কথামৃতে' তাঁহার গুরুগৃহবাসের এই দিনগুলির কথা লিখিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ধ্যান, রামকৃষ্ণ জ্ঞান; রামকৃষ্ণ বই মাষ্টার মহাশয় আর কিছু জানিতেন না। তাঁহার কথায় সত্যই রামময় মহাবীরের কথাই মনে হয়।

এরূপ আত্মবিলুপ্তিকে (Self-effacement) নিরভিমানতা বলিলে কম বলা হয়, 'আমি'কে একেবারে মুছিয়া ফেলা অদ্ভুত ব্যাপার! এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'মাষ্টার বড় শুদ্ধ। এর অভিমান নাই।' ইহার বাড়া প্রশংসা নাই। বহুদিন মাষ্টার মহাশয় গভীর রাত্রে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সিনেট হাউসের বারান্দায় পথের ভিক্ষুক-দের সহিত শয়ন করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে শেষ রাত্রে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার শয়ন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—দেশের ও বিদেশের সুধীজন যাঁহার সাহচর্যলাভে মুগ্ধ হইতেন, সেই মহেন্দ্রনাথ রথযাত্রার পর অপেক্ষা করেন হাওড়া স্টেশনে—৺জগন্নাথের প্রসাদের আশায়।

বহু উপদেশার্থী আসিয়াছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু একটিও নিজের কথা নাই। বীণাবিনিন্দিত কোমলকণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, 'ঠাকুর বলতেন' —আর সেই ঠাকুর আর ঠাকুর। শ্রোতারা অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন, ঠাকুর যে 'ডায়লুট' (dilute) হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যে কি বস্তু—তাহা তাঁহারা দেখিলেন, বুঝিলেন। একজন সত্যসন্ধানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনেও মাষ্টার মহাশয় কী গভীর রেখাপাত করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় Dr. Paul Brunton-লিখিত A search in secret India নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে।*

*And so I am in Calcutta itself, searching for the house of the 'Master Mahasaya' the aged disciple of Ramakrishna.

I climb up a dark stairway and find myself in a small room which opens out on to the flat, terraced roof of the house. A young man bids me wait for the coming of his master who is on a lower floor.........

When at last—for he moves with extreme slowness—he enters the room, I need *no one* to announce his name. A venerable patriarch has stepped from the pages of the Bible, and a figure from Mosaic times has turned to flesh!

He takes his seat on a divan, and then turns his face towards mine. How *noble and dignifed the man looks.* In that grave, sober presence I realise inst-

পল ব্রান্টন তাঁহার এই সুপরিচিত পুস্তকের ১৮১ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের গৃহের ছাদের উপরকার ঘরে একজনের নির্দেশে বসিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। দশ মিনিট পরে মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রান্টনের মনে হইল বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে যেন একজন গোষ্ঠীপতি (Patriarch) বাহির হইয়া আসিতেছেন, মোজেসের সময়ের কোন মহাপুরুষ যেন রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন!

আসন গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রনাথ লেখকের সামনাসামনি বসিলেন। ব্রান্টন লিখিয়াছেন: *কী মহিমামণ্ডিত তাঁহার চোখমুখ! তাঁর উপস্থিতির গম্ভীর পরিবেশে কোন সন্দিগ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন বা নগ্ন সমালোচনা সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আচরণে মহত্ত্ব—যেন তাঁর চোখে মুখে মুদ্রিত রয়েছে।*

ব্রান্টন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেন। এই সামান্য কয়েক-দিনের সঙ্গ-লাভেই সংশয়বাদীর মন নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

তাহারই স্বীকৃতি ব্রান্টনের লেখার শেষ দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে: যদিও আমি ধর্ম-বোধহীন, তবু এই দেবদূতের মতো মানুষটির কাছে আমি শ্রদ্ধায় নত হই, তিনি আমার অন্তরদেশ আলোড়িত করেছেন। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় বসে ভাবি, যদি কেউ আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিগত সন্দেহবাদ থেকে মুক্ত ক'রে আমাকে সরল বিশ্বাসের জীবনে আকৃষ্ট করতে পারে তো সে মাষ্টার মহাশয়!

* * *

মহেন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ছিল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যস্বরূপ। 'মায়ের কথা'র পাঠকেরা সেই চিত্রটি স্মরণ করিবেন। মাষ্টার মহাশয় গরুর গাড়ী করিয়া কামারপুকুরে পৌঁছিয়াছেন। গাড়ী হইতে নামিয়া একদৃষ্টে ঠাকুর যে কুটিরে বাস করিয়াছিলেন, সেইদিকে তাকাইয়া আছেন, চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে।

ঝামাপুকুরের যে মিত্র-বাড়ীতে (বর্তমান কেশব সেন স্ট্রীটের 'নববিধান মন্দিরে'র পার্শ্বের অট্টালিকা) ঠাকুর কলিকাতায় প্রথম আসিয়া কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন; যাতায়াতের পথে সেখানে মাষ্টার মহাশয় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, মহেন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ নাই। বলেন, 'জানো এই রাস্তায় কেউ যদি বেড়ায়, সেও যোগী হ'য়ে যাবে।'

কখনও বা দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়াছেন—সঙ্গে আনিয়াছেন অমূল্য সম্পদ—একটি ভিক্ষা

...antly that there can be no utterance of harsh cynicism and dark scepticism which overshadow my soul from time to time. His character with its commingling of perfect faith in God and nobility of conduct is written in his appearance for all to see.

Night after night I come to bask in the spiritual sunshine of the presence. The atmosphere around him is tender and beautiful, gentle and loving; he has found inner bliss and the radiation of it seems palpable. I began to understand how potent must have been the influence of the Teacher (Sri Ramakrishna) when the disciple exercises such a fascination on me.

I bow humbly before this angelic man, irreligious though I am. He has strangely stirred me. In midnight stillness I reflect that if anyone could free me from the intellectual scepticism to which I cling and attach me to a life of simple faith, it is undoubtedly *Master Mahasaya.*

Paul Brunton—A search in secret India. Pp. 181—185.

গামছা; তাহাই নিঙড়াইয়া ভক্তদের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করতেন—সেই ঘাটের জল আছে এই গামছায়।'

এই সব যিনি করিয়াছেন, তিনি ভাবপ্রবণ বাতিকরোগগ্রস্ত বা গ্রাম্য অন্ধবিশ্বাসী নন, তিনি একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি—ধীর, গম্ভীর; ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে—'গম্ভীরাত্মা'।

'কথামৃত' জগতের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জগতের ধর্মপিপাসু লোক যে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধ্য, অথচ লেখক নিজ কৃতিত্বের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বরং নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য কতই না প্রয়াস করিয়াছেন, বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত।

আর কত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন এই 'কথামৃত'। 'কথামৃতে'র লেখার কাজ আরম্ভ হইলেই মাষ্টার মহাশয় হবিষ্যাশী একাহারী হইয়া দিন যাপন করিতেন; যতদিন পর্যন্ত মুদ্রণ শেষ হইয়া পুস্তক প্রকাশিত না হইত, ততদিন এইরূপ করিতেন। এ সব মনে করিলে তাঁর অপূর্ব জীবনাবসান খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয়। 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগের মুদ্রণ ছাপাখানায় চলিতেছে, জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে মাষ্টার মহাশয় অসুস্থ হইলেন। পরের দিন ভোর বেলা 'ঠাকুর, মা, আমায় কোলে তুলে নাও' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীজীর ভাষায় বলিতে হয়—'meeting such souls here and there repays for all the nonsense of this life.'

ঝরনার গান

শ্রীমতী গীতা হাজরা

(ঐ) নির্ঝরে ঝরে পড়ে স্বপ্নের গান
শুনিতে কি পাও কভু পাতিয়া কান?

সুমধুর সঙ্গীতে
কহে যেন ইঙ্গিতে:

প্রকৃতি লীলায় আছে নিজে ভগবান—
সকলি তাঁহারই রূপ, সবই তাঁর দান।

ঈপ্সিত কামনায়,
লাঞ্ছিত বেদনায়

সবার মাঝারে বাজে অপরূপ তান
সবারি প্রাণের মাঝে আছে তাঁর প্রাণ।

নির্মল সলিলে
আধফোটা কমলে

তাঁহারই অমিয় হাসি করেছেন দান,
অপরূপ স্নেহে ভরা তাঁহার পরাণ।

ভ্রমরের ছলনায়
পুষ্পের বেদনায়

তিনিই তো হ'য়ে যান শুষ্ক ও ম্লান
মায়ার বাঁধনে কাঁদে নিজে ভগবান!
নির্ঝরে বাজে তারই মুক্তির গান।

সাধু শ্রীমাণিক ভাসগর

স্বামী শুদ্ধ সত্ত্বানন্দ

চারজন বিখ্যাত শৈব সময়াচার্যের মধ্যে তিন জনের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন আমরা—তাঁদের অন্যতম শ্রীমাণিক ভাসগরের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

মাদ্রাজ প্রদেশের মাদুরা সহরের নিকটবর্তী ত্রিভাডাকুর নামক স্থানে শ্রীমাণিক ভাসগর এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম দেওয়া হয় ভাডাবুরার। তার জন্মের সময় নিরূপণ আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে হয়নি। এই নিয়ে বহু তামিল ও বিদেশী পণ্ডিত অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে কোন দু'জন একমত হ'তে পারেননি। কথিত আছে, অন্য কোন মহাপুরুষের জন্ম তারিখ নিয়ে এত বেশী বাদানুবাদ কখনও হয়নি। খৃঃ প্রথম শতাব্দী হ'তে একাদশ শতাব্দী পযন্ত প্রায় প্রত্যেক বছরকেই বিভিন্ন পণ্ডিতেরা তাঁর জন্মকাল বলে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। সাধু আপ্পার, জ্ঞান সম্বন্ধর, ও সুন্দরবের রচিত 'তেবারমে' মাণিক ভাসগরের উল্লেখ থাকায় ইনি যে তঁদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। খৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সব যুক্তিতর্ক পাঠ ক'রে এইরূপই অনুমিত হয়।

বাল্যকালেই ভাডাবুরার বেদ ও আগমশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাদুরার তদানীন্তন পাণ্ড্যরাজা অরিমর্দন পাণ্ড্য তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে আরূঢ় হলেও তিনি অতি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ভোগ-ঐশ্বর্য বা মান-সম্মানের দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। নানারূপ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হলেও তাঁর মনের সাম্য কখনও নষ্ট হয়নি। প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালনের পর অবসর সময়ে তিনি ভাবতেন, কিভাবে তিনি তাঁর আচার্যের সন্ধান পাবেন, যিনি তাঁকে চিরমুক্তির পথের সন্ধান ব'লে দেবেন। হৃদয়ের আকুলতা ক্রমশই তীব্রতর হ'তে থাকে। অবশেষে তাঁর জীবনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণ এক আশ্চর্যভাবে উপনীত হ'ল।

রাজা অরিমর্দন শুনতে পেলেন যে তাঞ্জোর জেলায় পেরুন্দুরায় বন্দরে পাঁচটি অতি সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব এসেছে। রাজা ঘোড়া খুব ভালবাসতেন। খবর পাওয়া মাত্র অরিমর্দন বহু টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ঐ ঘোড়া পাঁচটি কেনবার জন্য পাঠালেন। বন্দরের কাছাকাছি এসে মন্ত্রী মহাশয় হঠাৎ শুনতে পেলেন দূরে জঙ্গল থেকে এক সুমিষ্ট স্তবের আওয়াজ আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই শব্দ ধরে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন একটি কুরুন্দ বৃক্ষের তলে বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ শিষ্য-পরিবৃত হ'য়ে প্রার্থনা করছেন। তাঁদের দেখেই তাঁর অন্তরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক ভাব ঘন বর্ষার নদীর ন্যায় দু-কূল ছাপিয়ে উঠল। তিনি তাঁর পদমর্যাদা ভুলে গেলেন, উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন। দায়িত্ব, কর্তব্য সব বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে নিপতিত হ'য়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ হ'তে অতি সুন্দর, সুমিষ্ট ও গম্ভীর এক স্তোত্র উচ্চারিত হল। মুক্তার মত স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুন্দর স্তব শ্রবণে গুরু তাঁর নাম রাখলেন, 'মাণিক ভাসগর' (শ্রীমাণিক্য-বাচকর)। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত 'পঞ্চাক্ষর মন্ত্র' পেয়ে তিনি ধন্য হলেন। পুনরায় গুরুর চরণ বন্দনা ক'রে তিনি গভীর সাধনায় ডুবে গেলেন। ঘোড়া কিনবার জন্য যে অর্থ এনেছিলেন, তা দিয়ে সেখানে এক সুন্দর শিবমন্দির নির্মাণ ক'রে দিলেন।

দেরী দেখে রাজাও এদিকে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময় অনুচর এসে সব কাহিনী বিবৃত ক'রল। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে প্রধানমন্ত্রীকে তলব করলেন। শঙ্কিত চিত্তে রাজার সম্মুখে এলেন তিনি; রাজার ক্রোধ আরও বর্ধিত হ'ল এবং ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসিত হ'য়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলে ফেললেন 'আবনী' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে শুভ মূলা নক্ষত্রে ঘোড়া এসে পৌঁছবে। এ-কথায় রাজা বিশ্বাস না ক'রে তাঁকে জেলে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতি নানারূপ অত্যাচারও করা হ'ল। আশ্চর্যের বিষয় নির্ধারিত দিনে দৈব উপায়ে পাঁচটি অতি সুদৃশ্য অশ্ব রাজার আস্তাবলে দেখা গেল। পরীক্ষান্তে অশ্বগুলিকে সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে অনেকেই নির্ধারিত করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আস্তাবল থেকে সমস্ত রাত ভীষণ শব্দ আসতে লাগল এবং সকালে উঠে দেখা গেল যে নবাগত অশ্বগুলি বিরাটকায় হিংস্র বন্য শৃগালে পরিণত হয়েছে এবং রাজার পুরাতন অশ্বটিকে মেরে ফেলেছে। রাজার ক্রোধের সীমা রইল না। মাণিক ভাসগরের প্রতি আবার অত্যাচার সুরু হ'ল। তিনি নীরবে সব অত্যাচার সইলেন; কারও প্রতি কোন দোষারোপ করা নেই, নেই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। কিন্তু ভগবানের আসন টলে উঠল। ভক্তের দুঃখ আর তিনি দেখতে পারলেন না। হঠাৎ দেখা গেল মাদুরা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভৈগাই নদীতে বন্যা সুরু হয়েছে।—সে কি জলস্রোত! সমস্ত শহর জলমগ্ন হওয়ায় আশঙ্কা দেখা গেল। রাজার মনে হ'ল এই সব দৈব দুর্বিপাক মাণিক ভাসগরকে অত্যাচারের ফল। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। ছুটে গিয়ে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তিনি তাঁকে মুক্ত ক'রে দিলেন।

মুক্তি লাভ ক'রে মাণিক ভাসগর মন্দির হ'তে মন্দিরান্তরে তীর্থপর্যটন শুরু করলেন। প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েই সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বন্ধে অতি মধুর ভক্তিমূলক স্তবস্তুতি রচনা করতে লাগলেন। তিরুপেরুন দুরাই মন্দিরে তিনি যে স্তব রচনা করেছিলেন সে গুলি ভক্তির আতিশয্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং দৈবভাবের অভিব্যক্তিতে অতুলনীয়। চিদাম্বরম্ যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হ'ল। পথে উত্তর কোশমাঙ্গাই। তিরুকলু-কুণ্ডরম্ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন ক'রে তিনি চিদাম্বরমে উপস্থিত হলেন। সেখানে লঙ্কাদ্বীপ থেকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সে দেশের রাজা ও তাঁর মূক কন্যা এসেছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল রাজার সহায়তায় সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মাণিক ভাসগরের সঙ্গে তাঁর এক তর্কসভার আয়োজন হ'ল। বহুলোক উপস্থিত। তর্ক শুরু হ'ল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে দেখলেন যে বাক্‌পটু বৌদ্ধভিক্ষু ক্রমশঃ চুপ ক'রে আসছেন। শেষ পর্যন্ত মূকের ন্যায়

তিনি মৌন হ'য়ে রইলেন। মাণিক ভাসগরের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে রাজা তাঁকে সবিনয়ে বললেন, 'মহাশয়, আপনি বাচালকে মূক ক'রে দিলেন, অদ্ভুত আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতা। আপনি দয়া ক'রে আমার এই মূক মেয়েটির মুখ ফুটিয়ে দিন।' মাণিক ভাসগরের দয়া হ'ল মেয়েটির জন্য তিনি অনেকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে তাকে বললেন, 'মা, আমি তোমায় যে সব প্রশ্ন করছি, তার জবাব দাও।' সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে মেয়েটি সুন্দরভাবে কথা কইতে লাগল। রাজা তখন তাঁর অনুগামী সব বৌদ্ধদের নিয়ে শৈবধর্মে দীক্ষিত হলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্বে আবার উড্ডীন হ'ল। মাণিক ভাসগরকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

কথিত আছে, মাণিক ভাসগর যে সব সব রচনা করেছিলেন, শিব নিজে মানুষের রূপ ধরে সেগুলি সঙ্কলন করেন। চিদাম্বরমের অধিবাসিবৃন্দ তাঁকে তাঁর গীতিগুচ্ছের সারাংশ ব্যাখ্যা করবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সকলকে নিয়ে প্রসিদ্ধ নটরাজের মন্দিরে গমন করেন এবং দেবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলেন, 'উনিই আমার স্তবস্তুতির লক্ষ্য ও বিষয়, উনিই ভাষা, উনিই ভাব, উনিই ছন্দ এবং উনিই অর্থ।' আশ্চর্যের বিষয়—এই কথা বলার পর সেখানেই সাধক সাধ্যের সহিত মিলিত হলেন। ভৌতিক দেহে মাণিক ভাসগরকে আর দেখা গেল না।

সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর, আপ্পার ও সুন্দররের রচনাবলী বিখ্যাত 'তেবারম্' নামে খ্যাত। মাণিক ভাসগরের রচনাবলীকে বলা হয় 'তিরুবাচকম্'। 'তিরু' অর্থে পবিত্র। কথিত আছে যে 'তিরুবাচকম্' পাঠ ক'রে যদি কারও মন না গলে; তবে অন্য কিছুতেই তার মন কখনও গলবে না। যে স্থানে মাণিক ভাসগর প্রথম তাঁর গুরুর দর্শন পান এবং আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেন, তাঞ্জোর জেলার সেই স্থানে মাণিক ভাসগরের অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন—উহা 'আবাড়িয়ার কোয়েল' নামে বিখ্যাত। তামিলে 'কোয়েল' বা 'কোবিল' শব্দের অর্থ মন্দির। ঐ মন্দিরে মাণিক ভাসগরের মূর্তি আজও বিদ্যমান।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক রচনাবলীর মধ্যে মাণিক ভাসগরের রচনা অন্যতম। তাঁর রচিত স্তব পাঠে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং ঘোর পাতকীও তার পাপ থেকে মুক্ত হয়। ঈশ্বরের ভাবে সম্পূর্ণ বিভোর হ'য়ে থাকাকালীন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঐ সব স্তবস্তুতি রচিত হয়েছিল। কাজেই সেগুলি পাঠ করলে এখনও বহু ভক্তের শরীর পুলকে শিউরে ওঠে। তাঁর রচিত দু-একটি স্তবের অনুবাদ :

হে দিব্য নর্তক, হে বিভূতিভূষিত ত্রিলোচন, হে পরম পুরুষ, তোমার জন্য কত কেঁদেছি, তোমাকে দেশ-দেশান্তরে কত খুঁজেছি, কই এখনও তো তোমার দেখা পেলাম না! হে আমার পিতা, আমি বড় ক্লান্ত, আর বেশীদিন এখানে থাকব না। তুমিই এ শরীর দিয়েছিলে, তুমিই তা নিয়ে নাও প্রভু। হে ভগবান! তোমার পাদপদ্ম দেবতারাও দর্শন করতে পান না, আমি তোমার বদনকমলের মহিমা দেখার জন্য পাগল, তোমার মধুর হাসি দেখে আমার জীবন সার্থক হবে। আমি যশ চাই না, ধন চাই না, পৃথিবীর সুখও চাই না, স্বর্গও চাই না। পুনর্জন্মেও আমার স্পৃহা নেই, মৃত্যুতেও আমার ক্ষোভ নেই। যারা ভগবান শিবকে চায় না, আমি তাদের স্পর্শ করতেও রাজী নই।

হে তিরুপেরুন্দুরাই-এর অধীশ্বর! আমি তোমার চরণকমলে পৌঁছেছি, আর কখনও তা ছাড়ব না। আমার বক্ষে তোমার শ্রীপদ একবার ধারণ করেছি, আর কখনও যেতে দেব না। হে ভগবান! তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কৃপা ক'রে আমার হৃদয়ে তুমি আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তোমার কৃপায় আমার অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, আমার বন্ধনরজ্জুকে তুমি কৃপা ক'রে কেটে দিয়েছ। তুমি আমার অন্তর আলোকিত ক'রে রয়েছ এবং উহা প্রেমে পূর্ণ করেছ। হে প্রভু! কৃপা ক'রে যখন তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছ, তখন আমি আর কিছুই চাই না।

মাণিক ভাসগরের অন্তর ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তার মন ছিল অহরহঃ ইষ্ট-চিন্তায় নিরত, জিহ্বা ক'রত সর্বদা ইষ্টেরই গুণগান, কর্ণকুহর সর্বদা উন্মুক্ত থাকত তাঁর কথা শোনবার জন্য। কায়মনোবাক্যে তিনি একেবারে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন তাঁর ইষ্টের চিন্তায়। মাত্র বত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। অপূর্ব ছিল তাঁর সাধন-জীবন, অলৌকিক ছিল তাঁর কার্যকলাপ!

যে চারজন বিখ্যাত সময়াচার্যের বিষয় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, এঁরা বহুসহস্র ভক্তহৃদয়ে আলোকবর্তিকা হ'য়ে বিরাজ করছেন। ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর তাঁদের দিব্য জীবন অনুধ্যান করলে জগতের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সংসারাসক্তি কমে যায়, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ইহজীবনেই ইষ্টকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষাও মনে জাগে।

প্রকাশ

শ্রীমতী বিভা সরকার

চিত্তের গভীর হ'তে উৎসারিত আলো—
সে তোমারই আলো!
আত্মার অমিত মুক্তি সেথায় প্রকাশে
মৃত্যুহীন প্রাণের উল্লাসে।

হৃদয়ের চির চাওয়া জাগে চিরন্তন
ভাঙে তাই মাটীর বন্ধন।
লোকোত্তর অভিযাত্রী আনন্দ-মহিমা
ছেড়ে যায় এই মর্ত্ত্য-সীমা।

অসীমের পূর্ণলোকে ওঠে সে আকুলি,
যায় স্তব্ধতার দ্বার খুলি।
জীবন-জিজ্ঞাসা ধন্য সেই যে ভূমায়
ধন্য প্রাণ প্রণমে তোমায়।

পরম অমৃত রসে কুম্ভ পূর্ণ আজ,
ধন্য আমি ওগো রসরাজ!
ঘুমন্ত চৈতন্য মোর চিদানন্দে জাগে,
মন মোর জাগে অনুরাগে!

'মহামানবের সাগরতীরে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের Human Society in Ethics and Politics-এর একটা জায়গায় এসে দেখতে পেলাম :

But schools are out to teach patriotism : newspapers are out to stir up excitement : and politicians are out to get re-elected.

বিদ্যালয়গুলি ঝুঁকেছে উগ্র দেশপ্রীতি শেখানোর দিকে, সংবাদ পত্রগুলির ঝোঁক উত্তেজনা সঞ্চারের প্রতি, আর রাজনীতিকদের চিন্তা—আবার কি ক'রে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়।

এর পরেই লেখা রয়েছে—এই তিনের কোনটাই মানবজাতিকে পারস্পরিক আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়। তবে আশা কোথায়? রাসেল্ বলছেন :

The only thing that will redeem mankind is co operation, and the first step towards co-operation lies in the hearts of individuals.

মানবসমাজকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখে যে একমাত্র বস্তুটি, তা হচ্ছে সহযোগিতা ; আর এই সহযোগিতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ।

আমরা ভিতরে যা, বাহিরে তো তারই প্রকাশ। সুন্দরকে যেখানে অন্তর দিয়ে ভালবাসি, সেখানে কি কখনো স্বেচ্ছায় নোংরামিকে সহ্য করি? মনের মধ্যে ভয় ঢুকলে পৈতৃক প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছায় পা-দুটো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ক্রোধ ঢুকলে মার-মুখো হ'য়ে উঠি। আমাদের বাহিরের আচরণের মধ্যে মনের খেলাটাই প্রায় ষোল আনা। তাই জ্ঞানীরা হৃদয়ের পরিবর্তনের উপরে এতটা জোর দিয়ে থাকেন। যদি মহাযুদ্ধের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত দেখতে চাই, তবে অন্তর থেকে বিদ্বেষভাব তাড়াতেই হবে। যাদের অসাধু মনে করছি, তাদের প্রতি ঘৃণা মানব-সমাজকে কোনকালেই মঙ্গলপথে অগ্রসর ক'রে দিতে পারবে না। আর সত্য-সত্যই এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি, যাকে ঘৃণা করা যেতে পারে? আমরা নিজেরা এমন কি শুভ্রশুচি যে অন্যদের ঘৃণা করবার স্পর্ধা রাখি?

যা কিছু অপরিচিত, তাকে ভয় করাই আদিম নরনারীর স্বভাব। সেই আদিম বর্বরকে রক্তের মধ্যে কি আমরা আজও বহন ক'রে আসছি না? 'ফরাসীরা ব্যাঙ খায়'—তাই ইংরেজের চোখে একজন ফরাসী কি ইংরেজের মতো ভালো হ'তে পারে? ফরাসীদের গুণগান শুনলে সাধারণ ইংরেজ বলবে, 'Nonsense, they talk French and eat frogs.' জেলখানায় আমাদের মধ্যে একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন যিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন, মেমসাহেবেরা কখনও সতী হ'তে পারে না, কারণ তারা শূকরের মাংস খায়। 'ছাতু', 'মছ্‌লিখোর' 'পৌত্তলিক' ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে যে বিদ্বেষবুদ্ধির অভিব্যক্তি, সেই বুদ্ধিতেই ফরাসী ইংরেজের কাছে শুধুই ব্যাঙ-খোর। যাকে জানিনে তাকেই ভয় করি, তাকে ঘৃণাও করি। সেই জন্যে ভয়কে জয় করবার উপায় হ'ল অজ্ঞতা দূর করা—ভয়কে জয় করতে পারলে মন বিদ্বেষবুদ্ধি থেকেও মুক্ত হবে।

কেবল নিন্দাবাদের ছড়াছড়ি! সব কিছুর মধ্যে ছিদ্রান্বেষণের এই মনোবৃত্তিই মারাত্মক। পৃথিবীতে ভালো ব'লে যদি কিছু থাকে সে

হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলটি, আমাদের গোষ্ঠীর মানুষগুলি ; আর সবই অপাঙ্‌ক্তেয় —এই রকমের নিন্দাবাদ দূর থেকে দূরান্তরে যারা ছড়াতে থাকে, তারাই কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে ডেকে আনে না? রাসেল্ বলছেন :

It is from just such condemnations, when wide-spread, that wars proceed. I have never heard of a war that proceeds from dance-halls.

এই রকমের নিন্দাবাণী যখন দূরপ্রসারী হয় তখনই যুদ্ধবিগ্রহ বাধে। আমি কখনও শুনিনি, নাচঘর থেকে কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

* * *

এই দিক থেকেই রামকৃষ্ণ-অবতারের পরম সার্থকতা। 'কথামৃতে'র মধ্যে কারও প্রতি একটিও বক্রোক্তি নেই। সব ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই স্বীকৃতির ঔদার্য 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায়। যত মত, তত পথ—এই সার্বভৌম সত্যকে সকলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব! তাঁর আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর সংগ্রাম, তাঁর ঈশ্বরীয় আনন্দের অনির্বচনীয় অনুভূতি, বিচিত্র সাধনার পথে তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি—এগুলির কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্যে? শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিতেই যদি তিনি পরিতৃপ্ত থাকতেন, তবে আরতির সময় কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়' ব'লে দিগ্‌দিগন্তে ডাক পাঠাতেন কেন? প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবার সহানুভূতিসূচক উদার মনোভাবের মধ্যেই তো মানবসমাজের ভবিষ্যতের আশার অরুণজ্যোতি! সহানুভূতির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবার কোন সুযোগকেই আজ আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না।

আর এজন্যে জ্ঞানকেই প্রধান হাতিয়াররূপে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। রাসেলের ভাষায় :

The main thing needed to make the world happy is intelligence, and intelligence can be fostered by education.

জ্ঞান এলে তবে প্রেম আসবে। যেখানে অপরিচয়ের ব্যবধান, সেখানেই ভয় ; যেখানে ভয়, সেখানেই তো ঘৃণা।

কত শত বৎসর ধ'রে আমরা হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে পাশাপাশি বাস ক'রে আসছি। ক'জন হিন্দু উপনিষদ্ পড়েছে?—জানে হিন্দুধর্মের মর্মকথা? কয়জন মুসলমানই বা কোরানের বাণীর সঙ্গে পরিচিত? নিজের ধর্মই জানে না, পরের ধর্মকে জানতে উৎসাহিত হবে—এমনটি আশা করা ঠিক নয়। তবুও বলবো, হিন্দুমুসলমান উভয়ের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে যে অজ্ঞতা আছে, তা অপসারিত হলেই অপরিচয়ের বিলুপ্তি ঘটবে, জ্ঞানের এই সম্প্রসারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করবে।

* * *

কিছুদিন আগে পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে আরম্ভ করেছি। ইউসুফ আলির অনুবাদের ভাষা চমৎকার। যতই পড়ছি ততই মনে হচ্ছে, সব ধর্মই মূলতঃ এক এবং সত্য। সব ধর্মেই দুটো আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হ'ল ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার আদর্শ দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে মানব-প্রীতির কথা। বাইবেলে সেণ্ট ম্যাথু লিখিত সুসমাচারের দ্বাবিংশতম অধ্যায়ে পড়েছি :

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

This is the first and great commandment and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets.

যীশু তাকে বললেন, তোমার প্রভু জগদীশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত আত্মা দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে। এইটাই হ'ল প্রথম এবং প্রধান অনুশাসন। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই তুল্য, তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসবে। এই দুটি অনুশাসনই সকল শাস্ত্রের ও সকল ধর্মগুরুর অবলম্বন।

খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসের গুণগান আছে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাচাই করবার শেষ কষ্টিপাথর তো কর্ম। সাধু জেম্‌স্‌ তাই বলছেন :

What doth it profit my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him?

কেউ যদি বলে তার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তার কর্মের ঘরে থাকে শূন্য; তবে সেই একক বিশ্বাসের দ্বারা তার কি লাভ হবে? বিশ্বাস কি তাকে বাঁচাতে পারবে?

Thou believest that there is one God, thou doest well: the devils also believe, and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

তুমি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ভালো কথা। শয়তানেরাও তা বিশ্বাস ক'রে এবং ভয়ে কাঁপে। কিন্তু হে অহঙ্কারী মানব, কর্ম ছাড়া বিশ্বাস প্রাণহীন—এ সত্য কি উপলব্ধি করবে?

সাধু জেম্‌স্‌ বলেছেন আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসও মৃত। তাঁর কথায় মধ্যেই আছে :

If a brother or sister be naked, and destitute of daily food. And one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body; What do it profit.? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.

যদি কোন ভাই অথবা বোন বস্ত্রহীন এবং অন্নহীন হয়, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বলে, শান্তিতে চলে যাও, পেট ভরে খাও এবং শীতের হাত থেকে বাঁচো, অথচ তাদের শরীরের পক্ষে যে সব বস্তুর প্রয়োজন ছিল, সে গুলি তাদের না দেয়, তবে লাভ কি? সেই রকম বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম যুক্ত না হ'লে একা বিশ্বাস মৃতের পর্যায়ে।

কোরানের প্রথম সুরার বা অধ্যায়ের সাতটি আয়েতের পঞ্চমটিতে আছে : Thee do we worship, And Thine aid we seek. করুণাময় তিনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন কর্তা তিনি, সর্বশক্তিমান্‌ তিনি। শেষ বিচারের দিনে বিচারকও তো তিনিই। এই উপলব্ধি থেকেই ঈশ্বরের ভজনা এবং তাঁর শরণাগতি। বাইবেলে যেমন ঈশ্বরপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে—কোরানেও তেমনি। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ধর্ম হতেই পারে না। আসলে ধর্ম তো 'life before God and in God.' জীবনকে ঈশ্বরের সামনে আরতির দীপশিখার মতো জ্বালিয়ে রাখা, তাঁর মধ্যে জীবনকে নিরন্তর ডুবিয়ে রাখা—এমিয়েল্‌ একেই বলেছেন ধর্ম।

ধর্মের অপরিহার্য দ্বিতীয় অঙ্গটি অর্থাৎ মানবপ্রীতিও কোরানে প্রশংসিত। ঈশ্বরে বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, সেই বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হবে জীবসেবায়। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি কোরানে মর্যাদা পেয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জীবে প্রেম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকেই বলা হয়েছে ধর্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রেমের

যথার্থ পরিচয় তো কথায় নয়, রসনার মধুতে নয়,—কাজে। সাধু জন্ বলছেন, My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed in truth. কোরানেও কর্মের মাধ্যমে জীব-সেবার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো এবং মানুষকে ভালোবাসো, শুধু এই দুটি কথা বলেই কোরান ক্ষান্ত থাকেনি; কোরানের দ্বিতীয় সুরায় ১৭৭ আয়েতে স্পষ্ট বলা হয়েছে:

It is not righteousness
That yo turn your faces
Towards east and west;
But it is righteousness
To believe in God
And the Last Day,
And the Angels,
And the Book,
And the Messengers;
To spend of your substance,
Out of love for Him,
For your kin,
For orphans,
For the needy,
For the wayfarer,
For those who ask,
And for the ransom of slaves.

—কেবল পূর্বে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করো—এটাই ধর্ম নয়। বাহ্যানুষ্ঠানের উপরে অন্যান্য ধর্মের মতো কোরানেও জোর দেওয়া হয়নি। জোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসের ওপর; বলা হয়েছে, 'আমানা বিল্লা'—ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই ধর্ম। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, He that loveth not his brother abideth in death, কোরানেও তেমনই বলা হয়েছে। আমাদের ভালোবাসতে হবে পরস্পরকে; সেই ভালোবাসা সত্য হয়ে উঠবে পুণ্যকর্মে, মানুষের অকুণ্ঠ সেবায়। তবেই বিশ্বাসের সার্থকতা!

তাই কোরান বলছে: তোমার যা আছে তার থেকে অন্যকে দাও। খ্যাতির লোভে দিও না; দাও ঈশ্বরকে ভালোবেসে। কাদের দেবে? যারা তোমার আত্মীয় স্বজন, যারা 'জিল্ কোরবা' তাদের দেবে। আর কাদের? 'ওয়াল এতামা' অর্থাৎ যারা পিতৃমাতৃহীন তাদের। 'এয়াল মোশাকিনা' এবং যারা অভাবগ্রস্ত তাদেরও দেবে। 'ওরা ইব্না সাবিল' অর্থাৎ যারা পথের পথিক তাদের প্রতিও সদয় হবে। হিন্দুরা যেমন 'অতিথিদেবো ভব' বলেছে, মুসলমান ধর্মেও তেমনি অতিথি-সৎকারকে ধর্মের কাজ বলা হয়েছে। ধর্মের কাজ বলা হয়েছে, যারা ক্রীতদাস, যারা বন্দী—তাদের মুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য করাকে। আত্মকেন্দ্রিকতাকে (Self centredness) যেমন হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টানধর্ম পাপ বলেছে, মুসলমান ধর্মও তেমনি তাকে পাপই বলেছে। হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টানধর্মে যেমন' জীবে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তেমনি কি মুসলমান ধর্মেও হয়নি?

হিন্দুধর্মও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মের মতো ঈশ্বর-প্রীতিকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, জীবে সেবা—এদের আসন ঈশ্বরপ্রেমের নীচেই। 'তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং'—অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক ঈশ্বরকে ভজনা করার আদর্শ গীতার পাতায় পাতায় কীর্তিত হয়েছে। সাধনের রাজা তো স্মৃতি-সাধন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর', নিয়ত তাঁর স্মরণমনন। 'কথামৃতে' পাই:

শম্ভুমল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হ'য়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়; ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়।·········ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে

তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারি ক'রে দাও? ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।' ভক্তির উপরেই ঠাকুর সমস্তটা জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম। কথামৃত—যার মধ্যে হিন্দুধর্মের নির্যাস—সেখানেও দেখি ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্মের মূল। ঠাকুর বলেছেন:

'একটা দৃঢ় ক'রে চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছলে তেলিপাড়াও জানতে পারবে, জানতে পারবে যে তিনি শুধু আছেন—তা নয়। তিনি তোমার সঙ্গে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু মানবপ্রীতির দিকটাকে কি ঠাকুর তবে উপেক্ষা করেছিলেন? তা কেন হবে? হাজরার মায়ের অসুখের সংবাদ এসেছে। ছেলেকে দেখবার জন্যে শয্যাশায়িনী মায়ের মন আকুল। ঠাকুর হাজারাকে বলেছিলেন, 'মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়?' মা যে কাঁদবে—এই ভেবেই না ঠাকুর বৃন্দাবন থেকে দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছিলেন সেজো বাবুর সঙ্গে। নিজে শুষ্ক সাধু ছিলেন না, আমাদেরও শুষ্ক হতে বলেননি। মানুষকে ভালোবাসার কথা বারংবার তিনি বলে গেছেন। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর সত্যোপলব্ধির আনন্দ, তাঁর বিচিত্র পথে সাধনা—তাঁর নিজের মুক্তির জন্য কি এগুলির প্রয়োজন ছিল? জগদ্ধিতায়, সারা মানবজাতির মঙ্গলকামনায় কি বিবেকানন্দকে তিনি উৎসর্গ ক'রে দেননি—তাঁর সমন্বয়ের বাণী দিগ দিগন্তে প্রচার করবার কাজে? কি তাঁর প্রয়োজন ছিল তরুণ সন্ন্যাসীদের একসূত্রে বাঁধবার? তাদের জীবনগুলিকে রূপান্তরিত ক'রে দেবার? কী অপূর্ব ভাষায় রলাঁ লিখেছেন:

This great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda as well as the delicate and tender wax of Yogananda and Brahmananda.

বজ্রকঠিন বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ, পুষ্পকোমল যোগানন্দের আর ব্রহ্মানন্দের মোম্—সবই নিয়েছেন নিজের হাতে আর আগুনের অঙ্গুলির স্পর্শে সেই মহাশিল্পী প্রত্যেককে গড়ে তুলেছেন তার স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়।

কোরানের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে পড়তে দ্বিতীয় সুরার ২৫৬ আয়েতে দেখলাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে: Let there be no compulsion in religion. ধর্মের রাজ্যে জোরজুলুমের স্থান নেই। মূল আরবীতে আছে, 'লা একৃলা সিদ্দীন্'—ধর্মে কোন জোর নয়। ধর্ম তো বিশ্বাসের ব্যাপার। জোর ক'রে কি কাউকে কিছুতে বিশ্বাস করানো যায়? ঐ সুরারই ২৭২ আয়েতে বলা হয়েছে:

It is not required of thee (Oh Apostle),
to set them on the right path,
But God sets on the right path
Whom He pleaseth.

একথা বলা হয়েছে দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশের সম্পর্কে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান দান করবার বেলায় ধর্মীয় বাছবিচার করবেন না। ধর্মের ব্যাপারে বিচার করবার মালিক ভগবান—মানুষ নয়। ধর্মান্তরিত করবার জোরজুলুম কেবল যে তরোয়ালের মুখেই প্রকাশ পায়, তা নয়। দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়েও অন্যকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার নজির আছে যথেষ্ট। মুসলমানধর্ম টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অন্যকে

ধর্মান্তরিত করার বিরোধী। ইউসুফ আলি ২৭২ আয়েতের ভাষ্যে লিখেছেন :

For compulsion may not only be by force, but by economic necessity. In matters of religion we must not even compel by a bribe of charity.

* * *

দিল্লীতে টয়েনবী কিছুদিন পূর্বে যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে আছে, বাঘ-সিংহ মানুষকে বিপন্ন করেছে—একথা সত্য। কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ আজ যত বিপজ্জনক, বাঘ সিংহ কি তত বিপজ্জনক? মানুষ রোগের বীজাণুকে জয় করেছে, কিন্তু নিজেকে কি জয় করতে পেরেছে? আর কি রকমের সব মারাত্মক অস্ত্রে মানুষ আজ সজ্জিত! এই সব মারাত্মক অস্ত্রের কাছে বাঘ আর ব্যাকটিরিয়া তো কিছুই নয়। এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে একটা সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যদি যুদ্ধকে বিলুপ্ত না করি, যুদ্ধ নিশ্চয়ই আমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনার দৃষ্টান্ত আজ সর্বত্র পরিবেশিত হোক।

'ভারতবর্ষের আদর্শ আজ মানব-সমাজকে পারস্পরিক হানাহানি থেকে মুক্ত হ'তে যতখানি সাহায্য করতে পারে—এমন আর কিছুতেই নয়।'

টয়েনবীর কণ্ঠে বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা ভারত আবার দিগ্বিজয় করবে। সেই দিগ্বিজয়ের ভূমিকায় ভারতবর্ষের অবতীর্ণ হওয়ার দিন কি এখনও আসেনি? মত ও পথের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করার মধ্যেই কি পৃথিবীর শান্তির ও মানুষের মুক্তির পথ প্রসারিত নয়?

ধূপগন্ধ

'অনিরুদ্ধ'

ধূপের গন্ধ মন্দির-গৃহ ছায়,
দেবতার স্মৃতি চিত্তে বহিয়া আনে—'
স্নিগ্ধ ভকতি উছলি উঠিতে চায়,
ইন্দ্রিয় ধায় ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে।

ধূপের সুবাস খুলি দেয় রূপ দ্বার,
রূপ গিয়া মিশে অরূপ-বিভব মাঝে;
ভাষা নাই সেই মহিমা বর্ণিবার—
যে মহিমা শুধু আপন সত্যে রাজে।

ধূপের গন্ধে শুনি অনাহত ধ্বনি,
গুঞ্জরি তাহা দশ দিকে তোলে গান;
নিখিল ভুবন আনন্দরূপে গনি,
সে পরম রসে মাতিছে গভীর প্রাণ।

ধূপ-সৌরভে তাঁহারি স্পর্শ পাই—
অন্তর হ'তে অন্তরতম যিনি,
সকল কামনা তাঁরে নিবেদিতে চাই—
শুভ্র শান্ত পূর্ণ স্বরূপে চিনি।

ধূপের গন্ধে নিজেরে মিশায়ে দিয়া
নীরবে একাকী চলি দেবতার পানে,
যত অনুভূতি যতেক প্রকাশ নিয়া
অখিল চেতনা স্তব্ধ নিগূঢ় ধ্যানে।

মধ্যভারত-পরিক্রমা

[গোয়ালিয়র—খাজুরাহো—চিত্রকুট—]

শ্রীঅমরনাথ বসাক

ভ্রমণের নেশা আমার চিরদিনের। সময় সুবিধা পেলেই যাযাবরের মত বেরিয়ে পড়ি। বেশ কিছুদিন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে আসি অভ্যস্ত পরিবেশের পিঞ্জরে। সে-বার ছুটিতে মধ্যভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখব মনে ক'রে একখানা টুরিস্ট গাইড (Tourists' guide) নিয়ে বসে গেলাম দুই বন্ধুতে।

প্রধান প্রধান স্থানগুলির তালিকা তৈরী ক'রে মানচিত্রে সেগুলির অবস্থান দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে গোয়ালিয়র থেকে যাত্রা শুরু ক'রে খাজুরাহো, চিত্রকুট, অমরকণ্টক, জব্বলপুর ওঁকারেশ্বর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, সাঁচী হ'য়ে কানপুরে ভ্রমণ শেষ করলেই সুবিধা হয়, এবং বেশ একটা পরিক্রমার মতও হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ আস্তানায় আশ্রয় নেওয়া হবে, কদিন কোথায় কাটানো হবে, তার পর অর্থ ও সময়-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান ক'রে ভ্রমণের একটা সূচীপত্র ছকে নেওয়া হ'ল।

অবশেষে আগ্রা হ'য়ে গোয়ালিয়রের পথ ধরেই যাত্রা সুরু করার সিদ্ধান্ত ক'রে দুই বন্ধুতে 'জনতা এক্সপ্রেসে'র জনতায় মিশে গেলাম—১৫ই অক্টোবর।

১৭ই ভোর ৪ টায় টুণ্ডলা ওয়েটিং রুমে বসে আছি। আগ্রার ট্রেনের বিলম্ব আছে। কিছুক্ষণ বাদে কুলি এসে জানালো—দেড় ঘণ্টা বাদে আগ্রা অভিমুখে একটি বাস ছাড়বে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি সুন্দর একখানা আগ্রা-গামী বাস অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র চাপিয়ে বাসের সম্মুখদিকের দুটি আসন দখল ক'রে বসে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসটি যাত্রীতে ভরে গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্নাস্নাত 'তাজ' দেখার জন্যই আজ আগ্রাযাত্রীর ভিড়। যাই হোক আগ্রায় পৌছে 'বেঙ্গলী লজে' মালপত্র রেখে, তাজমহল ফোর্ট প্রভৃতি দেখতে বেরুলাম। আগ্রা পূর্বেও এসেছি, কাজেই এ-দুটি দেখা ছিল। দ্বিতীয়বার দেখার সময় প্রথমবারের সে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকে না। সেজন্য পুরানো পড়ার মতো কেবল একবার চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। তাজ-দর্শন-পিয়াসী জনতা চলেছে, পুরুষ নারী চলেছে, চলেছে কৌতূহলী ছেলের দল—মহা উল্লাসে ক্যামেরা নিয়ে।

'তাজ' দেখে ফোর্টে যাবার পথে একটি গাইড জুটে গেল। নানা আখ্যায়িকার অবতারণা ক'রে সে বিগত দিনের স্মৃতি উদ্‌গীরণ করতে থাকে। মোগল বাদশার সভাস্থল, বিচার-স্থান, বেগমদের স্নানের জায়গা,—শীতল ও উষ্ণ জলের অভিনব ব্যবস্থা—কোন কিছুই সে বাদ রাখে না। ইতিহাসের পাতায় যে সব খবর পৌছয় না, গাইডদের মুখে তাও শোনা যায়; জানি না, কোন্ সূত্রে তারা এ-সব জেনেছে। বন্দী শাজাহান যে স্থান থেকে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন, যে স্থান গাইড যত্নের সঙ্গেই দেখায়।

ফোর্ট দেখা শেষ ক'রে আমাদের ডেরায় ফিরে আসি। মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রামের পর সন্ধ্যার ট্রেনেই গোয়ালিয়র রওনা হই।

গোয়ালিয়র পৌঁছে স্টেশনের কাছেই অবস্থিত 'অশোক হোটেলে' আশ্রয় পাই। পরদিন সকালে ফোর্ট দেখতে বেরুলাম একটি টাঙ্গা ক'রে, পথে মহম্মদ ঘাউস ও তানসেনের সমাধিস্থানে নামলাম। প্রায় একশতফিট বর্গ পরিমিত স্থান জুড়ে স্মৃতি-মস্‌জিদ, সমাধিস্থানের উভয় পার্শ্বে দালান। প্রস্তরের দেওয়ালে ঝিলিমিলির মধ্য দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ ক'রে মস্‌জিদের অভ্যন্তর আলোকিত করে। এই সুবৃহৎ স্মৃতি-সৌধের পাশেই নজরে পড়ে তানসেনের ছোট্ট সমাধি-স্থানটি। কথিত আছে, এর পাশেই একটি তেঁতুল গাছ ছিল, তার পাতা চিবুলে নাকি গলার স্বর মিষ্টি হ'ত। বলা বাহুল্য, এ গাছটির আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই,—পাতার সঙ্গে ডালপালা শিকড়ও গেছে।

অল্প কিছু দূরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র ফোর্ট। উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুর্গটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। দুর্গের সামনে গাড়ী থেকে নেবে দেখি, খাড়া পাহাড় উঠেছে, উপরে সুবিস্তৃত ফোর্টের এলাকা। ওঠবার রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে। শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য পাঁচ পাঁচটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বারগুলি যে কত সুদৃঢ় ক'রে তৈরী করা হয়েছিল, না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। বিশেষ ক'রে মানসিংহের নির্মিত হাতী-ফটকের বৃহৎ ও উচ্চ এবং কারুকার্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভগুলি দেখলে মনে যুগপৎ কৌতূহল ও বিস্ময় জাগে—কেমন ক'রে ঐ বিরাট স্তম্ভযুক্ত প্রবেশদ্বার নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

দুর্গের ভেতর মানসিংহের প্রাসাদ একটি দর্শনীয় বস্তু। নাববার সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদের বেশ নীচে আসা যায়। এখানে রাজা ও মহিষীদের বিশ্রামের স্থান। গ্রীষ্ম অপনোদনের সুন্দর ব্যবস্থা। উপরের অলিন্দপথ দিয়ে নেমে আসা শীতল বায়ুর স্পর্শ শরীর জুড়িয়ে দেয়। এই সব অভ্যন্তর প্রদেশে আলোকপাতের ব্যবস্থাও মনোরম। এমনভাবে ফোকরগুলি নির্মিত যে সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

মধ্যে হোমকুণ্ডের মত একটি স্থান নজরে পড়ে। গাইড বলে যে এই স্থানটি রঙী- জলে পূর্ণ করা হ'ত। যুদ্ধ-যাত্রার সময় রাজ এই জলে স্নান করতেন। এর চারিদিকে মানসিংহের আট রানীর ঝুলন। রা[illegible] মধ্যস্থলে থাকতেন, তার চারিপাশ হ'তে রানীদের দোলন স্পর্শ লাগত। গাইড আ[illegible] একটি স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেখা[illegible] রাজার পরাজয়ের সংবাদে রানীগণ জহর ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে নিজেদের সম্মান অক্ষু[illegible] রাখতেন। একটি তালাবদ্ধ ঘর নজরে পড়ে এটিতে নাকি পুস্তকাগার ছিল।

মানসিংহের আর একটি কীর্তি 'গুজরি মহল'। মৃগনয়না-নাম্নী গুজরবংশীয় রমণীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তারই মনোরঞ্জনের জন্য এ[illegible] প্রস্তর নির্মিত মহল তিনি তৈরী করান। এ[illegible] দ্বিতল মহলটির দেওয়ালে রঙীন টালি বসানো আছে, তাতে নানা রকমের প্রাচীন প্রতিকৃতি বর্তমান। দরজার খিলানে নিখুঁত কারুক[illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদের মধ্যে দালান আর চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠ। এই প্রাসাদের মধ্যে মধ্যভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্য কলা[illegible] নিদর্শন স্বরূপ বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, পাথরের মূর্তি প্রভৃতি একটি যাদুঘরে (muscum) রক্ষিত আছে।

মানসিংহের এই দুটি স্মরণীয় প্রাসাদ ছাড়া ফোর্টের মধ্যে আরও কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু রয়েছে। অনতিদূরে দুটি বিষ্ণু মন্দির, এর

পর 'তেলি' মন্দির দক্ষিণ ভারতের রীতিতে নির্মিত, উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিটেরও বেশী হবে। আরও অগ্রসর হ'লে সূর্যকুণ্ড। জৈনসম্প্রদায়ের কয়েকটি অতি বৃহৎ দিগম্বর মহাবীরের মূর্ত্তিও দুর্গের প্রাচীরগাত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের কাজ—দেখলে মনে হয় সচল, সজীব মূর্ত্তি। বিশেষ ক'রে আদিনাথের ৫৭ ফিট উঁচু দণ্ডায়মান পাথরের মূর্ত্তিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কেল্লাটি দেখা হলে, গোয়ালিয়রে আর বিশেষ কিছু দেখবার থাকে না। ঝান্সী-রাণীর সমাধি-স্মৃতিটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। গোয়ালিয়রের রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, তবে বড় জন-বিরল,—কলিকাতাবাসী আমাদের চোখে।

এর পর 'হরপালপুর' স্টেশনে নেমে খাজুরাহোর বাস ধরি। মাত্র ৬৩ মাইল পথ, কিন্তু পৌঁছতে সময় নেয় অনেক, মধ্যে 'ছতরপুর' নামক স্থানে বাসটি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। খাজুরাহোতে পূর্ব হতেই সার্কিট হাউসে আমাদের জন্য ঘর সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা ছিল। এখানে সব কিছুরই সুবন্দোবস্ত। তবে পরিচারক 'ছোটন' অতিথির সুখ-সুবিধার জন্য সব সময় তৎপর। 'ছোটন' বলে ডাক দিলেই হ'ল, নিমেষে এসে দাঁড়ায়—হুকুম তামিল করে। রাত্রে অতি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পর সুকোমল শয্যায় আশ্রয় নেবামাত্র চোখে নেমে এল গভীর সুষুপ্তি।

পরদিন দুইবন্ধু ক্যামেরা নিয়ে বেরুলাম প্রাচীন চণ্ডেলা বংশের নৃপতিদের রাজত্বকালে নির্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখতে। প্রত্যেক মন্দিরই বেশ উঁচু পোতার উপর স্থাপিত। নির্মাণ-কার্যে কেবলমাত্র বেলে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। অতি নিপুণভাবে বিরাট বিরাট পাথরে গড়া এই মন্দিরগুলি তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করে। মন্দিরের চূড়াগুলি খুব উঁচু ও গম্বুজাকৃতি—বহুদূর থেকে দেখা যায়। মন্দিরগুলি অল্পবিস্তর প্রায় সবগুলি একই ধরনের; সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত চাতাল, মধ্যে মন্দির,—যাতে মন্দিরের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করা যায়। মন্দিরের সামনে চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট খিলান, কারুকার্য-সমন্বিত চন্দ্রাতপের ন্যায় আস্তরণ। আরও অভ্যন্তরে নয়নাভিরাম দেবতার বিগ্রহ। খাজুরাহোর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে যে এখানে শিল্পী সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে পাশাপাশি শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ ক'রে গেছে। মাতঙ্গেশ্বরের শিবমন্দিরের বিরাট শিবলিঙ্গ দর্শন ক'রে পাশেই অবস্থিত লক্ষ্মণজীর মন্দিরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় শিল্পীর ভেদাভেদ চিন্তার সময় ছিল না। মন্দিরের প্রতিটি অংশে ফুটে উঠেছে ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক চরিত্রগুলি সজীব বলে মনে হয়। শিল্পীর বহুপ্রসারী মন মর্ত্ত্যের সৌন্দর্যও অতি সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই সব মন্দিরগুলির কিছু দূরেই অবস্থিত চতুর্ভুজের মন্দির, যেতে হয় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, পাকা রাস্তা এখনও হয়নি। পায়ে চলা পথ কুলবনের মধ্য দিয়ে, ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে। অপূর্ব এর পরিবেশ! দিক্‌চক্রবালের চারিদিকে ঘেরা পাহাড়, দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট গাঁ, মাঝে লতা গুল্ম শোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমস্ত মিলে একটি সুন্দর আলেখ্য। প্রকৃতির পটভূমিকায় বিখ্যাত এই বিষ্ণুমন্দির স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের বিগ্রহ যে এত সজীব, এত স্নিগ্ধ কোমল হ'তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিগ্রহের আয়ত নয়নে যেন শতধা ঝরে পড়ছে অসীম মাধুরী। এ মন্দিরে পূজারী নেই, প্রকৃতিই পূজারিণী। নীরব উপাসনা সতত চলেছে শিশিরে, ফুলসম্ভারে। নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশে বহির্মুখী মন স্বতই গুটিয়ে আসে। ক্ষণেকের জন্য মনের চাঞ্চল্য থেমে যায়। মনে হয় এ দেবতা সহজলভ্য নয়। সাধারণ টুরিষ্টরা

কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে আসে না। কিন্তু যে আসে, সে ধন্য হ'য়ে ফিরে যায়—মনের মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ নিয়ে।

সম্পূর্ণ অন্যদিকে রয়েছে জৈন মন্দিরগুলি। মন্দিরের আকৃতি ও গঠননৈপুণ্য একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে মন্দিরের ভেতর মহাবীরের ছোট বিগ্রহ। শান্তিনাথের বিরাট মর্মর মূর্তি দর্শনে শিল্পীর নিপুণ হস্তের প্রশংসা করতে হয়। আদিনাথ ও পরেশনাথের মূর্তিদুটিও অনুরূপ নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খাজুরাহের মন্দির গুলির মধ্যে কয়েকটির শেষ অবস্থা। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আজ আর নেই, রয়েছে যোগিনীর কয়েকটি মূর্তি মাত্র। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু কিছু এমন জিনিস পাওয়া গেছে, যেগুলি সযত্নে রক্ষা করা দরকার। এরূপ বহু ভগ্ন মূর্তি বা মন্দিরের দেওয়ালের অংশ-বিশেষ রক্ষিত আছে একটি মিউজিয়ামে।

বিকালের বাসে খাজুরাহো থেকে ফেরার পালা। যতদূর চোখ যায়, সোজা রাস্তা—দুপাশে ঘন জঙ্গল, রাস্তার পাশে মহুয়ার সারি। বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে দৈত্যের মত ছুটে চলেছে। ধীরে ধীরে নেমে আসে রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকার, তারই মধ্যে হেড্‌লাইটের তীব্র আলো দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে চলতে থাকে আমাদের বাস। অবশেষে সন্ধ্যার পর হরপালপুরে ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চিত্রকূট রওনা হলাম।

চিত্রকূটে ভাল আস্তানাই পাওয়া গেল। এই সেই চিত্রকূট, শ্রীরামচন্দ্র ও জনকনন্দিনীর ব্যথাবেদনাময়, আবার তাঁদের নিরন্তর মিলনের পুণ্য স্মৃতিতে যার প্রতিটি ধূলিকণা ধন্য হ'য়ে আছে। এই সেই চিত্রকূট—যার মাহাত্ম্য অমর হ'য়ে আছে বাল্মীকির মহাকাব্যে, তুলসীদাসের 'মানস'-ঝঙ্কারে!

প্রথমে পূতসলিলা মন্দাকিনীতে স্নান ক'রে মন্দির দর্শন করতে বেরুলাম। বহু দেবদেবীর মন্দির রয়েছে এই পবিত্র ভূমিতে। বিশেষ ক'রে 'ভরতমিলনের' মন্দির শ্রীরামচন্দ্র ও ভরতের মিলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মত্তগজেন্দ্রেশ্বর, রাঘবজীব মন্দির, ব্রহ্মযজ্ঞবেদী, তুলসীদাসের মন্দির প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য মন্দির রয়েছে মন্দাকিনীর ধারে ধারে। তীর্থ পরিক্রমার চার মাইল পথ একটি পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ভক্ত জনগণ শ্রদ্ধানত হ'য়ে এই রাস্তা পরিক্রমা করে। লোকে বলে, এই সেই পাহাড় যেখানে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের প্রথম অবস্থায় ছিলেন। যুক্তির জাল না বুনে, ভক্তি-মদিরায় মাতোয়ারা হ'য়ে চলে ভক্তের দল শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত ক'রে।

চোখে পড়ে 'জানকীকুণ্ড'—মন্দাকিনীর এই স্থানেই জানকীদেবী স্নান করতেন। পাথরের ওপর একটি শ্রীচরণের প্রতিকৃতি অদ্যাপি ভক্তিভরে পূজিত হয়। আর ঐ দেখা যায় 'রাঘব প্রয়াগ'—মন্দাকিনী ও পয়স্বিনী নদীর সঙ্গমস্থান, শ্রীরামচন্দ্র এইখানেই স্বর্গত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেছিলেন। তুলসীদাসের স্বহস্তরোপিত পিপুলবৃক্ষটিকে নত মস্তকে প্রণাম ক'রে চলে যাত্রীর দল।

ভক্তির জয় এখানে, সরল বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে যুক্তিতর্কের জাল ছিন্ন ভিন্ন। 'হনুমান-ধারা' পুণ্যার্থীদের আর একটি দর্শনীয় স্থান: প্রায় তিনশত সিঁড়ি ভেঙে খাড়া পাহাড়ে উঠতে হয়। উপরে হনুমানের শয়ান মূর্তি, চোখ দুটিতে যেন জীবন্ত দ্যুতি খেলছে। শিয়রে ঝরে পড়ছে একটি ঝরনার জল। অতি পবিত্র ও সুস্বাদু এই বারিধারা। আরও ওপরে একটি গহ্বর—সীতার স্মৃতিতে মধুর ও মহান্ হ'য়ে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

পরশুরাম ঃ রাজশেখর বসু

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বাংলা সাময়িকপত্রগুলির শারদীয়-সংখ্যায় তাঁর একটি রচনা-প্রকাশের জন্য সম্পাদকদের চেষ্টার অন্ত থাকত না। আর গত চার-পাঁচ বছর ধরে শারদীয়-সংখ্যার ভূষণরূপে পরশুরামের রচনা-সংগ্রহের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বহু বিচিত্র নয় পরশুরামের রচনা-সম্ভার। সেই 'গড্ডালিকা'র যুগ থেকে তিনি প্রধানতঃ হাস্যরসের স্রষ্টা এবং এই হাস্যরসের সৃষ্টিতেই বাংলার একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তিনি হ'তে পেরেছিলেন, এ কম বিস্ময়ের কথা নয়।

পরশুরামের আসল নাম রাজশেখর বসু—সে নামে তিনি 'চলন্তিকা'র সঙ্কলয়িতা, "লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'চলন্তিকা' প্রভৃতি মননশীল প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক; 'কুটীরশিল্প', 'ভারতের খনিজ' পুস্তিকা দুটিতে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট সহায়ক; রামায়ণ, মহাভারতের সারানুবাদ ও কালিদাসের মেঘদূতের সম্পূর্ণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতের সাহিত্য ও সাধনার যোগ্য উত্তরসাধক, বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ পরিচালক; সমকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকর্মী ও চিন্তানায়ক। কিন্তু এসব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর প্রজ্ঞাগম্ভীর সংযতবাক্ স্থিতধী ব্যক্তিত্ব। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিকদের কাছে রাজশেখর বসু গুরুতুল্য সম্মান পেয়েছিলেন এবং সে সম্মানের কারণ তাঁর বয়সের প্রবীণতা নয়, মননের সিদ্ধি।

কিন্তু বাংলাসাহিত্য ও বাঙালী পাঠক তাঁকে বেশী ক'রে মনে রাখবে তাঁর ছোট গল্পের জন্য। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'—এ তিনখানি গল্পসংগ্রহ পর পর প্রকাশিত হবার পরই পরশুরামের নাম বাংলা সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তাঁর 'গল্পকল্প', 'ধুস্তুরী মায়া', 'কৃষ্ণকলি', 'নীলতারা', 'আনন্দীবাঈ', 'চমৎকুমারী' প্রভৃতি গল্পসংগ্রহ একে একে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি গল্পসংগ্রহের সৃষ্টিসৌন্দর্য পরবর্তী গল্পগুলিতে স্তিমিত হলেও কল্পনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার সংযোগে তাঁর শেষ বয়সের রচনাগুলিও সুসমৃদ্ধ। তাঁর রচনা সংখ্যাবহুল নয় বলেই শারদীয়া সংখ্যা মারফৎ যে দু-চারটি পাওয়া যেত, তাই আমাদের কাছে অনেক বলে মনে হ'ত। আজ সেই মুষ্টি-ভিক্ষাও বন্ধ হ'ল, বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের কাছে এ বেদনা মর্মান্তিক।

রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামটি নিয়েছিলেন পরিবারের স্যাকরা পরশুরামের নাম থেকে। যোগাযোগটি আকস্মিক; তবু যেন পুরোপুরি আকস্মিক নয়। 'পরশুরামের নির্মমতা তাঁর রচনায় নেই, কিন্তু জাতীয় জীবনের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। 'পরশুরাম' নামটি পৌরাণিক সাহিত্য থেকে এসেছে। 'পরশুরামে'র রচনাবলীর পটভূমিতে ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী—বিশেষতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এমন আত্মিক সংযোগ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কারো রচনায় এত গভীরভাবে সাধিত হয়নি। 'রামায়ণ-মহাভারত' চিরায়ত সাহিত্য

(classic literature)[১]—এ দুই মহাগ্রন্থের প্রেরণাস্পর্শে রাজশেখর-তারাশঙ্করও চিরায়ত সাহিত্য-স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। জাতীয় ঐতিহ্যের গভীরে যে প্রাণরস নিহিত আছে, তার দ্বারা পরিপুষ্ট সাহিত্যই চিরন্তনতার অধিকারী। একথা ভেবে দেখবার সময় আধুনিক সাহিত্যিকদের হবে কিনা, জানি না। কিন্তু রাজশেখর ও তারাশঙ্করের রচনাবলীর সার্থকতা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার বিস্তার সম্বন্ধে পাঠকেরা চিরদিন কৌতূহলী। কিন্তু রাজশেখর বসু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন—'জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা, তা ওই রামায়ণ-মহাভারত পুঁথিশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা।'[২] এখানে রাজশেখর নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করেছেন—বাস্তবিক ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও তাঁর দেখার এবং লেখার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি যা দেখেছেন, যেমন ক'রে দেখেছেন—এর আগে আর কেউ তেমন ক'রে দেখেননি। তাঁর সেই দৃষ্টিরহস্য কোথায় ?—একথা চিন্তনীয়। রামায়ণ-মহাভারতের চোখ দিয়ে দেখলে জগৎ সম্বন্ধে কি ধারণা হয়, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

'মানুষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। ···এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সুখদুঃখ, মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনদ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনে অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন :

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥
(স্ত্রীপর্ব—মহাভারত)

—সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।'[৩]

এই নির্লিপ্ত দৃষ্টিই রাজশেখর বা পরশুরামের বৈশিষ্ট্য। জীবনের সুখে দুঃখে অচঞ্চল প্রশান্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের আদর্শ, আর ভালো-মন্দ, সঙ্গত অসঙ্গত, উদ্ভট ও শোভন—সর্বশ্রেণীর মানুষের দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত—এই ছিল তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে তিনি হাস্যরসেরই স্রষ্টা; তবু তাঁর রচনা পড়ে কোন মানুষ বা শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা বা আক্রোশের ভাব কখনো চোখে পড়ে না। মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েই পরশুরাম হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করতেন। তাই তাঁর হাস্যরসের মর্মস্থলে শান্তরসের প্রসন্ন আবির্ভাব পাঠক হৃদয়কে নিরঞ্জন শুভ্রতায় শুচিস্নাত ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।'[৪] সেদিক থেকে পরশুরাম বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

সাহিত্যে চিরন্তনতার উপাদান সৃষ্টির কারণ সাহিত্যিকের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য, বিষয়বস্তুর

১ মহাভারত (সারানুবাদ) : রাজশেখর বসু (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২ কথাসাহিত্য, শ্রাবণ (১৩৬০) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ—'শ্রীরাজশেখর বসু'।

৩ মহাভারত (সারানুবাদ) : রাজশেখর বসু (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৪ আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ('বঙ্কিমচন্দ্র দ্রষ্টব্য)।

মহিমা নয়। পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রগুলি সিদ্ধরস ; কিন্তু সমসাময়িক জীবন ও জগৎ থেকেও যে সিদ্ধরসের উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে সেকথা প্রমাণিত হয় আধুনিক শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের রচনায়। পরশুরামের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া, কেদার চাটুজ্জে,[৫] রায়বাহাদুর বংশলোচন, ভূশণ্ডীর মাঠের শিব ভট্টাচার্য, নাদু মল্লিক, কারিয়া পিরেত, জিগীষা দেবী, শিহরণ সেন, হোদল দে, লালিমা পাল (পুং), বিরিঞ্চিবাবা, উদ্ধব বকসী, রটন্তীকুমার প্রভৃতি অজস্র চরিত্র এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদিনের পরিচিতমণ্ডলী থেকেই সাহিত্যের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ।

ঘটনাসংযোগ ও সংলাপবৈচিত্র্য—এ দুয়ের ক্ষেত্রেই পরশুরামের নৈপুণ্য অসাধারণ। তাঁর পাত্রপাত্রীদের সংলাপ থেকে অনেক অংশই বাংলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। 'হয়, জানতি পার না'[৬], 'যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলস হয়েছে',[৭] 'হাড় ডি পিলপিলায়া গয়া'[৮], 'মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে',[৯] 'মাই গড',[১০] 'আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি',[১১] 'সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী'[১২]—এমনি অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে, সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ কৃতিত্ব। সেই সঙ্গে অসামান্য তাঁর বর্ণনাশক্তি। ব্যক্তিবর্ণনায় এ দক্ষতা তো মুগ্ধ করেই, প্রকৃতি-বর্ণনার ক্ষেত্রেও এর নতনত্ব চমক লাগায়। যেমন ধরুন, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের' শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী—'শ্যামবাবু বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই......ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করেন।...শ্যামবাবু তাঁহার অফিসঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ব ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা ওরে বাঞ্ছা';......বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার-স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়।' এই 'অটো দুর্গাগ্রাফে'র আবিষ্কর্তা শ্যামবাবুর শ্যালক শ্রী—বি.এস.সি. ; কোম্পানীর নামটিও লক্ষণীয়—"ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার ইন ল"।

'লম্বকর্ণ' থেকে একটি ঝড়ের বর্ণনা : 'ক্রম্ দুন্দুড় দুড়্ দড়দড় ড়! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসারঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি

[৫] 'কেদারবাবুকে একবার বললুম, মশাই, আপনার নামটি ব্যবহার করছি, আপত্তি নেই ত? ......অবিশ্যি আমার গল্পের কেদার চাটুজ্জের চেহারা বা চরিত্রের সঙ্গে আপনার কোন মিল থাকবে না।' (কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৬০), পৃঃ ৬৪৫।

[৬,৭,৮] চিকিৎসা-সঙ্কট—গড্ডলিকা।

[৯] লম্বকর্ণ—গড্ডলিকা।

[১০] বিরিঞ্চিবাবা—কজ্জলী।

[১১] মহেশের মহাযাত্রা—হনুমানের স্বপ্ন।

[১২] রাতারাতি—হনুমানের স্বপ্ন।

নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন।··· সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।' এই সঙ্গে 'ভূশণ্ডীর মাঠের' বসন্তবর্ণনা এবং 'জাবালির' আশ্রমে হঠাৎ বসন্তের আগমন ও পলায়নের বর্ণনা স্মরণীয়। প্রকৃতিবর্ণনার মাধ্যমে এমন নিগূঢ় হাস্যরসের সঞ্চারের তুলনা মেলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে এ ব্যাপারে পরশুরামই সার্থকতর।

'ভূশণ্ডীর মাঠে' থেকে আর একটি চরিত্র: 'বেলগাছের কাছে যে ইটের পাজা ছিল তাহা হইতে খানিকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া সাদা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয়, সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি।·· শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ।—ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হা?'

মহৎ স্রষ্টার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাঁর সৃষ্টি আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত বন্ধু-স্বজনদের মতই অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠে। রামায়ণ-মহাভারত থেকে পরশুরামের কাল অবধি কল্পনা সৃষ্টি অথচ একান্ত বাস্তব চরিত্র গুলির কথা মনে করলেই এ কথা বুঝতে পারি। পরশুরামের কল্পনা-জগৎ থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা একেবারে আমাদের পাড়ার লোক ও আড্ডার সহচর হ'য়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, তাঁর প্রথম যুগের রচনার চেয়ে শেষ যুগের রচনার চরিত্রগুলি একটু বেশী মুখর। প্রথম দিকের গল্প-রচনায় তিনি মূলতঃ গল্পকার, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় তিনি প্রধানত ভাষ্যকার। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর সৃষ্ট সব চরিত্র ও গল্প প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক সত্তার অস্তিত্ব-মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রায়ই আলোচনা ক'রে থাকেন। রাজশেখর বসুর ভ্রাতা সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু যদি রাজশেখরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব রহস্য হয়তো অনেকটা ধরা দিত। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের চোখেও পরশুরাম ও রাজশেখর বসু—এ দুটি সত্তার পার্থক্য ও পার্থক্যের অন্তরালে সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র ধরা পড়ে। রাজশেখর নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে

প্রথমাবধি বিনীত ও সঙ্কুচিত। এমন কি কিছুদিন আগে তাঁর জন্মদিনে সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধাভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে 'আমি সাহিত্যিক নই।' সাহিত্য-পণ্ডিত বলতে যা বোঝায়, তাঁর রচনা পড়ে সে পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে না; কিন্তু যা মেলে তা আসল সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাই রাজশেখর-সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখেছেন "...আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" রাজশেখর বসুর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শ্রীঅমল হোমকে "ওঁর হাতে কুঠার আছে কি না জানি না, কিন্তু ওঁর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা।" --(দ্রষ্টব্য কথাসাহিত্য : শ্রাবণ, ১৩৬০ পৃঃ ৬৫৩,৬৫৪)

পরশুরাম ও রাজশেখর—এ দুই সত্তার মধ্যে যোগ রয়েছে ওই অন্তরের পাবকশক্তিতে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে রাজশেখর মানুষকে দেখেছেন, জীবনকে অনুভব করেছেন। 'কৃষ্ণকলির ভবতোষ ঠাকুর তাই তাঁর' ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন—"মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। এদেশের জ্ঞানীরা একদেশদর্শী নন। তাঁরা অত্যন্ত realist, মঙ্গল অমঙ্গল দুই শিরোধার্য করেছেন, বিরোধ মেটাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বলেছেন—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। আবার পরেই বলেছেন—"গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্"..... গীতায় বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান করলে মনের ক্ষুদ্রতা কমে।.....'সকলের দুঃখ বোঝাবার চেষ্টা কর, তোমার দুঃখ কমবে। সকলের সুখে সুখী হও, তোমার সুখ বাড়বে।' মনে হয়, এই ছিল পরশুরামেরও জীবনদর্শন। তাঁর 'জাবালি' ও 'দশকরণের বানপ্রস্থ'—গল্প দুটিতে এই জীবনদর্শনের সার্থক প্রকাশ।

সার্থকতা

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবনে আসেনি জোছনা রজনী
তাই কি চোখের জলে
দিবানিশি শত মরম বেদনা
জাগে অন্তর তলে?

ব্যর্থ সাধনা, বিফল জীবন—
প্রতি নিমিষেই ছুঁয়ে যায় মন,
ঘন-আঁধারের বুকে ধীরে ধীরে
যায় যে জীবন চলে।

মিছে অভিমানে ওরে অভিমানী!
করিস নে সংশয়;
কিছুই রে তোর হয়নি বিফল,
হয়নি কো অপচয়।

কত ফুল ফোটে, কত ঝরে যায়;
বিফল কিছু তো হয় না ধরায়—
ফোটা কুসুমের সাথে ঝরা ফুল
যায় তাঁরই পদতলে।

রোল্যাণ্ড জেনেট

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির পত্রে জানিয়া আমরা গভীর বেদনা বোধ করিলাম, সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্মী রোল্যাণ্ড জেনেট (Rolande Genet) দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেদান্তের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি অদ্ভুত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। রোল্যাণ্ডের শরীর যাইবার পর তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা সকলে একবাক্যে বলিতেছেন, 'আমাদের সামনে সে মস্ত একটা আদর্শ দেখাইয়া গেল।' সুদূর আমেরিকায় বেদান্তের সম্পর্কে আসিয়া একজন এরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন—এ সংবাদ এ-দেশের ভক্তদেরও প্রাণে প্রেরণা জোগাইবে, মনে করিয়া 'পাশ্চাত্য শিষ্যে'র মর্মস্পর্শী চিঠিখানির ভাবানুবাদ আমরা প্রকাশিত করিতেছি :

বেদান্তের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি জীবন

রোল্যাণ্ড জেনেট বেদান্তের ছাত্র বা ভক্ত ছিলেন, শুধু এইটুকু বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করা হইবে না; তাঁর জীবন ছিল কর্মে পরিণত বেদান্ত। তাঁর জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল—উপনিষদের আদর্শে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবশিব-বোধে সকলের প্রতি সেবা ও সহানুভূতি।

রোল্যাণ্ড জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৭ খৃঃ ক্যানাডার একটি ফরাসী পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

১৯২৪ খৃঃ আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য তাঁদের পরিবার নিউ ইয়র্কে উঠে আসে, রোল্যাণ্ডকে কিছুদিন নৃত্যশিল্প প্রদর্শন ক'রে অর্থ উপার্জন করতে হয়। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল পড়াশুনায় ও আধ্যাত্মিক চিন্তায়; তিনি ভাবছিলেন, কি ক'রে রোম্যান ক্যাথলিক সংঘে যোগদান করা যায়।

এমন সময় রমাঁ রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থ (Prophets of the New India) তাঁকে দিল নবজীবনের দিগ্‌দর্শন। স্বামী বোধানন্দজী-পরিচালিত নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে এসেই তিনি অনুভব কর-লেন, 'এই আমার নিজের ঘর'। স্বামী বোধানন্দের শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁর জীবন এগিয়ে চলে।

১৯৫০ খৃঃ শেষ অসুখের সময় রোল্যাণ্ড প্রাণপণে গুরুর সেবা করেন। স্বামী বোধানন্দের দেহত্যাগের পর নবাগত স্বামী পবিত্রানন্দজীকে তিনি সমভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল উপাসনা, সোসাইটি ছিল তাঁর মন্দির। নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন; গত নয় বৎসর যাবৎ প্রতিদিন তিনি বিশ্রাম না ক'রে দৈনিক ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ করতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'কাজে আমি আনন্দ পাই।'

যতই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকুন, সহানু-ভূতির সঙ্গে সকলের কথা শোনবার সময় তিনি পেতেন, রোগীদের সেবা করবার সময়েরও অভাব তাঁর হ'ত না। সকলের দোষত্রুটি ঢেকে রেখে তাদের গুণগুলির উপরই তিনি জোর দিতেন।

এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাব ছিল মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত একটি শিশুর মতো। তিনি ছিলেন যেন সকলের ছোট বোনটি।

তাঁর শেষ অসুখের সময় যখন ক্যানসারে শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে—যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ কর-ছেন তিনি, তখনও তাঁর আনন্দের অভাব নেই, প্রীতিরও অভাব নেই। মৃত্যুর তিনদিন আগে বলেছেন, 'আমার খুব সৌভাগ্য!' তার পরদিন বলছেন, 'যদিও বাইরে আমি দুর্বল, ভেতরে আমি একটা শক্তি অনুভব করছি।' এই রোল্যাণ্ড আমা-দের ছেড়ে চলে গেছেন ১৫ই এপ্রিল বিকেলে।

সমালোচনা

Philosophy and Religion : স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬৷৷০।

এই পুস্তকে ১৪টি অধ্যায়ে দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে জটিল তত্ত্বগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আমেরিকাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সেইগুলি এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। ১৫টি বক্তৃতার মধ্যে প্রথম দুইটি নূতন এবং এখনও প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই পুস্তকের মুখবন্ধ এবং বিস্তৃত সূচী সম্পাদন করিয়া পাঠকবর্গের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে বেদান্ত দর্শন, সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, শব্দব্রহ্ম, পাপপুণ্যের মীমাংসা, ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা, মুক্তির দিগ্‌দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলক (Comparative Study) আলোচনা করা হইয়াছে। নানা ধর্ম ও দর্শনের উদ্ধৃতি থাকায় পুস্তকখানির মূল্য বাড়িয়াছে। গ্রন্থকার শুধু দার্শনিক নহেন, সাধক ও মনীষী। অতি সহজ ইংরেজীতে আলোচনা করায় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকও বিশেষ উপকৃত হইবেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনের দিগ্‌দর্শন করায় যাহারা পণ্ডিত, তাঁহারাও বিশেষ লাভবান্ হইবেন। গ্রন্থকারের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি পুস্তকখানিকে মর্যাদামণ্ডিত করিয়াছে।

—মৈথিল্যানন্দ

সংগীত কণিকা—১ম ভাগ ঃ শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক ঃ ব্রহ্মময়ী আশ্রম, আকনা, হুগলী। পৃঃ ৩৮, মূল্য ২৲।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর রাখিয়াছেন। গানের স্বরলিপিতে সুরের আলাপের মতো অংশটুকু যোজনা আরও ভাল হইয়াছে। একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। রাগ নির্বাচনে আর একটু দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, মনে হয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রথমতঃ বেশীর ভাগ শুদ্ধ স্বর-যুক্ত রাগের চর্চা করা দরকার। এ বিষয়ে পণ্ডিত ও ভাতখণ্ডেজীর রাগনির্ণয় আমাদের সাহায্য করিতে পারে, আর একটি জিনিষ জানা দরকার, পুস্তক-রচয়িতা তাঁর পুস্তকে উচ্চাঙ্গ ভক্তিমূলক গান খেয়াল, ঠুংরি, বাউল ও পল্লীগীতি ছাপাইয়াছেন। স্বরলিপি মোটামুটি ভাল। রাগের ও তালের নাম ও পরিচয় পুস্তকটির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

অঞ্জলি ঃ কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসীতানাথ চৌধুরী, ৫।২ মহেশ চৌধুরী লেন হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য টাকা ২'২৫।

লেখক ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁহাদের জীবনীতে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমাদের সঙ্গীতধারাকে ঠিক কিভাবে চালিত করা দরকার, তাহা বিশেষ করিয়া স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নিজের নিজের সমালোচনা নিজেই করতে পারি। লেখকের প্রচেষ্টা শুভ, গানের সুরগুলি বর্তমান যুগের মিশ্রণধর্মী ও গতানুগতিক। শুদ্ধরাগের প্রতি লেখকের আরও অনুরাগ থাকা উচিত ছিল।

—'ষড়জ সন্ধানী'

ত্রয়ী—তৃতীয় সংখ্যা (১৯৫৯), বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (L.C.E.) বিভাগের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের পত্রিকা 'ত্রয়ী'র তৃতীয় সংখ্যাটি পেয়ে আমরা এই দেখে আনন্দিত যে, যন্ত্রশিল্প লেখার শিল্পকে ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না ক'রে নতুন নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে সমৃদ্ধ করছে। অবশ্য সব লেখাই যে যন্ত্রশিল্প নিয়ে তা নয়। জীবনের সবটুকুই তো যন্ত্র নয়—জীবন-শিল্প যে আরও ব্যাপক এবং কিছুকেই বাদ দিয়ে নয়, ত্রয়ীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই কথাই মনে হয় বার বার।

বাংলায় ২২টি (৫০ পৃষ্ঠা) এবং ইংরেজীতে ২০টি (৫০ পৃষ্ঠা) বিষয়সম্ভারে এবারের ত্রয়ী সমৃদ্ধ। এরই মধ্যে আছে সম্পাদকীয়, আমাদের কথা, গল্প, কবিতা; ইংরেজী অংশে পরীক্ষার ফল (Results) এবং বিভিন্ন বিভাগের সচিত্র বার্ষিক বিবরণ (Annual report) ছাত্রদের বহুমুখী সাফল্যের ইঙ্গিত দেয়। টেকনিক্যাল বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যালয়-পত্রিকাঃ বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় শিক্ষাবিভাগে বিভিন্ন স্তরে তিনটি বিদ্যালয় আছে—নিম্ন বুনিয়াদী, প্রাথমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক। প্রত্যেকটি হইতে এবার এক একখানি বার্ষিক পত্রিকা পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দুটি বিদ্যালয়ের পত্রিকার নাম (১) কচি ও (২) মুকুল। তৃতীয়টির বিশেষ নামকরণ এখনও হয় নাই।

পত্রিকাগুলির বিষয়-নির্বাচন, মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রকাশকদের সুরুচির পরিচায়ক। 'কচি'তে আছে ছোট বড়দের লেখা মোট ৩১টি প্রবন্ধ, 'মুকুলে' ৪০টি। উচ্চতর বিদ্যালয় পত্রিকায় ৩৫টির মধ্যে ৫টি ইংরেজীতে। গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী ছাড়া দু-একটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পত্রিকা-গুলির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

নির্বাচিত প্রবন্ধ (আর. ডব্লু. এমার্সন): অনুবাদক—অজিত চক্রবর্তী। প্রকাশক—গ্রন্থম্। পৃষ্ঠা ২৬৭, মূল্য টা. ১৫০।

আমেরিকার মহামনীষী রালফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন—পারিভাষিক বিচারে দার্শনিক নন, কারণ তিনি কোন বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ক'রে যাননি, তবে তাঁর গভীর জ্ঞান-দৃষ্টি নিয়ে কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় তিনি লিখে গেছেন সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায়। তাঁর সংগ্রাম ছিল কপটতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। 'কংকর্ড' থেকে প্রকাশিত তাঁর বিরাট গ্রন্থাবলী শুধু আমেরিকারই গৌরব নয়, মানবজাতির গৌরব। চিন্তার জগতে তিনি দেশকাল অতি-ক্রম করেছিলেন, তাই তিনি সর্বকালের—সর্ব-দেশের। সব দেশের মানুষই চাইবে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। মূল গ্রন্থ যাঁরা পড়তে পারবেন না, তাঁদের অবশ্যই অনুবাদের আশ্রয় নিতে হবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী পড়বার সময় সকলের হয় না, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' তাঁদেরই জন্য। বর্তমান গ্রন্থে যে ন'টি প্রবন্ধ বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে এমার্সনের আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিক একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। অনুবাদ ভাল হয়েছে—একথা বলতে পারলাম না। শব্দচয়নও সর্বত্র সার্থক হয়েছে—তাও বলা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিদ্যামন্দির—ডিগ্রি কলেজে উন্নয়ন

বেলুড়ঃ—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি আবাসিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, প্রতিবৎসর গড়পড়তা ২০০ জন ছাত্র এই এই শিক্ষায়তনে পড়ে। বিগত ২০ বৎসর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি এই শিক্ষায়তনের সম্প্রসারণ আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ায় মিশন-কর্তৃপক্ষ আগামী জুলাই মাস হইতে ইহাকে একটি তিন বৎসরের ডিগ্রিকলেজে রূপান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এবং আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রের জীবনে আদর্শ শিক্ষা যাহাতে সহজ লভ্য হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্তৃপক্ষ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দীর্ঘদিনের আযাসলব্ধ বিদ্যামন্দিরের উন্নততর শিক্ষামান এবং জীবনধারার গৌরবময় ঐতিহ্য যাহাতে রূপান্তরিত অবস্থায় বজায় থাকে, তাহার জন্য ইহার আবাসিক রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে অধিকসংখ্যক ছাত্রের জন্য নূতন আবাসভবন, ল্যাবোরেটরি, এবং অধ্যাপক ও কর্মীদের জন্য স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

সমস্ত পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে মোট ৩৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মিশন-কর্তৃপক্ষ জমি, গৃহাদি এবং সাজ সরঞ্জাম বাবদ ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সরকারও এই বিষয়ে যথেষ্ট অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্যকর করিতে আরও কয়েক লক্ষ টাকার ঘাটতি পড়িবে। জনসাধারণের উদার সাহায্যই ইহা পূর্ণ করিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক (পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া) আবেদন করিতেছেন। যে কোন প্রকার সাহায্যই ধন্যবাদের সহিত সাদরে গৃহীত হইবে।

কার্যবিবরণী

বিশাখাপত্তনম্ঃ বঙ্গোপসাগরের মনোরম উপকূলে ১৯৩৮ খৃঃ এই আশ্রমটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমে নিত্যপূজা, একাদশীতে রামনাম এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠ হয়। সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৮৮১, পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং ১৩টি সাময়িকী পত্রিকা রাখা হয়। আশ্রম-পরিচালিত মধ্য বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৯২টি ছাত্র ও ৩০টি ছাত্রী পড়ে। অল্পবয়স্ক ছাত্রদের খেলাধূলার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে তাহাদের জন্য বহু সচিত্র পুস্তক রাখা হয়। শ্রুতিচাক্ষুষী (audio-visual) শিক্ষার প্রতি এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রদিগকে সরল সংস্কৃতে পাঠ দেওয়া হয়।

ম্যাঙ্গালোরঃ ১৯৪৭খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ কেন্দ্রটি ১৯৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। এখানে দৈনিক নিয়মিত পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা

আছে। আলোচ্য বর্ষে বাল্মীকি-রামায়ণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিয়মিত আলোচিত হইয়াছিল। আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগারে পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কন্নাড় ভাষায় কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিষ্ণু-সহস্রনাম উল্লেখযোগ্য।

উৎসব-সংবাদ

রাঁচি : গত ২৮শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিশেষ পূজা, ভজন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে আহূত এক সভায় আদিবাসীদের অন্যতম নেতা শ্রীরামনারায়ণ খালখো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভান্তে ৩৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তনের পর উৎসব শেষ হয়।

ফরিদপুর : গত ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়; অবশেষে সমাগত দশ সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

করিমগঞ্জ : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিষ্ঠা ও সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে শ্রীধর্মদাস দত্ত এডভোকেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় স্বামী সৌম্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের আদর্শ আলোচনা করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমতের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হইতে আবেদন জানান।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা বেজবরুয়া শ্রীসারদাদেবীর জীবনাদর্শের উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করেন ও বর্তমান যুগে নারীসমাজকে শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। স্বামী প্রণবাত্মানন্দও এক সারগর্ভ ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

তারপর ছায়াচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার নরনারী যোগদান করেন।

বরিশাল : গত ২০শে চৈত্র, বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে শান্ত পরিবেশে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার তিন দিনই শত শত ভক্ত নর-নারী প্রতিমা দর্শন ও উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মহাষ্টমীর দিন স্থানীয় বিবেকানন্দ ব্যায়াম সঙ্ঘের ব্যায়াম প্রদর্শন সকলকে মুগ্ধ করে। মহানবমীর দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ রামনামসংকীর্তন করে। প্রায় হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) : বহরমপুর শহরে গত ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ধর্মসভাতে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে—শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল, এম. এল. সি. শ্রীদ্বিজোত্তম চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅপূর্বকুমার মৈত্র। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভার পরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথকতা, খাগড়া-নিবাসী শ্রীসুবোধকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের 'রামকৃষ্ণায়ণ গীতি' এবং কীর্তন-রসসাগর শ্রীনন্দকিশোর দাস মহাশয়ের কীর্তন সমবেত জনসাধারণকে আনন্দ দান করে।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল। বহু নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সরিষা (২৪ পরগণা) গত ২৪শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় স্বামী বেদান্তানন্দ ও স্বামী রঘুবীরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেন। কলিকাতা ও বেলুড় হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগমে পল্লীর আশ্রমটি আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে।

বক্তৃতা সফর : স্বামী যুক্তানন্দ

তারিখ	স্থান	বিষয়
ফেব ১২	কয়লাঘাট	স্বামী বিবেকানন্দ
মার্চ ৮.	'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চ	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৮-২০	আলিপুরদুয়ার	—শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও মা
২২	আঁটপুর (বিদ্যালয়)	
২৬.	শিল্কি	স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম
২৭.		শ্রীরামকৃষ্ণ ও সেবাধর্ম
২৮.		শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা
এপ্রিল ১.	ভাটপাড়া	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন
৩.	ভাঙ্গামোড়া (হুগলী)	"
১৮.	বিষ্ণুপুর	"
২৪.	বলরামপুর	"

বক্তৃতা-সফর : স্বামী প্রণবাত্মানন্দ

গত জানুআরি হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসামের শিলং, হোজাই, করিমগঞ্জ, পাণ্ডু, ধুবড়ী, গৌরীপুর এবং বাংলার আলিপুর দুয়ার জংশন, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, তমলুক, নাটশাল ও মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে 'যুগ প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা দেবী', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও আচার্য বিবেকানন্দ', ও 'ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৩টি ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত।

ইংলণ্ডে বেদান্ত-কেন্দ্রের কার্যধারা

লণ্ডন : ৬৮ ডিউক্স এভিনিউ, মাস্ওয়েল হিল, (London, N. 10) অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দের পরিচালনায় প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ৫ ঘটিকায় উপনিষদ্ আলোচনার পর ধ্যান ধারণার একটি পবিবেশ রচিত হয়। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥০ টায় সহায়কস্বামী মুখ্যানন্দ শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' ব্যাখ্যা করেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥০ টায় কিংস্ওয়ে হলে প্রার্থনা ও ধ্যান চিন্তার পর বক্তৃতাকারে বেদান্তের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। দুএকটি বিষয় যথা : জ্ঞানের সহজ ও কঠিন পথ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ, আলোচনার পর প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্দেহ দূর করা হয়। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে স্বামী ঘনানন্দ ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাধ্যমেও প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে সাহায্য করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ : আমরা গভীর দুঃখের সহিত স্বনামধন্য পণ্ডিত ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হরিদ্বার গুরুকুলে তর্কতীর্থ মহাশয়ের অধ্যাপক জীবন শুরু হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পর কিছুকাল তিনি গবেষণা-অধ্যাপকের কাজও করেন। সংস্কৃত-বিদ্যার উন্নতিকল্পেই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। প্রাচ্যবাণী মন্দির ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি-রূপে তিনি ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পণ্ডিত—কেহ তাঁহার ছাত্র, কেহ বা গবেষণার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন সাধুও তাঁহার নিকট ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান : প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, ভারতের দর্শন-সমন্বয়, অদ্বৈতসিদ্ধি। এই পরম পণ্ডিতের দেহত্যাগে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা অপরিপূরণীয়। আমরা তাঁহার দেহমুক্ত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ভক্ত অন্নদারচণ সেনগুপ্ত : গত ২৩শে ফেব্রুআরি (১৯৬০) শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত ৭৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার ভট্টপ্রতাপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডাকঘরের সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। অন্নদা বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অনেকের সংস্পর্শেই আসিয়াছিলেন। সময় পাইলেই মিশনের বিভিন্নকেন্দ্রের সেবাকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার আত্মা চির-শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

মৃৎশিল্পী নিতাইচন্দ্র পাল : আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি কুমারটুলীর খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করিয়াছেন। উদ্বোধনের সহিত তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন, পূজাসংখ্যায় তাঁহার নির্মিত শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রতিকৃতি একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

শোভাবাজার (কলিকাতা) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রিল ১এ অমৃতলাল বসু ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সারাদিন পূজা, হোম, ভজন, কীর্তন, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, সাধু-সেবা, প্রসাদবিতরণ, হয়। অপরাহ্ণে স্বামী সাধনানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনবেদ আলোচনা করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর) **:** গত ২৪শে এপ্রিল বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনমঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়, এই উপলক্ষে প্রভাতে উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা এবং পূর্বাহ্ণে বেদ উপনিষদ্‌ গীতাপাঠ ও বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ এবং পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিভিন্ন দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গীত সহ কথকতা বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বাঁকাটি (মেদিনীপুর): গত ৬ই চৈত্র রবিবার বাঁকাটি গ্রামে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মস্থান জয়রামবাটী মাতৃ-মন্দিরের নিকটবর্তী এই গ্রামখানি মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই তিন জেলার অন্তর্গত পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসিগণের সমবেত চেষ্টা ও আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব এখানে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ও অন্যান্য সাধুগণ এই উৎসবে যোগদান করায় গ্রামবাসিগণ বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করেন। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতিসহ ভজন-গান সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পরে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। প্রায় ২০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

বাবুগঞ্জ (হুগলী): ২৬শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি হুগলী জেলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী অক্ষজানন্দ এবং শ্রীহরিপদ ভারতী। চণ্ডীপাঠ, পূজা, আরাত্রিক, ভজন, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের প্রাত্যহিক অঙ্গ ছিল। সমাপ্তি-দিবসে নরনারায়ণ-সেবা হয়।

নূতনপুকুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, কালীকীর্তন, প্রসাদবিতরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য-কীর্তন উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ ও সভাপতি বারাসতের মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সরল ব্যাখ্যা করেন।

কলাইঘাটাঃ গত ২০শে চৈত্র রাণাঘাটের নিকটস্থ চূর্ণীনদীতীরে কলাইঘাটায় রাণাঘাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন পবিত্র অনুষ্ঠানের সহিত পালন করা হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের নরনারী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি ও আনন্দ-কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় সংঘের সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদস্পর্শপূত স্থানটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে পর স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সরল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য—নদীতীরে বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়াতলে উৎসব এবং সেইখানেই সহস্রাধিক নরনারায়ণের একত্র প্রসাদগ্রহণ।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে উৎসবের সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতি দোমড়া, (বর্ধমান)। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া, (পূর্ণিয়া)। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, খড়ি-বেড়িয়া, বজবজ। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব-সমিতি, তারকেশ্বর, (হুগলী)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পূঃ পাকিস্তান)। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খেপুত (মেদিনীপুর)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চক্ কাশীপুর (২৪ পরগণা)। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ঢাকুরিয়া।

টোকিও: জাপানের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৪শে মে অপরাহ্নে—

টোকিওতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষে একটি সভায় ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ডক্টর পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন জড়বাদী বা যুদ্ধবাদীদের আবেদন ভারতীয় মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না; বেদান্ত দর্শনের প্রতিমূর্তি স্বার্থশূন্য মহাপুরুষেরাই জীবন দিয়ে সে দেশে শিখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনায় পার্থিব শক্তি, সম্পদ ও গৌরব অতি তুচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভারতের এই ঐতিহ্যের ধারা বর্তমান যুগের ইতিহাসে নিয়ে এসেছেন। স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর প্রেরিত বাণীও সভায় পঠিত হয়।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান

খাদ্য: জাতিসংঘের সদ্যঃপ্রকাশিত (১৯৫৯) বার্ষিক পরিসংখ্যানের যে ৪০টি দেশের হিসাব আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ভারতের খাদ্যমান সর্বাপেক্ষা কম। ১৯৩৪-৩৮ খৃঃ এক জন ভারতীয়ের খাদ্যমান ছিল ১,৯৫০ ক্যালরি, ১৯৫৪-৫৬ খৃঃ উহা দাঁড়াইয়াছে ১,৮৯০। ইহার পরবর্তী হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

পুস্তক: উক্ত পরিসংখ্যানে আরও প্রকাশ: যে ৭টি দেশ সর্বাপেক্ষা বেশি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে তন্মধ্যে ভারত পঞ্চম। সোভিয়েত রাষ্ট্র (U. S. S. R.) প্রথম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) ষষ্ঠ। এই দেশগুলি ১৯৫৮ খৃঃ ১০,০০০-এর বেশি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে।

সংবাদপত্র: প্রতি হাজার জনে সংবাদপত্র প্রচলন এই কয়টি দেশে সর্বাধিক:

যুক্তরাজ্য (U. K.)	৫৭৩
সুইডেন	৪৬২
ফিনল্যাণ্ড	৪২০
জাপান	৪০০

[United Nations' Statistics হইতে সংকলিত]

মস্কোতে বুদ্ধ-দিবস

মস্কোতে সিংহলী দূতাবাসে বুদ্ধপূর্ণিমা (১১ই মে) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বিখ্যাত সোভিয়েত পণ্ডিত অধ্যাপক রোরিচ (Prof. Yuri Roerich) বলেন: রাশিয়াতে বৌদ্ধ দর্শন ও কৃষ্টি গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আলোচিত হইতেছে; সম্প্রতি রাশিয়ান একাডেমি হইতে প্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর ৩১তম খণ্ডে 'ধম্মপদ' অনূদিত হইয়াছে মূল পালি হইতে রাশিয়ান ভাষায়।

সিংহলের রাষ্ট্রদূত ডক্টর মললশেখর, এখন মস্কো বিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। এই সভায় তিনি বলেন, বুদ্ধের প্রধান শিক্ষা অহিংসা ও যুদ্ধবিরতি। ভারত, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড ও জাপানের রাষ্ট্রদূতগণও নিজ নিজ দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে বলেন।

[Tass হইতে সংকলিত]

বিশ্বশান্তি

শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় ছয় জন বিশ্ববিখ্যাত নোবেল 'শান্তি' পুরস্কার-প্রাপ্ত মনীষী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিবসব্যাপী একটি সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন।

ক্যানাডার মিঃ লেস্টার পিয়ার্সন উহার সভাপতি, অন্য পাঁচজন সভ্য: স্কটল্যাণ্ডের মিঃ জন বয়েড অর, বেলজিয়ামের রেভাঃ পায়ার, ইংলণ্ডের মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকার ও সার নর্মাল এঞ্জেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ র‍্যালফ বুঁশে।

[রয়টার

উদ্বোধন

গঙ্গাস্তুতি

অভিনব-বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥

পাপপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥

[মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত 'গঙ্গাষ্টকম্' হইতে]

নারায়ণের চরণকমলের অপরূপ মৃণাল-লতা, মদনজয়ী মহাদেবের জটাজালের মালতীমালা, মুক্তিলক্ষ্মীর বিজয়পতাকা স্বরূপ ইনি কে জানি না, ইঁহার জয় হউক। কলিকালের কলুষনাশিনী জাহ্নবী আমাদিগকে পবিত্র করুন।

পাপনাশকারিণী, দুষ্কৃতি-নিবারিণী, তরঙ্গভঙ্গিমায় ধাবমানা, পর্বতবিহারিণী, হিমালয়গুহাবিদারিণী ঝঙ্কারমুখরিতা, শ্রীহরির চরণধূলা সিক্তকারিণী মঙ্গলময়ী গঙ্গার বারিধারা সর্বদা আমাদিগকে পবিত্র করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

বাধ্যতামূলক সেবা ও শিক্ষা

দেশরক্ষার জন্য সামরিক বিভাগের স্থান যদি হয় প্রথম সারিতে, শিক্ষাবিভাগের স্থান ঠিক তাহারই পিছনে দ্বিতীয় সারিতে। বিশেষতঃ যে দেশের সীমান্ত বিপন্ন, সে দেশকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার দিকে। জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও শৃঙ্খলা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাও শিখিতে হইবে। শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা দেশ রক্ষা করা যায় না, দেশের সাধারণ উন্নতি-সাধনও সম্ভব নয়। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিক্ষার সহিত শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন।

ছাত্র-বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া কয়েক মাস পূর্বে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম, ব্যাপারটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সমস্যা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার বর্ষশেষে ঋতুচক্রের পুনরাবর্তনের' মতো আবির্ভূত হয়।

তবে শুভ লক্ষণ এবার এই যে শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্যাপারটি সব দিক দিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ-বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষগণের মতামত আহ্বান করেন, কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য (Chancellor) সেই প্রদেশের উপাচার্যগণকে লইয়া আলোচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় - সাহায্য - মঞ্জুরি - সমিতি (U.G.C.) কিছু কাল পূর্বে এই সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁহারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বহুক্ষেত্রে তাঁহারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাহির হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলাভঙ্গে উত্তেজিত করে। এ বিষয়ে কমিটির প্রস্তাব: রাজনৈতিক দলগুলি যেন ছাত্রদের লইয়া টানাটানি না করে; শিক্ষার পবিত্র প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে।

ছাত্রদের অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিচিত্র রূপ ও বহুবিধ কারণ তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান— শিক্ষার সহিত পরীক্ষার যোগাযোগের অভাব। পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে, কিন্তু সহসা কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার অভাব দূরীকরণে কমিটির প্রস্তাব: ছাত্রানুপাতে শিক্ষক-সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, এবং শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন দিতে হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে তবেই শিক্ষার, শৃঙ্খলার ও ছাত্রদের উন্নতি হইবে; নতুবা নয়।

উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিহীন বহু ছাত্র কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, এবং শিক্ষালয় বাজারে পরিণত হয়। ছাত্র-ভরতির ব্যাপারে গুণানুসারে নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। যাহারা উচ্চশিক্ষায় আসিতে পারিল না, তাহাদের জন্য শিল্প- ও জীবিকাশিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যাহাদের উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা আছে

তাহারা যাহাতে উপার্জনক্ষম হইয়া সান্ধ্য শ্রেণীতে এক-একটি বিষয় পড়িতে পারে, এরূপ কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহা হইলে আর উচ্চশিক্ষার দ্বার কাহারও নিকট চিরতরে রুদ্ধ করা হইল না।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় অবলম্বিত 'আইন অমান্য'-নীতিটি ছাত্রেরা জীবন-নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং রাজনৈতিক নেতারাই আজ তাহাদের জীবনের আদর্শ, ইহাও কমিটির দৃষ্টি এড়ায় নাই।

সংবাদপত্রে রাজনীতি ও ছাত্র-আন্দোলনের সংবাদগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই ছাত্রেরা ঐ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করে। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে দেশের নেতা হইবার পথ প্রস্তুত হয়,—একথা আজকাল স্কুলের ছাত্রেরাও বুঝিতে শিখিয়াছে।

ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেইজন্যই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বাড়িতেছে,—কমিটির এ কথার তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দু-চার জন হয়তো ১৪।১৫ বৎসর বয়সে উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে, কিন্তু অধিকাংশই করে ১৬।১৭ বৎসরে। অথচ এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীদেশমুখ বলিতে চাহিয়াছেন, অতি অল্প বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া আরম্ভ না করিয়া মাঝে এক বছর বাধ্যতামূলক জাতীয় সেবায় কাটাইয়া ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হউক,—এ প্রস্তাবেরও তাৎপর্য দুর্বোধ্য!

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিয়া শেষে আমরা এইটির সমালোচনা করিব।

কমিটি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। শিল্প ও জীবিকার্জনের বিদ্যালয়-সমূহে—যেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ব্যবহার শান্ত, সংযত; তাহাদের মধ্যে একটা দায়িত্বের ভাবও লক্ষিত হয়।

শিক্ষার মাধ্যম ছাত্রদের অশান্তি ও অসন্তোষের আর একটি কারণ, ইংরেজী আজ-কাল অনেক ছাত্রই বুঝে না; অথচ ছাত্রের মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। দুই মিলিয়া ছাত্রের মন একটা হতাশা ও বিফলতার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন পড়াশুনার বাহিরে সে যে আনন্দ পায়, যে সার্থকতা অনুভব করে, তাহাতেই সে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়। ছাত্র-পরিষদগুলি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি-গুলিকে কমিটি বলিয়াছেন, ছাত্রদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগ শীঘ্র মিটাইয়া দিবার প্রয়াস করিলে ছাত্রেরা কর্তৃপক্ষকে শ্রদ্ধা করিবে। কোন ছাত্রের গুরুতর দুর্ব্যবহারের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। অবশ্য শাস্তি দেওয়াই শিক্ষকের বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়, সংশোধনের জন্য এবং প্রতিষেধক হিসাবেই শাস্তি দিতে হইবে। শিক্ষকেরাই ছাত্রদের বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথ-পরিদর্শক। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে চমৎকার উপাদান আছে, তাহারাই আমাদের ভবিষ্যতের আশা, উপযুক্ত শিক্ষা ও সময়োপযোগী নির্দেশ পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই দেশকে গৌরবান্বিত করিবে।

ছাত্রদের শৃঙ্খলা-শিক্ষা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা রচনা করার জন্য আর একটি কমিটি গঠিত হয়, তাহার নাম **'জাতীয় সেবা কমিটি'** (National Service Committee)। ইহার সভাপতি স্বয়ং শ্রীদেশমুখ, তিনি অনুমোদন করিয়াছেন: বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে নয় মাস বা এক বছর সামাজিক

বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন সেবাকার্য করিতে হইবে। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরই তাহারা এই বাধ্যতামূলক সেবাকার্যে নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলে দেশ-সেবার সহিত শৃঙ্খলা-শিক্ষার পর একটু পরিণত বয়সে অর্থাৎ একবৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হইয়া শান্তভাবে তাহারা পড়াশুনা করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনায় সামরিক শৃঙ্খলা-শিক্ষা, শারীরিক পরিশ্রম এবং কিছু সাধারণ শিক্ষাও অন্তর্গত হইতে পারে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ভার থাকিবে—এজন্য গঠিত একটি জাতীয় পরিষদের (National Board) উপর। ইহা চালু করিবার পূর্বে শিক্ষাবিদ্‌গণ, শাসন-বিভাগের কর্মচারিগণ এবং দেশরক্ষা-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ মিলিয়া শিক্ষা-সূচী ও কর্মসূচী প্রস্তুত করিবেন।

গত ১৫ই ও ১৬ই জুন পুনার জাতীয় আরক্ষা শিক্ষায়তনে (National Defence Academy) অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-গণের সম্মেলনে শ্রীদেশমুখ আমাদের বর্তমান উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া শৃঙ্খলা-শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দিয়া বাধ্যতা-মূলক জাতীয় সেবার পরিকল্পনাটি আলো-চনার জন্য উপস্থাপিত করেন। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলেন : সমাজের কোন সেবা না করিয়া যুবকেরা সমাজের নিকট সুখ-সুবিধা আশা করে। তাহারা কর্তব্য না করিয়া অধিকার দাবী করে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহারা দেশের সেবা করিতে শিখিবে, শৃঙ্খলা শিখিবে, ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইবে।

কেহ কেহ সমালোচনা করেন, যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলক জাতীয় সেবার কর্মসূচী থাকিলেও শান্তির সময় থাকা উচিত নয়। তাহাদের উদ্দেশ্যে ডঃ শ্রীমালীর উত্তর : যদিও দেশে এখন তেমন কোন সঙ্কট নাই, তথাপি সীমান্ত আর পূর্বের মতো নিরাপদ নয়, দেশের অন্ত-র্নিহিত শক্তি সর্বদা সংগঠিত করিয়া রাখিতে হয়, উহা শান্তিকালেও কাজে লাগিবে, সঙ্কট-কালেও কাজে লাগিবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাও দেশমুখ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন, তিনি এই প্রস্তাব সর্বতোভাবে সমর্থন না করিয়া ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত, এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-মূলক ভাবে ছোটখাটো একটি অগ্রগামী দলের ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তবে ইহাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ প্রস্তাব-টির মহৎ উদ্দেশ্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন, এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ডিগ্রি কলেজে যাইবার পূর্বে একটি বৎসর শৃঙ্খলা, সহ-যোগিতা, জাতির সেবা প্রভৃতিতে কাটানোর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন; তবে তাঁহারা সরকারকে পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে বলেন, শিক্ষাসূচী প্রস্তুত ও শিক্ষক-শিক্ষণের পর সকলের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া তবে এই ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা চালু করা উচিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনে ব্যাপারটি গুরুতর, তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যাটির প্রকৃত রূপ ও সমাধান-প্রচেষ্টার প্রস্তাব-গুলি আমরা উপস্থাপিত করিয়াছি। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় সমস্যা, আবার প্রত্যেক ঘরেরও সমস্যা। প্রত্যেক পিতামাতা, অভি-